॥ প্রথম পর্ব ॥

সত্যানন্দ স্বামী

প্রথম প্রকাশ ঃ
ভাদ্র—১৩৭৬

প্রকাশক ঃ
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮ শ্যামাচরণ দে
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ
অশোক ভট্টাচার্য
শোভনা প্রেস
১/১ জ্ঞাননগর রোড
কলিকাতা-১৭

১ থেকে ২৫ ফর্মা
সুরেন জানা
মর্মবাণী প্রেস
১৭/এ যুগীপাড়া বাই লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

দাম ঃ ১৬·

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে আমি নানাকারণে সংকোচ বোধ করেছি। বইয়ের লেখক নিজেই তাঁর প্রকৃত নাম দিচ্ছেন না। এক্ষেত্রে ভূমিকা লেখকের নামটা দেওয়ার দায়িত্ব অনেক। অথচ যিনি লিখেছেন, তিনি যে লিখতে পারেন, একথা পাঠকমাত্রেই কয়েকটি পাতা পড়লেই স্বীকার করবেন। আর তাঁর লেখবার অধিকারও আছে। তিনি একজন ক্ষুরধার লেখক বলেই পরিচিত। তাছাড়া, তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন। তারও ওপরে একথা জানা দরকার যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাবতীয় তথ্য—বিশেষ করে যা সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়ে আছে—তা সব কিছু সামনে রেখেই তিনি এই ইতিহাস লিখেছেন। আবার বলি, লেখকের লেখবার অধিকার আছে, যোগ্যতা আছে, এবং অনবদ্য লেখনীশক্তিও তাঁর আছে। কাজেই, এই ইতিহাস সবাইকে পড়তে আমি অনুরোধ করি।

বইখানা বেশ বড়ো হয়েছে, কিন্তু কত বড়ো হয়েছে? ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে যে মহাভারতীয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, তার একটা সমীক্ষা করা কি সহজ কাজ? লেখক কোন ইতিহাস লেখেন নি, আধুনিক মহাভারতীয় ইতিহাসের পর্যালোচনা করে গুটি কয়েক সারবস্তু পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এ কেবল ঘটনার পরিবেশন নয়, ঘটনার তাৎপর্যও। আজ একথা ভাবতে অবাক লাগে, আমরা এই মহাভারতীয় পর্বের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবটাই দেখেছি, এবং এই নাটকে কিছু না কিছু অংশও নিয়েছিলাম! কাজ করেছি, জেল খেটেছি, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু সবটা কী হচ্ছে—কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কেন চলেছি, কে চালাচ্ছে এবং কেন শেষ পর্যন্ত মহাভারতেই মত একটা ট্রাজিক উপসংহারে এসে পৌঁছোলাম—এর একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সিংহাবলোকন করতেও আজ ভয় লাগে, সত্যিই ভয় লাগে। হয়তো অনেকেরই ভয় লাগে, তাই অতীতের দিকে নজর দিতে মন চায় না।

কেন ভয় লাগে? হয়তো আত্মসন্তুষ্ট হবার অথবা গৌরব অনুভব করার মত প্রত্যয় মেলে না। কেন মেলেনা? এত সংগ্রাম, এত শহীদ, এত বক্তা, এত নেতা, এত ধর্ম, এত অহিংসা, এত যোদ্ধা—এত এত কাণ্ড থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত 'স্বাধীনতা' অর্জন করা সত্ত্বেও, গৌরবে বুকটা ফুলে ওঠেনা কেন? মনের গভীরে—সমগ্র জাতির অবচেতন মনেই যেন কোথায় একটা হীনমন্যতা বা অপরাধবোধ ঢুকে আছে। অপরাধবোধের মন্ত্র-চেতনা কেবল যে গান্ধীপন্থীদের, কংগ্রেসীদেরই থাকা স্বাভাবিক বা উচিত তা নয়, এ অপরাধবোধ বিপ্লবীদের, কম্যুনিস্টদের, সোশ্যালিষ্টদের—সকলেরই অল্পবিস্তর থাকা স্বাভাবিক ও উচিত। তা যদি না থাকে, এই স্বীকৃতিটুকুও যদি না থাকে, তবে বুঝবো আমাদের আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। সত্যিকার আত্মসমালোচনা না হলে আমাদের দুষ্ট অহংবোধ থেকে, অভিমান থেকে পরিত্রাণ নেই, ভুল সংশোধন করায় উপায় নেই। এই জন্যেই যত তিক্ত; যত বেদনাদায়কই হোক এই ইতিহাস—চোখ-বুঁজে একে অস্বীকার করায় লাভ নেই।

ঢাক পিটিয়ে, ধ্বজা উড়িয়ে, মিটিং মিছিলে আমাদের অতীতের যাবতীয় কমিশান ও ওমিশানের অপরাধ ও দুর্বলতাগুলোকে যতই চাপা দেবার চেষ্টা করিনা কেন, ইতিহাস লেখার নামে ইতিহাসকে চাপা দেবার চেষ্টা করিনা কেন, সে সব অপরাধের সূক্ষ্ম বীজাণুগুলো আমাদের বর্তমানকেও—আজকের চলার পথকেও দুষ্ট ও দুর্বল করতে থাকবে। আমরা ইতিহাসকে ভুলতে চেষ্টা করলেও ইতিহাস আমাদের ভোলে না, আর আমরা তো ইতিহাসেরই সন্তান—সে রক্ত তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমরা অবশ্যই আবার ১৯২৮ সালে ফিরে যেতে পারি না—বা ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের কার্যকলাপ ক্রটিহীন ভ্রান্তিহীন ভাবে পুনরায় পরিচালিত করার সুযোগ পেতে পারিনা—যা অতীত তা অতীত। তবু অতীতের অবশেষ ও রেশ শূন্য হয়ে যায়না, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে আমাদের চাল চলন চরিত্র স্বভাব ব্যবহার আচরণ ইত্যাদিতে তাৎপর্য-পূর্ণ দুরপনেয় রেখাঙ্কন সৃষ্টি করে যায়। সেগুলো তখন ভূতের মত আমাদের আশ্রয় করে থাকে। কাজেই আত্মসমালোচনা ও আত্মশোধনের জন্য ইতিহাসকে অমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা

করার দরকার থাকে। অতএব আমি পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ করবো যে, বইখানা পড়লে হয়তো মনটা তিক্ত হবে, বিষণ্ণও হবে—তবু পড়ুন। এবং সবটাই লজ্জা বা বেদনা ও বিষণ্ণতার কথা নয়। অমন জটিল, অন্ধকার, পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত গতির মধ্যেও মাঝে মাঝে অমর শহীদদের উল্কাসদৃশ, উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর মত দীপ্যমান, দৃষ্টান্তগুলোও জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের আত্মবিশ্বাসের উপাদান হয়ে বর্তমান আছে, যাঁদের ঔজ্জ্বল্য, যাঁদের দীপ্তিকে ম্লান করে দেবার জন্য, মুছে ফেলে দেবার জন্য ইংরেজ, কংগ্রেস ও পরবর্তী যুগে সরকারী ঐতিহাসিকেরা অনেক চেষ্টা করেছেন--এক রকম ঐকতানে ঐক্যবদ্ধভাবে।

যুগে যুগেই ইতিহাসের পুনর্লেখন কর্মটি (rewriting the history) চলে। পুনর্লেখন হয় শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই। এবং যেমন যেমন শাসকশ্রেণী পাল্টায়, ব্যাখ্যাও পাল্টায়। অনেক অবহেলিত দিক মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে, আবার বহুঢক্কানিনাদিত ব্যাপারও পিছনে চাপা পড়ে যায়। স্বাধীন ভারতে এতকাল যে দল একচেটিয়া রাজত্ব করে এসেছিল, তাদের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেওয়া ইতিহাসেরও লয় ঘটবে, আবার যাঁরা ক্ষমতায় আসছেন তাঁরা তখন ইতিহাস নতুন করে লিখবেন সন্দেহ নেই। ফলে, ইতিহাস কখনো মৃত নয়, জীবন্ত একটি ধারা। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের ইতিহাসও আবার নতুন করে গড়া ও বোঝার চেষ্টা চলবে। এবং বর্তমান লেখক যেভাবে তা দেখেছেন সেটাই যে সব তাও হয়তো কেউ মনে না করতে পারেন—তবে লেখক যেভাবে যত তথ্যের সঙ্গে গোটাকয়েক প্রশ্ন ও তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তার বিচার বিবেচনা সকল ইতিহাস-পাঠক—বিশেষ করে যারা বিপ্লববাদী ঐতিহ্যের অনুসরণকারী পাঠক—তাদেরকে করতেই হবে।

লেখক নিজেই বলেছেন "কারো সাধ্য নেই এই মহাভারতের সংগ্রাম পর্বকে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করতে পারেন। যাঁরা এর ভেতর দিয়ে এসেছেন তাঁদের পক্ষেও এর গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কেউ তা যথাযথ সঙ্কলন করেননি। এর মধ্যে থেকে মোটা দাগগুলো লক্ষ্য করলেই বহু খণ্ডের মহাকাব্য হবে। আমি সে চেষ্টা করবোনা। একটা ভগ্নাংশ বলে যাই।" বলা উচিত ছিল, একটা

সারাংশ বলে যাই। এটুকু বলতে গিয়েই পাঁচ'শ পৃষ্ঠা বই হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজনও উপস্থিত হয়েছে। তিনি আরও লিখছেন বলেই শুনছি। না লিখলে সত্যিই অসম্পূর্ণ হবে। এই খণ্ডের শেষের দিকটা এত তাড়াতাড়ি এত সংক্ষেপ করেছেন যে, তাতে পাঠকের পক্ষে এত দ্রুতলয়ের নাটকের শেষ অঙ্কগুলোর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। অবশ্য একথা ঠিক, আপোষকামী রাজনীতির গতির লয় সর্বদাই একপা এগিয়ে দুপা পেছনে চলার জন্য অত্যন্ত মন্দাক্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু শেষ অঙ্কে এই আপোষকামী নেতৃত্বের হাতে নেতৃত্ব কিছুই ছিলনা, ঘটনার মালিক না হয়ে শেষ পর্যন্ত উপর্য্যুপরি প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—একটা কলঙ্কজনক পরাজয়কে "জয়-জয়" বলে বিঘোষিত করার গৌরব প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল। শেষ অঙ্কের এই ঘটনাবলী দ্রুতলয় বুঝতে চেষ্টা করলে আজও আমাদের মাথা ঘুরে যায়। যে ভারতে শত শত বছর ধরে তেমন কোন ঘটনাই ছিল না—মনে হতো এই অচলায়তন সমাজে গতিবেগ সৃষ্টি হবে কবে—শেষ কালটায় যেন হাজার বছরের বিলম্বিত ঘটনাসমূহ এক একটা রক্তমাখা দৈত্যের মত আমাদের আছড়ে পিছড়ে দুমড়ে দলে যেতে লাগলো। এগুলো বোঝবার জন্য আরও অনেক বইয়ের দরকার, আরও অনেক সত্যসন্ধানী লেখকের দরকার। একার পক্ষে, বিশেষ করে, কোন দরিদ্র লেখকের পক্ষে, এ কাজ করা সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। আর সকল দিক থেকেই বিষয়টি যেমন দরকারী, তেমনি ইন্‌টারেষ্টিং।

লেখকের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো দেখানো যে, আমাদের দেশের সকল সংগ্রাম বা আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিলো—গোল টেবিল বৈঠক। সংগ্রামটা একটা চাপ সৃষ্টি মাত্র—আসল লক্ষ্য, কবে গোলটেবিলে বসা যাবে। ফলে, সংগ্রামটা এড়ানোই যেন সংগ্রামের লক্ষ্য। লেখকেরই ভাষায়, "যে-কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ওরা বাক্‌সর্বস্ব দুষ্ট ক্যান্‌সার মনে করেছিল সেই বৈধ পার্লামেন্টারী পথই তো সর্বাংশে সত্য হয়ে উঠলো ভারতীয় জীবনে, সাইমন থেকে কেন, মন্টেগু-চেমসফোর্ড থেকে মাউন্টব্যাটেন অবধি কোথাও তো এর ছেদ ঘটেনি, সংগ্রাম, আন্দোলন ভারতীয় জীবনে সত্য নয়, সত্য

গোলটেবিল বৈঠক।" এ ধরণের চার্জ অতীতে আরও অনেকে করেছেন, কিন্তু বর্তমান লেখক যেভাবে এবং যতভাবে এই চার্জ বা অভিযোগকে অজস্র উদাহরণের সাহায্যে উপস্থিত করেছেন তা আজও পর্যন্ত কোন বামপন্থী লেখক এত জোরের সঙ্গে করতে পারেন নি। এর সম্যক উত্তর দিতে অতিবড় গান্ধীবাদীকেও হিমসিম খেতে হবে। আর, একথাও তো সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতার আইনটি বিলেতের পার্লামেণ্টকেই দিতে হয়, আমরা নিজেদের জোরে নিজেরা নিজদেশে তা তৈরী করিনি!

আর এই স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা খণ্ডিত ভারতে কী করে রূপায়িত হতে পারে? পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাপারটি কেবল একটি ভৌগোলিক ব্যাপার নয়, মানে, দেশ ছোট হলেও স্বাধীনতা, বড় হলেও স্বাধীনতা, অখণ্ড ভারতেরও স্বাধীনতা ও কয়েক খণ্ডে খণ্ডিত ভারতেরও স্বাধীনতা— স্বাধীনতা হলেই হলো—এই কি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য? খণ্ড কখনো সম্পূর্ণের সমান হতে পারে—অথবা সম্পূর্ণের ঐশ্বর্য ও মহিমা অর্জন করতে পারে? স্বাধীনতা তো কেবল কতখানি জমি দখলের লড়াই নয়। তার সামাজিক, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সারবস্তু যদি হারিয়ে যায়, তবে কি অবশিষ্ট মেটিরিয়াল প্রাপ্তিটুকু আমাদের প্রাণ মন ও চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ রাখতে পারে? এ তো সীমার মধ্যে অসীমের স্বাদ অনুভব করার মত, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের স্বাদ পাওয়ার মত ব্যাপার নয়! হ্যাঁ, আমরা জনকয়েক এই খণ্ডিত দেশের এপারে ওপারে ক্ষমতা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আদর্শ আমাদের চেতনার আকাশে যা কিছু রঙিন চিত্র একদিন উপস্থিত করেছিল—তা সব শেষ পর্যন্ত কালোয় কালো হয়ে গেলো। স্বাধীনতা আমাদের মুক্তি না হয়ে নানা সমস্যার জাল হিসেবে আজ আমাদের বেড়ে ধরেছে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, আমাদের হাজারো বছরের জাতি পাতি, সংস্কার ও দারিদ্রের বোঝা বহন করতে হয়েছিল, একথাও ঠিক, এতবড় একটা দেশের এত সমস্যা-জর্জ্জরিত পরাধীনতা সহসা ফেলে দেওয়ার কাজটা সহজ নয়—কিন্তু এত বড় বোঝা বইবার শক্তি আমাদের একটাই থাকতে পারে—সে হলো এক অপরাজেয় আদর্শবোধ। সেই আদর্শ সৃষ্টি করার একমাত্র কাজেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের। কিন্তু যেদিন আমরা এক জাতি নই বলে নিজেদের মেনে নিলাম—সেদিন ভারতীয়

জাতীয়তাবাদের মধ্যে সেই আদর্শকে কবর দিয়ে দিলাম। খণ্ডিত ভারত একটা পেলাম বটে—আমরাও পেলাম, পাকিস্থানীরাও পেলো, কিন্তু একজাতি একপ্রাণ একতার ভারত—ধর্মনিরপেক্ষ মানব-সভ্যতার মিলন ক্ষেত্রের ভারততীর্থের আদর্শের বিনিময়ে যা পেলাম—তাতে আজ মনে হচ্ছে, আমরা কোথায় যেন মূলেই বঞ্চিত হয়েছি। আজ এসব কথাই ভাববার সময় হয়েছে—দুই দেশেই—এখানে ও পাকিস্থানে।

কলিকাতা

৮.৯.৬৯

পান্নালাল দাশগুপ্ত

আরাকান যুদ্ধে যারা বৃটিশ সৈন্যদল ছেড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে এসেছেন তাদের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন অজিত সিং-এর ভাষণ.
"এই আমাদের প্রধান সেনাপতি নেতাজীর ফটো।" ভারতবর্ষকে পরাধীন-মুক্ত করাই আমাদের কাজ।
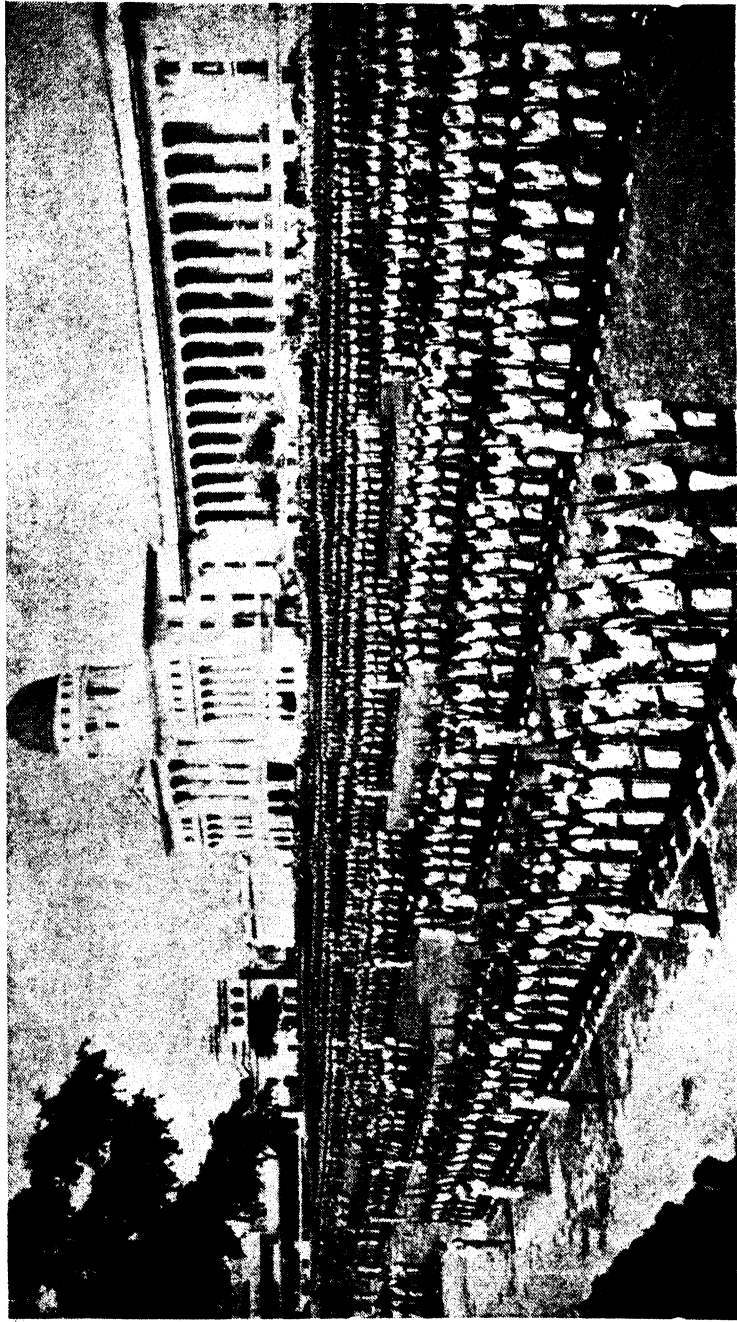
সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ।
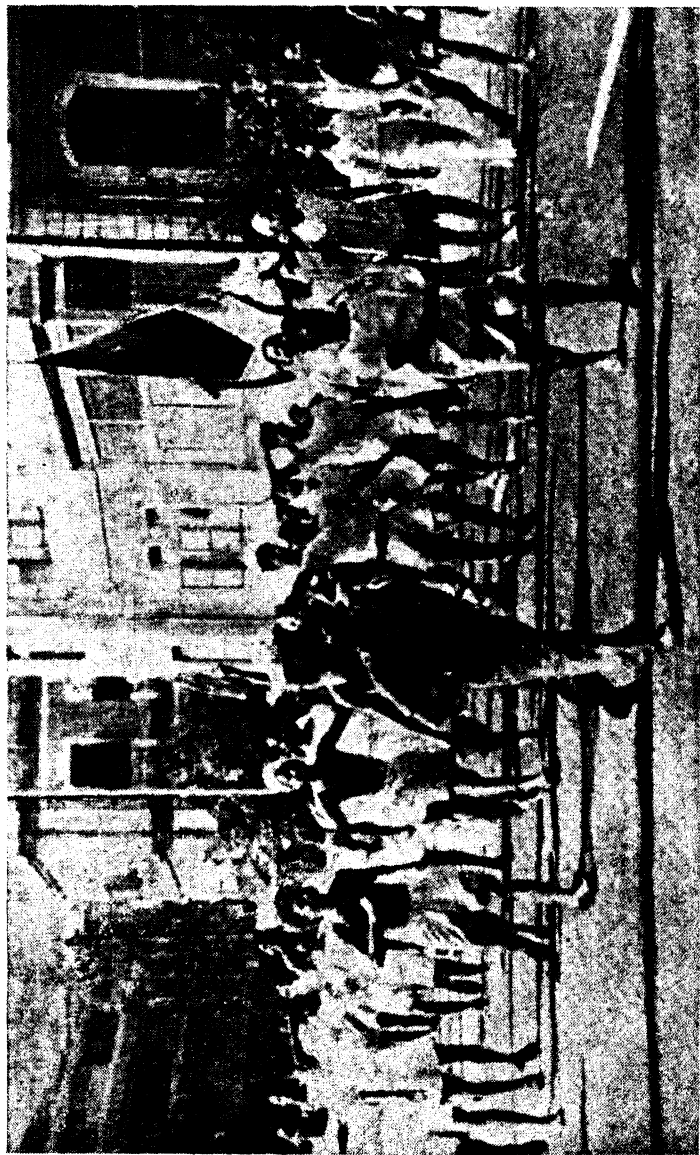
ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংরা 'তলোয়ারে' গুলিবর্ষণের সংবাদে উত্তেজিত।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আলোচনায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও মাউন্টব্যাটেন ।

হে অতীত কথা কও !

হিমেল হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছিল পতাকাটা।

থরথর করে কাঁপছিল আমার দেহটাও—উত্তেজনায় উদ্দীপনায়। স্বাধীনতা সঙ্কল্পের তে-রঙা ঝাণ্ডা; সমুন্নত গৌরবে আকাশের কোলে সদ্যজাত স্নেহের পুত্তলি মুখ ঘষছিল যেন।

না, সত্য, ১৯২৯/৩০-এর সন্ধিক্ষণে শীত উপেক্ষা করে যারা সেই রাতে পতাকাদণ্ডের নিচে দাঁড়ায়নি, ঊর্ধ্বচক্ষু হয়ে অস্থির চাঞ্চল্যে সেই পতাকাকে অভিবাদন করেনি, তারা আমার এই তীব্র অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার আশেপাশে চারিদিকে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ—সমগ্র ভারতের জীবন্ত মানচিত্র প্রসারিত, সব-প্রাণে একাকার ভারতমাতা; সবার মুখে ঐ এক সঙ্কল্পবাক্য—স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা, ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহদীপ্ত ঐ এক বাণী—বন্দেমাতরম্।

মুখেও বলিরেখা পড়েছে অনেক, এমনিতে চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ, মাঝে মাঝে ঐ ম্লানিমা ভেদ করে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে যেন, পাণ্ডুর মুখে সহসা রক্ত-বন্যা!

কত বয়স হবে? ষাটের নিচে নয়, সত্তরও হতে পারে। জীর্ণ এই কুটিরে একখানা তক্তপোষের ওপর বিশৃঙ্খল অসংখ্য পুরোনো বইয়ের মাঝে একটুকু শোবার জায়গা, বসবার জায়গা, পড়বার লেখবারও জায়গা। ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন, আল্‌গা উনুন আর রান্নার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। কে কি করে দিয়ে যায় অথবা এখনও স্বপাক স্বাবলম্বী কি না প্রশ্ন করতে কুণ্ঠা জাগে। আর এক কোণে কিছু আবর্জনার মধ্যে একটা চরকার আভাস পাওয়া যায়,

নিঃসংশয়ে অব্যবহৃত ; কিন্তু গায়ে এখনও খদ্দর—ছেঁড়া ; পরনেও অমনি মোটা কিছু, মালিন্যে ঠাওর করা কঠিন ; খালি পা-জোড়া চৈত্রের নীরস আঙিনার মত ফাটা। জীবনকে সুন্দর করবেন বলে যিনি সুন্দর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, জীবনে তাঁর এত বীতস্পৃহা ; যা-কিছু আসক্তি ঐ এক রাশি বইয়েই।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন ঃ

লাজপৎ রায় নগরের এ রাতটি আর কখনো ফিরবে না, রাত বারোটা ; ২৯-এর বারোটার কাঁটা গড়িয়ে এল ১৯৩০-এ ; কোথাও সুষুপ্তির লেশমাত্র নেই ; গোটা লাজপৎ রায় নগরটাই জেগে। হ্যাঁ, লাজপৎ রায় নগর ; আজকের ভারতের মানচিত্রে এই নগরকে খুঁজতে যেও না যেন ; পৃথিবীর মানচিত্রেও এর কোন অস্তিত্ব নেই। পররাষ্ট্র, বিদেশী রাষ্ট্র, বৈরী রাষ্ট্রের নামী শহর লাহোর, ঐ লাহোরেরই কোলে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সদ্য প্রাণ-দানের স্মৃতিতে গড়া হয়েছিল অখণ্ড ভারতের লাজপৎ রায় নগর ; সারা ভারত ছোট্ট সংক্ষিপ্ত হয়ে এখানে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সমবেত হবে বলে। প্রাণপাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের আপোষ নয়, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার চূড়ান্ত শপথ নেবেন। একটু আগে নিলেন, তারই পতাকা উঠল এইমাত্র ঝাণ্ডা-চকে—উড্ডীন ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকা।

হ্যাঁ, এইজন্যই তো লাজপৎ রায় সাইমন কমিশনের সামনে প্রতিরোধের বুক পেতে দিয়েছিলেন, চাই না, ফিরে যাও। সেই বুকে এসে পড়েছিল ইংরেজ রাজপুরুষ সণ্ডার্সের লাঠি। নেতা লাজপৎ রায় ছিলেন প্রতিরোধী জনতার পুরোভাগেই। একটু পিছিয়ে যাবে, সত্য ? শোনো, তবে বলি।

১৯২৭-এর নবেম্বরে বৃটিশ সরকার স্থির করলেন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি হবে তা নির্ধারণের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করা হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ এই ভাগ্য-নির্ণয়ে কোনো ভারতীয়কে ডাকা হল না ; কমিশনে স্থান থাকল না

কোনো ভারতীয়েরই। উপরন্তু ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড চ্যালেঞ্জ করলেন, করুক দেখি ভারতীয়েরা সর্বসম্মত একটি সংবিধান। ভারতীয়েরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। মতিলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্রের একটি সংবিধান রচনাও করলেন ১৯২৮-এ।

থামলেন। স্বল্পচুলের মাথায় হাতটা পীড়ন করে নামিয়ে আনলেন কপালে, নাকের ডগায়, মুখে হাতটাকে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভারতীয় রাজনীতি চিরটাকাল রাহুগ্রস্ত হয়ে আছে, তাই একদল মুসলমান যৌথ নির্বাচনে অসম্মতি প্রকাশ করতেই বিলেতের সরকার এই "ভারতীয় সংবিধানে" কর্ণপাতও করলেন না। পাঠালেন সাইমন কমিশন। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করল পূর্ণ অসহযোগিতার, বিরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের। সাইমন কমিশন ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এলে সারা ভারত হরতাল পালন করল। পাঞ্জাবে বিক্ষোভ প্রকাশের সময় যে লাঠি এসে পড়ল লাজপৎ রায়ের বুকে তাই হল মর্মান্তিক। ১৯২৮-এর ১৭ই নবেম্বর তিনি দেশমাতৃকার বেদীমূলে দেহরক্ষা করলেন।

হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন, একটু জোর দিয়ে বললেন: কিন্তু এর জন্য সণ্ডার্সকেও চরম মূল্য দিতে হল। একমাস না যেতেই বিকেল চারটেয় প্রকাশ্য রাজপথে সণ্ডার্সকে গুলী করে হত্যা করল হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মির যুবকেরা। হিংসাশ্রয়ী গুপ্তদল; তাদের সঙ্গে অহিংস গান্ধীপন্থী আমাদের মিল ছিল না। কিন্তু আজ তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করব, সত্য, সেদিনও খুশি হয়েছিলাম।

কেমন একটু বিব্রত লজ্জায় হাসলেন। আস্তে আস্তে সলজ্জ মুখ তুলে বললেন, ঐ শহীদ লালার নামেই আজকের পাকিস্থানের লাহোরে একটা রাজনৈতিক শহর গড়ে উঠেছিল এবং তাকে ছেয়ে ফেলেছিল গোয়েন্দারাও। বৃটিশ সরকার জানতেন, দেশের জাগ্রত যৌবনের যে মেজাজ তাতে তারা এবার আর চরম শপথের কমে সন্তুষ্ট হবে না কিছুতেই।

এই মেজাজের লক্ষণগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল শুধু ১৯২৯-এ-ই নয়, তারও আগে থেকে, এবং ১৯২৮-এ তো বটেই ; তখন থেকেই তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ভর করেছে পূর্ণ স্বাধীনতার কঠিন সঙ্কল্প। একেবারে নির্ভেজাল বৃটিশ অধীনতা-মুক্ত, বৃটিশ-প্রভাব-বিরহিত নিঃশর্ত স্বায়ত্ত পূর্ণ স্বাধীনতা, চাই, এবং এখনই চাই।

বৃটিশ শক্তির একমাত্র ভরসা ছিল অহিংস আপোষকামী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রত্যাশায় বসেছিলেন বিদায়ী ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের রাত বারোটা অবধি। বিশ্বাস ছিল অপরিসীম ; আমাদের মধ্যেও সে বিশ্বাস সংক্রামিত, অনুরণিত। ১৯২৮-এ কলকাতার কংগ্রেসে এক বছরের নোটিশ চেয়েছিলেন তিনি ; সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। বিজ্ঞজনদের কাছে হেরে গেছলেন। সেদিনকার অন্য এক যৌবন-মুখপাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুও সামিল হয়েছিলেন ঐ বিজ্ঞজন-দলে। পিতা ছিলেন কংগ্রেস অধিবেশনের, সুতরাং, কংগ্রেসেরই প্রেসিডেণ্ট। আমরা—আমি ছিলাম তাঁদেরই অনুগামী। সুভাষের যৌবনাভিযানকে ভ্রান্ত গণ্য করেছি, উৎসাহের আতিশয্য ভেবেছি।

সুতরাং, সংখ্যাভারে কলকাতা কংগ্রেসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিল। গান্ধীজী কী জয়। বিশ্বাস ছিল এই এক বছরে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস আসবেই, ইংরেজের সুমতি বা মনের পরিবর্তন হবেই।

পুরো ২৯ খ্রীস্টাব্দটা গড়িয়ে গেল, ১৯৩০-ও ছুঁয়ে এগোলো। এল না তো অপরিমেয় বিশ্বাসের সুধাপাত্র ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস।

রাত বারোটার কাঁটা দাঁড়িয়ে যেতেই কংগ্রেসের সেই বিরাট চন্দ্রাতপতলে আমাদের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে গেল। জাগল আর এক স্বপ্ন, নতুন এক সূর্য, বহু আশায় লালিত পূর্ণ স্বাধীনতার। গান্ধীজীই প্রস্তাবটি তুললেন। কিন্তু ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস স্বপ্নভঙ্গের খেদ ছিল তাতে।

প্রস্তাব তুলে গান্ধীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন হিন্দীতে ; সমর্থন

করেছিলেন মতিলাল নেহ্রু, বক্তৃতা দিয়েছিলেন উর্দুতে ; কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের একটি তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র, বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। মতপার্থক্য শুধু লক্ষ্যাদর্শে নয়, ভাষাতেও প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এবারেও গান্ধীজী কী জয় এবং সুভাষচন্দ্রের পরাজয়। জয়ী বিজ্ঞজনদলে এবারও জওহরলাল নেহ্রু সামিল ছিলেন, আমরা, আমিও।

আরো দুটি উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ছিল। একটি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের, আর একটি ডাঃ আলমের।

পণ্ডিত মালব্য চেয়েছিলেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রত্যাশায় আরও কিছুকাল অতিবাহিত করা যাক—অন্তত এপ্রিল অবধি, তদ্দিন থাক প্রস্তাবটি মুলতবী। কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত সারা ভারতের শপথবদ্ধ মানুষের মনে মনে এমনি বিপরীত জোয়ার যে, ঐ প্রস্তাব তুচ্ছ তৃণের মত ভেসে গেল।

কিন্তু ডাঃ আলমের সংশোধনীর মুখে গান্ধীজীও ভেসে গেছলেন আর কি, একটু হলে ; ডাঃ আলমের পক্ষে মত এমনি প্রবল ছিল। বিষয় নির্বাচনী সভায় তো ব্যবধান মাত্র এক ভোটের, ১১৩ আর ১১৪। প্রকাশ্য অধিবেশনে অবিশ্যি ব্যবধান কিছু বেশি, কিন্তু তাও ধর গিয়ে ৬৬৪—৭৬৩। সেদিনকার মেজাজের কথা বলছিলাম না ? তা হচ্ছে এই। সেদিনও যাদের বলা হত জিঞ্জার গ্রুপ, আর আজ বলা হয় ইয়ং টার্কস, তাদের প্রাধান্য ছিল সেদিন অনুভব করার মত। আজ যাঁরা বামপন্থী— কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, কি ফরোয়ার্ড—তাঁরা একাকার, স্বাতন্ত্র্যে যূথবদ্ধ নয়, কিন্তু উচ্চারণে স্পষ্ট।

সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করলাম, ডাঃ আলমের প্রস্তাবটা কি ছিল তা বললেন না।

বলিনি ? ও। ডাঃ আলমের সংশোধনী ছিল স্বাধীনতা-প্রস্তাবের যে অংশে বড়লাটের প্রচেষ্টার প্রশস্তি আছে তা বাদ দেওয়া হোক ; অর্থাৎ, এ কথা ক'টি :

"and appreciates the efforts of the Viceroy towards the settlement of the national movement and for Swaraj."

পুরো অনুচ্ছেদটা কি ছিল ?

বলতে পারব। ভুলিনি একেবারেই। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে, কিন্তু কথা ক'টি ঠিক মনে আছে। ওতে ছিল :

"This Congress endorses the action of the Working Committee in connection with the manisfesto signed by party leaders including Congressmen on the Viceregal announcement of the 31st October relating to Dominion Status."

আর আগের অংশটুকু।

বলতে চেষ্টা করলাম : সুভাষচন্দ্রের···

তিনি আমার কথা গ্রাহ্য না করেই বললেন, সুভাষচন্দ্র যে সংশোধনী প্রস্তাব তুলেছিলেন তার দৈর্ঘ্য কিছু বড়। গান্ধীজী তো সেটিকে একটি আলাদা পুরো প্রস্তাব বলে অভিহিত করেছিলেন। আমরাও তাই মনে করেছি। ১৯২৮-এ সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা ; এবার এক ধাপ এগিয়ে। স্বাধীনতার প্রস্তাবমাত্র নয়, একটা পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যকর ব্যবস্থাও। সমর্থক ছিলেন অনেকেই, কিন্তু আমরা গান্ধীপক্ষ ছিলাম প্রবলতর। ভোটের দাবি ওঠেনি। অর্থাৎ ১৯২৮-এর পুনরাবৃত্তি হল ১৯২৯/৩০-এ। কংগ্রেস অবিশ্যি এক ধাপ এগোলো।

আবার হাতটা মুখের ওপর ছড়িয়ে দিলেন সেই রকম করে ; আঙুল ক'টির ফাঁকে ফাঁকে মানুষটির জ্বলজ্বলে দুটি চোখ আমার দিকে কিছুকাল নিবদ্ধ থাকল, কি দেখলেন কে জানে ? তারপর হাত নামালেন এবং চোখ জোড়াও নামিয়ে বললেন,

আজ তোমার কাছে স্বীকার করব, সত্য,—যদিও এ স্বীকারে কারো পক্ষেই কোনো লাভ নেই, কেননা, লোকসান যা হয়েছে তা অপূরণীয়, তবু অকপটে বলে যাব, একে তুমি dying statement বলেও নিতে পার যে, কংগ্রেস অথবা ভারতীয় রাজনীতিতে আমরা

সুভাষচন্দ্রকে সব সময় যথাযথ বুঝতে পারিনি; ১৯২৮-এ যখন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললেন তখনও নয়, ১৯২৯/৩০-এ স্বাধীনতা প্রস্তাবেরও অতিরিক্ত পাল্টা-সরকারের কথা যখন বললেন তখনও নয়। আমরা আমাদের পরিচালকদের ছকে বাঁধা মন নিয়ে বুঝেছিলাম ১৯২৮-এ পূর্ণ স্বাধীনতা চাওয়ার যোগ্যতা আমাদের হয়নি; ১৯২৯/৩০-এ পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও মনে হয়েছে হাস্যকর, ছেলেমানুষি। কিন্তু তখন বুঝিনি যাঁরা শেষ পর্যন্ত একটা স্বাধীনতা প্রস্তাব আনতে বাধ্য হলেন তাঁরা স্বাধীনতার প্রস্তাবটাকে বার্গেন কাউন্টারে একটা থ্রেটনিং হিসেবেই ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন এই বলে যে, শাসক ইংরেজ নিদেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের আলোচনায় বসতে রাজি হবে। আগাগোড়া আমি এঁদের সঙ্গেই থেকেছি এবং এত কাছে থেকেছি বলে কোন কিছুই হয়তো দেখতে পাইনি, কিন্তু আজ আমার কাছে এ কথাটি স্পষ্ট যে, ১৯২৯/৩০-এ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হলেও আমাদের নেতারা বার বার ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের খাদেই পদস্খলিত হয়েছেন, অনিচ্ছায় নয়, স্বেচ্ছায়, অচেতন অজ্ঞানতায় নয়, সজ্ঞান চেতনায়; স্বাধীনতার প্রস্তাবে অবিচল থাকলে, একথা তোমায় বলতে পারি, সত্য, এত বৈঠকের লেবিরিন্থ সৃষ্টি হ'ত না, জট পাকিয়ে পাকিয়ে শেষটায় দুই হাতে সাম্প্রদায়িকতার করাতে কেটে একটা বৈরী রাষ্ট্রের জন্মও দিতাম না। স্বাধীনতার প্রস্তাব আন্তরিক হলে আমরা আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি, সেখানে পৌঁছোতাম? ইচ্ছাকৃত শত্রুরাষ্ট্র সৃষ্টির খেসারত দিতে দিতে আমার দরিদ্র স্বদেশের সামগ্রিক কল্যাণ যে সুদূরপরাহত হয়ে চলেছে, এ বোধ হয়েছে যখন আমার, তখন আর কিছু করবার নেই।

একটু কাৎ হয়ে বালিশের ওপর হাত, তার ওপর মাথাটা রাখলেন, বোধ হয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র, আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, একটু সেই সলজ্জ হাসি মুক্ত করে বললেন, ভাবাবেগে চালিত হয়েছিলাম, কিছু মনে কোরো না, সত্য, আজ আমার এই আবেগটুকু ছাড়া কিচ্ছু নেই। কিন্তু নিষ্ঠুর ইতিহাসে ভাবাবেগের

স্থান নেই। আমি সেই নির্দয় ইতিবৃত্ত তোমায় বলে যাব, আমার ব্যক্তিসত্তা তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যদি সেই মুমূর্ষু সত্তাটি নির্বীষ ভুজঙ্গের মত মাঝে মাঝে আস্ফালন করে, ক্ষমা কোরো।

কিন্তু সত্য এই যে, স্বাধীনতা প্রস্তাবের যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারত ঐ পাল্টা-সরকারের রূপায়ণ চেষ্টায়ই। এখন অবেলায় বুঝতে পারছি, আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের একটা পা আগে ছিল সুভাষচন্দ্রের। কিন্তু সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতাদের প্রতিপদে সন্দেহ করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ভাল চোখে দেখিনি।

একটু হেসে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই বলবে, এ নৈরাশ্যের কথা, এ হতাশার কথা। হ্যাঁ, এ নৈরাশ্যের হতাশার কথা, কিন্তু কেন? ভারতের ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০-এর ব্যক্তিনিরপেক্ষ রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির তথ্যগুলো তোমায় বলে যাই, তখন আমার অপরাধ নির্ণয় কোরো।

১৯২৮-এ-ই ভারতবর্ষ বিদ্রোহের মুখে এসে পড়েছিল; তখন স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলে নেতারা ব্যক্তিনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনাকেই বাঙ্ময় ও ক্রিয়াময় করে তুলতে পারতেন; অথচ এক বছর পর ১৯২৯-এর শেষ রাত বারোটায় যখন তা করতে বাধ্য হলেন তখন বাস্তব ঘটনাক্রম অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ১৯৩০-এ কেবল বিরাট ব্যাপক লবণ-আইন অমান্যের আন্দোলন নয়, এর আগে-পরে জাতীয় আকৃতির যে বিক্ষিপ্ত অনিরুদ্ধ হিংস-অহিংস বিদ্রোহের অভিব্যক্তি ঘটেছিল ভারতবর্ষে, কোনো অভ্যুত্থানের সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। ১৯৩০ একক, অনন্য, অসাধারণ। ১৯২১-এর অসহ-যোগ আন্দোলনে যে সাম্প্রদায়িকতার পেছনফেরা ধর্মান্ধতার কলুষ এসে মিশেছিল, ১৯৩০ তা থেকে বিমুক্ত। আজ পেছনদিকে তাকিয়ে দেখছি, সেদিন ঐ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণে যে অবিস্মরণীয় উদ্দামতা বোধ করেছি তা সেকালের সর্বজনীন মানসিকতারই প্রতিধ্বনিমাত্র, সমগ্র জাতীয় সত্তার জাগ্রত চেতনার কাছে তা কত সামান্য। স্বাধীনতা প্রস্তাব কাগজে-কলমে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না,

থাকলে তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখদের হাতেই দেশের নেতৃত্ব নিরাপদ থাকত। কংগ্রেসও তা যখন গ্রহণ করল তখন তা গোটা দেশের প্রাগ্রসর মনে গৃহীত হয়েইছিল। গান্ধীজীর প্রস্তাবের মধ্যেও সেই অপরিহার্যতা সুপরিস্ফুট। তাঁর প্রস্তাবটির বয়ান ছিল:

> "This Congress, therefore, in pursuance of the resolution passed at its session at Calcutta last year declares that the word 'Swaraj' in Article 1 of the Congress Constitution shall mean complete independence……"

নিতান্ত বাধ্য হয়েই অথবা ঘটনার চাপে পড়ে, কংগ্রেসকে প্রাণময় করে রাখতে স্বরাজের সদর্থ সরলার্থ করা হল। একটা ধোঁয়াটে রহস্যময় হিং টিং ছটের নিগূঢ়ার্থটি আলোকে এল। উপায়ান্তর যে ছিল না, তা অমৃতবাজার পত্রিকার মত নিতান্ত নম্রপন্থী সংবাদপত্রও সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পত্রিকা লিখেছিলেন:

> "The independence Resolutions would have been passed with or without Gandhi."

এর ভূমিকায় যা বলেছিলেন তা তর্জমা করলে মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, কখনো কখনো নেতারা চালনা করেন বটে কিন্তু প্রায়ই চালিত হন। কোন কোন সময় নেতারা খানিকটা চালনা করেন, বেশির ভাগ চালিত হন। স্বাধীনতা প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বিতর্কের যে জবাব দিয়েছেন তা পড়ে আমরা এই উপসংহারই করতে বাধ্য হচ্ছি যে, অন্তত এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা চালনা করেছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগটাই অধিকাংশ কংগ্রেসসেবী ও যুবআন্দোলনের অভিমত প্রতিফলিত করেছেন। এমন কখনো কখনো ঘটে যখন নেতাকে হয় নেতৃত্ব ত্যাগ করতে হয়, নতুবা অপরের বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে মানিয়ে নিতে হয়। গেল বছর কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পাইয়ে দেবার জন্য দু'বছর সময় চেয়েছিলেন। শেষে আপোষ হিসেবে এক বছর সময়ে রাজি হয়েছিলেন। অবশ্য বলেছিলেন, লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য এ

সময় বড় কম। লাহোর কংগ্রেসেও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। তবু তিনি অবস্থাগতিকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পাবার প্রয়াসে অবসান ঘটিয়ে এবার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন—এইসব কথা লিখেছিলেন পত্রিকা ১৯৩০-এর জানুয়ারী।

কেন, কি এমন ঘটেছিল ১৯৩০-এ? ১৯৩০ তো সবে শুরু। সবে ১৯২৯-এর গর্ভ থেকে বেরোলো এবং ১৯২৯-ও ১৯২৮-এর গর্ভেই সঞ্চারিত হয়েছিল······

বেপরোয়া হয়ে বললাম, মাপ করবেন, সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব থেকে কিন্তু আমরা······

আমায় বাধা দিও না, সত্য, ইতিহাসকে আমি বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারিনে, ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ অবধি কেন এই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে, কেন একজন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চাইছেন আর একজন তার প্রতিবাদী হচ্ছেন, কেন একজন পূর্ণস্বাধীনতা চাইছেন, আর একজন তার প্রতিবাদী হচ্ছেন, কেন একজন পাল্টা-সরকার চাইছেন আর এক-জন তার প্রতিবাদী হচ্ছেন; কেন একজন আন্দোলনের ওপর জোর দিচ্ছেন, আর একজন অহিংসার ওপর জোর দিচ্ছেন, কেনই বা বাংলা ও পাঞ্জাবে দুটি বিপরীত ধারার দ্বন্দ্ব চলছে এবং কেনই বা দাক্ষিণাত্যে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, ঘটনাক্রম না দেখলে তো বোঝা যাবে না; বোঝা যাবে না, কেন দাক্ষিণাত্য থেকেই দেশবিভাগের সমর্থন এসেছে, বাংলা ও পাঞ্জাবের বেদনা কেন দক্ষিণকে কখনো স্পর্শ করেনি। আমায় বাধা দিও না, আমি ১৯৩০-এ আসতেই, ১৯৩০কে বুঝতেই, কয়েক পা পিছিয়ে যেতে চাই। সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীজীর মতবিরোধ কি ব্যক্তিগত? বাংলা ও অবশিষ্ট ভারতের যে পথ-পার্থক্য সে কি নিছক প্রদেশগত? অথবা বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টি-পার্থক্য কি শুধুই অঞ্চলগত অথবা ভাষাগত? এই বিরোধগুলো বুঝতে হলে কি করেই বা সমন্বয় হয়, বৈচিত্র্যে ঐক্য ঘটে, আবার ঐ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, বাংলা-পাঞ্জাবের অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কিংবা

'সিন্ধুর বেদনা কেন অন্যান্য অঞ্চলকে চঞ্চল করে না, তা বুঝতে হবে। তবেই বোঝা যাবে ১৯৩০-এর অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সঙ্কল্প কেন ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার খণ্ড ভারত ও বৈরী রাষ্ট্রের পত্তনিতে পর্যবসিত হল। যথেষ্ট মিথ্যাচরণ হয়েছে, বহু দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের কথা-মালা গাঁথা হয়েছে, মাথায় ছাই পড়েছে অনেক মহাপুরুষের, অনেক বেদীমঞ্চে এখনও পুষ্পমাল্যস্তবকের সমারোহ ঘটে, আর নয়, দলিল-দস্তাবেজ থেকে এবার কিছু নিষ্ঠুর নগ্ন ইতিহাসের প্রামাণ্য ঘটনাক্রম উদ্গীত হোক, বাধা দিও না।

সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাৎ হয়ে হাতের ওপর রাখলেন মাথাটা। চোখ বুজলেন। আফশোষ হতে লাগল। বাধা দিয়ে কোথাও আঘাত করে ফেলেছি। ওঁর পক্ষে বোধ হয় তা দুঃসহ হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আরও খানিকটা অপেক্ষা করব কি না ভাবছিলাম। এদিককার চোখের কোণটায় কি যেন চক্‌চক্ করছে। শুকনো জল?

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উঠলাম; তক্তপোষ ভর্তি এগুলো কি তবে ওঁর সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজ, নগ্ন-নিষ্ঠুর ব্যক্তিমুখ না-চাওয়া ইতিহাস উদ্ঘাটনের? টিপে টিপে যা সেদিনও মাউণ্টব্যাটেন কৃপণের মত ছাড়লেন?

সতর্কতার সঙ্গেই কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন যেতেই বললেন, বয়স হলে স্বাস্থ্য যায়, কিন্তু আবেগ যায় না। যৌবনে সংযমও বেশি থাকে, আবেগকে সংযমে নির্বাক নিষ্ক্রিয় করে রাখা যায়। কিন্তু বয়সে? কাল যখন তুমি চলে যাও তখন আমি যে জানিনে, তা নয়, কিন্তু বাধা দিইনি। একটু লজ্জা করছিল। অথচ দেখ, দেশপ্রেমটা একটা গভীর অব্যক্ত আবেগ ছাড়া কিছু নয়, সামান্যও নয়। ১৯২৮-এর যুবশক্তির মধ্যে আমি তাই প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯২৮-এর রাজনৈতিক মন্থন

১৯২৮-এ ভারতের যুবশক্তি অস্থির। গান্ধীবাদী, কিন্তু বাংলা-দেশের নাড়ীর সঙ্গে আমার যোগ; সারা ভারতের কল্যাণে, শান্তিতে, অস্বীকার করতে চেয়েছি এর বিদ্রোহী চিত্ত, অমঙ্গল গণ্য করেছি। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় নেই চারদিকে যুবশক্তি অস্থির; তাই স্পর্শ করেছিল বর্ষীয়ান পাঞ্জাব-কেশরীকেও; স্পর্শ করেছিল অভিজাত মতিলাল নেহ্‌রুর পুত্র জওহরলালকেও, হ্যারোতেও ভেদ করেছিল ইউরোপের সেকালের সমাজবাদ; এগারো বছর আগে বলশেভিক বিপ্লব ঘটে গেছে জারের রাশিয়ায় এবং ইউরোপ নিয়ে-ছিল মার্ক্সবাদের সহজপাঠ, বার্নস্টিন্ অথবা কাউট্‌স্কি—সংশোধিত অথবা খাঁটি। কিন্তু পুরোনো সামন্ত-চিন্তা নয় কিছুতেই। ভারতেও সেই ঢেউ—কেতাবী শিক্ষার পরিমাপে সঞ্চারিত।

এবং সেখানে, আমি তোমায় বলছি, সত্য, হিংসা-অহিংসার একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট সীমারেখার বন্ধন ছিল না। ১৯২১-এ গান্ধী এথিক্‌সে বিশ্বাসী অনুগামী আমি, চারদিককার বলিদানের আব-হাওয়ায় বাংলা-পাঞ্জাবের মূর্তি দেখে মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠতাম, চোখ বুজতাম, অকল্যাণের বলি বলে ওদের নিন্দাও করতাম, কিন্তু অন্তরেরও অভ্যন্তরে ওদের দেশপ্রেমকে অস্বীকার করার কোনো যুক্তি পেতাম না। নতুন-পাওয়া বিশ্বাসে আরও জোরে চরকাটা আঁকড়ে ধরতাম ঠিকই, কিন্তু ওদের নির্ভয় আত্মোৎসর্গকে ছোট করবার মত ছোট হতে পারিনি কোনদিন। আমরা তো প্রতি পদক্ষেপে হিংসা ও অকল্যাণকে বিচার করে করে এগিয়েছি, অহঙ্কার করে বলেছি ন্যায়, সত্য ও অহিংসার রাজতোরণ দিয়ে আনব স্বাধীনতা, কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ও জিন্নার পায়ের তলায় সবই কি অন্যায়, অসত্য, অকল্যাণ ও হিংসায় এসে শেষ হয়নি?

স্বীকার করি, সেকালে শনিবারের চিঠি যখন ১৯২৮-এর সুভাষ-চন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে 'গক্' (G. O. C.) কার্টুন ছেপেছিল, কলকাতা অধিবেশনের সমারোহকে সার্কাসের সঙ্গে তুলনা করে কারও এক মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে তা উপভোগও করেছিলাম ; কিন্তু ১৯২৮-এ মতিলাল নেহ্রুকে সমিছিল অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অধীর বাংলার চিন্ময় মূর্তিও তো কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। তুমি আমার চোখে বার্ধক্যের ছানিটা দেখো না, সত্য, সে ছবিটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। হাওড়া স্টেশন থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় দেখেছি বাংলার যুবশক্তিকে কুচকাওয়াজ করে যেতে। হ্যাঁ, এই সর্বপ্রথম তরুণীদের সারিবদ্ধ মিছিল, উছলে উপচে পড়ছে শৃঙ্খলপীড়িত দর্শক নরনারী, খোলা গাড়িতে মতিলাল নেহ্রু, যুববাহিনীর পুরোভাগে সামরিক পোশাক-পরিহিত জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং সুভাষচন্দ্র। পূর্ণ সামরিক ভঙ্গিতে কংগ্রেস সভাপতির রাজকীয় সম্বর্ধনা ; দেশ সংগ্রামে প্রস্তুত। বলিদানে অকুণ্ঠিত বাংলার মায়েরা।

ইতিহাসের এক অনস্বীকার্য সত্য হ'ল ১৯২৮-এর কংগ্রেসমণ্ডপে স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। প্রবীণেরা জয়লাভ করলেন, কিন্তু ইতিহাসে এ-ও এক অলিপিবদ্ধ সত্য যে, গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল স্বাধীনতার বাণী এবং আগামী সংগ্রামের মহড়া। ঐ যারা এখানে নকল মেজর, কর্নেল, ক্যাপ্টেন ভলাণ্টিয়ার হয়েছিল তারাই শহরে শহরে এবং শহর থেকে দূরে আসল হয়ে উঠতে লাগল। ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু এই নতুন তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন ম্যাজিকের মতই কাজ করেছিল। এ-ও বাংলাদেশের এক বিশেষ ভঙ্গি। ১৯২৮-২৯-এ তড়িতালোকবিহীন মফঃস্বলের গাঢ় অন্ধকারে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন থেকে সামান্য গ্যাস আলোর ছোট্ট ফোকাস পড়েছে পর্দায়, আর তাতেই ফুটে উঠেছে শাসন ও শোষণের কথা, পরাধীনতার তীব্র দহনের কথা, শপথে জ্বলছে মূক মানুষগুলোর চোখ। তোমাদের যুগে এ হয়তো শ্লেষের বস্তু, ১৯২৮-এ

এ ছিল হৃদয়ের সত্য। ছোট ছোট সভায় খণ্ড খণ্ড অগ্নিদাহ, অখণ্ড বৈশ্বানরের ভ্রূণ সৃষ্টি।

১৯২৮-এর কংগ্রেস-মণ্ডপে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; জানো, সত্য, ঐ পার্ক সার্কাস ময়দানের কংগ্রেস চত্বরেই বাংলার পালোয়ান গোবরও বিশ্রীরকমে হেরে গেছলেন? কিন্তু বাংলার অন্তর পরাজয় মানেনি; স্বরাজী রথাগমনের ঘরঘরে সঙ্কেত-ময় চরকা আমাদের কঠোর কব্জায় এসে গেছল। গান্ধী-পথানুসারী আমাদের আধিপত্য ছিল, কিন্তু শহর বন্দর গ্রামে গোপন ব্যায়ামের আখড়ায় আখড়ায়ও উদ্ধত হয়ে উঠেছিল আর এক বাংলা।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, হেরে গেলাম, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা একটা বছর পিছিয়ে গেল। আমরা মানিনি একথা। একথাও মানিনি যে, দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল, প্রস্তুত ছিলেন না নেতারাই! ১৯২৮-এর কংগ্রেস-মণ্ডপে হুগলী তীরের দশ হাজার শ্রমিকও জানান দিয়ে গেছল যে, তারাও সংগ্রামে সামিল হতে প্রস্তুত। তবু নেতাদের একথাই সযুক্তি মেনে নিয়েছিলাম যে, দেশ প্রস্তুত নয়, গান্ধীজীর আপোষের পথও শেষ হয়নি এখানেই।

কখনো কাদামাটির এমন বদ্ধজলা দেখেছ যার ওপরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, বুদ্বুদের মত ছোট মাটির ব্রণ ফুটে উঠছে, ফেটে যাচ্ছে? নৈসর্গিক কি একটা উত্তাপ প্রকাশের জন্য উন্মুখ, অসংস্কারের জগদ্দল চাপ ঠেলে উৎসারিত হতে পারছে না।

১৯২৮-এ স্পষ্টতই এমনি একটা বিরাট বদ্ধজলার রুদ্ধ বেদনা ও অদৃশ্য উত্তাপ লক্ষ করেছি। নন্দকুমার, নীলচাষী বিদ্রোহ, ১৯০৫-৮-১০-এর বাংলা এই উত্তাপ সঞ্চার করেছে, ১৯২১-এ এসে তা দ্বিমুখী হয়েছে, চরকায় আর রিভলভারে, অহিংসায় আর শস্ত্র চালনায়। ১৯২৮-এ-ও দেখেছি সেই দ্বিমুখী অভিব্যক্তি। প্রকাশ্য কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরাল রেখায় চলেছে সশস্ত্র রাজদ্রোহের 'ষড়যন্ত্র'

আর তার মামলা, গোপন ইস্তাহারের বন্যা। 'রাষ্ট্রবিরোধী' বইয়ের পর বই বাজেয়াপ্ত হয়ে চলেছে, নানা ছলে যুবকেরা বন্দী হয়ে চলেছে; চলেছে সরকারী বিধিনিষেধের অব্যাহত পীড়ন।

১৯২৮-এ কয়েকটি মজার ব্যাপারও লক্ষ্য করবার। তা হচ্ছে এই যে, মাদ্রাজ কংগ্রেস যে স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়েছিল ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস তা বাতিল করে দিল; সুভাষচন্দ্র অল পার্টিজ কনফারেন্স (সকল দল সম্মেলন) বিরচিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাতে ছিল ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসেরই দাবী, কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে তা থেকে সরে এসে স্বাধীনতা প্রস্তাব তুললেন; জওহরলালজী অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্সের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মানেননি, স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে তা থেকে সরে এসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসকেই ভারতের আপাত-লক্ষ্য বলে মেনে নিলেন।

গোলমালটা হয়েছিল ঐ অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত থেকেই।

এই সকল-দল-সম্মেলনের বিবরণীতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্যার আলি ইমাম, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, এম. এস. আনে, সর্দার মঙ্গল সিং, সোয়েব কুরেশী, সুভাষচন্দ্র বসু, জি. আর. প্রধান।

তোমায় বলেছি, বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের জবাবেই এই সর্ব-দলের উদ্ভূতি; কিন্তু দিল্লীতে নেতৃবৃন্দের প্রথম বৈঠক নিষ্ফল হল মুসলমান ও শিখের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা নিয়ে। বোম্বাইয়ে বসল বৈঠক। একই ফল। তখন একটি ছোট কমিটি করা হল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু হয়েছিলেন সেই কমিটির প্রধানতম নায়ক; এরই জন্য কমিটির রিপোর্টের নাম নেহরু রিপোর্ট; অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের একটি সর্বদলীয় খসড়া। তাই নিয়ে বসল লক্ষ্ণৌতে সর্বদল সম্মেলন। ২৯-এ আগস্ট। সুতরাং, কমিটি রিপোর্টের ভিত্তিতে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই স্থির হয়, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা

সম্পর্কে কোন দলের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, তাই তিনি সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাবে সামিল হননি এবং তার পক্ষে তিনি যুক্তিও দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু অনুমোদন করে বলেছিলেন, তিনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের অনুরাগী নন, কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি এটি অনুমোদন করেছেন।

কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে, সন্দেহ নেই, স্বাধীনতার কম কিছুতেই গ্রাহ্য নয়, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এমনি এক প্রবল মত আছে, শুধু তাই নয়, খোদ কংগ্রেসও তার সর্বশেষ অধিবেশনে স্বাধীনতাকেই ভারতের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ কমিটি তো কংগ্রেসের কমিটি নয়, এ কমিটি হচ্ছে সকল-দল-সম্মেলনের, সুতরাং, এর লক্ষ্য হল সর্বাধিক ঐকমত্য। কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের কোন প্রদেশেই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করেননি; কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্য প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যানুপাত প্রতিনিধিত্ব সুপারিশ করেছেন।

এবং এই হল কমিটির পক্ষে কাঁটা। একদল মুসলমান সেই পৃথক নির্বাচনের খুঁটি ধরে বসে থাকলেন। ফলে কমিটির সামগ্রিক সুপারিশও অচল হয়ে গেল।

কিন্তু ধাক্কা লাগল কংগ্রেসে। মাদ্রাজ প্রস্তাবকে ডিঙ্গিয়ে যখন কলকাতা কংগ্রেসে সকল-দল-সম্মত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রতিধ্বনি হল তখন অনেক কংগ্রেসকর্মীই বিহ্বল হয়ে গেছলেন। প্রশ্ন করলেন, এ কি হল?

গান্ধীজী অবশ্য ৫ই জানুয়ারীতেই মন্তব্য করেছিলেন, মাদ্রাজের প্রস্তাব 'hastily conceived and thoughtlessly passed.' কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু বললেন, হ্যাঁ, এই তো ঠিক হল, কেননা, সকল-দল-সম্মেলন কংগ্রেসের চাইতেও বড়, সেখানে সকল দলের মত প্রতিফলিত, কংগ্রেসকর্মী হিসেবে তিনিও তাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন, আজ তা অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

বলা দরকার, এ নিয়ে পিতা-পুত্র—মতিলাল-জওহরলালের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বও গেছে গুরুতর। মাদ্রাজ কংগ্রেসের মুখে এসেছিলেন জওহরলাল, বিলাতি শিক্ষাদীক্ষার টাটকা সতেজ গন্ধ, ইউরোপের সোস্যালিজম তাঁর চিন্তাধারায় বিমিশ্রিত; মাদ্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবে ছিল তাঁরও নিঃশ্বাস। কিন্তু পিতা এসে নৌকো বাঁধলেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসে। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল একটা আলাদা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গড়বেন স্থির করলেন। লক্ষ্ণৌয়ে সর্বদল সম্মেলনে বাধা দিলেন না; ভোট দেননি কিন্তু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খসড়া ভারতীয় সংবিধানে সুভাষচন্দ্রের সই তো ছিলই।

কলকাতা কংগ্রেসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ভিত্তিতেই পিতাপুত্রে মিলন এবং জওহর-সুভাষে ছাড়াছাড়ি হলেও সর্বদল সম্মেলনের খসড়াও কোন কাজে এল না; জিন্নাজী লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে যদি-বা হিন্দু-মুসলিম ফরমুলা মেনে নিয়েছিলেন, পরে তার খেলাপ করলেন, হাজির করলেন ১৪ দফার দাবি। এর মধ্যে ছিল, কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক তৃতীয়াংশ আসন দিতে হবে, বাংলা-পাঞ্জাবে আসন হবে সংখ্যানুপাতে। শিখরাও অমনি দাবি চড়ালো। সুতরাং, সর্বদল সম্মেলন ও তার খসড়া সংবিধানেরও সাঙ্গ হল এখানেই।

জের রইল কংগ্রেসে এবং তাই নিয়েই ২৯ পার হয়ে ত্রিশ অবধি।

কিছুকাল চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবলেন। দেওয়ালে ঝুলানো ধুলোয় কিছু অস্পষ্ট একটা পুরোনো মানচিত্র লক্ষ্য করে আসছি, সেদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন, তার পরে খানিকটা বিব্রতস্বরে বললেন:

আমার একটু ভুল হচ্ছে, সত্য, তোমায় মোটে এই কংগ্রেস অধিবেশনের পটভূমিকা বলা হয়নি। এই পটভূমিকায় মোটা দুটি দাগ: একটি, সাইমন কমিশনের আগমন, তার বয়কট ও তার প্রতি বিরূপ অভ্যর্থনা, আর একটি বরদোলি সত্যাগ্রহ।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর বারাণসীতে সকল দল মিলেই স্থির

করলেন স্ট্যাটিউটরী কমিশন, সাইমনের নেতৃত্বে বলে যার আর এক নাম সাইমন কমিশন, বয়কট করতে হবে। ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সারা ভারতে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯২৮) হরতাল পালন করার সিদ্ধান্তও হল। ঐ দিনই কমিশনের বোম্বাইয়ে পদার্পণ করার কথা। জনসভা হবে, আর সেসব জনসভায় কমিশন নিয়োগের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হবে—এই হল নির্দেশ। লক্ষ করার বিষয়, এ নির্দেশ কেবল কংগ্রেসের নয়, সকল দলের।

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজীদের প্রস্তাবক্রমে ও অত্যন্ত চড়া পর্দায় বিতর্কের পর সাইমন বয়কট করার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। (২৪শে জানুয়ারী)।

সাইমন কমিশনের সফর

আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে পালিত হল হরতাল—ঐ নির্দিষ্ট তারিখে। ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করে কমিশন সদস্যেরা দেখলেন এক পরিত্যক্ত শ্মশান, আর তাদের সামনে অজস্র কালো পতাকা বিরূপ অভ্যর্থনার রূপ নিয়ে আন্দোলিত হচ্ছে। অসামান্য এক জনসভা হল; কিছু বিশৃঙ্খলাও এবং পুলিশের গুলী।

বেগতিক বুঝে স্যার জন সাইমন ৭ই ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতিযোগে এক "সংযুক্ত সম্মেলনের" আভাস দিলেন। সকল-দল নেতৃবৃন্দ তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। সত্যি করে ও ছিল এক ফাঁদ, সর্বদলের অটুট বন্ধন শিথিল করার দুশ্চেষ্টা।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় সাইমন কমিশন নিয়োগ নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল, তাকে বলা হয়েছিল, "ঐতিহাসিক"; উল্লেখযোগ্য যে, লালা লাজপৎ রায় এ সম্পর্কে ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা গৃহীত হয়ে গেল। কে জানে, সেই থেকেই লালার উদ্দেশে শাসক গোষ্ঠীর সণ্ডার্স যষ্ঠি উদ্যত হয়ে ছিল কি না।

কমিশন কলকাতায় এল ১৯-এ ফেব্রুয়ারী। তার জবাবে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হল এক মহতী জনসভা। শুধু তাই নয়, কলকাতায় একই

সঙ্গে ৩২টি ওয়ার্ডে ৩২টি জনসভা হল বিলাতি পণ্য বর্জনের সঙ্কল্প নেবার (১লা মার্চ)। মেয়েরাও পিছিয়ে থাকলেন না। কলকাতায় দশ হাজার মহিলার এক সমাবেশে বিলাতি কাপড় বয়কট করার শপথ উচ্চারিত হল। বোঝা গেল, বাংলায় ১৯০৫ থেকে যে সাধনা চলে এসেছে তা বৃথা যায়নি। বৃথা যায়নি বাংলার সাহিত্য, কবিতা, গান, মুকুন্দ দাসের যাত্রা। অন্দর মহলের বিলাসী কনেরা দিল ছুঁড়ে ফেলে ম্যাঞ্চেস্টারের অঙ্গাবরণ।

যে কোন কমিশনের পক্ষেই এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষিত। তাই তাঁরা পেলেন—৩১-এ মার্চ রওনা দিলেন স্বদেশ অভিমুখে।

চমকে উঠে জিগ্‌গেস করলাম; হয়ে গেল কমিশনের কাজ?

প্রথম কিস্তি, ইতিমধ্যে মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে এক কৌতুকাবহ ঘটনা হল। ২৪-এ জানুয়ারী এই পরিষদই সাইমন কমিশন বয়কটের প্রস্তাব নিয়েছিল; ৩রা সেপ্টেম্বর নিল এক পাল্টা প্রস্তাব—সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার। স্বরাজীদের পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

দ্বিতীয় কিস্তি হিসাবে সাইমন কমিশন ফিরে এল ১১ই অক্টোবর; মাস সাতেকের ব্যবধানে। জেদী জাত, যা ধরে তার শেষ দেখে ছাড়ে। এবং এবার জেদের কিছু বাড়াবাড়িই হল। অযথা প্ররোচনায় জনসাধারণও গেল ক্ষেপে, কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বলল, সাইমন, ফিরে যাও। হরতাল হল পুনায়। কমিশন এল লাহোরে (৩০-এ অক্টোবর)। লালা লাজপৎ রায়ের বুকে যে লাঠির আঘাতের কথা বলেছি তা ঘটল। পাঞ্জাব কেশরীর শেষ নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, ১৭ই নবেম্বর। পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদী সদস্যেরা প্রতিবাদে এলেন না পরিষদ কক্ষে। তারপর সারা ভারতে লালা লাজপৎ রায় দিবস পালিত হল ২৯-এ নবেম্বর।

সদল স্যার জন সাইমনের সরকারী রক্ষীদের উদ্যত লাঠি পড়তে

লাগল ঘন ঘনই ; লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রহৃত হলেন, ছাত্ররাও। (২৯/৩০ নভেম্বর)।

তোমায় বলছি, একতরফা এই মার অসহ্য হয়ে উঠেছিল তরুণ ভারতের পক্ষে ; তারা কখন কিভাবে তৈরি হয়ে ইউরোপীয়ান পুলিশ অফিসার আই. পি. সণ্ডার্সকে ঐ লাহোরেই বিপরীত পুরস্কার দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও কংগ্রেসকর্মী মিলিয়ে এই সম্পর্কে প্রথম দফায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। (২০-এ ডিসেম্বর)। কিন্তু লাহোর সহরে প্রাচীরপত্র ছেয়ে গেল : 'পুরস্কার ! পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার, আততায়ীই দেবে, গভর্ণমেণ্ট যে পুরস্কার দেবে তার উপরন্ত—'আমায় যে ধরবে সে পাবে পুরস্কার, পাঁচ হাজার টাকা।' দুরন্ত, দুর্ধর্ষ যৌবন। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিল নেই, আবার কোথায় যেন মিলও আছে। নইলে অপরিমেয় অশ্রদ্ধায় একথা তো আমার ভুলে যাওয়ার কথা—ভুলিনি কেন ?

প্রশ্ন করে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে ক্ষণকাল। বিব্রত বোধ করেও বুঝতে পারলাম, আমি উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁর দৃষ্টি অন্য কোন দূরান্তে চলে গেছে। কিন্তু খেই হারাননি। বললেন :

কলকাতা কংগ্রেসের আগে ১৯২৮-এ আর একটা দাগ পড়েছিল বোম্বাইয়ের বর্দোলিতে। তার নাম বর্দোলি সত্যাগ্রহ। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ছিলেন সে সত্যাগ্রহের নেতা। খাজনা বন্ধের সত্যাগ্রহ। এপ্রিল থেকে আগস্ট অবধি। সারা ভারতের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, একটি অঞ্চলের সীমাবদ্ধ সংগ্রাম প্রবলপক্ষ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধেই। তারপর একদিন অনেক আশা জাগিয়ে বোম্বাইয়ের গভর্ণর ডাকলেন এক সম্মেলন ; চাষিদের পক্ষ থেকে সামান্য দাবিই রাখা হল, তবু সব আশা গেল উবে।

এরপর যা হয় ; রাজপুরুষদের নেত্র হল রোষকষায়িত। রাজস্ব না মিটিয়ে দিলে তদন্তের কোন কথাই ওঠে না। উল্টে কুফল ফলবে। অর্থাৎ সেই দমন নীতি। কিন্তু না, বোম্বাই সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল অনমনীয় চাষিদের কাছে; রাজস্ব বৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত

হবে, এই ঘোষণা করতে হল সেই রাজপুরুষদেরই। ১৩ই আগস্ট বর্দোলি বিজয় দিবস পালনের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হল।

হ্যাঁ, আরও একটা দিক—জনসাধারণের দিক—লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে ই. আই. রেলওয়ে অন্তর্গত লিলুয়া কারখানার ১০ হাজার কর্মী হাতিয়ার সম্বরণ করল; মজুরী বাড়াবার দাবিও জানিয়ে দিল। কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধ নিলেন কারখানার আগল টেনে দিয়ে, যাকে তোমরা বল, লক্ আউট। বামুনগাছি লোকো ওয়ার্কশপে বাঁধল হাঙ্গামা, পুলিসের অভ্যস্ত হাতে গুলীও চলল। দু'জন মারা গেল, আহত হল পাঁচ। এস. আই. রেলওয়েতেও হল এক সাধারণ ধর্মঘট। আমাদের কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম দিকে সচরাচর যারা চোখের আড়ালে থাকত তাদের স্বার্থচেতনার দৃষ্টান্তও তোমার চোখের সামনে ঐ পটভূমিকায় রাখতে চাই।

আর মুসলমানদের মধ্যে যে অংশটা চিরকাল ভারতবিরোধী ধর্মান্ধ পথানুসরণ করেছে তারা এখানেও পৃথক হয়ে থাকল, আর নষ্টামির জন্য ইংরেজের প্রশ্রয় খুঁজতে লাগল। কিন্তু তখন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেশে দেশপ্রেমের জোয়ারে এতই বেগ যে, ওদের তাচ্ছিল্য করা চলত; তাচ্ছিল্য করতে চায়নি সর্বদল-সম্মেলন, কিন্তু সেখানেও ওদের আহুরেপনার অন্ত ছিল না।

দেশের চঞ্চল প্রবাহে এও ভোলবার নয় যে, এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে যেমন এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-যুব সম্মেলন হয়েছিল (এবং এই এপ্রিলেই বর্দোলি সত্যাগ্রহ) তখন বাংলাদেশে বারাসতে এক রাজনৈতিক মেলা বসেছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত; জে. এম. সেনগুপ্ত বললেই লোকে তাঁকে বেশি চেনে।

১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে বারংবার নিন্দিত বিপ্লবী তরুণদের কথা উল্লেখ করে সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আমরা এইসব দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের ক্রিয়াকলাপ

অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিনি। আমরা তাঁদের এই বলে নিন্দা করে এসেছি যে, তাঁরা এদেশে নিষ্ঠুর পীড়ন নীতি চালাবার ছল তুলে দিচ্ছে বৃটিশরাজের হাতে! কিন্তু আসলে এই অশান্তচিত্ততার মূল কি? এজন্য দুষ্‌ব কাকে?"

"শাসন-যন্ত্রের দুঃসহ পীড়ন এবং দাসত্বের দুর্বহ শৃঙ্খলভারই এই সব দেশপ্রেমিক তরুণকে বিদ্রোহী করে তুলেছে।"

অহিংসপন্থী সেনগুপ্ত অবশ্য বললেন, "তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমরা এই বিদ্রোহীদের মদদ যুগিয়েছি। আমরা এই ধরণের অস্থিরতার পক্ষপাতী নই। আমরা শুধু এই বলতে চাই, এই অসন্তোষ দূরীকরণের উপায় অথবা প্রতিকার উন্মত্ত দমননীতি নয়; জনসাধারণের রাজনৈতিক ও দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বিক্ষোভ দূর করা যাবে না।

"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, আমরা তাই দাবি করি; এর বঞ্চনা আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দিয়েছে এবং নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।"

সেনগুপ্ত প্রত্যেক জেলা মহকুমায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনেরও আহ্বান জানান।

আর, মনে পড়ছে, সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা প্রস্তাবটি তুলেছিলেন।

জিগ্‌গেস করলাম, আপনি এই বারাসত সম্মেলনে ছিলেন?

হাসলেন, কেন জিগ্‌গেস করছ বুঝেছি। হ্যাঁ ছিলাম এবং ঐ স্বাধীনতার প্রস্তাবের পক্ষে হাতও তুলেছিলাম। সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, এই সম্মেলন পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করছে।

এ হল গিয়ে তোমার এপ্রিল, আর ডিসেম্বরে হল কংগ্রেস। পার্ক সার্কাসের এক বিরাট চত্বরের নাম হয়েছিল দেশবন্ধুনগর; ওরই এক মস্ত এলাকা জুড়ে অধিবেশন-মণ্ডপ ছাড়াও হয়েছিল তেমনি এক বিরাট প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণ। আঃ, সে প্রদর্শনী যদি তুমি দেখতে, সত্য!

আমার তো মনে হয়, ঐ প্রদর্শনীর নানারকম নিদর্শন, বিশেষ করে, যাকে তোমরা আজকাল বলো পরিসংখ্যান্, তারই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী পোস্টার সব, লক্ষ লক্ষ লোকের মনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

তোমায় বলেছি বোধ হয় কংগ্রেস সভাপতির অভ্যর্থনা মিছিলের কথা, বলেছি কি পুষ্পমাল্যশোভিত রথটির কথা? ৩৪টি সাদা ঘোড়া টেনে নিয়েছিল, আর তাদের পিঠে পিঠে লাল সবুজ কামিজ পরা ঘোড়সওয়ার। দেশবন্ধুনগরে এসে রথ থামতেই ১০১টি হাউই উঠল আকাশে।

যেদিন সণ্ডার্স-আততায়ীর পোস্টার পড়েছিল লাহোরে, সেদিনই কংগ্রেস সভাপতির শুভাগমন হল কলকাতায়। ২১শে ডিসেম্বর।

৪৩তম অধিবেশন কংগ্রেসের। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান জে. এম. সেনগুপ্ত দীর্ঘ বক্তৃতা পড়লেন। সব মনে নেই, মনে আছে সর্বদল সম্মেলনের "নেহরু রিপোর্ট" সম্পর্কে বলেছিলেন, "I look upon this document not as a begging bowl for Dominion Status but as a weapon in our fight for full independence."

অবশ্য আবহাওয়ার গতি তখন খানিকটা ওদিকেই ঝুঁকেছিল। মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতা-লক্ষ্য স্থির হবার এবং ৩রা নভেম্বর দিল্লীতে এ. আই. সি. সি.র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সত্ত্বেও; ডাঃ আন্সারী তখনও সভাপতি এবং দিল্লীতে প্রস্তাব তুলেছিলেন আয়াঙ্গার। আমি দিল্লী এ. আই. সি. সি. যাইনি, মাদ্রাজে ছিলাম।

কলকাতায় প্রথম দিনকার অভিভাষণ ইত্যাদি পাঠের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বসল সাবজেক্ট্স কমিটি বা বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক। ওয়ার্কিং কমিটি যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রস্তাবটি ৬—৫ ভোটে গ্রহণ করেছিল তাই তুললেন গান্ধীজী স্বয়ং। ৬-৫ ভোটে স্পষ্টতই দুটি প্রবল ধারা প্রতিফলিত হয়েছে; সত্যিই সববার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা, একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল। মাদ্রাজ-দিল্লী স্বাধীনতা প্রস্তাবের পরও আবার এ কি!

কিন্তু সামান্য প্রবলতর ধারার পক্ষেই প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। একটা কথা তোমায় মনে রাখতে বলি। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতেই গান্ধীজী দু'বার প্রস্তাব তুলেছিলেন, দ্বিতীয়বার প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নতুন এক প্রস্তাব তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রস্তাবের বিপক্ষ এতই উদ্বেগজনক ছিল, যে বিপক্ষকে যতটা সম্ভব প্রশমিত করার জন্য একটা আপোষ-প্রস্তাব রচনা করতে হয়; তাই থেকেই দ্বিতীয় প্রস্তাবের উৎপত্তি।

আর একটা কথাও মনে রেখো। সর্বদল-সম্মেলন-কমিটির রিপোর্টে অন্যতম স্বাক্ষরদাতা সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু বিষয় নির্বাচনী সমিতির আলোচনাকালে একেবারেই মুখ্য ভূমিকা অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। সেখানে মুখ্য ভূমিকা ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরই। তিনিই গান্ধী-প্রস্তাব-বিরোধী স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবটি তুলেছিলেন; অনুরূপ একটি প্রস্তাব তুলেছিলেন আমাদের কিরণ শঙ্কর রায়।

প্রস্তাবগুলো আমি তোমায় স্মরণশক্তি থেকে বলতে পারব না, কাগজপত্র দেখে বলব, তুমি ভাল করে শুনে যেও, নইলে পার্থক্য বোঝা যাবে না বা কোথায় আপোষ হল তাও ধরা যাবে না।

বলে তক্তপোষের ওপরই ছড়ানো বইপত্তর থেকে খুঁজে এ কটা পুস্তিকার মতো বই বের করলেন, হাত দিয়ে ধুলো ঝাড়লেন, আস্তে আস্তে ওর মলাটটা তুলে কয়েকটি পাতা উল্টে পড়লেন:

গান্ধীজীর প্রথম প্রস্তাব

'This Congress having considered the constitution recommended by the All-Parties Committee Report welcomes it as a great contribution towards the solution of India's political and communal problems and congratulates the Committee on the virtual unanimity of its recommendation and whilst adhering to the resolution relating to complete independence passed at the Madras Congress adopts the Constitution drawn up by the Committee as a great step in political advance specially as it represents

the largest measure of agreement attained among the important parties in the country.

'Provided however that the Congress shall not be bound by the Constitution, if it is not accepted on or before the 31st December 1930 and' provided further that in the event of non-acceptance by the British Parliament of the Constitution by that date the Congress will revive non-violent non-co-operation by advising the country to refuse taxation and every other aid to Government.

এর পর আরও কিছু কথা, প্রোগ্রাম ইত্যাদি আছে। একটি কথায় আপত্তি হয়েছিল, সে কথার জবাবও গান্ধীজী দিয়েছিলেন পরে। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

The President is hereby authorised to send the text of this resolution together with the copy of the said report to His Excellency the Viceroy for such action as he may please to take.

লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই যে, সর্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টটির ওপর জোর দিতে গিয়েও মাদ্রাজ প্রস্তাবকে ভোলা সম্ভব হয়নি, এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন না করার উদ্বেগই এতে আছে, তা সত্ত্বেও, যেহেতু দেশের মুখ্য দলগুলোর সর্বাধিক মতৈক্য প্রতিফলিত হয়েছে সেইহেতু ঐ রিপোর্টকেই রাজনৈতিক অগ্রগতির বিশেষ এক পদক্ষেপ রূপে গ্রহণ করা হয়। সময় চাওয়া হয় ১৯২৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০-এর ৩১শে ডিসেম্বর অবধি। এর মধ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সকল দল সম্মেলনের ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ না করেন তো দেশকে অহিংস অসহযোগিতার কার্যক্রমরূপে কর বন্ধ প্রভৃতি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হবে।

গান্ধীজী তাঁর ভাষণে স্বীকার করলেন, এ আর গোপন নেই (It is an open secret) যে, আমাদের মধ্যে নিদারুণ মতদ্বৈধ আছে (that we have in our camp sharp differences of opinion) কংগ্রেস-কর্মীরা কিভাবে রিপোর্টটি গ্রহণ করবেন, এই

নিয়ে। গান্ধীজী এই রিপোর্টটিকে বললেন, epoch-making, "I call it an epoch-making report".

প্রস্তাব সম্পর্কে বললেন, 'রিপোর্ট নিয়ে এই যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে তাদের দু'পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা অথবা সন্তুষ্ট না করা গেলে, প্রশমিত' করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রস্তাবে। এই দলিলটি শেষ লক্ষ্য নয়, শেষ লক্ষ্যের আরম্ভ।

বললেন, এই সর্বদল সম্মেলন হয়েছে কার উদ্যোগে? অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, সেদিক থেকেও কংগ্রেসসেবীদের একটা কর্তব্য আছে। 'তা'ছাড়া, মাদ্রাজ কংগ্রেস তো কংগ্রেস-লক্ষ্যের কথাই বলেছে, বলেছে এই হল আমাদের লক্ষ্য, বলেনি এই স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম (It tells you that this shall be the goal but it is not a declaration of independence)।'

মাদ্রাজের প্রস্তাবটাকে আমি গান্ধীজীর ব্যাখ্যা মতো গ্রহণ করিনি, তাই বড্ড গোলমাল লাগতে লাগল মনে; যদি তা না হয়ে থাকে তবে তো মাদ্রাজ প্রস্তাবটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। বড্ড ভাবিয়ে দিয়েছিল; এমন সময় উঠতে লাগল সংশোধনী প্রস্তাবগুলো। হরি সর্বোত্তম রাও, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কিরণ শঙ্কর রায়।

জওহরলালের প্রস্তাব

জওহরলালের সংশোধনীর মর্মার্থ হচ্ছে—there can be no freedom till all connection with British Imperialism is severed.

কথাটা খুব মনে গেঁথে গেছল। সত্যি তো, সকল রকমে বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা কি? কিরণশঙ্কর যে সংশোধনী তুললেন, তাতেও ঐ কথা এবং সোজা কথা: British connection should be severed.

কিন্তু জওহরলাল যেখানে মাদ্রাজ প্রস্তাব ক্ষুণ্ণ না করে রিপোর্ট গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, সেখানে কিরণ শঙ্কর ছিলেন স্পষ্ট; তিনি

ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করতে গররাজি।

তবে ঐটুকু বাদ দিলে, লক্ষ্য কোরো, জওহরলাল মাদ্রাজের স্বাধীনতা-প্রস্তাবকেই আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। পড়ছি, "This Congress adheres to the decision of the Madras Congress declaring complete independence to be the goal of Indian people and is of opinion that there can be no true freedom till British connection is severed."

তিনি দেশকে আইন অমান্য ও কর বন্ধের আন্দোলনে নামার জন্য প্রস্তুত হতেও বললেন।

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল; গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই যদি সত্যি হয় তবে তো মাদ্রাজ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তির অর্থ শুধু লক্ষ্য স্থির করে রাখা, সময়মত তা হাসিল করলেই হবে, স্বাধীনতা ঘোষণা তো নয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারী। তাই তিনি ওয়ার্কিং কমিটি-বিরোধী সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের কৈফিয়ৎ হিসেবে বললেন:

'ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারী হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশ-করা প্রস্তাব চ্যালেঞ্জ করা বিসদৃশ।'

তবু তিনি 'কর্তব্যবোধেই' তা করছেন।

তিনি বললেন, "আমার এমন কোন দেশের কথা জানা নেই, যে-দেশ অনুরূপ অবস্থায় ইচ্ছে করে সচেতনায় ডোমিনিয়ান গভর্নমেণ্ট বেছে নেয়। আমি ভেবে পাচ্ছি নে, আমরা কেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস-জাতীয় সরকার চাইব? মনে রাখবেন, এ কিন্তু আমাদের কেউ দিতে চায়নি।"

বেশ জোর দিয়ে বললেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যেদিক থেকেই দেখা যাক, তা জাতীয় মর্যাদার দিক থেকেই হোক কি বাঞ্ছনীয়তার দিক থেকেই হোক, আপনারা যদি ডোমিনিয়ান

স্ট্যাটাস গ্রহণ করেন, তবে তা অতিমাত্রায় অসঙ্গত এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। দেশে কি সব ঘটনা হয়েছে তা আপনারা জানেন। আপনারা লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর খবর শুনেছেন, লাহোরে কি হয়েছে তা জেনেছেন এবং বড়লাট কি রকম অপমানকর হুমকি দিয়েছেন তাও আপনারা শুনেছেন। এর পরও কি বলতে চান আপনারা মতের পরিবর্তন করবেন না, বড়লাট বা ঐ জাতীয় কেউ যাই কেন বলুন না ?

"আমি সরলভাবেই আপনাদের কাছে আবেদন করছি," জওহরলাল বললেন, "দেশ-সেবার শক্তি-সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথা মনে করতেও তা নিঃশেষ হয়ে যায়।"

চারিদিকে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "আপনারা এদেশে কি বৈপ্লবিক চেতনার পরিপোষণ করতে চান অথবা তা নিরস্ত এবং নির্বীর্য করতে চান আপোষ নিষ্পত্তির জন্য ?"

সকলের দৃষ্টি কিছু প্রসারিত করার জন্য বললেন, "ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্ন তো আছেই, তার চাইতেও বড় কথা এ সংগ্রাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং যা-কিছু সাম্রাজ্যবাদ নয় এই দুইয়ের মধ্যে। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস গ্রহণ করলে এই প্রমাণিত হবে যে, আপনারা সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা গ্রহণে রাজি আছেন। এ অত্যন্ত বিপজ্জনক কথা।

গান্ধীজীর নতুন প্রস্তাব

জওহরলালের বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী এবং উপস্থিত কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কিরণশঙ্কর রায় তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি জওহরলালের সংশোধনী প্রস্তাবের অনুকূলে প্রত্যাহার তো করলেন, কিন্তু পরদিন এক নাটকীয় পটপরিবর্তনের মধ্যে গান্ধীজী নতুন এক প্রস্তাব তোলবার জন্য যখন তাঁর প্রথম

প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবার অনুমতি চাইলেন, তখন দেখা গেল, পণ্ডিত জওহরলাল সভায় অনুপস্থিত।

সচকিত হয়ে আমি বলে উঠলাম, সে কি!

বললেন, গান্ধীজীই তার কৈফিয়ৎ দিলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। যেটুকু মনে আছে তার মর্মার্থ হচ্ছে—

"আমি আপনাদের খোলাখুলি বলতে চাই যে, আমি যে নতুন প্রস্তাবটি তুলতে যাচ্ছি তাতেও তার (জওহরলালের) সায় নেই। সে অযথা কথার তিক্ততা বাড়াতে চায় না। নিজেকে সর্বাংশে মুক্ত করে দিয়ে সে এ থেকে অব্যাহতি চায়। তাই আপনারা দেখছেন যে, সে কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত ও শ্রমসহিষ্ণু সেক্রেটারী হয়েও মনে করছে, যে-কার্যক্রমের সঙ্গে তার মিল নেই তার অসহায় দ্রষ্টা হওয়ার চাইতে আজকের সকালের অধিবেশনে তার পক্ষে অনুপস্থিত থাকাই শ্রেয়তর।"

একটু বিব্রতের হাসি হাসলেন। বললেন, আগের দিন প্রস্তাব তুলে জওহরলাল তাঁর সুন্দর অভিভাষণে যে-দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই অনুপস্থিতি মানিয়ে নিতে বেগ পেতে লাগলাম। মনে হয়েছিল আদর্শের জন্য জওহরলাল পিতৃদেবকেও অমান্য করতে রাজি, গান্ধীজী তো দূরের কথা। কিন্তু কার্যকালে তিনি শুধু অনুপস্থিতই থাকলেন না, গান্ধীজীকে তাঁর প্রস্তাব অবাধে তুলতে দিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিলেন গান্ধীজী এসে। যিনি পিতৃদেব ও গান্ধীজীর মতো নেতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতে পারলেন তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাসও নিশ্চয়ই ছিল অপরিমেয় এবং তাই আমাদেরও হৃদয় স্পর্শ করেছিল। কিন্তু অন্তরালে কি ঘরোয়া ব্যাপার হল কে জানে—সেই দৃঢ়তা শোচনীয়ভাবে শিথিল হয়ে গেল, তিনি নিরস্ত হয়ে গেলেন এবং লোকের চোখে পড়বার মত করে অনুপস্থিত থাকলেন। অর্থাৎ, স্বাধীনতা-প্রস্তাব তোলবার আর কেউ রইলেন না; কেননা, কিরণ শঙ্কর রায়ও তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব জওহরলালের অনুকূলে

প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা অনেকের কাছে এমনই অশোভন ঠেকল যে, অন্তরালে কোন একটা অভিসন্ধি সক্রিয় হয়েছে এমন অপযশ কেউ দিলে কিছু বলবার রইল না। জওহরলালের যে-চরিত্র অনেকখানি সমুন্নত হয়ে প্রতীয়মান হয়েছিল তা কেমন খাটো হয়ে গেল।

সাহসে ভর করে বললাম, তা'হলে গান্ধীজীর প্রস্তাব প্রত্যাহার ও নতুন প্রস্তাব উত্থাপনে কোন বাধাই রইল না ?

না। অন্তত বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে নয়।

নতুন প্রস্তাবটা কি ছিল ?

এটাও তোমায় পড়ে শোনাব ; কেননা, এগুলো ঐতিহাসিক দলিল, শ্রুতিও নয়, স্মৃতিও নয়, একেবারে, ইংরেজিতে যাকে বলে, in cold print, নিরুত্তপ্ত ছাপার অক্ষরে রক্ষিত।

আবার পাতা উল্টে উল্টে একটা জায়গায় থেমে, পড়তে লাগলেন :

> "This Congress having considered the Constitution recommended by the All-Parties Committee Report welcomes it as a great contribution towards the solution of India's political and commnual problems and congratulates the Committee on the unanimity of its recomendations and whilst adhering to the resolution relating to complete independence passed at the Madras Congress approves of the Constitution drawn up by the Committee as a great step in political advance, specially as it represents the largest measure of agreement attained among the important parties in the country"........

হঠাৎ দেখি চুপ করে গেলেন, মুখটা বইটার আড়ালেই ছিল, সুতরাং তাঁর মুখে মনের ক্রিয়া কি দাগ কাটছিল দেখতে পাইনি। একসময়ে নিজেই বইটা নামালেন এবং আমার চোখের ওপর সোজাসুজি চোখ রেখে বললেন, একটা কথা বলব ? যত জোড়াতালি তত ফাঁক। সব দলকে রাখতে হবে আবার মাদ্রাজ প্রস্তাবও রাখতে হবে, তাও কি হয় নাকি ? আর তা'ছাড়া, বিভিন্নমুখীন দলগুলোকে

এক জায়গায় দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে এক করতেই হবে এবং তা করে গোটা দেহটা বিকৃত হয় হোক, তবু সকল-দল-ঐক্যের গৌরব হাস্যকর শুধু নয়, বিপজ্জনকও হয়ে পড়ে। যা হোক, একটা বাধা এসেছিল তাও অপসারিত হল, এখন এই জোড়াতালিকেই বলতে হবে মস্ত একটা কাজ হল?

জিগ্‌গেস করলাম, প্রস্তাব কি এটুকুই?

বললেন, না, আরও আছে, তবে, তার উল্লেখযোগ্য অংশটা হচ্ছে:

> "Subject to the exigencies of political situation, the Congress will adopt the Constitution, if it is accepted in its entirety by the British Parliament on or before the 31st December 1929 but in the event of its non-acceptance by that date or its earlier rejection, the Congress will organize a Campaign of Non-Violent Non-Cooperation by advising the country to refuse taxation and in such other manner as may be decided upon."

স্বীকার করব, তখন সবটা বুঝিনি, মন সায় দেয়নি, কিন্তু এ যে কতখানি হাস্যকর আজ তো তা উপলব্ধি করি। কে-বা সংবিধান করতে বলল, আর কাকেই বা চরম পত্র দিচ্ছি? জওহরলালের সেই "mind you, it is not offered to us"—সত্যি, এ যেন বাড়ির সেই অভিমানী ছেলের দেয়ালের লিখন: আমাকে যদি আর একবার না সাধা হয় তবে আমি খাব না। চরম পত্র কেউ ঘরে থাকার জন্য, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের জন্য দেয় না, জওহরলালও এমন কথাই বলেছেন। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দিলেন এইটেই ট্রাজেডি।

খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন; সেদিকে তাকিয়ে বললেন, প্রস্তাব দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা লক্ষ্য করেছো?

সংক্ষেপে বললাম, হ্যাঁ, দু'বছরের বদলে এক বছরের প্রতীক্ষা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের জন্য।

বললেন, আরও একটা বড় পার্থক্য আছে। প্রথম প্রস্তাবে

বলা হয়েছিল, প্রস্তাবটিকে প্রেসিডেন্ট বড়লাটের কাছে পাঠাবেন। নতুন প্রস্তাবে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ হচ্ছে অন্তরালে আপোষ-মীমাংসার ফল। কিন্তু ওতে যে মনোভাবটি লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ কেবল সর্বদলীয় আপোষ-মীমাংসা নয়, সাম্প্রদায়িক সংস্থার তোষণ-চেষ্টা নয়, বৃটিশ শাসকদের সঙ্গেও আপোষ-মীমাংসার আগ্রহ তা কিন্তু অন্যথা অমৃতই রইল। আমাদের শেষ ৪৭-এর যে ট্রাজেডি তার বীজটিও এখানে দৃশ্যমান হল।

বড়লাটকে প্রস্তাবের নকল পাঠানো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি বর্জিত হওয়ায় অনেকেই আংশিক তুষ্টিলাভ করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বলে-ছিলেন, এতে তিনি মহাভারত অশুদ্ধ হত মনে করেন না।

> "If the Viceroy today asks me to go to him and discuss things of importance on a footing of equality I would go there bare-foot and post-haste and still defend my non-cooperation"

গান্ধীজীকে আমি বরাবর মেনে চলেছি, অনুসরণ করেছি; কিন্তু তাঁর অসহযোগ নীতির মধ্যে এই যে সহযোগ-রীতি এটি সর্বদা বুঝে উঠতে পারতাম না। বোঝা গেল, তিনি সকল দলের ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব রক্ষায় বড়লাটের কাছে প্রস্তাব পাঠানো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি তুলে নিলেন বটে কিন্তু যে-মনোভাব-বশে ওটি মূল প্রস্তাবে গ্রথিত করেছিলেন তা রয়ে গেল। যদি কখনো তাঁর একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভিন্নমত উপেক্ষায় নিজের মত ও পথে চলবেন। পরে চলেও ছিলেন। আপাততঃ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসে সব দলকে বেঁধে নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন।

এবং সেই সর্বদল-ঐক্য রক্ষার জন্যই চেয়েছিলেন দু'বছরের সময়। আশা ছিল, তদ্দিনে তাঁর চরকার খদ্দর, অস্পৃশ্যতা-মাদক-বর্জন ইত্যাদি সহ অসহযোগিতা-সহযোগিতার সূত্র-বন্ধনে তিনি স্বরাজে অবতীর্ণ হতে পারবেন। স্বরাজ মানে ছিল সেখানে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস।

সব বর্ণনা করে তাই বললেন, এই কারণেই আমি মনে করি,

সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মতো শক্তি-সঞ্চয় ও সংগঠনে দু'বছর সময়ও যথেষ্ট নয়।

আরও লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে, কারও কারও মতে গান্ধীজী যা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিয়েছিলেন তার কথাও বললেন : সাম্প্রদায়িক ঐক্য তো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না ; তা নেহরু রিপোর্টে নিহিত রয়েছে।

এইভাবে গান্ধীজী যখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, যুক্তি ও চিত্তাকর্ষক ভাষার জোরে সর্বরোগহর নিদানরূপে ঐ প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন তখন আর কোন প্রতিবন্ধক নেই, জওহরলাল নেই ; কিরণশঙ্কর নেই, দ্বিতীয় কোন বিরোধী প্রস্তাবের অবলম্বনও নেই ; সুতরাং গান্ধীজীর প্রস্তাবটি গ্রহণ ছাড়া কংগ্রেসকর্মীদের সামনে গত্যান্তরও রইল না। এই অন্তিমকালে সুভাষচন্দ্র মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

আশ্চর্য মানুষটি। ঐ অগোছালো স্তূপীকৃত বই কাগজপত্তর থেকে অনায়াসে এবং নির্ভুলে দরকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বের করে ফেলেন। এমনি একটা কাগজ নেড়েচেড়ে বললেন, গান্ধীজীর প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন আয়েঙ্গার। ছোটখাটো সংশোধনী প্রস্তাব সূত্রে আলোচনাও চলল অনেকক্ষণ। শেষপর্যন্ত ক্লোজার ভোটও পড়ল। বলেছি, এই অন্তিমমুহূর্তে সুভাষচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হলেন। অর্থাৎ প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট নেবার মুখে মুখে।

তিনি সভাপতির অনুমতি নিয়ে একটা ছোট্ট বিবৃতি দিলেন। ছোট্ট এই কারণে যে, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লোজার মোসানের পর বক্তৃতায় আপত্তি করাতে প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহরু সুভাষ-চন্দ্রকে নিরস্ত করলেন। মঞ্চে সুভাষচন্দ্র নিরস্ত হলেন বটে, সংবাদপত্রে বেরোলো তাঁর দীর্ঘ বিবৃতি। তাতে তিনি প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগও করলেন যে, প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলতে দেননি। পরদিন বিষয়নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে বাংলার প্রতি-নিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ক্লোজার মোশানের পর ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ থাকে বলতে দেওয়া যায়, বক্তৃতা

দিতে দেওয়া যায়? তাও দিতাম, কিন্তু শ্রোতৃমহল থেকে আপত্তি করলে ন্যায়ত তা দিই কি করে?

সুভাষচন্দ্রের ছোট্ট বিবৃতিতে কি ছিল?

বললেন, ছিল বিব্রত হতভম্ব, ঠিক যাকে বলা যায়, আউটউইটেড, তরুণদের একটি মৃদু নিষ্ফল প্রতিবাদ।

সুভাষচন্দ্র বললেন, তাঁর তরুণ বন্ধুরা তাঁকে অবস্থাটা পরিষ্কার করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এমন কি হল যে, দিল্লীর সর্বশেষ প্রস্তাব থেকে প্রবীণ নেতারা সরে এলেন? তাতে তো সর্বদলের সম্মতিই ছিল। তাঁর অবশ্য প্রবীণ নেতাদের প্রতিবন্ধক হবার কোন অভিপ্রায় নেই এবং সেজন্য তিনি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটও দেবেন না। ইত্যাদি।

জিগগেস করলাম, তবে আর কি হল?

বললেন, আপাততঃ কিছুই হল না। প্রস্তাবটি ১১৮—৪৫ ভোটে গৃহীত হয়ে গেল। বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক ভালোয় ভালোয় সমাপ্তির দিকে এগোলো। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে বিক্ষোভ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠছিল। তার একটা লক্ষণ প্রকাশ পেল যখন বাংলার প্রতিনিধিরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করলেন দু'ভাবে: বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে নতুবা নিরপেক্ষ থেকে···

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: আপনি? বলেই মনে হল, ঠিক হল না। কিন্তু তিনি বিরক্ত হন নি; হেসে বললেন, নিরপেক্ষ, কেননা, আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গেছলাম। মারাঠী ব্লকে এবিষয়ে দ্বিধা ছিল না, ওঁরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের পক্ষপাতী বলে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটকের দৃশ্যান্তর হতে লাগল, সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি থেকে। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে আর কিছু করবার ছিল না। সংবাদপত্রের বিবৃতিতে তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু যে কথা কটি বড় হয়ে উঠল তাই উল্লেখ করছি। বলে রাখি, এতে জওহরলালের সেদিনকার ভাষণেরই

প্রতিধ্বনি রয়েছে, জওহরলাল নেই, কিন্তু তাঁর কথা 'রিলে' করলেন সুভাষচন্দ্র, অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ তরুণদের মুখপাত্ররূপে :

> "What we feel acutely is that at a most critical juncture in our history our older leaders have failed to rise to the occasion. After the death of Lala Lajpat Rai and the manner in which it was brought about, after the happenings at Lucknow and Cawnpore and at other places, after the speech of His Excellency the Viceroy, we would have expected our leaders to respond to the attitude of the Government in a fitting manner by adopting a policy, atonce bold and defiant."

তরুণদের পক্ষে জওহরলাল পিছিয়ে যাওয়াতে সুভাষচন্দ্রকেই নেতৃত্ব নিতে হল ; কিন্তু আমাদের মত কোন-না-কোন প্রবীণ নেতার অনুগামীদের হঠাৎ কোন তরুণ নেতৃত্বে নির্ভর করা সম্ভব হয়-নি ; তরুণদের পক্ষে জোরালো অনেক যুক্তি সত্ত্বেও পাকা খুঁটিগুলো ছাড়তে পারিনি। সত্যি বলতে কি, স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে নতুন করে ভাবনার যথেষ্ট শক্তিও আমার মত মানুষের ছিল না।

তবে বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে হেরে যাওয়ার পর তরুণপক্ষে যখন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কেননা, সুভাষচন্দ্র এক বিরাট রাজনৈতিক ঝুঁকি নিলেন ; তিনি এই যে প্রবীণ রাজনীতিকদের অপ্রিয়ভাজন হলেন, আর কখনও তাঁদের স্নেহাশ্রয়ে তাঁর পুনর্বাসন হয়নি, ক্রমশই দূর থেকে দূরে গিয়ে পড়তে লাগলেন। পক্ষান্তরে জওহরলালের প্রথম নতিস্বীকৃতি তাঁকে গান্ধীজীপ্রমুখ প্রবীণ নেতাদের নিকট থেকে নিকটতর করেছে। ১৯২৮-এর কলকাতায় গান্ধীজীর মর্যাদার বিজয়ের পর পরবর্তীকালে জওহরলালের নেতৃত্বকে বারংবার সমুন্নত করে তুলেছেন গান্ধীজী। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিপদে জওহরলালকে বরণের পথ এই সময় থেকেই নিষ্কণ্টক করে চললেন গান্ধীজী এবং উপলক্ষ দেখা দিক না-দিক, জওহর-লালের গুণকীর্তনে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি। একবার

এক যুবসম্প্রদায়ের সামনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনাদের বীরত্ব গাঁথা, গান্ধীজী বললেন, কিন্তু তোমাদের সামনেই তো রয়েছে দৃষ্টান্ত, বলেছিলেন, I want it to be like Pandit Jawaharlal Nehru.

আর সুভাষচন্দ্র ? সেই যে ছক-বাঁধা-পথ স্খলিত হয়ে মূল্য গুণে দিতে লাগলেন, দেশান্তরে ঘটনা-তাড়িত হয়ে, দুর্নামে-সুনামে তার পরিসমাপ্তি হল ; অবিচ্ছিন্ন স্বদেশ-পুত্তলী হবার ভাগ্য তিনি হারালেন কলকাতা কংগ্রেসেই।

কিন্তু আর পিছোবার পথ নেই এবং সকলের পথ কুসুমাস্তীর্ণ থাকেও না।

সংবাদপত্রে বিবৃতির পর সুভাষচন্দ্রকে তাই প্রকাশ্য অধিবেশনে তরুণের বিদ্রোহ ঘোষণার বর্শাগ্র হতে হল। তিনি গান্ধীজীর ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাবে বিরোধিতা করে তুললেন এক সংশোধিত প্রস্তাব এবং এরই নাম স্বাধীনতা প্রস্তাব।

আবার পাতা উল্টে উল্টে ঠিক জায়গাটিতে স্থির হলেন এবং পড়তে লাগলেন ;

> "The Congress adheres to the decision of the Madras Congres declaring complete independence to be the goal of the Indian people and is of opinion that there can be no true freedom till British connection is severed.
>
> The Congress accepts the recommendations of the Nehru Committee as agreed to by the Lucknow All-Parties Conference for settlement of communal differences. The Congress congratulates the Nehru Committee on their patriotic labours and while it does not accept Dominion Status as the basis of the recommended constitution is of opinion that other recommendations contained in the report constitute a great step towwrds political advance and, without committing itself to every detail, generally approves of them."

লক্ষ করেছো বোধ হয়, এ সেই জওহরলাল-প্রস্তাবেরই

পুনরাবৃত্তি। এই জন্যই বলেছি, এ যেন রিলে রেস, শুধু পার্থক্য, রিলে রেসে টিমটি থাকে অটুট এবং একজন আর একজনের হাতে তুলে দেয়, এখানে একজনকার একটি পরিত্যক্ত বস্তু সাদরে তুলে নিয়ে আর একজন ছুটলেন, প্রথম ব্যক্তি মুছে গেলেন।

আর সুভাষচন্দ্রও যে একটা ভাবের প্রতিভূ হিসাবেই প্রকাশ্য অধিবেশনের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, তা তাঁর বক্তৃতাতেও প্রতিফলিত হল। তিনি ইংরেজীতে যা বলেছিলেন, তার বাংলার মর্মার্থ এই দাঁড়ায়ঃ

"আমি যে সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে দাঁড়ালাম, এতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, একটা মতদ্বৈধ—মৌলিক মতদ্বৈধ ঘটেছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবীন পন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে।

আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, আমি আপোষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি নে।

আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছেন যে, বাংলার ডেলিগেটরা, অন্তত তাঁদের অধিকাংশ, একত্র মিলিত হয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে এই সংশোধনী প্রস্তাব তোলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সভায় যেরকম ভোটই পড়ুক এবং তার পরিণতি যাই হোক তা তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন। আজ এখানে আমি যদি না দাঁড়াতাম এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে, তবু আপনারা নিশ্চিত জানবেন, আর কেউ দাঁড়াতেনই এই কর্তব্য পালন করতে।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগ এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা যাঁরা এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন কর্তব্য বলে মনে করছি তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে এইটিই অনুভব করছি, এ এক এমনই সন্ধিক্ষণ যে, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বনাম স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতবর্ষে সত্যিকারের কি মানসিকতা বিরাজ করছে তা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা দরকার। পক্ষান্তরে, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, মাদ্রাজ-প্রস্তাবকে খর্ব করা

হচ্ছে। আমাদের অনুভূতিকে ভাষা দিয়ে আমরা বলতে চাইছি, না, আমরা স্বাধীনতার পতাকাকে এক দিনের জন্যও আনত হতে দিতে রাজি নই।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলুন তো, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পাবার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে এ আপনারা বিশ্বাস করেন? পণ্ডিত মতিলাল তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তিনি তা বিশ্বাস করেন না। তবে কেন আমরা আমাদের পতাকাকে বারো মাসের জন্য অবনমিত করতে যাচ্ছি?

হ্যাঁ, আপনারা এ প্রশ্ন করতে পারেন, এই স্বাধীনতা প্রস্তাব থেকেই বা আমরা কি পাচ্ছি? আমি বলব, পাচ্ছি, পাচ্ছি এক নতুন মানসিকতা।

সব লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, এ আপনারাও লক্ষ করেছেন।

"দেখুন, বাংলার কথা বলতে পারি, আপনারাও জানেন যে, এদেশে জাতীয় আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে আমরা বরাবর মুক্তি বলতে অখণ্ড ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝে এসেছি, আমরা কখনো তাকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বলে বুঝিনি। ঐ স্বাধীনতার জন্য আমাদের দেশে অত জীবনোৎসর্গের পর, আমাদের কবিরা অধিনতাপাশ-মুক্তিকে বারংবার অখণ্ড ও পূর্ণ স্বাধীনতা বলে শোনাবার পর আমাদের দেশের তরুণসমাজের কাছে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের লেশমাত্র আবেদন নেই।"

সুভাষচন্দ্রের ঐ সংশোধনী প্রস্তাব ও বক্তব্যকে মাদ্রাজের সত্য-মূর্তি সমর্থন করলেন।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত গান্ধী-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন, রক্ত-তর্পণই যদি করতে হয় তবে তা অখণ্ড ও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই করা হোক—ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের জন্য নয়।

গোটা প্যাণ্ডেলটার ভেতরে কেমন একটা অনিশ্চয়তার স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল; হৃদয়ে হৃদয়ে দারুণ উৎকণ্ঠা, তরুণের বিদ্রোহ,

প্রবীণদের মর্যাদার লড়াই, স্বাধীনতা তো সংগ্রাম লড়াইয়ের ট্রফি, হাতের কাছে গান্ধীজীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব।

রাত দশটা বেজে ২০ মিনিটে এল ঘড়ির কাঁটা। গান্ধীজী তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠলেন জবাব দিতে। মনে হল, তিনি তাঁর নিজের দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন। প্রবল বিশ্বাসের স্পর্শ এসে লাগল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে। তিনি বললেন, তিনি বিশেষ করে তরুণ-বাংলাকে উদ্দেশ করেই বলেছেন। তিনি তাঁর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তা'ছাড়া, এই দলিল (নেহরু রিপোর্ট) কোত্থেকে উদ্গত হল? মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকেই তো? মাদ্রাজ কংগ্রেসেই তো একে গড়ল? তবে?

"এবিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশই নেই যে, আমি এই যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি তা আপোষ-মীমাংসারই ফসল। এ কেবল আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; এর উদ্ভাবনায় অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন; যতটা করা সম্ভব ততটাই তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেক পার্টিকে।"

এতক্ষণ যে-গণ-মনসার কনা বিচিত্র বাঁশির তানে একবার এদিক আর একবার ওদিক দুলছিল তা যেন একদিকে স্থির হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট মতিলাল নেহরু দুই পক্ষের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। রাত সাড়ে এগারোটায় ভোট গণনা সুরু হল, তিনি চারজনকে গণনার কাজে নিয়োগ করা হল। বারোটা বাজল, সাড়ে বারোটা বাজল, তারপর একটা। গণনা শেষ। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবের অনুকূলে পড়েছে ৯৭৩ ভোট আর প্রতিকূলে ১৩৫০; ৩৭৭ ভোটের ফারাক। বাংলার ভোটেরও এক তৃতীয়াংশ গেছে তাঁর প্রতিকূলে, দুই-তৃতীয়াংশের অথবা অধিকাংশের সমর্থন পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ঐ এক-তৃতীয়াংশই অবশিষ্ট গান্ধী-ভারতের সূত্রবন্ধন বা সেতুস্বরূপ হয়ে রইল। অন্ধ্র প্রদেশের ভোট ৫০টি পক্ষে তো ১০০টি বিপক্ষে, মাদ্রাজেও ৫০টি পক্ষে ১০৫টি বিপক্ষে, সেণ্ট্রাল

প্রভিন্সে ৪৫/৫৬, কর্ণাটক ৩৯/৪৭, বোম্বে ৯/৪, যুক্তপ্রদেশ ১১২/২৬৭, সিন্ধু ৯/২০, ব্রহ্ম ১৪/২৮, মহারাষ্ট্র ১১/২৮, বিহার ৫৫/৩৬৫, পাঞ্জাব ৮২/৭৯। বলতে গেলে বিহারই সুভাষচন্দ্রকে হারিয়ে এবং গান্ধীজীকে জিতিয়ে দিয়েছে।

তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন? কলকাতা কংগ্রেসে এই যে তরুণের বিদ্রোহ এ কি নিছক আকস্মিক? অথবা সত্যি করেই প্রবীণেরা স্খলিত হয়ে পড়ছেন? তা কিন্তু আদৌ নয়; বরং এরকম মনে করা ভুল হবে। কেননা, ঐ ভোটাভুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এক বোম্বাই, পাঞ্জাব আর বাংলা বাদ দিলে, সর্বত্রই প্রতিকূল ভোটের সংখ্যা হয়েছে বেশি। অন্ধ্র মাদ্রাজে তো দেড়গুণ, বিহারে বহুগুণ। বাংলা-বিহার দু'টি প্রতিবেশী একেবারে বিপরীতমুখী।

সারা ভারতের দৃষ্টিতে বলতে গেলে, পাঞ্জাবও নয়, এ বাংলারই এক বিশেষ মানসিকতা, যার জন্য তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে, অথচ এই মানসিকতার পোষকতাও সে করতে পারেনি, বিরাট এক সাম্প্রদায়িক লিভায়েথান তাকে পেছনে টেনে রেখেছে, মুষ্টিমেয় ভদ্র হিন্দু বিপ্লবীর কালচার কখনো সঞ্চারিত গ্রাহ্য হয়নি সমগ্র বাংলায়, ১৯০৫ শুধু নয়, দীর্ঘকালের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাংলাদেশকে আছড়ে মেরেছে। তবু ইতিহাসে দাগ আছে, সত্য। দেশবন্ধুনগরেই সারা ভারত যুবকংগ্রেসের তৃতীয় বাৎসরিক মেলা বসেছিল ২৫-এ ডিসেম্বর—ঐ ১৯২৮-এই, প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে. এফ. নরীম্যান পরবর্তীকালে প্রবীণদের হাতে এঁদের দু'জনেরই যে হেনস্তা হয়েছিল সেই কাঁটাগাছের বীজ পড়েছিল এসব যুবসম্মেলনেই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত যুবসম্প্রদায়কে Members of the Republic বলে সম্বোধন করেছিলেন। তোমরা কখনো শুনেছ কিনা জানিনে, সুভাষচন্দ্র এই যুবসম্মেলনেই সবরমতী আশ্রম ও পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন। দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই, তোমরা একালে ভাবতেও পারবে না কি অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল সেকালে।

তরুণেরা আর প্রবীণদের ওপর সবটা নির্ভর করতে পারছে না, এ তেমন রাগ সৃষ্টির কারণ না-ও হতে পারে কিন্তু একেবারে মূল ধরে টান?

সুভাষচন্দ্র এই দিয়ে কথাটা শুরু করেছিলেন যে, "ভারতের তরুণেরা আর প্রবীণ নেতাদের হাতে সকল দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চেষ্ট, তাঁদের পাদমূলে জোড়হস্ত হয়ে বসে থাকতে অথবা মূক নিরীহ পশুর মত চালিত হতে চায় না।

তারপর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যুব-জাগরণের একটি চিত্র তুলে দিয়ে ভারতের মানচিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি সেই মানচিত্রে? বললেন।

"আজ যখন আমি আমার চারদিকে তাকাই তখন দু'টি আন্দোলন বা দু'টি চিন্তাধারা দেখে চমৎকৃত হই। আমি যতই ক্ষুদ্র ও সামান্য হই, এদের সম্পর্কে আমার অভিমত খোলাখুলি ও নির্ভয়ে ব্যক্ত করা কর্তব্য মনে করি। আমি যে দুই চিন্তাধারার কথা বলছি তাদের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে সবরমতী ও পণ্ডিচেরী। আমি এই দুই চিন্তাধারার মৌলিক দর্শন সমীক্ষা করছি নে।"

বললেন, দর্শন তো আমাদের দেশে বরাবর আছে, চলে আসছে। কিন্তু এখানে তিনি এই দুই চিন্তাধারার ব্যবহারিক দিকটা দেখতে চান—I shall talk to you as a pragmatist.

সবরমতী আশ্রমের যে চিন্তাধারা তার প্রচারের প্রকৃত ফল হচ্ছে এই এক ধারণা ও মনোভাবের সৃষ্টি যে, আধুনিকতা খারাপ, বৃহদায়তন উৎপাদনও অনিষ্টকর, অভাব বাড়ানো উচিত নয়, জীবন যাত্রার মান উন্নত করা উচিত নয়, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সেই গরুর গাড়ির কালে ফিরে যেতে এবং মন বা আত্মা এতই বড় যে ব্যায়াম বা সামরিক শিক্ষণ অনায়াসেই উপেক্ষা করা যেতে পারে।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের যে চিন্তাধারা প্রচারিত, এই ধারণা ও মনোভাব সৃষ্টি করে যে প্রশান্ত ধ্যান-নিমগ্ন হওয়ার চাইতে উচ্চতর ও মহত্তর কিছু হতে পারে না।

এইসব প্রচারের ফলে অনেকেই ভুলে গেছেন বর্তমানকালে বিরামহীন নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারাই আত্মোন্নতি সম্ভব এবং প্রকৃতিকে জয় করার জন্য তার সঙ্গে সংগ্রাম করাই শ্রেষ্ঠ পথ।

নিছক দার্শনিক নয়, বাস্তব এই, যে-নিশ্চেষ্টতা এই দুই আশ্রম জনসাধারণ্যে সঞ্চারিত করে চলেছে আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। আমরা যদি মুক্ত, সুখী ও মহৎ এক নবীন ভারতের সৃষ্টি করতে চাই, তবে আমাদের ঐসব অনুসরণ করলে চলবে না।

"গরুর গাড়ির কাল চলে গেছে এবং গেছে চিরকালের জন্যই। সারা পৃথিবী যতক্ষণ সমগ্র অন্তর দিয়ে অস্ত্রবর্জন নীতি মেনে না নিচ্ছে, ততক্ষণ ভারতবর্ষকে যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

অবশ্য একথাও বললেন, "আধুনিকতার আতিশয্যে অতীতের গৌরব যাঁরা ভুলে যান আমি তাঁদের দলে নই। অর্থাৎ, আমরা প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চাই। একদিকে আমাদের যেমন—'চল ফিরে বেদের কালে' শ্লোগানের প্রতিরোধ করতে হবে, তেমনি প্রতিরোধ করতে হবে আধুনিক ফ্যাসানের; আধুনিক ইউরোপীয় অনুকরণের মত্ততাকে।

তুমি জানো না, সত্য, সেকালে এই 'তরুণের বিদ্রোহ' নিয়ে কি তোলপাড় হয়েছিল। কিন্তু এ শুধু বিদ্রোহই, ও দু'টি আশ্রমের কোনটিরই ক্ষতি হয়নি, বরং, আশ্চর্য, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছে, তরুণেরাও গ্রহণ করেনি এই বিদ্রোহকে। ঐ সবরমতী আশ্রমের প্রবীণ মহাত্মাই নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব করে গেছেন ভারতবর্ষে। গরুর গাড়ি আজও চলে, ওপর তলায় মার্কিণী সভ্যতার হাওয়াই জাহাজ চলছে কিন্তু বৃহত্তম ভারতবর্ষ পড়ে আছে ঐ গরুর গাড়ির চাকার নিচে, অপরিমেয় দারিদ্রের কাদায়, কোটি কোটি নিরন্ন মানুষ আজও শূকরের পালের মতো জন্মায়, শীতে কুঁকড়ে মরে, নয়তো বন্যায় প্লাবনে ডোবে, অথবা খরার ধূলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে। জুতো নেই, জামা নেই, দেহাবরণ নেই, গরুর মতই নিরীহ আর সহিষ্ণু, সে দেশেই তো গরুর গাড়ির পাশে লাইমুসিন

চলতে পারে, মাটির বস্তি আর চৌদ্দতলা অট্টালিকা থাকতে পারে। সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ আজ শান্ত, সবরমতীর আশ্রম আজও সত্য।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমকে এবং পরোক্ষে প্রবীণ "মহাত্মার" নেতৃত্বের ওপর কটাক্ষ করলেন, এও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনে তথা বাংলাদেশের পক্ষে কল্যাণবহ হল না। তোমায় বলেছি, ডোমিনিয়ান প্রস্তাব বনাম স্বাধীনতা প্রস্তাবের ব্যাপারে জওহরলাল যেখানে পিছিয়ে গেলেন, সুভাষচন্দ্র সেখানে এগিয়ে এলেন অধিকাংশ বাংলাকে নিয়ে—একেবারে মুখোমুখি কনফ্রন্টেশন এবং তার আগে যুবকংগ্রেসে ঐ ইনডাইটমেন্ট। এ যেন ইচ্ছে করে দুঃখের পথ বরণ করা।

আমি মহাত্মা হতে পারি কিন্তু ব্যক্তি তো বটে, মানুষ তো বটে, হিংসা-দ্বেষ-স্নেহ-ভালবাসা-নিস্পৃহ কাল্পনিক ভগবান নই, ভাষায় যতই সংযম রক্ষার চেষ্টা করি, ভেতরের রক্ত টগবগ করেই। ফলটা হল এই, মহাত্মা অনুগত জওহরলালের জন্য সিংহদ্বারের শত কণ্টক উন্মুলন করে চললেন এবং সেগুলো এসে পড়তে লাগল সুভাষচন্দ্র তথা তরুণ বাংলার চলার পথে। আমরা নিঃসহায় অবস্থায় তা দেখে গেছি, পায়ের তলায় কাঁটা মাড়িয়ে যাবার মত রক্তাক্ত সাহস আমাদের ছিল না, সুভাষচন্দ্রের আশ্বাস সত্ত্বেও মনে হত ওঁর পথ আমাদের অতীতকে ভুলে যাবার, হোক তা গরুর গাড়ির কালের। চারদিকে তাই এক চরকা-তাঁত-মোটাখদ্দরের জাল বুনে চলেছি খালি পায়ে।

বললাম, আজও তো তাই আছেন।

বললেন, আছি। সংস্কার। কিন্তু তাও নেই। সে বিশ্বাস গেছে, বিশ্বাসহীন কতকগুলো উপকরণ আর আচার আছে, এবং আজ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সব ব্যাপার যেন বুঝতে পারছি। তাইতো, যে-ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নিজে এসেছি, নিজেও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলাম কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, আজ সেই ইতিহাসই নতুন করে পড়ছি এবং আশ্চর্য, নতুন মানে উঠে আসছে।

বলা হয়নি, সুভাষচন্দ্র আর একটি অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন, দেশান্তরে ভবিষ্যৎ 'নেতাজী' স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের হিন্দুস্থান সেবাদল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং কলকাতা স্বেচ্ছাবাহিনী জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং তখনই এই সংস্থাকে আরও মিলিটান্ট দেখার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগ

এই ১৯২৮-এর বছর। তার আরও পরিচয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগের প্রথম অধিবেশন দিল্লীতে ৩রা নভেম্বর। এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল। যে কুড়িজন সদস্য নিয়ে সেণ্ট্রাল কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় পরিষদ হয়েছিল তাতেও ছিলেন সুভাষ, নেহরু গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, মৌলানা আবদুল বারি প্রমুখ। স্বাধীনতা-সূচক সংশোধনী প্রস্তাব তুলে সুভাষচন্দ্র যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এই। কিন্তু তার একজন জেনারেল সেক্রেটারী ডোমিনিয়ান দলে নাম লিখিয়ে ভারতের গোটা ভবিষ্যৎ ইতিহাসেরই মোড় দিলেন ঘুরিয়ে।

১৯২৮-এর এই নবজাতক ঝাঁপিয়ে পড়ল ১৯২৯-এ।

এনামেলের একটা ছোট্ট থালায় খানিকটা মুড়ি আর তার ওপর চারটে নাড়ু এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও।

আমি যেন চমকে উঠে বললাম, একি!

দু'কড়ির মা দিয়ে গেছেন, ১৯৩০-এ জেলে গেছলেন, বোধ হয় সেই সুবাদে এই হতভাগার ওপর মায়া। মাঝে মাঝে এমনি দেন নানা ছুতোয়। সুতরাং, ভয় নেই, আমার দারিদ্রে খাবলা মারছ না তুমি। বলে হাসলেন। এত জোরে ওঁকে হাসতে দেখিনি আগে।

থালাটা কোলে নিয়ে বসলাম।

বললেন, তুমি চিবোও, আমি বলি। হ্যাঁ, সত্য, কালের কোলে

২৮, ২৯ বলে কোন দাগ, সীমা বা রেখা আছে? জানিনে। কিন্তু আমাদের সংস্কারে ওটি এমন সহজ হয়ে গেছে, অনুষ্ঠানের তারিখে তারিখে মহাকাল বা সময়কে এমন খণ্ড খণ্ড করেছি যে ভুলেই গেছি ওটা প্রকৃত নয়। তবু আমরা এলাম অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের '২৯-এ।

এই সীমাবদ্ধ কালের ঘটনাগুলো কিন্তু কালাতীত। পাকিস্তানের বীজ যেমন ১৯৪০-এ-ই নয়, তার অনেক আগে। নেহরু কমিটির হাল তোমায় বলেছি। ওর রিপোর্ট নিয়ে কংগ্রেসে দ্বন্দ্ব হল। ভারতবর্ষের বিরাট এক নিস্পৃহ সম্প্রদায়ের মুখর ব্যক্তিরা পথান্তরে সহধর্মীদের হাতছানি দিল। ভারতবর্ষে রক্তাক্ত পরিণতির লক্ষণগুলো শতাব্দীব্যাপী তো বটেই, তারও বেশি।

১৯২৯-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে মুসলমানদের এক সর্বদল সম্মেলন হয়; তাতে মৌলানা মহম্মদ আলি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন-প্রথা সমর্থন করে হিন্দু-সংখ্যাধিক্যে এই বলে ভয় না পেতে পরামর্শ দেন যে, অতীতে যত ধর্মযুদ্ধ হয়েছে তাতে দেখা গেছে, এক মুসলমান তিন কাফেরের সমবল ধারণ করেন। এই বীরত্বগাথায় অনুপ্রাণিত হয়েই কিনা বলতে পারব না, ৯ই এপ্রিল লাহোরে এক বইয়ের দোকানে, জনৈক মুসলিম বীর 'রঙ্গিলা রসুলের' লেখক মহাশয় রাজপালকে হত্যা করল।

সুতরাং, এই রাজনৈতিক অবস্থার ফাঁকফোঁকর দিয়ে সাইমন কমিশন আনাগোনা করতে লাগল। কমিশন এল কলকাতায় ১২ই জানুয়ারি। মাদ্রাজে গেল ১৮ই ফেব্রুয়ারি, পেল বিরূপ অভ্যর্থনা। ১৪ই মার্চ নাগপুরেতে সেই 'সাইমন ফিরে যাও,' আর কালো পতাকা। ২৬-এ এপ্রিল যখন লণ্ডনে ফিরে গেল তখনও দেড়শ' ভারতীয় বিক্ষোভ জানালো। হলে কি হবে? ভারতের ভালো করার স্বক্ষপে ২৩-এ ডিসেম্বর বেরোলো সাইমন কমিশনের রিপোর্ট।

এসব কিন্তু ১৯২৯-এর পরিচয় নয়।

১৯২৯-এর পরিচয় সণ্ডার্স হত্যাসম্পর্কে ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সারাভারত জুড়ে ব্যাপক গ্রেপ্তার। সণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে

শুধু তো নির্বিচার ধরপাকড় নয়, নিপীড়ন ও নির্যাতন চলল ছাত্র ও জাতীয়তাবাদী কর্মীদের ওপর। গ্রেপ্তার, গৃহতল্লাসি সংবাদপত্রের নিত্যনৈমিত্তিক খবর হয়ে দাঁড়ালো। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, পুণা, এলাহাবাদ, চাঁদপুর, ঢাকায় শ্রমিক আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে মীরাটে হাজির করা হতে লাগল। ধরবার পরও নিস্তার নেই, ট্রেনে, জেলে সর্বত্র হাত-কড়া এবং পাছে কেউ চেনে এজন্য মোটা বোরখায় জড়িয়েও চালান হল সন্দেহভাজনের, শ্বাসরোধ হয়ে মরণ আর কি! ডাঃ আন্সারী ও অন্যান্য নেতা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন ৭ই জানুয়ারি।

কলকাতায় বিলাতী কাপড়ের বহ্নুৎসব উপলক্ষে গান্ধীজীও সদলে গ্রেপ্তার হলেন ৪ঠা মার্চ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হল সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়ান ইন বণ্ডেজ' প্রকাশনার জন্য। ১১ই আগস্ট নিখিল বঙ্গ নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী দিবস পালন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করার জন্য সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল ৩রা সেপ্টেম্বর; এর নামেও হয়েছিল এক ষড়যন্ত্র মামলা। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার কংগ্রেস নেতারা যখন ১৯২৯/৩০-এ লাহোর কংগ্রেসে তখনও এই ষড়যন্ত্র মামলার খড়্গ ঝুলছিল।

এরই মধ্যে সেণ্ট্রাল এসেম্বলির সভাকক্ষে পড়ল বোমা আর হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মির ইস্তাহার।

বহ্ন্যুৎসবের অপরাধে সদল গান্ধীজীর এক টাকা করে জরিমানা হল (২৭শে মার্চ)। কেন্দ্রীয় আইনসভায়, মানে সেণ্ট্রাল এসেম্বলিতে বোমা নিক্ষেপের দায়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল ১২ই জুন; এদিনই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হল; সণ্ডার্স হত্যা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলারও আরম্ভ হল ১০ই জুলাই আর লাহোর জেলের ভেতরে চলল বন্দীদের মর্যাদার লড়াই—অনশন। রামানন্দ চ্যাটার্জির হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে চার মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল।

মস্ত এক দাগ কেটে দিয়ে গেল যতীন্দ্রনাথ দাস; ৬৪ দিন অনশনের ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁর অসামান্য জীবনাবসান হল। হাওড়া টাউন হল থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত যে দু'মাইল ব্যাপী জন-মিছিল পথ-পরিক্রমা গেল (১৬ই সেপ্টেম্বর) তার কথা তোমায় বোধ হয় বলেছি, হয়ত আবারও বলব, কেননা এই অসাধারণ জীবন-দানের কথা মনে পড়লে আমি আমার আবেগ সংযত করতে পারিনে।

এমনি এক মৃত্যু ঘটেছিল রেঙ্গুন জেলেও, পীতবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণের দাবিতে ফুঙ্গি ইউ উইজায়া চার মাসের অনশনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

১৯২৯-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, যেদিন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বেরোলো সেদিন বড়লাটের স্পেশ্যাল ট্রেনটি বোমায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। ট্রেনটি দাক্ষিণাত্য থেকে আসছিল এবং নয়াদিল্লীর ছ'মাইল দূরে নিজামুদ্দিন স্টেশনের কাছাকাছি হয়েছিল ঘটনাটি। কেউ আহত হয়নি। বোমাটাকে দুটো রেলের মাঝখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল আর স্টেশন থেকে তিনশ গজ দূরে একটা ব্যাটারীর সংলগ্ন ছিল লুকোনো কেব্‌ল। বোমাটা ফাটে চার নম্বর কোচের নিচে, বড়লাটের স্যালুন আর দুটো কোচ ছিল পেছনে।

ঘটনাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৯/৩০-এর কংগ্রেসে এই সম্পর্কে গান্ধীজী উত্থাপিত একটি নিন্দাত্মক প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

জিগ্‌গেস করলাম: ১৯২৮-এর ডোমিনিয়ান প্রস্তাবটির কি হল?

বললেন, বলছি। কিন্তু ১৯২৯-এর আরও কিছু পরিচয় আছে। তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে এই কারণে যে, বিচিত্র মানসিকতার মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব একটা বিশেষ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল তার বাহন ছিল এগুলোই।

একটু থেমে কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন:

ফেব্রুয়ারি মাসের ন'তারিখে পাবনায় এক যুব-সম্মেলন হয়েছিল ; সেখানেও সুভাষচন্দ্র এক নতুন সমাজ ও নতুন জাতি গঠনের আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি আর এক উপলক্ষে বিলাতী কাপড় বর্জনের আর পাট চাষ হ্রাসের আবেদন জানিয়েছিলেন। সত্য, মনে রেখো, এই পাট বাংলা-বাঙ্গালীর জীবনে এক অভিশাপরূপে এসেছিল, চলে এসেছে এবং আজ স্বাধীনতার পরও চলছে, তোমায় বলব।

যশোর জেলা সম্মেলনেও সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাইমন কমিশন নিয়োগের পর থেকে এই যে নিষ্ঠুর সরকারের পীড়ন-নীতি চলছে তা শান্তিপূর্ণ ও বৈধ আন্দোলন লক্ষ্য করেই প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সেন্ট্রাল প্রভিন্সের যুব-সম্মেলনেও সভাপতি হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র (২৯ নভেম্বর) ; ডিসেম্বরের দুই তারিখে সেখানে যে ছাত্র-সম্মেলন হয় তারও সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র।

সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তরুণ ভারত বিদ্রোহী তারুণ্য-কেই অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু তরুণেরা যে কত শক্তিশালী তা কেবল কার্যকালেই প্রতিপন্ন হয়েছে। না, শুধু ১৯২৯/৩০-এর কংগ্রেসেই নয়, ১৯২৯-এর সূচনা থেকেও 'ধীরে বয়ে গেছে ডন'।

২৯-এ জানুয়ারি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল উদ্বোধন করতে গিয়ে বড়লাট যথারীতি এক দীর্ঘ নীতিগত বক্তৃতা দেন। তার ক্ষুদ্র চুম্বক হচ্ছে এই যে, Declaration of 1917 stands as solemn pledge of British people to India.

নেহরু রিপোর্ট তাঁদের দৃষ্টিগোচর অথবা কর্ণগোচর হয়েছে কিনা তার আভাসমাত্র নেই।

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বললেন,— আপোষ আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়নি।

> The door of negotiations is not closed. There is yet ample time for a free exchange of opinion on terms honourable to all, provided the will for such a free exchange is there.

সুতরাং, এখনও সময় হয়নি "নিকট যখন"বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

প্রেসিডেণ্টের চা-পার্টি

১৯-এ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল বড়লাটকে এক চা-পার্টি দিলেন এবং তাতে গান্ধীজী ও অন্যান্য দলনেতাকেও আমন্ত্রণ করলেন। আলোচনা কঠিন গোপনতার বেষ্টনীতে আড়াল করা হল, কিন্তু আলোচনার প্রকৃতি ও বিষয় যে চা বা স্ন্যাক্‌সের ভালমন্দ বিচার নয়, রাজনৈতিক—এবং তাও কলকাতা কংগ্রেসের ইতিকথা এবং বোম্বাইয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তা' মোটামুটি জানা গেল। শেষেরটা বরাবরের মত কংগ্রেসকে ঘায়েল করার হাতিয়ার।

এরপর ১১ই আগস্ট তেমনি এক গোপন বৈঠক হল। গান্ধীজী, জিন্নাজী এবং আলিভাইদের। প্রযোজনা করেছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বোম্বাইয়ে। উদ্দেশ্য—নেহরু রিপোর্টকে এমন-ভাবে সংশোধন করা যাতে তা সব মুসলমানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ, স্পষ্টই বোঝা যায়, বড়লাটের দুইচোখে যে বোম্বাই-য়ের রক্তচক্ষু ফুটে উঠেছিল তার ফল ফলতে শুরু করল। এত ভারতীয় রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি অথবা বিভ্রান্তির এক মস্ত কলকাঠি। আমরা বরাবর এজন্য ইংরেজকে দুষেছি, আবার ইংরেজের সাহচর্যেই ফয়সালার ময়দানে নেমেছি।

লোকে বলে বটে ইতিহাসের শিক্ষা, কিন্তু কোনকালেই কেউই ব্যক্তিগতভাবেও নয়, জাতিগতভাবেও নয়, ইতিহাসের শিক্ষা নেয়নি, নেয় না। সুতরাং আপন গতিতেই ১লা নবেম্বর বড়লাটের ঘোষণাকে উপলক্ষ করে দিল্লীতে হল এক নেতৃসম্মেলন। গান্ধীজী চারটি শর্তে সাক্ষাতে রাজি হলেন। অর্থাৎ, যদি ঐ চারটি শর্ত পূরণ করা হয়। পরদিন ২রা নবেম্বর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বড়লাট-প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এলেন এবং তাই হল ঐ প্রস্তাবের জবাব।

বড়লাটের ঘোষণা নিয়ে ইংলণ্ডের লর্ডস সভা ও কমন্স সভায়

৫ ও ৭ই ডিসেম্বরে যে চুলচেরা বিতর্ক হয়েছিল তাতে এই স্থূল কথাটিই পুনরুচ্চারিত হল যে, বড়লাটের বিবৃতিটি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি মাত্র ; কমন্স সভায় ওটাকে ফাঁকা আওয়াজ বলেই বর্ণনা করা হল।

বড়লাটের ডাকে নেতৃবৃন্দ

ভারতীয় রাজনীতিকেরা হাল ছাড়লেন না ; তাঁরা এলাহাবাদে এক সম্মেলন ডাকলেন। পার্লামেণ্টে সরকারী মুখপাত্রের বিবৃতি এবং মিঃ বলডুইনের প্রশ্নের মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যে জবাব দেন তার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাটা পর্যালোচনা এবং দরকার হলে দিল্লী ম্যানিফেস্টোটির পরিবর্তন সাধনের জন্য। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড স্পষ্ট করেই বলেছেন, ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি তো! সম্মেলনে তাঁরা একটি প্রস্তাবক্রমে স্থির করলেন যে, তাঁরা দিল্লী ম্যানিফেস্টোটিই আঁকড়ে থাকবেন এবং আশা করবেন যে, বৃটিশ সরকার শিগগিরই এতে সাড়া দেবেন।

সুভাষচন্দ্র বড়লাটের ডাকে যাননি এবং দিল্লী ম্যানিফেস্টোর কেউ নন বলে লণ্ডন কংগ্রেস কমিটি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রস্তাবে বললেন, সুভাষচন্দ্র বড়লাটের ঘোষণা ও দিল্লী ম্যানিফেস্টোয় পূর্ব-পরিকল্পিত ফাঁদটি দেখতে পেয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। প্রস্তাবে তাঁকে অনুরোধ করা হল তিনি যেন লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পেছপা না হন।

ভারতীয় রাজনীতির আর একটা দিকও তোমায় খেয়াল রাখতে বলি। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে—তোমায় বলেছি ?—লিলুয়া কারখানার, বিহার কিষাণ সভার ২০,০০০ চাষী-মজুর চত্বরে বন্যার মতো ঢুকে গেছল ? প্যাণ্ডেলের বাইরেই তাদের সম্বোধন করে নেতারা বক্তৃতা দেন ; কিন্তু তাতেও হয়নি, প্যাণ্ডেলে বসেই আর এক সভা করে তারা শান্ত হয়। বৃহৎ শিল্প কারখানা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শক্তিও জাগছে, সেদিন তারই

জানান দিয়ে গেছল ওরা। মীরাট ষড়যন্ত্র উপলক্ষে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে ভারত সরকার যে মতলবই হাসিল করে থাক তাতে ঐ শক্তি যে আর উপেক্ষার নয় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এ পরিচয় ওরা ভালভাবেই দিল ১৯২৯-এর ২৬-এ এপ্রিল। বোম্বাইয়ের ৬৭টি কাপড়কলের দেড়লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে বসল। গিরনি কামদার ইউনিয়ানের অধিকাংশ নেতাকেই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এ পর্যন্ত ভাল—ওদের সংহতির দিক থেকে। কিন্তু নাগপুরে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বসলে দেখা গেল মস্ত বড় ফাটল দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে। নাগপুরে এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জওহরলাল। ২৪টি ইউনিয়ন এই কেন্দ্রীয় সংস্থার সংশ্রব এই বলে বর্জন করল যে, এতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা প্রাধান্য লাভ করেছেন তাঁদের নীতি শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী। যারা সব ইউনিয়ন ছেড়ে গেল তাদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে এন. এম. যোশী, দেওয়ান চমনলাল, ভি. ভি. গিরি, বি. শিব. রাও।

বাংলাদেশে ছাত্র-আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। ৭ই ডিসেম্বর এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন দেখা দিল।

খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভারত সরকার কংগ্রেসকে নিয়ে খুব বেশি বিব্রত বোধ করছিলেন না, তার কথা ধীরে সুস্থে কর্ণপাত করলেও চলবে এই মনোভাব নিয়ে কখনও কখনও ওঁদের ডেকে পুরোনো কথাটা শুনিয়ে দিয়েছেন ; কিন্তু যে আন্দোলন, বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ কংগ্রেস মঞ্চেও স্বীকৃতি পায়নি তাই নিয়ে বিব্রত ও তৎপর হয়ে পড়ছিলেন। সণ্ডার্স লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, এসেম্বলিতে বোমা বিস্ফোরণ মামলা, কলকাতায় সুভাষচন্দ্র-প্রমুখকে জড়িয়ে রাজদ্রোহ মামলা, যতীন্দ্রনাথ দাশের মৃত্যু, শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন স্বাধীনতা সম্মেলন প্রভৃতি সরকার পক্ষকে অতিমাত্রায় তৎপর করে

তুলেছিল। আইনের ভাণ্ডারে যে মজুত আয়ুধ আছে তাতে যেন কুলোচ্ছিল না, তাই আইনসভায় এনেছিলেন পাব্লিক সেফ্‌টি বিল। প্রেসিডেণ্ট ভি. জে. প্যাটেল প্রস্তাব করলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওটি মুলতুবী থাক। ভারত সরকার এ প্রস্তাব মানতে চাইলেন না। (এপ্রিল ২ ও ৪) তখন প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল সুস্পষ্ট রুলিং দিলেন যে, সরকারী বিবৃতি প্রেসিডেণ্টের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে এবং তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, অতএব তিনি পাব্লিক সেফটি বিলকে বিধি-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করছেন। বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিনান্স জারি করে পাব্লিক সেফ্‌টি বিলটি কার্যত বলবৎ করলেন। ভারত সরকার সেখানেই ক্ষান্ত হলেন না, আগস্ট মাসে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা হ্রাসেও হাত দিলেন।

কেবল অবিচ্ছিন্ন গুরুগম্ভীর ঘটনাই নয়, মাঝে মাঝে প্রহসনও ঘটে। এবং তাই ঘটেছিল ১৯২৯-এর ৯ই মে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মঞ্চ যখন তৈরি তখন ঐদিন মীরাটে হঠাৎ সাজ সাজ রব পড়ে গেল, মীরাট শহরের এক অভূতপূর্ব চেহারা। সর্বত্র সৈন্য ও পুলিশের পদচারণা। কড়া দৃষ্টিপাত না করে কাউকে শহরে আসতেও দেওয়া হচ্ছে না। কোন শহর অবরোধ করলে যা হয় তাই। শহরের বাসিন্দা ও নবাগতদের পক্ষে অবস্থাটা মোটেই স্বস্তিকর ছিল না। থমথমে গমগমে ভাব।

পরে জানা গেল, বৃটিশ রাজপুরুষেরা গুজবে কান দিয়েছিলেন, স্নায়ুভঙ্গে তাঁরা এই আশঙ্কা করেছিলেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মে মীরাটে অভ্যুত্থান হয়েছিল।

গ্রেপ্তার আর গ্রেপ্তার

বোম্বাই বা কলকাতা ছেড়ে মীরাটেই যে সর্বভারতীয় মামলাটি হল তা কিছু রহস্যময়। একটা মাত্র যুক্তি পাওয়া যায়; ধৃত ব্যক্তিদের জুরী বিচার থেকে বঞ্চিত করা; বোম্বাই বা কলকাতায় তা' দিতে

হয়। তবু সে যুক্তি সবটা টেঁকে না; আসামীদের মধ্যে বৃটিশ নাগরিকও ছিলেন।

১৯২৯-এর ২০এ মার্চ বিরাট এক জাল ফেলেছিলেন ভারত সরকার; কোন্ এক গোয়েন্দা নাকি খবর দিয়েছিল যে, মস্ত এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলেছে, সোভিয়েট রুশিয়ার তাঁবেদার এক সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা চলেছে তলে তলে। সুতরাং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও তল্লাশী চলল, বাড়িঘর সংবাদপত্র-অফিস কিছু বাদ পড়ল না। লক্ষ্যটা কম্যুনিস্টদের ধরা, কিন্তু ধরা পড়লেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকর্মী, শ্রমিক-নেতা ও যুবলীগ সদস্যদেরও কেউ কেউ।

ওঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন এ. আই. সি. সি. সদস্য: ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জি, ডি. জে. থেঙদি, কেদারনাথ সায়গল, সোহন সিংঘি যোশী, কে. এল. যোগলেকর, আর. এস. নিম্বকর, এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমেদ। আর ছিলেন বেঙ্গল ফেডারেশন অব লেবারের কিশোরীলাল ঘোষ।

একটা বই দেখে পড়ছিলেন। বললেন, বাংলা আর বোম্বাইয়েরই বেশি। বাংলার ছিলেন—কিশোরীলাল ঘোষ, গোপাল বসাক, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জি, ফিলিপ স্প্রাট, অযোধ্যা প্রসাদ, মুজফ্‌ফর আহমেদ, সামসুল হুদা, রাধারমণ মিত্র। বোম্বাইয়ের ছিলেন—এস. ভি. ঘাটে, এস. এইচ. ঝাবওয়ালা, এস.এস. মিরাজকর, জি. এম. অধিকারী, ডি. জে. থেঙদি, কে. এন. যোগলেকর আর. এস. নিম্বকর, এস. এ. ডাঙ্গে, সৌকৎ উসমানী, বি. এফ. ব্রাডলে, এম. জি. দেশাই, এ এ. আলভে, জি. আর. কাসলে; যুক্তপ্রদেশের—ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জি, পূরণ চাঁদ যোশী, গৌরীশঙ্কর, ধরমবীর সিংঘী, এল. আর. কদম; পাঞ্জাবের—কেদার নাথ সাইগল, আবদুল মজিদ, সোহন সিং যোশ।

বিপজ্জনক জ্ঞানে এঁদের অনেককেই ট্রেনে নিয়ে যাওয়ার সময়, জেলের সেলে রেখেও হাতকড়া দেওয়া হয়েছিল। খাদ্য*বরাদ্দ পাঁচ আনা। এদের গ্রেপ্তার উপলক্ষে এই যে, এত তল্লাশি হল তাতে গাড়ি

গাড়ি বই আর কাগজপত্র উদ্ধার করা হল। ইংরেজি কবিতার বই, সাউদের কবিতার বই পেলে আর রক্ষা নেই। কথা উঠেছিল, League Against Imperialism নাকি কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল নিয়ন্ত্রিত ও তারই অধীন।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব এসেছিল, প্রেসিডেণ্ট অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু বড়লাটের হস্তক্ষেপে তা নাকচ হয়ে যায়। প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতেও তোলবার চেষ্টা হয়েছিল, গবর্নরদের হস্তক্ষেপে সেগুলোও নাকচ হয়ে যায়।

২রা ও ৩রা মে আরও কিছু গ্রেপ্তার হল। তাঁরা হলেন মুনীশ্বর প্রসাদ অবস্তি, শৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এ. কে. ঘোষ, বীরেন্দ্র পাণ্ডে, মহাবীর প্রসাদ পাণ্ডে, রামগোপাল শুক্ল, জে. এন. দাশগুপ্ত, অনিল চন্দ্র মুখার্জি, নরসিংহ দত্ত শর্মা, হংসরাজ ভোরা ও দেশরাজ। তারপর ডাঃ সত্য পাল ও এইচ. এল. হাচিনসন।

১২ই মে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হতেই দশদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায়; তারপর ২৫ তারিখ অবধি শুনানী চলে। চারদিন নিলেন সরকার পক্ষের কৌঁসুলী তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করতে। মনে হল এটি উপলক্ষ, লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ। সব চাইতে চোখে পড়ার মতো হল ডিরেক্টর অব গবর্নমেণ্ট পাব্লিসিটির উপস্থিতি; তিনি স্বয়ং প্রচারকার্যের তদারক ও ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় জানা গেল, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর এইচ. হর্টন এই মর্মে এক রিপোর্ট পেশ করেন:

(১) রুশিয়াতে একটা সংস্থা আছে তার নাম কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল। এই সংস্থার লক্ষ্য পৃথিবীতে যত গবর্নমেণ্ট আছে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাদের উচ্ছেদ সাধন এবং তাদের জায়গায় মস্কোতে সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ ও শাসনাধীন সোভিয়েট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা।

(২) ঐ কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল নানা কমিটি, শাখা ও সংগঠনের মাধ্যমে এর কাজ ও প্রচার চালায়; ঐ সব কমিটি, শাখা সংগঠনগুলো ওর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অথবা প্রাচ্য ও ঔপনিবেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত সাব-কমিটি, গ্রেট বৃটেনের কম্যুনিস্ট পার্টি, রেড ইণ্টার ন্যাশনাল অব লেবার ইউনিয়নস, প্যান প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন, লীগ এগেন্স্ট ইমপিরিয়ালিজম, ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগ ও অন্যান্য সংস্থা মারফৎ কাজ করে থাকে।

(৩) এই কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চরম লক্ষ্য হচ্ছে (ভারতবর্ষ সহ) সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রত্যেক দেশের বর্তমান সরকার গুলোকে সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া ও তাদের উচ্ছেদসাধন করা। এই উদ্দেশ্যে একটি কার্যসূচী রচনা করা হয়েছে, লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তাই অনুসরণ করা হবে। যে সব পদ্ধতি বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে (ক) পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধের প্ররোচনা; (খ) কৃষক ও মজদুর পার্টি, ইয়ুথ লীগ ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন—আপাত দৃষ্টিতে এদের উদ্দেশ্য হবে সংস্থা সদস্যদের কল্যাণ, কিন্তু আসলে সেগুলো হবে প্রচারের বাহন, কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের লক্ষ্য পূরণে ঐ সব পার্টিতে কম্যুনিস্ট আধিপত্য বিস্তার, একই কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অধীন ওগুলোকে একীভূত করা, (গ) ট্রেড ইউনিয়নে, জাতীয়তাবাদী সংস্থায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কম্যুনিস্ট নিউক্লিয়াস স্থাপন করা—উদ্দেশ্য হবে ওগুলো অধিকার করা অথবা কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের স্বার্থে ওদের সমর্থন লাভ; (ঘ) ধর্মঘট, হরতাল ও বিক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া; (ঙ) বক্তৃতা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রুশ বিপ্লব সংশ্লিষ্ট উপলক্ষ উত্থাপন প্রভৃতি এবং (চ) সরকার-বিরোধী যে কোন আন্দোলনের সদ্ব্যবহার ও তাতে উৎসাহদান।

(৪) ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল স্থির করে যে, বৃটিশ ভারতে একটি শাখা সংগঠন স্থাপন করতে হবে এবং আসামী শ্রীপদ অমৃত ডাঙে, সৌকৎ উসমানি ও মুজফ্ফর আহমেদ আরও

কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে মিলে বৃটিশ ভারতে সম্রাটকে তাঁর সার্বভৌমাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এমন একটি শাখা সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়।

(৫) এবং এই উদ্দেশ্যেই স্প্রাট ও ব্রাডলিকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মিলনার হোয়াইটের সামনে মামলা শুরু হল; সরকার পক্ষে ল্যাংফোর্ড জেমস, আসামী পক্ষে কে. এফ. নরীম্যান প্রমুখ কয়েকজন।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী দীর্ঘ এক বক্তৃতার আরম্ভে এই বলতে চাইলেন যে, আসামীদের লক্ষ্য যে বিপ্লব এ তাঁদের 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' এই শ্লোগানেই পরিষ্কার প্রতিপন্ন হচ্ছে।

শুনে অধিকাংশ বন্দী বলে উঠলেন, ঠিক ঠিক।

ল্যাংফোর্ড জেমস বললেন, জাতীয়তাবাদীরা ভারতের স্বরাজ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, আঃ, এঁদের উদ্দেশে আসামীদের কি ঘৃণা! ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বিপথ-চালিত বুর্জোয়া সংস্থা বলে কলঙ্কিত করা হয়েছে; আসামীদের লক্ষ্য ছিল এটিকে দখল করা ও এর মতান্তর ঘটানো। নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে এঁদের অভিমত হচ্ছে: মতিলাল নেহরু—ভয়ঙ্কর দেশপ্রেমিক (dangerous patriot); জওহরলাল স্বল্লোঞ্চ সংস্কারপন্থী (tepid reformist); সুভাষচন্দ্র বসু—বুর্জোয়া ও স্বার্থসন্ধানী (bourgeoisie and ludicrous careerist); মিঃ গান্ধী—কিম্ভূতকিমাকার প্রতিক্রিয়াশীল (grotesque reactionary)।

আসামীরা কখনো হেসে গড়িয়ে পড়ে, কখনো চুপ করে থেকে ল্যাংফোর্ড জেমসের অভিযোগ-তালিকা উপভোগ করতে লাগলেন।

ল্যাংফোর্ড জেমস বললেন, কম্যুনিস্টদের মতে জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ—hopelessly wrong. আর কম্যুনিস্টরা, নিরপরাধ হতে

পারে, অপরাধী হতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী কিছুতেই নয়। এই আসামীদের প্রত্যেকে, আমি বলছি, জাতীয়তা-বিরোধী। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল মিঃ স্ট্যালিনের গবর্নমেণ্টকে হিজ ম্যাজেস্টিস গবর্নমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত করা। বস্তুত, আমাদের অভিযোগই এই এঁরা বলশেভিক, এঁদের আদর্শ বলশেভিক এবং এঁরা ভারতবর্ষে রুশিয়ার অনুরূপ শাসন প্রবর্তনে সচেষ্ট।

বলশেভিক বলতে কি বোঝায়, ল্যাংফোর্ড জেমস তাও বললেন। নিষ্কলঙ্ক বলশেভিক চরিত্র হচ্ছে তুমি তোমার দেশকে ভালোবাসবে না, তুমি হবে স্বদেশদ্রোহী, ভগবানে অবিশ্বাসী, পরিবার-নিস্পৃহ, এক কথায় তুমি হবে সবকিছুর বিরোধী। তোমার মতের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে তুমি নিষ্করুণভাবে ঘৃণা করবে।

ল্যাংফোর্ড জেমসের মতে যে-কোন মানুষ যে-কোন অভিমত পোষণ করতে পারে, কিন্তু বলশেভিজম তো শুধু জীবন-দর্শন নয়, জীবন-প্রণালীও বটে।

ইত্যাদি ভূমিকার পর ল্যাংফোর্ড রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেলেন, 'এ বি সি অব কম্যুনিজম' বইটির কথা উল্লেখ করলেন, বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এঁদের সংশ্রবের কথা বললেন, আর বললেন স্প্রাটের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টির কথা, স্প্রাটের বিদেশের কম্যুনিস্টদের পত্রালাপের কথা, তারপর ব্রাডলি ও হাচিনসনের আগমনের কথা। বললেন, উসমানি —নাসিম, সফিক ও আলিসানের সঙ্গে মিলে মস্কোর প্রিসিডিয়ামে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে প্রথম নিখিল ভারত কৃষক-মজুর সম্মেলনে সোহন সিং যোশ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি হিসেবে তিনি যে বক্তৃতা দেন ল্যাংফোর্ড জেমস তাই থেকে কিছু কিছু পড়েন। তাতে তিনি দেখান, যোশ বলেছিলেন, কৌশল হিসেবে এখন তাঁরা অহিংসানীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না, কিন্তু সকল সময় এবং সর্ব অবস্থায়ই এ নীতি অনুসরণের প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে অহিংসার জন্যই অসহযোগ আন্দোলন

ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বিক্ষোভ, ধর্মঘট, সভাসমিতি ও বলশেভিক সাহিত্যের মাধ্যমে শ্রমিকদের পার্টির আওতায় আনতে বলেছেন এবং গণ-আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে দেশে সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘট সম্ভব করে তুলতে বলেছেন। তাঁদের শ্লোগান হচ্ছে; পূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে।

এরপর ল্যাংফোর্ড মুজফ্‌ফর আহমদের উদ্দেশে লেখা সে চিঠিখানি পড়লেন যে চিঠিখানি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছোবার আগেই পুলিশের হাতে পড়েছিল। তাতে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদসাধনের জন্য খোলাখুলি কঠিন লড়াইয়ে নামতে বলা হয়েছে।

যে-চিঠি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছোলো না, সে-চিঠির নির্দেশ অনুসারে কি করে কাজ হল অনুমান করতে পারিনে, কিন্তু ল্যাংফোর্ড জেমস বললেন, ঐ চিঠি অনুসারে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে তাঁরা (মানে আসামীরা) কলকাতায় এক সভা করলেন এবং সে সভায় কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া সংগঠিত করলেন। তার সদস্যভুক্তিও হল। কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার সংবিধানে আনুগত্য জানিয়ে কেউ কি বলতে পারে যে, সে থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের মন্ত্র ও অভীষ্টে শপথবদ্ধ নয়?

থামলেন।

বললাম, তারপর?

হেসে বললেন, তারপর নেই, আজ এই পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা

১৯২৮/২৯-এর অন্তরালায়িত মেজাজের কথা তোমায় বলছি। ১৯২৯/৩০-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বাধীনতা-প্রস্তাব কেন কিভাবে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এই মেজাজে তার জবাব আছে। এবং এই মেজাজেরই বিস্ফোরণ ঘটেছিল রাজধানী দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায়।

১২ই জুন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা বিস্ফোরণের দায়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল, একথা তোমায় বলেছি।

এমন দু'টি উজ্জ্বল-প্রাণ শিক্ষিত যুবক কেন এই কাণ্ড করলেন? আদালতে এক বিবৃতিযোগে তাঁরা বলেছেন, কারও প্রাণনাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তাঁরা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তা' এসেম্বলি বা আইন-সভায় কেন? কারণ—জাতির সকল দাবি বারংবার অগ্রাহ্য করার জন্য গবর্নমেণ্ট এটি ব্যবহার করেছেন এবং ভারতের অবমাননা ও অসহায়তার প্রতীক হয়ে আছে এটি।

আদালতে ভগৎ সিংহের বিবৃতি

ভগৎ সিং পড়লেন আদালতে ঃ

> Our practical protest was against an institution which since its birth has eminently helped to display not only its worthlessness but its far-reaching power for mischief.

যতই আমরা ভেবেছি ততই এই গভীর উপলব্ধি হয়েছে যে, এ শুধু ভারতের অবমাননা ও নিঃসহায়তা জাহির করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং এ হচ্ছে দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের দম্ভ ও আধিপত্যের প্রতীক। জন-প্রতিনিধিগণ বার বার এখানে জাতীয় দাবি উত্থাপন করেছেন—সে যেন শুধু আবর্জনাস্তূপে সমাধিলাভের জন্যই। তথাকথিত ভারতীয় পার্লামেণ্টে সশ্রদ্ধ-গৃহীত প্রস্তাবগুলো সভাকক্ষের মেঝেয় ফেলে ঘৃণাভরে দলন করা হয়েছে। একদিকে দমনমূলক আইন ও স্বেচ্ছাচারী কানুন বাতিল করবার প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশে নিস্পৃহ উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে, আর একদিকে নির্বাচিত সদস্যরা গ্রহণের অযোগ্য সরকারী বিধিব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করলে তাদের কলমের খোঁচায় সঞ্জীবিত করা হয়েছে।

এক কথায়, আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের

যুক্তি খুঁজে পেতে আমরা হয়রান হয়ে গেছি; ভারতের কোটি কোটি মানুষের স্বেদার্জিত অর্থে সংগঠিত এই সৌকর্য ও আড়ম্বরের কোন আবেদন নেই আমাদের কাছে; আমাদের কাছে এ এক শূন্যগর্ভ মূর্তিও ছলনাময় মায়া-হরিণ। তেমনি আমাদের বোধগম্য হয়নি জননেতাদের মনোবৃত্তি—কেন না, এঁরাই তো ভারতবর্ষের অসহায় পরাধীনতার সাজানো নিদর্শনের ওপর সাধারণের অমূল্য সময় ও অর্থ অপচয়ে সহযোগিতা করেন। আমরা দিনের পর দিন এই নিয়ে এবং শ্রমিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের ব্যাপক গ্রেপ্তার নিয়ে অনেক ভেবেছি। ট্রেডস ডিসপিউটস বিলটি যখন উত্থাপিত হয় তখন আমরাও এসেম্বলিতে উপস্থিত ছিলাম, নিরীক্ষণ করেছি এর বিতর্ক, এর কার্যক্রম; তাতে আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, ভারতের কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই—এ শুধু শোষক শ্রেণীর কণ্ঠরোধী শক্তি ও নিরুপায় শ্রমিকশ্রেণীর দাসত্বের আপদস্তম্ভস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর এই অপমান, যাকে আমরা অমানুষিক ও বর্বরোচিত বিধান মনে করি, তাই সারা দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের অনুগত মাথার ওপর বর্ষণ করা হল এবং কোটি কোটি নিরন্ন ও সংগ্রামী জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হল তাদের প্রাথমিক অধিকার ও বৈষয়িক উন্নয়নের একমাত্র উপায় থেকে। সম্ভবত আমাদের মতো যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর মূক শ্রমকাতা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা কিছুতেই নিরুদ্বেগে এই দৃশ্য দেখতে পারবেন না। শোষকের অর্থনৈতিক সৌধ গড়ে তুলতে যাঁরা নীরবে রক্তপাত করেছেন তাঁদের জন্য যাঁদের হৃদয় আকুল হয় তাঁরা কি পারেন অন্তরাত্মার চীৎকারকে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দমন করে রাখতে? এদেশে সেই শোষকদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে ঐ গবর্নমেণ্ট। আমাদের অন্তরে তারই প্রবল আঘাত লেগেছে।" এস. আর. দাশ একদা ছিলেন বড়লাট-পরিষদের (Governor-General's Executive Council) আইন সদস্য; তিনি তাঁর ছেলেকে একটি পত্র লিখেছিলেন এবং সেই পত্রে তিনি

বলেছিলেন, ইংলণ্ডকে তার স্বপ্ন থেকে জাগাবার জন্য বোমার দরকার। একথাটি মনে রেখেই আমরা—যাদের হৃদয়-বিদারক বেদনা প্রকাশের আর কোন পথই নেই তাদেরই পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আইন সভাকক্ষের মেঝেতে বোমা নিক্ষেপ করেছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বধিরকে অবহিত করা, নির্বিকারকে যথাকালে সতর্ক করে দেওয়া।

"আরও অনেকের আমাদের মতোই তীব্রানুভূতি হয়েছে এবং এই মানব সমুদ্রের বাহ্যিক প্রশান্তির অন্তস্তল থেকে এক অপ্রতিরোধ্য ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে। আমরা শুধু তাদের উদ্দেশে বিপদ-সঙ্কেতটি তুলে ধরছি যারা এই সমূহ বিপদকে মোটে আমলে না এনে ছুটে চলেছে। আমরা অবাস্তব অহিংসার কালাবসান চিহ্নিত করেছি মাত্র; এই অবাস্তব অহিংসার ব্যর্থতা সম্পর্কে উদীয়মান তরুণ সমাজের লেশমাত্র সংশয় নেই। মনুষ্যসমাজের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা থেকে আমরা অকথ্য দুর্গতি নিবারণের জন্য সকলকে সতর্ক করার এই পন্থা অবলম্বন করেছি।

আমরা যে অবাস্তব অহিংসা কথাটি বলেছি, সম্ভবত তার কিছু ব্যাখ্যা দরকার। কোনো আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করলে তা নিসঃন্দেহে হিংসাত্মক, সুতরাং, নৈতিক বিচারেও অসঙ্গত। কিন্তু কোন সঙ্গত লক্ষ্যে এর প্রয়োগ নৈতিক বিচারেও সমর্থনযোগ্য। যে-কোন মূল্যে বলপ্রয়োগ পরিহার করাই হচ্ছে অবাস্তব এবং দেশে যে নতুন আন্দোলন দেখা দিয়েছে এবং যার দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি তা' গুরু গোবিন্দ সিং ও শিবাজী, কামাল পাশা ও রেজা খাঁ, ওয়াশিংটন ও গ্যারিবল্ডী, লাফায়েৎ ও লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কি বিদেশী ভারত সরকার, কি জননেতৃবৃন্দ, এই দিকটায় চোখ কান বন্ধ করে আছেন, এর অস্তিত্ব, এর কণ্ঠ স্বীকারই করছেন না; তাই, আমরা এমন জায়গায় তা উচ্চারণ করা কর্তব্যবোধ করেছি যেখানে তাঁদের কর্ণপাত না করে গত্যন্তর নেই।

দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে ভগৎ সিং আবেগের সঙ্গে পড়লেন:

বিপ্লব-সাধন মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতা সকলের অনন্যনির্ভর জন্মগত অধিকার। শ্রমিকই সমাজের প্রকৃত ধারক। জনসাধারণের সার্বভৌমাধিকার শ্রমিকদের চরম লক্ষ্য। এই আদর্শ এবং এই বিশ্বাসের জন্য আমরা যে কোন দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত। এই বিপ্লবের বেদীমূলে আমাদের যৌবনকে এনেছি আমরা প্রজ্বলিত ধূপের মতো, কেননা, ঐ মহৎ লক্ষ্যে কোন আত্মাহুতিই বড় নয়। আমরা সেই বিপ্লবের অপেক্ষা করছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

এমনভাবে বলছিলেন ও পড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল এসব কথা ওঁর বুঝিবা। শেষ করলেনও এমনভাবে যেন তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু ক্ষণকালের বিরতি ও নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, ভগৎ-বটুকের অনেক কথাই সত্যি, কিন্তু অনেক কথাই মিথ্যে হয়ে গেছে। ওঁরা ধূপের মতো নিশ্চয়ই নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কে অস্বীকার করবে এই সত্যকে? বিপ্লব মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার এ আর এক অনস্বীকার্য সত্য; কিন্তু ভগৎ-বটুকের পথ কখনো সত্য হয়ে উঠতে পারেনি এদেশে, সুতরাং অবাস্তব অহিংসা বিরহিত সশস্ত্র বিপ্লবও নয়। মানবসমুদ্রের অন্তঃস্থল থেকে ঝড়ও উঠেছিল সত্য, সে ঝড় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৩০-এ; কিন্তু সে ঝড়ের বেগ ওদের পথে প্রবাহিত হয়নি; এই ভারতের এক সাগরকূলে ওদের ধূপ জ্বলে উঠে চিরকালের জন্য নিভে গেছে, কিন্তু আর এক সাগরকূলের আহ্বান ওদেরকে অতিক্রম করে গেছে। একদিকে আর্মারি রেডের গোলা, আর একদিকে লবণের গোলা। বঙ্গোপসাগর নয়, আরবসাগরই সত্য হয়েছে। অহিংসা অবাস্তব হয়তো হয়েছে, কিন্তু ওঁদের হিংসার পথও সত্যি হয়ে ওঠেনি।

হ্যাঁ, ধূপকাঠির মতো ওদের আত্মোৎসর্গও তো বিলীন হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। যে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ওরা বাক্‌সর্বস্ব দুষ্ট ক্যাম্পার মনে করেছিল সেই বৈধ পার্লামেণ্টারী পথই তো সর্বাংশে সত্য হয়ে উঠল ভারতীয় জীবনে, সাইমন থেকে কেন, মণ্টেগু চেমসফোর্ড থেকে

মাউন্টব্যাটেন অবধি কোথাও তো এর ছেদ ঘটেনি, সংগ্রাম, আন্দোলন ভারতীয় জীবনে সত্য নয়, সত্য গোল-টেবিল-বৈঠক।

ওঁর কথার সামান্য একটু ছেদ পড়তেই দুঃসাহসভরে বললাম, একটা সামান্য কৌতূহল—

চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, কখন কি অবস্থায় ওঁরা বোমা ফেললেন ?

কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে বললেন,

ট্রেড্স্ ডিসপিউট্স বিলটি সবে গৃহীত হয়েছে; প্রেসিডেন্ট পাব্লিক সেফটি বিল সম্পর্কে রুলিং দিতে উদ্যত, এমন সময় গ্যালারী থেকে পড়ল বোমা—স্যার জর্জ সুস্টার যেখানে বসেছিলেন তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। স্যার জন সাইমনও ছিলেন প্রেসিডেন্টের গ্যালারীতে বসে। আহত হলেন স্যার জর্জ সুস্টার, স্যার বোমানজী দালাল, রাঘবেন্দ্র রাও। বোমানজীর আঘাত কিছু গুরুতর।

সরকার পক্ষের আসনগুলো ভেঙ্গে খান খান। একজন ডেপুটি সেক্রেটারির হাত থেকেও রক্তপাত হচ্ছিল।

শুধু বোমা নয়, বোমার সঙ্গে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বলরাজ স্বাক্ষরিত হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মির ইস্তাহারও ছড়িয়ে পড়েছে।

না, পলায়নের চেষ্টা নয়, অপরাধ অস্বীকারও নয়, কোন অপরাধ জ্ঞানে তো ওঁরা এ করেননি।

দশ মিনিট পর আবার সভা বসানোর উদ্যোগ হয়েছিল; কিন্তু ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সুতরাং মুলতুবী।

পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষ-দ্বারে লাগালো তালা।

বলা বাহুল্য, বন্দী ভগৎ সিং, বটুকেশ্বরও চালান হয়ে গেল; বটুকেশ্বর নয়াদিল্লী থানার দিকে; ভগৎ পুরোনো দিল্লীর চাঁদনী চক থানার দিকে।

এর একটু পরিশিষ্ট আছে, জানালার বাইরে দৃষ্টিপাল করে বললেন,

১১ই এপ্রিল, অর্থাৎ পরদিন প্রহরী-প্রহরায় এসেম্বলি ভবন জম জমাট। স্বাভাবিক। বোমা পড়েছে বলে আইন-পুলিশের তো কিছু হয়নি।

কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল। সরকার পক্ষ পাব্লিক সেফটি বিলটি পাশ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন প্রতিজ্ঞা যে, এসেম্বলি-প্রেসিডেন্টের অধিকার পর্যন্ত গ্রাস করতে উদ্যত হল। প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব ছিল, পাশ করতে হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তির পর, নইলে বিল নিয়ে আলোচনা প্রহসনের মত ঠেকবে। সরকার পক্ষ মানলেন না। তখন প্রেসিডেন্ট তাঁর রুলিং দিলেন।

তিনি বললেন, সরকার পক্ষের বিবৃতি প্রেসিডেন্টের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং তাঁর অধিকার ক্ষুন্নকর। ল-মেম্বার তাঁর সমর্থনে যে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে সমর্থন করতে চেয়েছেন, সেই উদ্ধৃত অংশে পরবর্তী বাক্যটি বাদ পড়েছে। তা' হচ্ছে এই যে, সভাকক্ষে ওটি ভোটে দেওয়া না-দেওয়া প্রেসিডেন্টের এক্তিয়ার। এ ক্ষেত্রে তাঁর সুদৃঢ় অভিমত এই যে, মামলা চলা-কালে বিল নিয়ে বিতর্ক সম্ভব নয়, এই অবস্থায় কোন বিতর্ক প্রতারণা ও প্রহসনেরই সামিল।

I therefore rule it out of order.

তুমি মনে কোরো না, এখানেই পর্ব চুকে গেল। সরকার পক্ষ মুখিয়েই ছিলেন। সবকিছু অনুমান করেই বড়লাট তাঁর সদস্যদের উদ্দেশে এক ভাষণ দেবার জন্য প্রেসিডেন্টের ওপর এক পত্রাঘাত করেছিলেন।

সুতরাং, যথারীতি তিনি সে ভাষণ দিলেন পরদিনই। বলা বাহুল্য, তিনি বোমা বিস্ফোরণের কথা বললেন; সেইটেরই জের টেনে পাব্লিক সেফটি বিল ঐভাবে বাতিল হওয়ায় এক অর্ডিন্যান্স বলে তা বলবৎ করার কথা ঘোষণা করলেন এবং প্রেসিডেন্টের অধিকার হরণ করলেন নিয়মাবলী বদলে দিয়ে।

এসেম্বলি প্রেসিডেণ্টের অপমান

ভগৎ সিং বিবৃতি দিয়েছিলেন আদালতে—পরে। কিন্তু এসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে জনপ্রতিনিধিদের সামনে প্রেসিডেণ্টকে উপেক্ষা করে যে কাজ বড়লাট করলেন তা ভগৎ সিংয়ের বিবৃতিকেই অকাট্য করে দিয়েছে। এই অপমান, এই অবহেলা—সে তো সবই ঐ বিধি-বিধানের পাহারাদার—দুর্গ—এসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে দিবালোকেই করে গেলেন।

আবার এও লক্ষ্য করবার, ভগৎ সিং যে-এসেম্বলিকে কটাক্ষ করেছেন তারও জবাব দিলেন বড়লাট আগেই। অর্থাৎ, দুটো বিপরীত চিন্তাধারার কনফ্রণ্টেশন ঘটল এই এসেম্বলিতেই; ভগৎ-বটুক বোমা বিস্ফোরণে তাঁদের কথা জানালেন; পুলিশ মিলিটারী পরিবেষ্টিত বড়লাট কথার বিস্ফোরণে তাঁর পাল্টা দম্ভ প্রকাশ করলেন। নাটকের চমকপ্রদ দৃশ্যান্তর।

বড়লাটই তাঁর ভাষণে এই মর্মার্থ প্রতিধ্বনি করে বললেন:

> "Here we come face to face with a naked conflict of two contradictory philosophies. This assembly exists as the outward symbol of that supremacy of reason, argument and persuasion which man through the ages has been, as is still, concerned to establish over the elemental passions of this kind."

কিন্তু বড়লাট নিজে কি করে গেলেন? সত্যিই দু'টি বিপরীত দর্শনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। যে-এসেম্বলি তাঁর মতে যুক্তি, তর্ক ও মীমাংসার বাহ্যিক প্রতীক স্বরূপ, স্মরণাতীত কাল থেকে যুক্তি-তর্ক-মীমাংসার পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা করে এসেছে, এখনও করছে, শাসকশক্তির শীর্ষ প্রতীকরূপে তিনি কি করে গেলেন? ঐখানে দাঁড়িয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত মনোনীত প্রতিনিধিদের সামনে supremacy of reason, argument and persuasion নগ্নভাবেই এসেম্বলির মেঝেতে পায়ে দলন করে গেলেন। তাঁর মুখে একথা মানায় না—

> "The bomb stands as a cruel and hideous expression of the gospel of physical violence which, repudiating reason,

would recoil from no atrocity in the achievement of its sinister designs. It is indeed, partly because, through the corporate person of this Assembly, a direct threat has thus been levelled at the whole constitutional life of India and everything which that life includes, that I have thought fit to summon the two houses together here to-day."

আমরাও মানি বোমা নিষ্ঠুর, বলপ্রয়োগ অসঙ্গত, কিন্তু খোদ বড়লাট এসেম্বলি বলতে যা বোঝায় সে "corporate life", "constitutional life"-এর কতটুকু মর্যাদা রাখলেন ? তাঁর গোটা ব্যাপারটার মধ্যে 'আমি উত্তমকুমার', 'আমি বিচারক', 'আমি ভগবৎ-শক্তি' এই অহঙ্কার ফুটে উঠেছে এবং "repudiating reason"-এর এক নোংরা দৃষ্টান্ত। কথা শুনে মনে হবে, বড়লাটের কথাগুলোর পেছনে বলপ্রয়োগের কোন কথাই নেই, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালেই পাব্লিক সেফটি বিলের আলোচনায় যে অসঙ্গতি আছে তাকে তাঁর বৈধ করার সিদ্ধান্তে কোন গা-জুরি, বলপ্রয়োগ নেই। বললেন,

"Deeds of violence, such as that of which this Chamber has recently been the scene, can never be completely disentangled from the setting in which the ideas behind them have been nurtured. In such matters some men have thought and spoken before other men resorted to extremity of action ; and dangerous words written or spoken, by one man are only too frequently the poisonous seed falling upon the soil of another man's perverted imagination."

অর্থাৎ এই বিস্ফোরণের মূলে আছে কোন কোন লোকের চিন্তাধারা, কথাবার্তা, লেখালেখি ইত্যাদি। এক কথায় রাজনৈতিক আন্দোলন, বক্তৃতা, সাহিত্য সবকিছুই দায়ী এজন্য, এবং তাই থেকেই এই সব মাথাগরমেরা চরম পথ অবলম্বন করে থাকে। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ রয়েছে। অনস্বীকার্য নয়। কিন্তু সরকার পক্ষের, বিশেষ করে এই দাম্ভিক বিদেশী রাজপুরুষদের ক্রিয়াকলাপ রাজনীতি কি সে দায়িত্ব থেকে বিমুক্ত ? বরং এই তো ইতিহাস

বলে যে, terror বা সন্ত্রাস তো সরকারপক্ষই সৃষ্টি করে রাখে, শাসকের ঐ অবলম্বন, প্রতিসন্ত্রাস তার জাতক মাত্র, ভগৎ-বটুক তো মূলে terrorism-এর আশ্রয় নেয় নি, ওরা যা করেছে তা বড়জোর counterterrorism, অবাস্তব অহিংসায় বিশ্বাস করে না বলে। সুতরাং, যে কথা বড়লাট বক্তা বা লেখকের ওপর প্রয়োগ করতে চেয়েছেন তা' সরকারী সন্ত্রাসবাদের ওপরও প্রযোজ্য এবং তাঁর এ কথাগুলোও :

> "From such roots, in due course, springs the impulse which drives human beings ruthless and shameless crime and invests with a false halo of self-sacrifice. And so, to go no further back than the last few months, India is disgraced by the murder in Lahore of that young and most promising police officer Mr. Saunders, and the gallant Head Constable, Chaman Singh ; still more recently of a highly respected Indian Police officer in Barisal ; and lastly by the outrage here which many hon'ble members were compelled to witness."

বড়লাটের মূল সুরের সঙ্গে আমাদের গান্ধীপন্থীদের সুরের মিল ছিল ; আমরাও বলেছি, এ ধরণের আক্রমণ ভারতের লজ্জা, পরম লজ্জা। কিন্তু লজ্জা কি শুধু আমাদেরই, ওঁরা সকল লজ্জা-বিরহিত ? সণ্ডার্সের হত্যায় আমরা চমকে উঠেছি, কিন্তু লালা লাজপৎ রায়ের বুকের আঘাত ও মৃত্যুতেও কি চমকে উঠিনি ? নিক্তির পাল্লায় কোন্‌টা ভারি তার বিচার করবে কে ? এসেম্বলিতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার অকুণ্ঠ নিন্দা প্রেসিডেন্ট ভি. জি. প্যাটেল সমবেত সকল জনপ্রতিনিধিদের হয়েই করেছেন। কিন্তু সেই প্রেসিডেন্টেরই মর্যাদার অধিকার ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে, প্রেসিডেন্টের রুলিং বাতিল করে দিয়ে, প্রতারণা ও প্রহসনের মধ্যে বাতিল পাব্লিক সেফটি বিলকে অর্ডিন্যান্সে সঞ্জীবিত করে প্রেসিডেন্ট ও জনপ্রতিনিধিদের যে হেনেস্তা করেছেন তা কি এসেম্বলিতে ভগৎ-বটুকের বোমা বিস্ফোরণের চাইতে কিছু কম অপরাধ ?

সচরাচর এমন হয় না। বলতে বলতে উঠে পড়লেন, কাগজপত্র

রেখে দিয়ে, খাট থেকে নামলেন, ঐটুকু ঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন, না, সত্য, এমন একপেশে বিচার জাতির উত্তরপুরুষ কখনো ক্ষমা করবে না ; তথাকথিত ইতিহাস বাংকাম, ইতিহাস শাসক-শ্রেণীর হাতে কাদা, ইতিহাসের শিক্ষা কেউ নেয়ও না, তবুও, সংস্কার বলতে পার, আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস অমর হয়ে আছে, ইতিহাসের এই জটিল লেবিরিংথের মধ্যেও মহাকালের সত্য দাগ কেটে চলেছে। কোন-না-কোন পুরুষ তার পুনরাবিষ্কার করে এবং মানুষ চমকে উঠে আবার একটা পথ কাটে, আমার বিশ্বাস প্রগতির পথই। এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে এই প্রগাঢ় দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কি উপায় ছিল বল ?

এমন কথাও কোনদিন বলেননি। ধারার বেড়াটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে আড়াল করে—অশ্রুপাত করছেন ? অশ্রু আছে মানুষটার ল্যাক্রিমাল গ্ল্যাণ্ডে ?

আমি বেরিয়ে এলাম।

কোনদিন প্রশ্ন করেন না ; সেদিন করলেন। জিগ্‌গেস করলেন, বলতে পারো, ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত বা পথভ্রান্ত করেছে কে ?

অনভ্যস্ত আমি চমকে উঠে অভ্যস্ত জবাব দিলাম, ইংরেজ।

বললেন, এমন একটা কথা আমরাও মুখস্থ বলে এসেছি। বলেছি, আমাদের ঝগড়াঝাটির মূলে রয়েছে তৃতীয় পক্ষ ; সে-ই ঝগড়াটা বাধায়। ঐ তৃতীয় পক্ষ না থাকলে আমরা ভাই-ভাই হয়ে থাকতাম, থাকবও। গভীর বিশ্বাসে মনে একথাটিই পোষণ করতাম—সে তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে ইংরেজ। অর্থাৎ, আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমার যত দুঃখ-দুর্দশার কারণ ইংরেজ জাতি, তার কূটনীতি, তার শাসন, তারই রোমান ডিভাইড এণ্ড রুল।

কিন্তু এই গোড়ায় গলদের জন্য মূল্যও বড় কম দিলাম না আমরা। কখনো আমাদের অবিচ্ছেদ্য মানসিকতাকে যাচাই করে আমাদের ক্রিয়াকলাপ স্থির করিনি।

আমি সবটা না বুঝে বললাম—মা-ন-সি-ক-তা!

বললেন, হ্যাঁ মানসিকতা। হিন্দু দেশপ্রেমিকের পক্ষে দেশকে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়নি; এই দেশ, দেশের ধর্ম, তীর্থস্থান, তার মানসিকতায় কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না, এদের হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারিকা, কামাখ্যা থেকে সোমনাথ এদেশেই। সুতরাং, তাদের দেশ, দেশাত্মবোধ, ধর্ম, ধর্মবোধের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নেই; ভারত, ভারতীয়তা, ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই; বুদ্ধ, মহাবীর এদের কাছে একাকার হয়ে গেছে। কেননা সেসব ধর্মপ্রবর্তক ও তীর্থস্থানও ভারতকে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু ……

হঠাৎ বললেন, এসব কথা বলার দায় আছে। ১৯২১-এর পর থেকে আমাদের একটা নতুন সংস্কার হয়েছে। সে সংস্কার হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা। হিন্দুধর্ম শুধু নয় (সে কি, আমিও জানিনে, হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণাই), হিন্দু কল্পিত দেব-দেবতা নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকও সহজ; কিন্তু মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা তো বটেই, কোন মুসলিম ব্যক্তি, এমন কি রাজনৈতিক ব্যক্তির সমালোচনাও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক নেতারা সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা করেছেন। কালক্রমে এমন হল যে, জিন্নাজীর সমালোচনা, মুসলিম লীগের সমালোচনা, এমনকি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় নীতির সমালোচনাও সাম্প্রদায়িকতা বলে নিন্দিত হয়েছে—আজও হয়।

হিন্দুদের এই যে হীনমন্যতা এটাকে ঔদার্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে এ হচ্ছে সেই ১৯২১-এর খেলাফতি জোড়াতালির জের মাত্র।

আমি অবাক হয়ে বললাম, খেলাফতী জোড়াতালি?

বেশ জোর দিয়েই বললেন, হ্যাঁ, ভারতের স্বরাজী আন্দোলনের সঙ্গে তুরস্কের খলিফার পুনর্বাসনের কি সম্পর্ক আছে? আর খলিফার

পুনর্বাসন যে ওঁদেরই কাছে অনভিপ্রেত ছিল, কামাল আতাতুর্ক তাই দেখিয়ে দিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের ভিত্তিভূমিটাই গেল সরে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেল। রাজনৈতিক স্বাধীনতাসংগ্রামে অনিচ্ছুকদের সাথী করার জন্য এই যে তোষণ বা তোষামোদ, তার বিষময় ফল যখন ফলতে লাগল, তখনও আমরা সাবধান হইনি।

কিছু মনে করবেন না, আমি বাধা দিয়ে বললাম, সাবধান হলেই বা কি করতেন ?

বললেন, একটাই করবার ছিল, তা হচ্ছে সংগ্রাম, কখনো বিরতি না দিয়ে, কখনো টেবিলের বিতর্কে না গিয়ে শেষ উপসংহারে পৌঁছোবার আপোষহীন সংগ্রাম।

সর্বনাশ, এ যে সুভাষচন্দ্রের কথা !

কারও মতের সঙ্গে আমার উপসংহার মিলে গেলেই তা আমার কথা নয় তাই বা কেন বলা হবে ? নিন্দা ? দেখা যাক্, ইতিহাসে কার বা কাদের জন্য নিন্দাবাদ জমে আছে। কারও অভিযোগ দূর করা নিশ্চয়ই কর্তব্য, কিন্তু অভিযোগ দূর করা আর অকারণ তোষণ, সমগ্র দেশের পক্ষে হানিকর তোষণ, সর্বনাশের অন্ধকূপেই নিয়ে যায়। তুমি বলবে, এ আপনার রুষ্ট অভিমত। আমি তাই ইতিহাস বলে যাব। এজন্য আমাকে ১৯২১-এ পিছিয়ে যেতে হবে না, ১৯২৯ থেকে এগোলেই চলবে। ১৯২১-এর কথাটা আমি দু'টি পৃথক মানসিকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বলেছি। খেলাফতি আন্দোলনে বাইরের পানে তাকানো দৃষ্টিটাই প্রকট হয়েছে, ওঁদের কাছে ভারতের মাটি, দেশ, বড় নয়—বড় ধর্মসূত্রে বাইরে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাই মহত্তর, বৃহত্তর ; সে মানসিকতায় ভারত তীর্থস্থান নয়, তার বাইরে কোথাও এবং এই মানসিকতারই পূর্ণ পরিণতি ওঁদের পক্ষে ভারত-বিচ্ছিন্ন পবিত্রস্থান —পাকিস্তান। যাঁরা এ পেয়েছেন তাঁদের চাওয়ার মধ্যে কিন্তু কোন ভুল ছিল না, ভুল করেছেন তাঁরা, যাঁরা এই চাওয়ার সিংহদ্বার খুলে খুলে গেছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের এই ট্র্যাজেডি।

সাহস করে বললাম, এও আপনার অভিমত ?

না, আমি ইতিহাসের প্রতিধ্বনি মাত্র। ১৯২৯-এর ২৮-এ মার্চ দিল্লীতে জিন্নাজীর সভাপতিত্বে হল লীগ কাউন্সিলের সভা। জিন্নাজী একটি খসড়া বিবৃতি বিতরণ করেছিলেন। তাতে ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লীগ যেসব প্রস্তাব নিয়েছিলেন তার উল্লেখ ছিল। প্রস্তাবগুলো হিন্দু নেতারা সমালোচনা করেছিলেন এবং যৌথ নির্বাচনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। বিবেচনা করার জন্য জিন্নাজী ১৯২৭-এ অন্যান্য মুসলিম নেতার সঙ্গে দিল্লীতে মিলিত হয়েছিলেন; সেখানে কয়েকটি প্রস্তাবও স্থির হল এবং বলা হল, কি কি শর্ত পূরণ করলে মুসলমানেরা যৌথ নির্বাচনে সম্মত হতে পারেন। জিন্নাজী ১৯২৯-এ যে বিবৃতি দিলেন তাতে বলা হল, ১৯২৭-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে এ আই. সি. সি.র যে অধিবেশন হয়, তাতে কিন্তু ঐসব প্রস্তাব ফলত গৃহীতই হয়েছিল, পরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার অঙ্গীভূত ছিল ঐসব প্রস্তাব। কংগ্রেসের কাছ থেকে এই সাড়া পেয়েই মুসলীম লীগ তার কলকাতা অধিবেশনে একটি প্রস্তাবক্রমে এক সাব-কমিটি নিয়োগ করে; উদ্দেশ্য, এই সাব-কমিটি এমন একটি সংবিধানের খসড়া নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসবে যাতে মুসলিম লীগের নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। তাঁরা একটা উভয়-সম্মত সংবিধানের খসড়াও দাঁড় করান। এই থেকেই ১৯২৯-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে সর্বদল আহ্বান করা হয়। সম্মেলন একদিন দু'দিন নয়, ১১ই মার্চ অবধি চলেছিল; কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌঁছোনো যায়নি। সর্বদল সম্মেলনের খসড়া-প্রস্তাবগুলো বিচার করে লীগ কাউন্সিল দেখতে পায় লীগের কলকাতা প্রস্তাবের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি নেই। জিন্নাজী তাঁর এই বিবৃতিতে তাই অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস প্রথমকার অবস্থা থেকে সরে আসায় মৌলিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয় এবং এই কারণেই তারপর থেকে সর্বদল সম্মেলনে লীগের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হয়নি, কেউ থাকেওনি।

কি একটি বই তুলে নিলেন। বললেন, জিন্নাজীর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর পরিষ্কার, কথা পরিষ্কার, দাবি পরিষ্কার, পথ সোজা, মিসটিসিজম-এর ধোঁয়ায় কখনো তিনি তাঁর বক্তব্যকে আচ্ছন্ন হতে দেননি। এজন্য অনেক সময় তাঁর বিবৃতি রূঢ়, চমকপ্রদ ঠেকেছে, কিন্তু তিনি কখনো রেখে ঢেকে চিবিয়ে কথা বলেছেন এ দুর্নাম কেউ দিতে পারবেনা। তিনি ১৯২৯-এর মুসলিম লীগ সম্মেলনের জন্য যে খসড়া প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন, তা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, কারণ এটিকে দশ বছর পর পাকিস্তানের আরব সাগরে ঝাঁপ দেবার মঞ্চ বললে বেশি বলা হবে না। প্রস্তাবটা শুনলেই বুঝতে পারবে:

"(1) Whereas the basic idea with which the All-Parties Conference was called in being and a Convention summoned at Calcutta during Christmas Week in 1928, was that a scheme of reforms should be formulated and accepted and ratified by the foremost political organisations in the country as a National Pact; and whereas the Report was adopted by the Indian National Congress only constitutionally for the year ending 31st December 1929 and in the event of the British Parliament not accepting it within the time limit, the Congress stands committed to the policy and programme of complete independence by resort to civil disobedience and non-payment of taxes; and whereas the attitude taken up by Hindu Mahasabha from the commencement through their representatives at the convention was nothing short of an ultimatum, that if a single word in the Nehru Report in respect of the communal settlement was changed, they would immediately withdraw their support to it; and whereas the National Liberal Federation Delegates at the convention took up an attitude of benevolent neutrality, and subsequently in their open session at Allahabad, adopted a non-committal policy with regard to the Hindu Moslem differences; and whereas the Sikh League had already declined to agree to the Nehru Report; and whereas Non-Brahmin and Depressed classes are entirely opposed to

it ; and whereas reasonable and moderate proposals put forward by the delegates of the All-India Muslim League at the Convention in modification were not accepted, the Muslim League is unable to accept the Nehru Report."

অতএব বলা হল : No scheme for the future constitution of the Government of India will be accepted to Muslims of India until and unless the following basic principles are given effect to and provisions are embodied therein to safeguard their rights and interests.

অর্থাৎ, মুসলিম লীগ-প্রতিনিধিরা নেহরু রিপোর্টকে যেসব যুক্তি-বলে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন তা গ্রাহ্য না হওয়ায় ঐ রিপোর্টটি লীগের পক্ষে গ্রহণীয় হল না। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ভারত সরকার যে সংবিধানই করুন তাতে যতক্ষণ না মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার্থে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো কার্যকর এবং সেই সংবিধানের অঙ্গীভূত না করা হচ্ছে ততক্ষণ তা ভারতের মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কি সেই রক্ষাকবচ মালা ?

জিন্নাজীর চৌদ্দ দফা

(১) সংবিধানের ধাঁচ হবে ফেডারাল ; অন্যান্য ক্ষমতা প্রদেশে প্রদেশে ন্যস্ত থাকবে ;

(২) সকল প্রদেশে একই ধরণে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার থাকবে ;

(৩) সকল আইন সভা এবং নির্বাচনমূলক সংস্থা এমন একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে গঠিত হবে যেন প্রত্যেক প্রদেশে সংখ্যা-লঘুদের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকেন এবং যদি কোন প্রদেশে এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে থাকে তবে তা' হ্রাস করে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা, এমন কি, সমসংখ্যক করা চলবে না ;

(৪) কেন্দ্রীয় আইন সভায়, মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশ রাখতে হবে ;

(৫) বর্তমানে যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনি পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে হবে ; তবে যদি

কোন সম্প্রদায় যৌথ নির্বাচনের অনুকূলে যেতে চায় তারা পৃথক নির্বাচন পরিহার করতে পারবে ;

(৬) যদি কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা'হলেও কোনক্রমে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না ;

(৭) প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে, অর্থাৎ, ধর্মবিশ্বাস, পূজা-উপাসনা, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, প্রচার, সংগঠন, শিক্ষার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত রাখতে হবে ;

(৮) কোন বিল কি প্রস্তাব কি কোন বিল প্রস্তাবের অংশ-বিশেষ কোন আইনসভা কি অনুরূপ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে যে-কোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য আপত্তি করলে গৃহীত হতে পারবে না ; সেই সম্প্রদায়গোষ্ঠীকে অবশ্য এই যুক্তি দেখাতে হবে যে ওটি গৃহীত হলে তাদের স্বার্থহানি হবে ; অবশ্য, এমন অবস্থায় কার্যকর অন্য কোন বিকল্প উপায়েও এর মীমাংসা করা যেতে পারে ;

(৯) বোম্বাই প্রদেশ থেকে সিন্ধুকে পৃথক করতে হবে ;

(১০) অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানেও শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে ;

(১১) যোগ্যতার দিকে লক্ষ রেখে যাতে মুসলমানেরা রাজ্যের অথবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক চাকরি পায় সংবিধানে তেমন বিধান রাখতে হবে ;

(১২) মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষা, মুসলিম শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত বিধি ও দাতব্য সংস্থা রক্ষার জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচ সংবিধানের অঙ্গীভূত করতে হবে ;

(১৩) অন্তত এক-তৃতীয়াংশ তো বটেই, আনুপাতিক সংখ্যক মন্ত্রি ছাড়া কি কেন্দ্রে কি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা চলবে না ;

(১৪) যে সব রাজ্য নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হবে তাদের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা সংবিধানে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না ।

হাতের বইখানা নামিয়ে রেখে তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, লক্ষ করেছো বোধ হয় যে, জিন্নাজীর মনের বিবর্তটি তখনও পূর্ণায়ত হয়নি, কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ্যে যে বৃত্তাঙ্কন করেছে তার লক্ষণগুলো এই চৌদ্দ দফায়ই সুস্পষ্ট। এখনও 'ভারতীয় মুসলমান,' কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর ওপর জোর। ফেডারাল কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। সেখানেও স্বস্তি নেই, কেন্দ্রীয় আইন সভায় চাই এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব; কোন মন্ত্রিসভাই মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ মন্ত্রিত্ব ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনরকম অঙ্গহানি তো চলবেই না, বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তা'হলে এটিও একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ হবে। আর চাই বেলুচিস্থান।

তোমায় বলেছি, ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে জিন্নাজীর দৃষ্টিই স্বচ্ছতম ও সব চাইতে ঋজু। যতদিন ঐ মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো একসূত্রে বাঁধা না যাচ্ছে, অথবা যদি না-ই যায়, তা'হলেও একটা সর্বজনীন মানসিকতা সৃষ্টির জন্য রক্ষাকবচগুলো চাই। এখনো মুসলমানেরা ভারতের একটি বা অন্যতম সম্প্রদায় বটে কিন্তু সর্বাংশে পৃথক, এর ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা সব কিছু পৃথক। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক। অর্থাৎ, দুই জাতিত্বের একটা পা পেছনে মাত্র।

কিন্তু জিন্নাজীর এই পার্থক্য বা বিচ্ছিন্নতাবোধের মানসিকতা তখনও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ সঞ্চারিত হয়নি বলে, লীগ মহলেই এ নিয়ে দারুণ মতানৈক্য ছিল, বাইরে তো ছিলই। সাধারণ মুসলিম জন-মানসে কোনরকম রাজনৈতিক চৈতন্যই ছিল না, কিন্তু ধর্মপথে এ চেতনা আনবার প্রস্তাবনা জিন্নাজীমহলে হয়ে রইল এবং কালক্রমে প্রচারণার ফলে ঐ ধর্মসূত্রেই এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হতে লাগল যে, মুসলিম জাহান একটি অনন্য পৃথক সত্তা। এমন কি, তাঁদের মধ্যেও যাঁরা মূলতঃ ধর্মান্তরিত ভারতীয় অথবা বাঙালী

তাঁরাও কেউ কেউ প্যান-ইসলামের প্রচারক হলেন। কিন্তু জিন্নাজী তাঁর লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হননি; এই ভৌগোলিক ভারতবর্ষেই একটা পৃথকত্বের দাবি জোরদার করে তুলতে চাইলেন। সেদিন পারেননি। বলেছি, তখনও ধর্মসূত্রটি থাকলেও এই বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা যথেষ্ট সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। ফলে মুসলিম লীগের প্রকাশ্য সম্মেলনে রীতিমত বিরোধ দেখা গেল, একটি দু'টি নয়, চারটি মত ও পথের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

৩০-এ মার্চ যে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়েছিল তাতে জিন্নাজী ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য: মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, মৌলানা জাফর আলি খাঁ, ডাঃ মহম্মদ আলম, মৌলানা সফি দাউদি, মৌলানা সৌকত আলি, মৌলানা মহম্মদ আলি, শেখ হাজি আবদুল্লা হারুন, নবাব ইসমাইল খাঁ, টি. এ. কে. শেরওয়ানী, ডাঃ কিচলু, মালিক বরকত আলি, ডাঃ সফৎ আহমেদ্ খাঁ, আনওয়ারুল আজিম, মৌলবী সৈয়দ মুর্তাজা, নবাব আবুল হাসান, মুফতি কিফায়েৎ উল্লা, রাজা গজনফর আলি খাঁ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ সিদ্দিক, আসফ আলি।

নামগুলো পড়তে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ল। তোমাকে যে মানসিকতার কথা বলেছি তার এক বিপরীত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

তুমি কি শুনে অবাক হবে যে, মৌলানা আজাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নয়? তাঁর বাবা ২৫ বছর বয়সে মক্কায় যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি মদিনার পণ্ডিত শেখ মহম্মদ জহিরের মেয়েকে বিয়ে করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় মৌলানা আজাদের জন্ম হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাবা সপরিবারে কলকাতায় আসেন। জেড্ডায় পড়ে গিয়ে আহত হন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতা আসেন। বেশিদিন থাকবেন না বলে

এলেও তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে ছাড়লেন না। তারপর মৌলানা আজাদ সুদ্ধ সবাই কলকাতা চলে আসেন।

বাবা ছিলেন প্রাচীনপন্থী। সুতরাং ছেলেকে আধুনিক শিক্ষা দেবার কথাই ওঠে না। প্রাচীন পন্থা মতো ছেলেকে শিখতে হল ফারসী আর আরবী; তারপর কিছু দর্শন, কিছু ভূগোল, অঙ্ক, বীজগণিত।

মৌলানা আজাদের লেখাপড়া অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতই হয়েছে। কলকাতায়, মাদ্রাসা ছিল বটে কিন্তু তাঁর পিতার এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। সুতরাং, পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থা বাড়িতে হল; প্রথমে কিছুকাল স্বয়ং, পরে নানা বিষয়ে নানা পণ্ডিতের অধীন। যাঁরা দস্তরমত পণ্ডিত। ষোল বছর বয়সেই তিনি এভাবে ২২।২৫ বছর বয়সের পড়া শেষ করলেন।

খুব শিগ্‌গিরই স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের লেখার সঙ্গে পরিচয় হল এবং লেখকের আধুনিকতায় চমৎকৃত হলেন। ওঁর India Wins Freedom থেকে পড়ছি শোন:

"I realized that a man could not be truly educated in the modern world unless he studied modern science, philosophy and literature. I decided that I must learn English. I spoke to Moulavi Mohammed Yusuf Jafri who was then Chief Examiner of the Oriental course of studies. He taught me the English alphabet and gave me Peary Churan Sarkar's First Book. As soon as I gained some knowledge of language, I started to read the Bible. ইত্যাদি।

অনেকের ধারণা তিনি চোস্ত উর্দু প্রভৃতি জানতেন, ইংরেজী জানতেন না। তোমারও যদি সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে থাকে তাই এটুকু পড়লাম।

বললেন, মৌলানা আজাদ ক্রমশঃ পারিবারিক গোঁড়ামির বা ধর্মান্ধতার শেকল ছিঁড়লেন এবং মুক্ত মনে সব কিছু বিচার করে চলতে যখন শুরু করেছেন তখনই ঘটল বঙ্গভঙ্গ। তিনি লক্ষ

করলেন বাংলার হিন্দুরাই রাজনৈতিক জাগরণের নেতৃত্ব করছেন। বঙ্গভঙ্গ বাংলা মাথা নত করে মেনে নেয়নি।

মৌলানা ক্রমশঃ তৎকালীন বাঙালী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন, প্রথমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ক্রমান্বয়ে অরবিন্দ ঘোষ অবধি। "The result was that I was attracted to revolutionary politics and joined one of the groups."

India Wins Freedom-এ তিনি আরও লিখেছেন :

সেকালে বিপ্লবীদলে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই লোক নেওয়া হত। বস্তুত তখন সব বিপ্লবী দলই ছিল মুসলিম-বিরোধী। তাঁরা দেখেছিলেন, বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করছিলেন এবং মুসলমানেরাও সরকারের হাতে খেলছিলেন। পূর্ব বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হবার পর তার লেঃ গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে, সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে সুয়োরানীরূপে গণ্য করেন। বিপ্লবীরা তাই মনে করতেন, মুসলমানেরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে কণ্টক-স্বরূপ, সুতরাং, অন্যান্য প্রতিবন্ধকের মতো এঁদেরও উৎপাটন করা দরকার।

"মুসলমানদের অপছন্দ করার জন্য বিপ্লবীদের আরও একটি কারণ ছিল। সরকার মনে করতেন, বাংলার হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এতই ব্যাপক যে, বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে লাগানোর ব্যাপারে কোন হিন্দু অফিসার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। তাই গভর্নমেণ্ট যুক্তপ্রদেশ থেকে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলিম অফিসার আমদানি করলেন পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে। ফল হল, বাংলার হিন্দুরা ভাবতে লাগলেন, মুসলমানমাত্রেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী।

"শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যখন আমাকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার বন্ধুরা দেখলেন আমি তাঁদের দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। প্রথম প্রথম

তাঁরা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁদের অন্তরতম পরিষদদের বাইরে রাখার চেষ্টা করতেন আমাকে। কালক্রমে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আমি তাঁদের আস্থা অর্জন করলাম। আমি তাঁদের সঙ্গে এই বলে তর্ক শুরু করলাম যে, মুসলিম সম্প্রদায় তাঁদের শত্রু এমন মনে করাটা তাঁদের ভুল। আমি তাঁদের বললাম, বাংলার কয়েকজন মুসলিম অফিসারকে দিয়ে তাঁরা যেন সকল মুসলমানের বিচার না করেন। মিশরে, ইরাণে ও তুরস্কে তো মুসলমানেরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতের মুসলমানেরা রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দেবেন যদি আমরা তাঁদের মধ্যে কাজ করি এবং বন্ধুভাবে যদি তাঁদের হৃদয় জয় করতে পারি। আমি আরও বললাম, মুসলমানদের সক্রিয় শত্রুতা, নিদেন ঔদাসীন্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম কঠিনতর করে তুলবে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হবে, ঐ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও বন্ধুত্ব লাভ করার চেষ্টা।

"আমি অবশ্য বিপ্লবীদের আমার নিদান সম্পর্কে নিঃসংশয় করতে পারিনি। তবে কালক্রমে কেউ কেউ আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন। এই সময় আমি নিজে মুসলমানদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, একদল তরুণ মুসলমান নতুন রাজনৈতিক কর্তব্য সাধনে প্রস্তুত।"

মন্তব্য করলেন, মৌলানা আজাদের কথাগুলো মর্মস্পর্শী, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার শহীদ আসফাক উল্লার কথা ভুলে না গেলে স্বীকার করতেই হয়, তরুণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষুদিরামের প্রাণ ছিল ও আছে; কিন্তু আমার মনে একটা জিজ্ঞাসার জবাব আজও পাইনি। হিন্দু বিপ্লবীরা যদি মুসলমানদের অবিশ্বাসে দলে না-ই নিয়ে থাকে, আর যদি তাঁদের তরুণ সমাজে দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গের আকুতি থেকেই থাকে তবে, হিন্দু বিপ্লবীদের মতো তাঁদেরও ছোট ছোট দল গড়ে উঠল না কেন? হিন্দু বিপ্লবীদের অসংখ্য দল এবং কুৎসিত দলাদলি ছিল; এক দলের লোক আর এক দলের লোককে

শত্রু, পুলিশের চর, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বিশেষণে নিন্দিত করত, কিন্তু হিন্দু তরুণ সম্প্রদায়ের হাজারো দল গড়ে ওঠার পথে কোন বাধা দেখা দেয়নি। রেষারেষির মধ্যেও তাদের লক্ষ্য ছিল শত্রুপক্ষ ইংরেজ, এবং রেষারেষিটা ছিল রিভলভার যোগাড় করার ও ইংরেজ মারার। ভাবটা এই যে, রিভলভার চালিয়ে স্বাধীনতা আনতে হয় তো আনবে অনুশীলন পার্টি, নয় তো যুগান্তর গোষ্ঠী, নয়তো এই দুই থেকে আলাদা ছোট ছোট শ্রীসঙ্ঘের দল ; চট্টল বিপ্লবীরা যেমন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিল। এমনটা হল না কেন মুসলিম তরুণদের মধ্যে? এ প্রশ্নের জবাব আমি আজও পাই নি।

মাটির টানে টানে

অথচ তুমি বোধ হয় শোনোনি, বাংলা দেশে একটা মস্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫৯-৬০-এ ; তার নাম নীল বিদ্রোহ। নীল চাষিদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, বলতে গেলে সবই। কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁদের বিষধর করে তোলেনি বলে হিন্দু-মুসলিম চাষি হয়েছিল একাকার এবং বহু ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছে, প্রচারণা করেছে, উদ্দীপনা জুগিয়েছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু। সেই বিদ্রোহ অসাধারণ সাফল্যের দীপ্তি নিয়ে বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের একাংশ অধিকার করে আছে। আছে সেই শক্তি ওঁদের মধ্যে। তবু কেন ইংরেজ আমলে তাঁদের উদ্ভব ঘটল না, এই প্রশ্নের জবাব আমি আজও খুঁজে পাইনি।

শুধু নীল চাষির বিদ্রোহ কেন ? খিলাফতি আন্দোলনের সূত্রে আর একবার এই বিরাট শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায় আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, কালক্রমে তা দ্বিধা বিভক্ত হল বটে এবং তার পরিণতিও মর্মান্তিক হল বটে, কিন্তু মৌলানা আজাদ প্রমুখের জাগরণ তো মিথ্যে নয়। তোমাকে আমি যে মূল মানসিকতার কথা বলেছি, তার বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু মৌলানা আজাদ নন, বিপুল সংখ্যক

জাতীয়তাবাদী মুসলমানও তো ভারতের রাজনীতিতে স্থান জুড়ে ছিলেন। তাঁদেরও মর্মান্তিক পরিণতি ঘটছে, কেন, কি করে?

সম্মুখের ইতিহাসে তার জবাব পাওয়া যাবে। এবং পাওয়া যাবে সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফুর খানের দিগন্ত-বিস্তারী ধিক্‌কার—Thrown To The Wolves-এর হৃদয় বিদারক জবাবে।

খিলাফতির টান কাটিয়ে এদেশের মাটির টান যাঁরা অনুভব করেছিলেন তাঁদের কথাই বলছি। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না বটে কিন্তু অন্তরের সঙ্গে কংগ্রেসকেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। ১৯২৯-এর জুলাইয়ে তাঁরাই গড়েছিলেন কংগ্রেস—মুসলিম পার্টি, মুসলিম লীগের কথায় যাঁরা সায় দিতে পারেননি। এস. এ. ব্রেলভি, য়ুসুফ মেহেরালী ও আর কয়েকজন যে সার্কুলার জারি করেন তারই ভিত্তিতে বোম্বাইয়ে ৮ই জুলাই এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়।

১৯২৯-এরই ২৭ ও ২৮-এ জুলাইয়ে যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন হয় তার সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ; উপস্থিত থেকে এতে অংশ গ্রহণ করেন বাংলা, বিহার, দিল্লী, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের ডাঃ আন্সারী, খালিকুজ্জমান, শেরওয়ানী মহম্মদ আলম, সামসুদ্দিন, আফতাভদ্দিন চৌধুরী, গুলাম জিলানী, জালালুদ্দিন হাসেমী; সরাফুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ কাসেম, মৌলানা আবদুল বারি, এফ. এইচ. আন্সারী, সিরাজুদ্দিন পারিচা, আবদুল কাদির, সঈদুর রহিমান কিদোয়াই ও আবদুল মজিদ জাইদি।

এই সম্মেলনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার মধ্যেই বিভিন্ন পন্থী-দের মত-সংঘর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে তাঁরা বললেন:

> "The political struggle started in 1919 is being gradually weakened by inter-communal conflicts and repeated attempts are being made in different quarters to wean Moslems away from political activities. The present disruption among politically-minded Moslems and the consequent apathy of the mass of the Moslem community

towards the problem of Indian freedom are due to a confused appreciation of the political obligations implict in the fact of the community being a part of the Indian nation. Moslem political activity is now confined under the auspices of the existing Moslem institutions, to winning political responsibility as the main objective, and freedom for the country as merely incidental thereto. Hence the need for the new party. The formal objects of it are to promote among Moslems a spirit of nationalism, to develop a mentality above communalism, and to inspire into them greater confidence in Indian national ideas, to induce Moslems to take their proper share in the national struggle, and to create such relations between the majority and the minority communities as would lead the former to consider the rights of the latter in a spirit of broad-minded patriotism."

তোমায় আমি অকপটে বলব, সত্য, যে, এমন স্বচ্ছদৃষ্টি-সম্পন্ন বাস্তব বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তাব এদেশে খুব বেশি গৃহীত হয়নি। এতে সমস্ত দুর্বলতার স্বীকৃতি আছে, আবার ভবিষ্যৎ বলিষ্ঠ পদক্ষেপের আশ্বাস আছে—এ রাজনীতি আদৌ সাম্প্রদায়িক কুয়াশায় আচ্ছন্ন নয়। 'মুসলমানেরা ১৯১৯-এর পর থেকে চারদিকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং রাজনীতি সম্পর্কে অনাগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে, যেন দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তাঁদের কোন কর্তব্য নেই, চারদিক থেকে তাঁদের টানছে বিপরীত স্বার্থের জাল। তাঁরা যে ভারতীয় জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এ চেতনাই বিস্তারিত হচ্ছে না। এই সব কারণেই নতুন পার্টির দরকার এবং এ পার্টির কাজই হবে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক মানসিকতার পরিপোষকতা করা, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি বেশি করে বিশ্বাস সূচিত করা, জাতীয় সংগ্রামে যোগদানে অনুপ্রাণিত করা এবং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ সৃষ্টি করা যাতে সংখ্যাগুরুদের চেতনায় সংখ্যালঘুদের

অধিকার স্বীকৃতির উপযোগী উদার দেশাত্মবোধ সহজ হয়েযায়।

বললেন, এ হচ্ছে নিঃসংশয়ে দেশের কথা, ঘরের কথা, অন্তরের কথা, একান্তভাবে সেন্ট্রিফিউগাল, কেন্দ্রমুখীন। কিন্তু তোমায় যে বিকেন্দ্রমুখীন সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের কথা বলেছি, তার কথাও শোনো।

বাইরের টানে টানে

স্যার মহম্মদ সফির উদ্যোগে সিমলায় হল অল ইণ্ডিয়া মুস্‌লিম কনফারেন্স, ৮ই সেপ্টেম্বর। তাতে যে প্রস্তাব পাশ হল তার মধ্যে ঠিক এই বিকেন্দ্রীকরণের বহির্মুখীন মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে; এখানে দেশ-আত্ম-বোধ নয়, সাম্প্রদায়িক বোধই নিরাবরণে প্রকাশ পেয়েছে:

"Whereas the Indian National Congress having succumbed to the influence of the Hindu Mahasabha has now abandoned its constitutional ideal of the establishment of a federal system of government with full provincial autonomy, which it had consistently advocated since 1904, and whereas owing to the same influence, the Congress has now adopted, instead of the constitutional ideal aforesaid, a Constitution embodied in the Nehru Report which as has been rightly stated by Kelkar in his recent address at the Dacca Provincial Hindu Mahasabha is practically identical with that advocated by the Hindu Mahasabha at Jubbalpore and elsewhere and is entirely opposed to the unanimous opinion of Muslim India; and whereas the Congress Session to be held at Lahore during the forthcoming Christmas will, in the circumstances, be essentially a gathering of the Hindu Mahasabha, the Executive Board of the all-India Muslim Conference deems it in the highest degree detrimental to the best interests of the country in general and the Muslim community in particular, for any Mussalman to attend the forthcoming Session of the National Congress

and earnestly hopes that Indian Muslims will at this critical juncture show united front by abstaining from participation in the Congress Session as by such participation they will only be lending support to the Constitution.

সংশয় সন্দেহের লেশমাত্র কারণ কখনো ঘটেনি এমন কথা কেউ বলবে না, বলা উচিতও নয়, কিন্তু ১৯৪৬-৪৭-এ ঐতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখবে, ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভার আধিপত্য ক্রমশঃ শূন্যে বিলীন হয়েছে, শেষ দ্বন্দ্ব হয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। সেখানে হিন্দু মহাসভা ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংস্থা অনুপস্থিত শুধু নয়, বামপন্থীদের মতো তারা কোনো সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু ষোলো সতের বছর আগে এবং ষোলো সতের বছর ধরে কংগ্রেসের হিঁদুয়ানি নিয়ে টানাটানি হয়েছে এবং কংগ্রেস 'হিন্দু নই' 'হিন্দু নই' বলতে-বলতেও চূড়ান্ত পর্যায়ে (১৯৪৬-৪৭-এ) লীগ কংগ্রেসকে দিয়ে বলিয়েছে সে হিন্দুই, হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, এই দুই জাতির দুই সংস্থা—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ; দুই জাতির দুই রাষ্ট্র চাই, অতএব কাটো ভারতবর্ষকে।

১৯২৯-এ জিন্নাজী ও সফিজী এক পথাবলম্বী নন বটে, কিন্তু দুইয়ের মৌলিক ঐক্য ছিল বহির্মুখীন মানসিকতায় এবং এই কারণে, বেশি দূরে নয়, ১৯৩০ নাগাদই দোঁহে মিলন হয়েছিল। আপাততঃ দু'টি প্ল্যাটফর্ম থেকে জিন্নাজী ও সফিজী কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বান জানালেন এই সংশয়ে যে, কংগ্রেসে আসলে হিন্দু মহাসভার আধিপত্য ; কংগ্রেসকেই পুরোপুরি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণার দিন জিন্নাজীর তখনও আসেনি।

দেখ, সত্য, বৈপ্লবিক আন্দোলনে যেমন, এই বৈধ সাংবিধানিক আন্দোলনেও তেমনি, হিন্দু মহাসভা বা কংগ্রেস থেকে একেবারে পৃথক একটা জোরদার জাতীয়তাবাদী মুসলিম আন্দোলন গড়ে উঠল না কেন ? অবশ্য বামপন্থীদের ব্যর্থতাও লক্ষণীয়। ঘটনাক্রমে

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, বৃটিশ কূটনৈতিক যোগসাজগে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ওপর এবং তার চাইতেও বেশি—মুসলিম লীগের ওপর ; কি ধরণের স্বাধীনতা ভারতে আসবে তা ডিকটেট করে দিয়েছে মুসলিম লীগই।

স্যার মহম্মদ সফির সম্মেলন সেদিক থেকে সামান্যও নয়, নগণ্যও নয়, সেকালের রাজনীতিকেরা অথবা বর্তমান শাসকশ্রেণী প্রভাবিত ইতিহাসবিদেরা যতই তাকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করতে চান। স্যার সফি মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে ১৯৩০-এর কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে বলতে পারলেন, একদল জাতীয়তাবাদী মুসলমানের অনুপেক্ষনীয় সহযোগিতা ও উপস্থিতি সত্ত্বেও। কেননা, জিন্না সফির অনুগামীরা ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের নামে যে জনসংযোগ চালিয়ে গেলেন, সেখানে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসদের চাপে বামপন্থী কংগ্রেসীদের পশ্চাদপসরণের মতোই সমানে পিছিয়ে গেছেন, যেটুকু-বা দৃঢ়তা বা সঙ্কল্প ছিল তাও ১৯৪৬-৪৭-এর কালনেমির লঙ্কাভাগকালে অনস্বীকৃত হয়েছে। ১৯৪৭-এ শুধু স্বাধীনতাই আসেনি, উন্মেষোন্মুখ জাতীয়তাবোধেরও ভ্রূণ-মৃত্যু ঘটেছে।

সত্য, কেন এমন হল, অনেকের কথাতেই এমনি একটা আফশোষ শোনা যায়, কিন্তু তাঁরা তো ইতিহাসের সব পাতাগুলো পড়ার অবকাশ পান না।

রাজা মহারাজার কথা

১৯২৯-এর উথাল-পাথাল ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত অথচ কৃত্রিম সীমারেখায় বিভাজিত দেশীয় রাজ্যগুলোর ইতিহাসও তেমনি আমাদের সমগ্র ইতিহাসের অপঠিত পাতা। রাজন্যবর্গের অবিচল বিশ্বাস ছিল বৃটিশরাজের ওপর—যদিও রাজন্যবর্গের ইতিহাস বৃটিশ কূটনীতি ও আধিপত্যে অবিরাম নিগৃহীত হবারই ইতিহাস। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সাত আটশো রাজন্যের দুঃখ ছিল

না, কিন্তু অবস্থাকে নিদারুণ করে তুলেছিল এই নিগৃহীতদেরই প্রজাপীড়ন-রীতি। রাজন্যবর্গ একদিকে যেমন নিগ্রহকর্তা প্যারামাউন্টসির য়্যাপ্রন ধরে থাকার আকুতি প্রকাশ করেছে, অন্য দিকে ওঁদের চণ্ড-দণ্ডনীতির লগুড় পড়েছে প্রজাদের ওপর। সুতরাং, তাঁরা যখন শুনলেন, কংগ্রেস তথা বৃটিশ-ভারতের জনগণ ক্রমশঃ স্বাধীনতার সঙ্কল্পে ঝুঁকে পড়ছে তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এবং ইংরেজের উদ্দেশে তাঁদের অনুরক্তি জানালেন।

নয়াদিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী রাজন্য সম্মেলনে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাব হল :

> "While adhering to their policy of non-intervention in the affairs of British India and repeating their assurance of sympathy with its continued political progress, the Princes and Chiefs composing the Chamber, in view of the recent Pronouncements of a section of British Indian politicians indicative of a drift towards complete indipendence, desire to place on record that in the light of mutual obligations arising from their treaties and engagements with the British crown they cannot assent to any proposals having for their object the adjustment of equitable relations between Indian States and British India unless such proposals proceed on initial basis of the British connection."

"পাতিওয়ালার মহারাজা চ্যান্সেলার হিসেবে প্রস্তাবটিকে পরিষ্কার করে বললেন, "রাজন্যবর্গ সর্বদাই বৃটিশ-ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত আছে এবং এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটাবার অভিপ্রায়ও তাঁদের নেই; কিন্তু সম্পূর্ণ বৃটিশ-সম্পর্কছেদের যে-কথা বৃটিশ-ভারতের একদল ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের মধ্যে উঠেছে তা' তো শুধু বৃটিশ-ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বৃটিশ-ভারতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনেও আবদ্ধ। এই কারণে তাঁরা সময় থাকতে এই উদ্বেগ প্রকাশ কর্তব্য বলে মনে করছেন যে, ভারতীয়

রাজনীতির গতি-পরিণতি এমন হওয়া উচিত নয় যাতে বৃটিশ-ভারত ও ভারতীয় ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হতে পারে অথবা বৃটিশরাজের সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক সন্ধিশর্ত পালনের পক্ষে সামঞ্জস্যহীন হয়। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে, ব্রহ্মদেশকে বাদ দিলে দেশীয় রাজ্যগুলো এই উপ-মহাদেশের অর্ধেক, জনসংখ্যা সাত কোটি। আমরা তাই মনে করি যে, সমগ্র দেশের চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণে আমরা উপযুক্ত মতাধিকার দাবি করতে পারি। আমরা এই দৃঢ় অভিমত পোষণ করি যে, বৃটিশ-ভারতের কল্যাণবহ স্বার্থেই বৃটিশ সম্পর্ক বজায় রাখা কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস করি, সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হয়ে নয়, তার অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ও প্রদেশের ফেডারেশনরূপেই ভারতের মহত্তর ও অধিকতর সমৃদ্ধি ঘটবে। এই যখন আমাদের দৃঢ় ধারণা তখন বৃটিশ-ভারতে পূর্ণ-স্বাধীনতাকল্পে আন্দোলনকে আমরা দেশের কল্যাণবহ স্বার্থের পক্ষে হানিকর গণ্য করব এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ-ভারতের স্বার্থের সৌহার্দপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে করব।"

কিন্তু, সত্য, দেশীয় রাজ্য তো শুধু রাজা-মহারাজার নয়, তাঁদের "সাতকোটি" প্রজাও ভারবাহী পশুমাত্র নয়; বৃটিশ-ভারতের চেতনার ছোঁয়াচ সেখানেও তো লেগেছে এবং সেখানকার প্রজারাও সকল কল্যাণের অভিভাবকতা রাজা-মহারাজার ওপর চিরকাল ন্যস্ত রাখতে রাজি নয়! ইংরেজ শাসকদের অনুকরণে অবশ্য তাঁরাও দাবি করতেন যে, প্রজারা নিজেদের কল্যাণ বোঝে না, সে বোঝবার দায়িত্ব রাজা-মহারাজারই। কিন্তু এমন একদিন আসে যেদিন নীচের মানুষ বলে, অনেক ভালো করেছ গো, আর ভালোতে কাজ নেই, এবার আমাদের ভালো আমাদের দেখতে দাও। দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও তাই বলতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলন হচ্ছিল, আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয়

এ-বছরেই বোম্বাইয়ে এমনি এক সম্মেলনে প্রজাদের কথা

প্রতিধ্বনিত করে সি. ওয়াই. চিন্তামণি বললেন, হ্যাঁ, বলে রাখি, তখনও প্রজা-আন্দোলন তেমন মিলিট্যাণ্ট বা মারমুখো হয়ে ওঠেনি; সুতরাং, তার ভাষাও ছিল চিন্তামণির মতই সংযত ও নম্র, কিন্তু মনোভাব স্পষ্ট থাকেনি, তিনি বললেন:

"কোন কোন রাজা অবশ্য বৃটিশ-ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য বৈধ-আন্দোলনের প্রতি বরাবর সহানুভূতিসম্পন্ন। উদাহরণ স্বরূপ গাই-কোয়াড়ের মহারাজা, সিন্ধিয়ার পরলোকগত মহারাজা ও বিকানীরের মহারাজার কথা বলা যায়, তাঁদের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণও করে থাকি; কিন্তু সাধারণভাবে ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি আজও তাই করে বলছি, ঠিক যখন বৃটিশ-ভারতে শাসন-সংস্কার বা সম্প্রসারণের সূচনা হতে চলেছে তখন রাজামহারাজাদের স্বাধিকার সম্পর্কে উৎকণ্ঠার আতিশয্যে এই বেদনাকর ধারণারই সৃষ্টি করেছে যে, বৃটিশ সরকারের ওপর তাঁদের যতখানি আস্থা, স্বদেশবাসীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ততখানি আস্থা স্থাপন করতে রাজি নন—অথচ এই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই তাঁরা সঙ্গত অভিযোগ করে থাকেন যে, তাঁদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিশর্তগুলো পালনে ন্যায়বিচার করছেন না।

সুতরাং. শুধু বৃটিশ-ভারতে নয়, দেশীয় রাজ্যেও রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব চলছিল ঐ ২৯-এই এবং ৩০-এর স্বাধীনতা প্রস্তাবের মুখে এসে। হতে পারে, তুলনায় এ ক্ষীণ প্রবাহ কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে কে? এবং এর অস্তিত্বই প্রচণ্ড সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল ৪৭-এ, ৪৭-এর পর; কেন না, দেশীয় রাজ্য হলেও ওরাও দেশের মানুষ, আর রাজ-শাসনের প্যাটার্নটাও তো একই? সেখানেও সেই একই মুক্তির আকুতি; একই সংঘর্ষ।

কিন্তু আজ নয়, কাল তোমায় বলব, যে দু'টি প্রবল ধারা আর সব ক্ষীণ ধারাকে টেনে নিয়ে চলেছিল, যার একটির দাবদাহ চার-পাঁচ বছরেই নিঃশেষ. হয়ে গেছল, আর একটি চলেছে অবিচ্ছিন্ন; আজ নয়, কাল।

পরদিন বললেন, ঠিক করে উঠতে পারছিনে. কোন্‌টি তোমায় আগে বলব, যেটি চার-পাঁচ বছরে নিঃশেষ হয়ে গেল সেটি, না, যেটি অবিচ্ছিন্ন চলেছে সেটি ?

থামলেন।

বললেন, একটির ওপর আর একটির অন্তঃক্রিয়া হয়েছে, কিন্তু যেটি স্বল্পায়ু নিয়ে হতপ্রাণ হল তার এপিটাফ বলব। তাই করি ঃ

১৯২৯-এর ১০ই জুলাই 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'সণ্ডার্স-হত্যা মামলা' শুরু হল। বিচারক—স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব পণ্ডিত শ্রীকিষণ। বিচার স্থান—লাহোর সেন্ট্রাল জেল। জেল হল আদালত। লরেন্স গার্ডেন পর্যন্ত জেলখানার সব আনাগোনা পথে কড়া পুলিশ প্রহরা, রাস্তায় রাস্তায় ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টদের টহল, ওদের ভট্‌ভটি মানে মোটর সাইকেলের আওয়াজ এক অব্যক্ত ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। তবু জেল রোড ধরে একদল দুঃসাহসী তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল; বন্দীদের যখন আনা হল তখন ওরা তেমনি অকুতোভয়ে চীৎকার করে উঠল ঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !

হয়নি। বিপ্লবকে দীর্ঘজীবন দিতে পারেনি ঐ নির্ভয় পথচারীরাও। কিন্তু অন্ততঃ সেদিন তো ছিল সূর্যের মতো জ্বলন্ত বিশ্বাস তরুণদের হৃদয়ে হৃদয়ে। অভিযুক্তের সংখ্যা ৩২ ; এর মধ্যে সাতজন মুক্তি-প্রতিশ্রুত, অর্থাৎ রাজসাক্ষীর কলঙ্ক কালিমা নিয়েছে মেখে ; ন'জন আপাততঃ পুলিশের বেড়াজাল-মুক্ত, পুলিশের ভাষায় পলাতক। চলতিভাষায় 'আত্মগোপন' করে আছে। আসলে ষোলোজন বন্দী বিচারকের সম্মুখীন। ধরবার পর থেকে আড়াই মাস পুলিশ তাদেরই হেফাজতে রেখেছে; আজ বিচারকের মুখ ও বিচারের বাণী শোনা যাবে।

(১) লায়ালপুরের অধিবাসী শুকদেব, ১৫ই এপ্রিল লাহোর

বোমা কারখানায় ধরা পড়েন। (২) কিশোরীলাল রতন; হোসিয়ারপুর 'বোমার কারখানায়' বন্দী হন। (৩) শিব বর্মা, শাহারানপুরে ধৃত। (৪) গয়াপ্রসাদ, কানপুরের, ধরা পড়েছেন শাহারানপুরে। (৫) জয়দেব, শাহারানপুরে গ্রেপ্তার হয়েছেন। (৬) যতীন্দ্রনাথ দাস, দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, বন্দী হয়েছেন কলকাতায়ই। (৭) ভগৎ সিং, দিল্লীতে বন্দী, এসেম্বলি বোমা মামলায় দণ্ডিত। (৮) কমল নাথ ত্রিবেদী, কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, বেতীয়ায় গ্রেপ্তার হন। (৯) বটুকেশ্বর দত্ত, বাংলা দেশে, বর্ধমানের জি. ডি. দত্তের ছেলে, দিল্লীতে বন্দী ও এসেম্বলি বোমা মামলায় দণ্ডিত। (১০) যতীন্দ্রনাথ সান্যাল, ঠিকানা এলাহাবাদ, ধরাও পড়েন সেখানে। (১১) আগিয়ারাম, শিয়ালকোট জেলা। (১২) দেশরাজ, লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজের ছাত্র। (১৩) প্রেম দত্ত, গুজরাট, লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। (১৪) সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, কানপুরে গ্রেপ্তার হন। (১৫) মহাবীর সিং, ইটাওয়া জেলা। (১৬) অজয় কুমার ঘোষ, কানপুরে ধৃত হন।

পুলিশ যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না বলে তখন ঘোষণা করেছিল তাঁরা হলেন : লাহোরের ভগবতীচরণ, (২) ধর্মশালার যশপাল, (৩) কানপুরের বিনয়কুমার সিংহ, (৪) বারাণসী ভিলাপুরের চন্দ্রশেখর আজাদ, (৬) বারাণসীর রঘুনাথ, (৬) ঝান্সীর কৈলাস, (৭) কানপুরের সংগুরু দয়াল অবস্তি, মে মাসে একবার ধরা পড়েছিলেন, জামীনে খালাস হন, তারপর থেকে নিখোঁজ।

আর রাজসাক্ষীদের মধ্যে জয়গোপাল লাহোর বোমার কারখানায় ১৫ই এপ্রিল ধরা পড়ে, হংসরাজ ভোরা ছিল লাহোরের ফোরম্যান, ক্রিশ্চান কলেজের ছাত্র; কপূরতলার রামশরণ দাস, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত; এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক এডভোকেটের ছেলে ললিত মুখার্জি; কানপুরে ধৃত ব্রহ্মদত্ত,

কলকাতায় ধৃত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, আর চম্পারণের মনমোহন মুখার্জি।

লাহোরের সিনিয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জর্জ ট্রেভর হ্যামিলটন হার্ডিং ছিলেন প্রধান অভিযোক্তা। অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১-ক, ১২২ ও ১২৩ ধারানুসারী। "আসামীরা" আরও অনেকের সঙ্গে মিলে সেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বৃটিশ-ভারতের লাহোর ও অন্যান্য স্থানে নানা সময় ও উপলক্ষে আজ অবধি অথবা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত সম্রাটকে বৃটিশ ভারতের সার্বভৌমাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, চেয়েছিল বৃটিশ-ভারতে আইনবলে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারকে ,বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করতে এবং এই উদ্দেশ্যে লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র ও তদুপকরণ সংগ্রহ কিম্বা অন্যথা প্রস্তুত হতে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সব ষড়যন্ত্র মামলারই বয়ান থাকে এক, কেননা, ও হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোরই ভাষা, সুতরাং, ওগুলোর ছাঁচে ফেললে এই বয়ান থেকে নিষ্কৃতি নেই, যতবড় নয় তার চতুর্গুণ প্রতিপন্ন হয় ঐ ধারা ক'টির গুণে।

অভিযোক্তা অভিযোগের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বললেন, ধৃত ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যে একটি দলও গড়েছিল এবং সে দলের নাম "হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশান" ও "ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি।"

কিন্তু অভিযোগগুলো যেমন মিথ্যে নয়, এই এসোসিয়েশন ও আর্মির কথাও তেমনি অসত্য নয়। হ্যাঁ, বলপ্রয়োগে, শস্ত্রপ্রয়োগে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ তো ওঁরা করতেই চেয়েছিলেন দল গড়ে। দুর্ভাগ্য এই, দল গড়ে কাজ করার আগেই তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে শাসক সেখানে আইন তাদেরই, সুতরাং, সেই আইনবলেই তাদের সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত, তার নাম ষড়যন্ত্র ততক্ষণই যতক্ষণ তা' সফল হয় না! নইলে পরাধীন দেশে শাসকজাতিকে উচ্ছেদ করা যে দেশবাসীর নৈতিক কর্তব্য, শাসকেরা তাকে যে বিশেষণেই অভিহিত করুক না কেন।

সুতরাং, অভিযোগের দু'টি একটি ক্ষেত্রে হয়তো বাড়াবাড়ি থাকে

কিন্তু মূল কথাটা থাকে ঠিকই। পরাধীন জাতির যা নৈতিক কর্তব্য তাই বিদেশী শাসকের কাছে ষড়যন্ত্রের অপরাধ, অতএব, দণ্ডনীয় এবং চরম দণ্ড।

পথ তো নিতেই হয়, রক্তপথ, কেন না, এঁরা তো অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত নন।

অভিযোক্তা বললেন, বৃটিশ-ভারতে ঐ ষড়যন্ত্র অনুসারে ১৩. ১. ১৯২৮ তারিখে ওঁরা চেষ্টা করেছিলেন বারাণসীর গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ব্যানার্জিকে—

হঠাৎ নিজের কথায়ই বাধা দিয়ে বললেন, তোমায় একটা কথা বলি, সত্য, বাংলাদেশে জীবনদানী বিপ্লবীর জন্ম হয়েছিল অনেক, নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে অকুতোভয়ে তাঁরা যে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্রও খুব বেশি নেই, কিন্তু হতভাগ্য এই দেশে মীরজাফরের একটা লাইনও কম প্রবল ছিল না। ভারতবর্ষে বোমারু বিপ্লবী বলতেও যেমন ছিল বাঙালী, তাঁদের ধরবার জন্য, তাঁদের ফাঁসিকাঠ অবধি পোঁছে দেবার ঘৃণ্য কৃতিত্বও বাঙালী গোয়েন্দাদের ; বাংলাদেশে এই বিপরীত মিশ্রণই বাংলাদেশকে বড় হতে দেয়নি ; বাংলা কখনও কোন ক্ষেত্রে এক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ; না হিংসায়, না অহিংসায়। বাংলাদেশের শাক্তমনকে শুধু ঐ বাঙালী গোয়েন্দারা নয়, অহিংসবাদীরা নির্বীর্য করে দিয়ে গেছে। সারাজীবন অহিংস পথ মাড়িয়ে, বিপ্লবীদের নিন্দাবাদে কোরাস গেয়ে আজ স্বীকারোক্তি করছি বলে চমকে যেও না। তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে, সত্য, ১৯৪৬-এ নোয়াখালির শ্মশানে গান্ধীজীও প্রশ্ন তুলেছিলেন, বাংলাদেশের বিপ্লবীরা কোথায় উবে গেল ?

উবে সত্যিই গেছল। তার সূচনা হয়েছিল ১৯২১-এই, অহিংস অসহযোগে ওঁদের আত্মসমর্পণ। তবু ছিল আগুন, গোপীনাথের ধারা গোপনে গোপনে ১৯৩০-৩৪ অবধি চলে এসেছিল, কিন্তু সারা ভারতে সর্বজনীন মুখর নিন্দা ও বৈষয়িক অপ্রতিষ্ঠার

মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জাগিয়ে রাখা অসম্ভবই হয়ে পড়েছিল। সুতরাং, নোয়াখালি থেকে যখন হিন্দুরা পালাতে শুরু করেছিল তখন কিছু হয়তো বেদনা-বিস্ময়ের কারণ ছিল। কেন না, তখনও দেশ ভাগ হয়নি, কিন্তু দেশভাগের পর ওরা লক্ষ লক্ষ যখন একতরফা মার খেয়ে পালাতে শুরু করল তখন বিস্মিত হইনি। বীর্যহীন বাঙালীর কাছে আর কিছু আশা করিনি। কিন্তু এর মৃত্যু-বীজ এর অন্তরেই ছিল। কোথায় বারাণসী আর কোথায় বাংলা, কিন্তু সেখানকারও গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বাঙালী, তাকে হত্যার চেষ্টা করতে হয়েছে বাঙালী বিপ্লবীদেরই অথবা তাঁদের সাথীদেরই! এবং, দেখ, রাজসাক্ষীও হল বাঙালী। কেমন একটা বিমিশ্র এবং একেবারে বিপরীত মানসিকতা নয়?

এই মামলায়ও, দেখ, পয়লা নম্বর অভিযোগ—ব্যানার্জিকে হত্যার চেষ্টা, অন্যান্য অভিযোগগুলো কত ছোট! কৈলাসপট্টি ওরফে কালীচরণ গোরখপুর জেলার এক সাবপোস্টাফিসের কর্মী, ২৬. ৬. ২৮ তারিখে হাজার তিনেক টাকা (৩,১৯০) তছরূপ করে গা-ঢাকা দিয়েছে, টাকাটা নিঃসন্দেহে দলের ব্যবহারের জন্যই। লাহোরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেও ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল ৪. ২. ২৮ তারিখে। চূড়ান্ত হল ঐ বছরেরই ১৭ই ডিসেম্বর আর পরের বছর, ২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ। সণ্ডার্স আর তার সহচর হেডকনস্টেবল চমন সিং ১৭ই ডিসেম্বর নিহত হলেন; ৮ই মার্চ এসেম্বলি কক্ষে পড়ল বোমা এবং চলল গুলিও, আহত হলেন স্যার বোমানজী দালাল ও আর কেউ কেউ। এ সব ছাড়াও ১৯২৯-এর ৭ই জুন মৌলনিয়ায় যে ডাকাতি হয় তাতে বাড়ির মালিক বাঁকে মাতন কোয়েরী নিহত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা লাহোর, শাহারানপুর, কলকাতা ও আগ্রার আরও কারও কারও সঙ্গে মিলে বোমা তৈরি করছিল। ইতিমধ্যে লাহোর-শাহারানপুরের বোমার কারখানা পুলিশের হস্তগত হয়।

এই দলের লোকেরা সাইমন কমিশনবাহী ট্রেনটি ডিনামাইট

যোগে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, সফল হননি ; ওঁদেরই দলের কারাদণ্ডিত সদস্য জগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জিকে উদ্ধারের চেষ্টাও সফল হয়নি।

হাস্যকরই বটে, মামলায় এই বিরাট ও অস্বাভাবিক আয়োজন করেও গবর্নমেণ্ট এডভোকেট কর্ডেন নোয়াড আদালতকে বোঝাতে চাইলেন যে এই মামলাটি কিন্তু নিতান্তই সাধারণ, নিতান্তই মামুলী, সাধারণ আইন ও বিধানমতই এর নিষ্পত্তি হবে, এর সঙ্গে লেশমাত্র রাজনীতির সম্পর্ক নেই।

অথচ সণ্ডার্স ও চমন কিভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় নিহত হয়েছে তার উল্লেখ করে বললেন, ধৃত ব্যক্তিরা একটি বিপ্লবীদলভুক্ত এবং সারা উত্তর ভারত জুড়ে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দিল্লীতে পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির এক সভা হয় ; তাতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যেসব কর্মপন্থা ও প্রস্তাব গৃহীত হয় তদনুসারে ফণীন্দ্রনাথের ওপর ভার পড়েছিল বিহার ও উড়িষ্যার, শুকদেব ও ভগৎ সিংয়ের ওপর পাঞ্জাবের, বিজয় কুমার সিংহ ও চন্দ্রশেখর আজাদের ওপর যুক্তপ্রদেশের ; কুন্দনলাল ওরফে প্রতাপের ওপর রাজপুতনা ও মধ্যপ্রদেশের। আর চন্দ্রশেখর আজাদ ভার পেলেন সামরিক বিভাগের।

উদ্দেশ্য ঃ হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সাহায্যে রিপাব্লিকান গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ; (২) কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায় যেসব পদস্থ ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তাদের প্রাণহানি ঘটিয়ে ত্রাসের সঞ্চার করা ; (৩) কারাদণ্ডিতদের মুক্ত করার বন্দোবস্ত ; (৪) যে কোন উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ ; (৫) ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মিতে যোগদানের জন্য শিক্ষিত তরুণদের আকৃষ্ট করা।

কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি দূরস্থান, আয়োজন বন্দোবস্তকালেই সব ফাঁস হয়ে গেল। দশহরা উৎসবকালে রোশেনি গেটের কাছে এক

বিস্ফোরণ ঘটে। লোক-পরম্পরায় শোনা গেল, ওরিয়েণ্টাল কলেজের তুটি প্রাক্তন ছাত্র রোশানি গেটের কাছে যে বোর্ডিং আছে তার দোতলা আর তিনতলায় আনাগোনা করে থাকে। ধরে নিয়ে তাদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায় করা হয়। তাদেরই একজন যা বলে, তাতে এই সর্বপ্রথম জানা যায় যে, সণ্ডার্স হত্যার সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের যোগ আছে, আর পাঞ্জাবের চীফ লেফটেনান্ট হচ্ছেন ভগবতীচরণ।

এরই কিছু আগে কারা সব এসে লাহোরের লোহা ঢালাই মিস্ত্রি-দের কয়েকটি লম্বাটে বস্তু তৈরীর অর্ডার দেয়; আসলে ওগুলো ছিল একটা গ্যাস মেসিনেরই পার্ট। মিস্ত্রিদের কৌতূহল হয় এবং ওদের মধ্যে এ এক গল্প হয়ে দাঁড়ায়, এক কনষ্টেবলও কথায় কথায় জানতে পারে। অর্থাৎ, এটি ক্রমশ: পুলিশের গোচরে আসে। যারা অর্ডার দিয়েছিল তাদের ওপর নজর রেখে তাদের পিছু নেবার ব্যবস্থা হল। সুখদেবের পেছনে যেতে যেতে দেখা গেল, তিনি ৬৯ নং কাশ্মীর বিল্ডিংয়ে ঢুকলেন। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানল ও বাড়ির ভাড়াটে হচ্ছেন ভগবতীচরণ।

এর পর দেখা গেল, এসেম্বলিতে যে বোমা ফাটল তার সঙ্গে ঐ পরিকল্পিত গ্যাস প্যাণ্টের মিল আছে। খুব সযত্ন নজর রাখা হল বাড়িটার ওপর। যখন আরও সব গোপন খবর এসে গেল তখন একদিন—১৫ই এপ্রিল—ও বাড়িতে দল বেঁধে হানা দিল পুলিশ এবং সুখদেব, জয়গোপাল ও কিশোরীলালকে বন্দী করল। তারপর জানা গেল সব ইতিবৃত্তই।

তুমি শুনে অবাক হবে, সত্য, আমাদের সঙ্গে, কংগ্রেসের সঙ্গে এসব হিংসাত্মক ব্যাপারের কোন সংশ্রব ছিল না। কড়া গান্ধীপন্থী-দের সহানুভূতি দূরস্থান কড়া বিরোধিতাই ছিল, তবু, অন্ততঃ সেদিনও ছুঁৎমার্গীরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি পরবর্তীকালের মতো। তাই এ. আই. সি. সি. বুলেটিনে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত সংবাদ থাকত। তোমায় তুটি একটি উদাহরণ শোনাই।

১১-ই জুলাই তারিখের বুলেটিনে বলা হল : যতীন্দ্রনাথ সান্যাল এলাহাবাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হলেন ; তাঁর দুই ভাই, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ককোরী ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করছেন। লাহোর ও অমৃতসরের বহু বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়েছে ৭ই জুলাই।

৩-রা আগষ্টের এ. আই. সি. সি. বুলেটিনে বলা হল : ১৯-এ জুলাই ৭টি যুবক লাহোরের রাস্তা ধরে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মামলা খরচ বাবদ চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি ধ্বনি দিচ্ছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার হুকুম দেন, তারা অস্বীকার করলে ৩৬ জন পুলিশ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাতে লম্বা লাঠি, অবিরাম লাঠি চালিয়ে যায়, দু'জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আর সবাইও জখম হয়। তারপরও ওদের টেনে হিঁচড়ে লরীতে তোলা হয় এবং সেখান থেকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। সর্দার মঙ্গল সিং, মৌলানা জাফর আলি খাঁন দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—এই অপরাধে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা ছিলেন এ. আই. সি. সি.-র সদস্য।

অনশন ও যতীন্দ্রনাথের আত্মদান

কিন্তু যা নিয়ে সারা ভারত তোলপাড় হয়েছিল এবং যার ওপর অহিংস কংগ্রেসের অধিবেশনেও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা হচ্ছে, লাহোর বন্দীদের অনশন এবং অনমনীয় সঙ্কল্পের বেদীমূলে যতীন্দ্র-নাথ দাসের দধীচির মতই আত্মদান।

আমরা ১৯২৯।৩০ এবং কংগ্রেসের মুখে এসে পড়েছি, যতীন দাসের শব ডিঙ্গিয়ে আমাদের সেখানে যেতে হবে, সুতরাং, এস, সত্য সেই শব-সাধনাটা আগে সেরে নি। এ. আই. সি. সি.'র আগষ্ট বুলেটিনেও ভগৎ-বটুকের অনশনের কথা ছিল, তখন ভগৎ-বটুকের অনশনের সপ্তম সপ্তাহ। আর সকলের দিন সতের। ১৩-ই

সেপ্টেম্বরের বুলেটিনে ছিল, অনশনের ফলে ওঁরা এত দুর্বল যে, আদালতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, শুনানী বার বার মুলতুবী করতে হয়। নির্লজ্জ গবর্নমেণ্ট অর্ডিনান্স জারী করলেন, ওঁদের অনুপস্থিতিতেই মামলার শুনানী চলবে।

কিন্তু যে খবর সেদিনকার সব খবরকে ছাপিয়ে গেছল তা হল যতীনদাসের আত্মদান।

কিন্তু বাংলাদেশে যতীন দাসের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক নয়, যতীন দাসের নিজ জীবনেও এই চরম পরিণতি আকস্মিক নয়। ওঁর জন্মকালটাও লক্ষণীয়—১৯০৪-এর ২৭-এ অক্টোবর। বঙ্গভঙ্গের মুখে। সেকালের দামাল ছেলেদের তাপ লেগেছে ওঁর শৈশবে। কিশোর যতীনকে দেখা গেছে কলেরা-বসন্ত মহামারীতে কাতর বস্তিবাসীদের পাশে পাশে। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানেও সাড়া জেগেছিল তার মনে। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র, পড়া ছেড়ে দিয়ে যতীন দাস আত্মনিয়োগ করলেন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে। বন্যার্তদের খবর আসে, যতীন ছুটে যান। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রথমবার মাত্র চারদিন আটক। দ্বিতীয়বার এক মাস জেল; তারপর আবার তিন মাস।

তদ্দিনে অহিংস অসহযোগের ব্যর্থতা যতীনের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে। কলকাতায় তারই এক শাখা উঠল গড়ে, গুপ্তদল "অনুশীলন সমিতির"ই একাংশ নাম ধরেছে হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন। ভারতের বাইরে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার এক কেন্দ্র হল দক্ষিণ কলকাতা এবং তারই অনেক ভার যতীন দাসের ওপর। এই কাজেই রহমত মিঞা ওরফে যতীন দাস খিদিরপুর ডকের কাছে পান-বিড়ির দোকান সাজিয়ে বসল। আসল কাজ বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর রহমত মিঞাকে দোকানপাট তুলে গা-ঢাকা দিতে হয়।

কাকোরী ডাকাতির পর মীরাটে দলের এক বৈঠক বসে ; যতীন দাস সে বৈঠকে যোগ দিয়ে এসেই কলকাতায় বেঙ্গল অর্ডিনান্সের জালে পড়ে গেলেন। তিন বছর নানা জেলে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায়ও জড়ানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু ব্যর্থ সনাক্তকরণের ফাঁক দিয়ে যতীন দাস অব্যাহতি পান।

জেলেও শান্তি নেই বিপ্লবীর। পদে পদে বিবাদ ও লাঞ্ছনা। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে ওরা যতীনকে বর্বরের মত মারে। যতীন দাস অনশন করেন একাদিক্রমে ২৩ দিন। সংবাদ ফাঁস হয় খবরের কাগজে। আর অমনি আন্দোলন। ঢাকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নতি স্বীকার করেন যতীনের কাছে। তারপরই চালান হয়ে যান সুদূর মিয়াঁবালী জেলে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি।

কিন্তু বিপ্লবীর ললাটে মুক্তিরেখা থাকে না। তবু কারামুক্তির অবসরটুকু যতীন নিয়োগ করলেন সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সংগঠনে। মেজর তিনি দাস, এই তখন তাঁর পরিচিতি।

আর এরই মধ্যে কখন গোপন শেকড় ছড়িয়ে পড়েছে পাঞ্জাব অবধি ; ভগৎ সিং, সুখদেব, বটুকেশ্বর, কুন্দনলাল, বিজয়কুমার সিংহ, জয়দেব প্রমুখের সঙ্গে একই রস আহরণ করে চলেছেন যতীন দাস। লাজপৎ রায়ের বদলা সণ্ডার্সের বুক লক্ষ্য করে তুলতে লাগল এক অলক্ষ্য ফণা, ওঁদের সেন্ট্রাল কমিটিতেই ঐ সিদ্ধান্তের জহর উঠেছিল।

কিন্তু বৃটিশ-শাসনের অক্টোপাস ছিল প্রবলতর ও সহস্রচক্ষু। যতীন দাসও ধরা পড়লেন এবং খুনী বদমায়েসদের জেল বলে কুখ্যাত লাহোরের বোরস্টাল জেলে যতীন দাস শেষবারের জন্য বন্দী হলেন। কুখাদ্য, অসদ্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ। অসহ্য অমর্যাদাকর। প্রাণ তুচ্ছ হয়ে গেল সঙ্কল্পের কাছে। যতীন দাস সহ সবাই আমরণ অনশন করলেন।

বৃটিশ সরকারেরও জেদ, পাশবিক জবরদস্তি। হোক কুখাদ্য, কিন্তু না-খাওয়া চলবে না। আট ন'জন চেপে ধরত অসহায় নিরস্ত্র

বন্দীকে—মাথায় বুকে হাতে পায়ে। নাকের ভেতর দিয়ে লম্বা নল, পেট অবধি, দুধের করুণা ধারা। কিন্তু যতীন দাসের জেদ ও অসযোগিতার দৃঢ়তা ঐ সমবেত শক্তিকেও পরাস্ত করতে লাগল, নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ছিন্ন ভিন্ন ক্ষতদুষ্ট হয়ে গেল। না, চিকিৎসার অশ্রদ্ধেয় প্রলেপও নয়, মৃত্যুকে সে চিনেছে, সে আসতে লাগল প্রতি মুহূর্তের কাঁটায়, বিঁধে বিঁধে; যন্ত্রণা-উদাসীন যতীন দাস অদৃশ্য দুই বাহু বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন।

যতীন দাস মৃত্যুর একটি হাত ধরে ফেলেছেন দৃঢ়মুষ্টিতে। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারও বুঝলেন কোন আশাই নেই ওঁর বাঁচবার। একটি দয়া করলেন। ছোট ভাইকে শুশ্রূষার জন্য থাকতে দিলেন পাশে। কিন্তু যতীনের কাছে এক শপথের পর; ছোট ভাইকে সে শপথ নিতে হল, এক ভয়ঙ্কর শপথ, সে মুহূর্তের কাতরতায়ও যতীনকে অনশনভঙ্গের অনুরোধ জানাবে না, কোন খাবার বা ওষুধ দেবে না—সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অবচেতনার প্রার্থনায়ও নয়।

সরকারের প্রেস্টিজও জখম হয়েছিল অনেকখানিই। কারা আইন সংস্কারের একটা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এক কমিটিও নিয়োগ করলেন। ক্ষুদ্রচিত্ত কমিটির সদস্যেরা আশ্বাস দিতে এলেন এই মুমূর্ষু বিপ্লবীকে। যতীনের চিত্ত স্থির, প্রত্যাখ্যান করলেন। আগে অনশনের শর্তপূরণ, পরে কথা। সে এক সঙ্কটকাল, সবাই অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যতীন অনির্বাণ শিখা।

ডাক্তারেরা মৃত্যুদূতকে দেখতে পেয়েছেন যতীনের শিয়রে; শরীরে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ, হৃদযন্ত্রের কাছাকাছি একটুকু ধুকপুক্। সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। এমন সময় জামিনের আবেদনের অনুরোধ। ঘৃণাভরে সেই প্রত্যাখ্যান। নির্লজ্জ বৃটিশ সরকার অন্তরালে দুই ছায়ানটকে দাঁড় করলো জামিনদার করে। যতীনের সই নিতে এসেই কারসাজি দৃশ্যমান হল।

তারপর পড়ল শেষ যবনিকা; শিখা নির্বাপিত, কিন্তু চারদিক

জ্যোতির্ময়। তারিখটা ১৩-ই সেপ্টেম্বর; চৌষট্টি দিনের প্রান্তরেখা, শপথ-সমুজ্জ্বল।

কিন্তু ঐ মরদেহ? বোম্বাই বলেছিল, ঐ দেহ আমাদের চাই, যত টাকা লাগে দেব; পাঞ্জাব বলেছিল দাবি আমাদের; আমরাই দেব সব। বল, সত্য, তোমরা যে জাতীয় সংহতির কথাটা আজকাল হামেশা শুনতে পাও, কোথায় পাবে তার এর চাইতে মহত্তর দৃষ্টান্ত?

সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি; টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যতীনের অমরপ্রাণ-পূত দেহাবশেষ আনতে, ১৪-ই তারিখে শ্মশানযাত্রা বিজ্ঞাপিতও করেছিলেন। তুমি সে দৃশ্য দেখনি, সত্য, দেখলে মুগ্ধ হতে; অহিংস গান্ধীপন্থী আমি, আমিও হয়েছিলাম, তখন বুঝিনি। আজ বুঝছি, যতীন দাস ১৯২৯কে একাই চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন। সে দাগ শুধু হাওড়া স্টেশন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান অবধি নয়, এ. আই. সি. সি.-র ৫-ই অক্টোবরের বুলেটিনের ভাষায় On September 13, whole of India deeply stirred। তবু চোখে দেখেছি হাওড়া থেকে কেওড়াতলা অবধি সে শোকমিছিলের মোটা দাগ, বিবেকানন্দের সেই—যাবি তো, দাগ রেখে যা। কত বড় হয়েছিল সে মিছিল? একটা তুলনা মনে এসেছিল, দেশবন্ধুর মরদেহ নিয়ে কলকাতা এক অভূতপূর্ব মিছিল দেখেছিল বটে, কিন্তু এ? সকাল আটটায় হাওড়া, বেলা দুটোয় শ্মশানে। এমনিতেই আমাদের কাছে আগুন পবিত্র, আর এই চিতাগ্নি? সঙ্কল্পশিখায় অতুলনীয়। ১৯২৯-এর সেই চিতার দাহ বাংলাকে দগ্ধেছে।

এ কি মৃত্যু?

এর উত্তাপ লেগেছিল দেশে এবং লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের মুখে। এই লাহোরেই—যে-লাহোরে যতীন দাস শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। এই লাহোরেই কংগ্রেস সেবীরা বুক ভরে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস নিলেন।

কিন্তু উত্তাপ যাঁদের স্পর্শ করে না, দুঃখে প্ররোচনায় নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন, প্রতিশোধের কথা যাঁদের মনে জাগে না, অপরের মনে জাগলে নিন্দা করেন, শ্মশান-শান্তির ছায়ায় ছায়ায় যাঁরা চলার শপথ নেন, অপমানের ধুলো যাঁরা গায়ে মাখেন না, তাঁরাও সংখ্যালঘু ছিলেন না এদেশে, তাঁদের অস্থিরতা ছিল না। তাঁরা কর্ণপাতের জন্য উন্মুখ থাকতেন।

শোনাও গেল একটা ঘোষণা—যার তার নয়, খোদ বড়লাটের ঘোষণা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা-কংগ্রেস-প্রস্তাবের পর থেকে তাঁরা শোনবার জন্যই কান পেতে রেখেছিলেন। বড়লাট ঘোষণা করলেন ১৯২৯-এর ৩১-এ অক্টোবর। ডিসেম্বরে হবে কংগ্রেসের অধিবেশন—যে অধিবেশন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলে ছিলেন: There is no doubt that in the Lahore Congress the resolution for complete Independence as the goal of India will be adopted.

১৯২৯এর-৩০/৩১ মার্চে রংপুরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল তার সভাপতিরূপে বলেছিলেন: "চলতি বছরটা হচ্ছে প্রস্তুতির বছর ; যদি আমরা আন্তরিক হই, তবে আমরা আসছে বছর আইন অমান্য আন্দোলন, খাজনা বন্ধ করতে পারব। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লাহোর কংগ্রেসে ভারতের লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হবে। আসছে জানুয়ারী থেকে দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে এবং দরকার হলে আইন সভাগুলো ছেড়ে আসতে হবে। কাউন্সিলে শুধু সে সব মানুষকেই পাঠাতে হবে যাঁরা বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করবেন না। দরকার হলে আমরা সিন ফিনারদের মতো শপথ না নিয়েই বেরিয়ে আসব এবং ঐসব কাউন্সিলের বাইরে নিজস্ব সব ন্যাশনাল এসেম্বলি গড়ব।"

কিন্তু যাঁরা এই চিন্তাধারার পোষক ছিলেন না তাঁরা বড়লাটের ঘোষণা শুনে সাড়াও দিলেন—যেন লাহোর কংগ্রেসকে ফোরস্টল করার জন্যই।

থামলেন।

এই সুযোগে আমি জিগ্‌গেস করলাম : কি ঘোষণা করেছিলেন বড়লাট ?

বললেন, যা বলেছিলেন, তার ব্যাখ্যাটাই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে উঠল এবং তা হাস্যকর। কালক্রমে সোনার হরিণ শিকারে রামচন্দ্রও মোহমুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, উৎসাহী নেতারা। হ্যাঁ, বড়লাট বললেন :

"আমি এই ফিরলাম ইংলণ্ড থেকে, সেখানে আমার 'হিজ ম্যাজেস্টিজ গবর্নমেন্টের' সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

"বৃটিশ নীতির লক্ষ্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট ঘোষণাতেই বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, ইংরেজী বয়ানটাই আগে পড়ি, Providing for the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of Government in India as an integral part of British Empire. স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে ভারত সরকারের উদ্ভব হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। হিজ ম্যাজেস্টির অভিপ্রায় এই যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট যে পরিকল্পনা ছকে দিয়েছেন তাই হবে তাঁর অন্যান্য ডোমিনিয়ানদের মধ্যে ভারতের স্থান করে দেবার পন্থা। হিজ ম্যাজেষ্টিস গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে একথা স্পষ্ট করে বলার অধিকার দেওয়া হয়েছে যে :

> "In their judgment it is inplicit in the declaration of 1917 that the natural issue of Indian constitutional progress, as therein contemplated is the attainment of Dominion Status."

তাঁদের মতে ১৯১৭-র ঘোষণায়ই এটি নিহিত আছে যে, ভারতীয় সাংবিধানিক অগ্রগতি তদর্থে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসকেই বোঝাবে।

সুতরাং, কমিশন (সাইমন কমিশন) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করার ও তা প্রকাশিত হবার পর এবং

বৃটিশ সরকার (হিজ ম্যাজেস্টিজ গবর্নমেণ্ট) ভারত সরকারের পরামর্শ-ক্রমে ও সকল আহৃত তথ্যের আলোকে বিষয়গুলো বিচার করার পর তাঁরা বৃটিশ ভারতের সকল দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিদের ও দেশীয় রাজন্য-প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে—অবস্থা বুঝে, পৃথক অথবা একত্রে—মিলিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। উদ্দেশ্য, এইভাবে এক সম্মেলনে বসে বৃটিশ ভারত ও সমগ্র ভারতের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার অবকাশ করে দেওয়া। তারপর তারই সারাংশ পার্লামেণ্টে পেশ করা।

আমি তোমায় বাংলা মর্মার্থ বললাম, কিন্তু বিতর্কের অবকাশ যেখানে রয়েছে, কেননা, সেকালেই তা অত্যন্ত প্রকট হয়েছিল নেতৃবৃন্দের মধ্যে, সেখানে তোমায় ইংরেজী বয়ানটাও পড়ে শোনাই :

> When, therefore, the Commission and the Indian Central Committee have submitted their reports, and these have been published and when His Majesty's Government have been able in consultation with the Government of India to consider these matters in the light of all the materials then available, they will propose to unite representatives of different parties and interests in British India and representatives of the Indian States to meet them separately or together as circumstances may demand for the purpose of a conference and discussion in regard both to the British India and the All-India problems. It will be their earnest hope that by this means it may subsequently prove on this grave issues to submit proposals to Parliagment which may command a wide measure of general assent.

আজকের পটভূমিকায় তুমি নিশ্চয়ই চট্ করে বলবে কিসের প্রতিশ্রুতি, কোথায় প্রতিশ্রুতি নিছেন, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসেরই বা আশু আশ্বাস কোথায়? আজ কুয়াশামুক্ত দৃষ্টিতে তাই বলবে তুমি বটে, কিন্তু সেকালটা ছিল মোহাচ্ছন্ন—কাল না হোক নেতারা—সব নেতা না হোক, অনেক নেতাই।

১লা নবেম্বর দিল্লীতে নেতাদের এক সম্মেলন হল। সেন্ট্রাল এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের বাড়িতে বেলা আড়াইটায়। সাংবাদিকদের থাকতে দেওয়া হল না। থাকলেন গান্ধী, মতিলাল, আন্সারী, মামুদাবাদের মহারাজা, সপ্রু, সি. পি. রামস্বামী আয়ার, জওহরলাল, শেরওয়ানী, কুরেশী, বল্লভভাই, লালা ছুনিচাঁদ, পট্টভি সীতারামায়া, মহম্মদ আলি, জে. এম. সেনগুপ্ত।

এক'দিক থেকে ভালই হয়েছে, বেসুর বেমিল কিছু হয়নি, সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্তেই তাঁরা পৌঁছোলেন। গান্ধীজী ও সপ্রুজী যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথা বললেন, তাই হল আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা হল, আমাদের ঐতিহ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা, পুনরাবৃত্তির আবারও পুনরাবৃত্তির দিক থেকে খুবই স্বল্লায়ু বলতে হবে। গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব কিছুটা সংশোধিত হল সপ্রুজীর প্রস্তাবে। জওহরলাল প্রথমে আপত্তি করলেন, বুঝিয়ে বলাতে রাজি হয়ে গেলেন ইস্তাহারে সই করতে।

নাম তার "দিল্লী ম্যানিফেস্টো"। শোনো, পড়ি :

> "We appreciate the sincerity underlying the declarations, as also the desire of the British Government to placate the Indian opinion.
>
> We consider it vital for the success of the proposed conference that :
>
> "(A) A policy of general conciliation should be definitely adopted to induce a calmer atmosphere.
>
> "(B) That political prisoners should be granted a general amnesty.
>
> "(C) That the representation of progressive political organisations should be effectively secured and that the Indian National Congress as the largest among them should have predominant represatations.
>
> "We understand , however, that the conference is to meet not to discuss when Dominion Status is to be established but to frame a scheme of Dominion Constitution for India.

Unlil the new Constitution comes into existence we think it is necessary that a more liberal spirit should be infused the Government of the country, that relations of the Executive and the Legislature should be brought more in harmony with the object of the proposed conference and that greater regard should be paid to constitutional methods and practices."

কথাগুলো লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই; "আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারছি," নেতারা বললেন, "ঐ ঘোষণার আন্তরিকতা আর ভারতীয় জনমতকে পরিতুষ্ট করার জন্য ভারত সরকারের আগ্রহ। তবু আমরা মনে করি প্রস্তাবিত সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হবার জন্য দরকার—(ক) প্রশান্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সাধারণভাবে একটা আপোষমূলক নীতি অবলম্বন করে চলা; (খ) রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্তি; (৩) উন্নততর রাজনৈতিক সংস্থাদিতে যথাযথ জনপ্রতিনিধিত্ব এবং তার মধ্যে সব চাইতে বেশি প্রাপ্য ভারতীয়-জাতীয় কংগ্রেসের।

"আমরা জানি," নেতারা ইস্তাহারে বললেন, "কবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠিত হবে সম্মেলন তার তারিখ স্থির করার জন্য নয়, ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ান সংবিধানটা কি রকম হবে তাই হবে আলোচ্য বিষয়।"

"তা যাই হোক্," নেতারা আরও নিবেদন করলেন, "যদ্দিন-না নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হচ্ছে তদ্দিন আমরা মনে করি, দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আরও উদারতর মনোভাব প্রতিফলিত হওয়া উচিত, প্রস্তাবিত সম্মেলনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসন ও আইনসভার মধ্যে মধুরতর সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজন এবং সাংবিধানিক প্রথাপদ্ধতির ওপরই অধিকতর জোর দেওয়া কর্তব্য।"

আজ তোমায় বলি সত্য, এমন একটি ইস্তাহার, বিশের কংগ্রেস যে মডারেট বা উদারনৈতিকদের বর্জন করেছিল তার পক্ষেও মোটে মানানসই নয়। কিন্তু তোমায় যে সর্বদল সম্মেলনের কথা বলেছি বা ১৯২৮-এ যে তরুণ-প্রবীণ দ্বন্দ্বের কথা বলেছি, তাতেই প্রতিপন্ন

হয়েছিল, সংগ্রামের হুমকি সত্ত্বেও ১৯২৯-এর কংগ্রেসও মডারেটই ছিল এবং বড়লাটের ঘোষণার পর যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল তা পেছনে-ফেলে-আসা সর্বদলেরই প্রতিধ্বনি। এ যেন ক্ষেত্রান্তরে সবারে করি আহ্বানের মিলন সুর; এমন একটি প্রস্তাব বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মঞ্চেও অনায়াসে গৃহীত হতে পারত। কিন্তু তাতে সই করেছিলেন :

এম. কে. গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মিসেস অ্যানি বেশান্ত, এম. এ. আন্সারী, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ মুঞ্জে, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, পোরওয়ানী, জে. এম. সেনগুপ্ত, এম. এস. আনে, ডাঃ বি. সি. রায়, ভি. জে. প্যাটেল, সৈয়দ মামুদ, জগৎ নারায়ণ লাল, মালি কুঞ্জুমান, সর্দার শার্দুল সিং।

২৭-এ নবেম্বরের এ. আই. সি. সি. বুলেটিনেও এর উল্লেখ ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "বৃটিশ সরকারের পক্ষে বড়লাটের সাম্প্রতিক ঘোষণায় যে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের প্রস্তাব ছিল তা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। ১লা ও ২রা নবেম্বর দিল্লীতে প্রখ্যাত কংগ্রেসসেবী ও অন্যান্য দল-নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়; তাই থেকে এক ইস্তাহারের উদ্ভব হয়, ইস্তাহারে নেতৃবৃন্দ জানান যে, তাঁরা সহযোগিতা করতে রাজি আছেন কিন্তু আগে নিম্নোক্ত কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার :

(১) প্রস্তাবিত সম্মেলনে সব আলোচনারই ভিত্তি হবে ভারতে পূর্ণ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠা। (২) সম্মেলনে কংগ্রেসকে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। (৩) সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীর কারামুক্তি দিতে হবে।

(৪) ডোমিনিয়ান গবর্নমেন্টের উপযোগী করে এখন থেকেই যথাসম্ভব ভারত সরকারের কাজ পরিচালিত করতে হবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৮ই নবেম্বরের বৈঠকে দিল্লী ইস্তাহার সমর্থন করেছিলেন।

তুমি হয়তো ভাবছ, সত্য, যে, এই স্রোতমুখে সবাই ভেসে গেছে। না তা যায়নি। বন্যাতেও এমন হয়, অনেক কিছুই ভেসে যায়, মনে হয়, প্রলয়ই বুঝি হল, কিন্তু বিস্ময়ের চিহ্ন হিসেবে কিছু দাঁড়িয়েও থাকে বিধ্বংসী প্লাবনকে মিথ্যে করে দিয়ে।

দিল্লী ইস্তাহারের পাল্টা এক বিবৃতিও প্রকাশ পেল, তাতে স্বাক্ষরকারীরা সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু যেন একটা য়্যান্টি-থিসিসের মতো পরস্পরকে স্ফুটতর করে তুলল। স্বাধীনতাকামী এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ কিচুল ও মৌলানা আবদুল বারি। ওঁরা দিল্লী ইস্তাহারে সই করেননি। ২রা নবেম্বর তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে বললেন: "আমরা মতিলাল নেহরু আহূত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। বড়লাটের ঘোষণাটি সযত্নে বিচার করে দেখার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিবৃতিটি যা, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে উৎসাহ বোধ করার কোন কারণ আছে। বড়লাটের ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত বিশেষ করে দু'টি বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। সে দু'টি হচ্ছে: (১) দায়িত্বশীল গবর্নমেণ্ট হিসেবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের সংজ্ঞা; (২) একদিকে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিবর্গ, আর একদিকে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজন্য প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন ব্যবস্থা।

"প্রথমটা সম্পর্কে কথা এই যে, ঐ বিবৃতিতে কবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মঞ্জুর হবে তার উল্লেখ নেই। আমরা অবশ্য দ্ব্যর্থহীন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং তা সুদূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসেবে নয়, অদূর বর্তমানের লক্ষ্য হিসেবেই এবং যদি ১৯২৯-এর ৩১-এ ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মঞ্জুরও হয়, তবু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতারই পক্ষপাতী থাকব। কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে শেষ অধিবেশন হয়ে গেছে, তাতে আমরা এই মতই প্রকাশ করেছি। আমাদের কর্তব্য, আগামী ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে এইকথারই পুনরাবৃত্তি করা।

"দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কথা হচ্ছে, আমরা প্রস্তাবিত সম্মেলনটিকে

যথাযথ গোলটেবিল মনে করিনে এবং আমরা স্বদেশবাসীদের অনুরোধ করব তাঁরাও যেন এটিকে ঐ মর্যাদার বিশেষণে বিভূষিত না করেন। কিভাবে ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার হবে তা নির্ণয় করার জন্য সাইমন কমিশনের ক্ষেত্রে যে বিধিব্যবস্থা করা হয়েছিল তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সম্মেলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সে সম্পর্কে বিবৃতিটি স্পষ্ট নয়। এও জানা যাচ্ছে না, সম্মেলন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোবে তা চূড়ান্ত এবং উভয়পক্ষের অবশ্য মান্য বলে গণ্য হবে কিনা। এই অবস্থায়, প্রস্তাবিত সম্মেলনকে অনেকখানি কল্পনার রঙে রাঙিয়েও রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বা গোলটেবিল বৈঠক বলা যাচ্ছে না।

"উপসংহারে আমরা স্বদেশবাসীদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন বড়লাটের ও ভারত সচিবের বিবৃতিতে বিভ্রান্ত না হন; পক্ষান্তরে, লাহোর কংগ্রেসের সময় তাঁদের যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করেন। কলকাতা কংগ্রেসে চরম কথা (আলটি-মেটাম) উচ্চারণ করা হয়েছে। তার মেয়াদ ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে। যদি ঐ তারিখের মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মঞ্জুর না হয় তবে কংগ্রেসকে সমগ্রভাবে এই চরম কথা পালনের জন্য এগোতে হবে এবং তাই হবে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত। সেই কারণে এটি আমাদের অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা যে কর্তব্য মনে স্থির গেঁথে নিয়েছি, অর্থাৎ, আগামী সঙ্কটের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা থেকে সামান্যমাত্রও বিচ্যুত না হওয়া।

এলাহাবাদের নেতৃ-সম্মেলনে জানা গেল, পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর পিতা ও গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘকালীন উৎকণ্ঠিত চুলচেরা আলোচনার পরই ইস্তাহার স্বাক্ষর করেছিলেন; নেতৃ-সম্মেলনে সেই ভাষ্যই তিনি রাখলেন। স্বাধীনতার প্রতিই তাঁর মৌলিক আনুগত্য, তবে তিনি স্বাধীনতাকামী-গোষ্ঠিটি বাদে সকল দলের প্রতিবন্ধক হতে চান না বলেই এই স্বাক্ষর রাখলেন। কংগ্রেসের মনোনীত প্রেসিডেন্ট ও

জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে এ তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব হল তাও তিনি ব্যাখ্যা করবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেন ; আসলে, কংগ্রেসের বর্তমান নীতি তো তাই যে, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস যদি দেওয়া হয় তো নেওয়া হবে।

কিন্তু প্রবীণ নেতারাও শিগগিরই মোহমুক্ত হলেন ; অথবা যে ফাঁকিটা প্রত্যাশী মনের উৎকণ্ঠায় চোখে পড়েনি তা পড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, বড়লাটের বিবৃতিটি ১৯১৭-র ঘোষণারই একটি ছদ্মবেশ মাত্র, এটি ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে মডারেটদের সমবেত করার চাল ছাড়া কিছু নয়।

স্বাক্ষরকারীরা এলাহাবাদে ১৮-ই নবেম্বর মিলিত হবার পর এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন এবং উপস্থিত নেতারা অবস্থাটার নতুন করে পর্যালোচনা করলেন। অংশ গ্রহণ করলেন গান্ধী, আন্সারী, জওহরলাল, মালব্য, বাজাজ, পট্টভি, সেনগুপ্ত, আজাদ, সপ্রু, মামুদাবাদের মহারাজা, সচ্চিদানন্দ সিংহ, রাজ রাজেশ্বর বলী, কালাকঙ্করের রাজা, ভি. রামদাস পান্টুলু, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মৌলানা ইয়াকুব হাসান, কিদোয়াই, শেরওয়ানী, খালিকুজ্জমান, পণ্ডিত পন্থ, বিহারীলাল, শা জুবাইর, সর্দার প্যাটেল, মণিলাল কোঠারী, এন. সি. কেলকার অভয়ঙ্কর, দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, যমুনাদাশ মেহতা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, গিরধারীলাল, আলম এবং সুভাষচন্দ্র।

সুতরাং, পণ্ডিত জওহরলাল যে ভাষ্য দিলেন তার ভিত্তিভূমিটাই গেল নড়ে ; যাঁদের মুখ চেয়ে তিনি একটা ফাঁকিবাজিকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরাই এলেন সেখান থেকে সরে এবং প্রস্তাব নিলেন :

> Tbis conference has viewed with misgiving and dissatisfaction the recent debates in Parliament in regard to the Viceroy's declaration. The Conference, however, decides te stand by Delhi Manifesto and hopes that a full and early response will be made to it.

এ হচ্ছে হতাশার মধ্যেও নিরাশ না হওয়ার দৃষ্টান্ত। বুঝি, তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, তবু আশা রাখি, তুমি সবটাই ফাঁকি দেবে না। এই

আশা বা দুরাশায় প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল ও তেজবাহাদুর সপ্রু ব্যাপারটা সহজ সরল করার জন্য (with a view to clarify certain issues) বড়লাটের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ২৩-এ ডিসেম্বর গান্ধীজী, মতিলালজী, প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল, সপ্রুজী এবং জিন্নাজীও দেখা করলেন বড়লাটের সঙ্গে। কিন্তু এই বড়লাট-সম্মেলন ভেঙে গেল ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রশ্নে।

মডারেটদের কথা থাক্, তাঁরা তো কখনো স্বাধীনতার কথাও বলেননি, সংগ্রামের কথাও বলেননি, তাঁদের এতে মান-অভিমানের কথা নেই; কিন্তু কংগ্রেসের মুখে যেখানে ছিল স্বাধীনতার কথা ও সংগ্রামের আগুন তার এই হতমান অবস্থা দেখে বৃটিশ সরকার তিল-মাত্র দেরি না করে এক ইস্তাহার বের করে দিলেন। সেই সরকারী ইস্তাহারে বলা হল:

বড়লাট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল "to elicit the greatest possible measure of agreement" যতটা সম্ভব মতৈক্যের সৃষ্টি, যার মর্মার্থ পেলে বৃটিশ সরকারের কর্তব্য হবে তা-ই প্রস্তাবাকারে পার্লামেণ্টে পেশ করা। সুতরাং, সম্মেলনের ক্রিয়াকলাপ কোনক্রমেই আগে থাকতে ধরে নেওয়া অথবা পার্লামেণ্টের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা, তাঁর বা বৃটিশ সরকারের (হিজ ম্যাজেস্টিজ গবর্নমেণ্টের) পক্ষে সম্ভব নয়।

সুতরাং, সত্য, আবার ফিরে চলো, ফিরে চলো আপন ঘরে। এ. আই. সি. সি.-র সভায় গান্ধীজী তুললেন প্রস্তাব:

নরমে ও গরমে আপোষ

"In view of the general situation in the country this meeting of the A. I. C. C. is of opinion that time has come when all national efforts should be concentrated on the preparation of the country for a campaign of non-violent non-cooperation after 31st December, 1929, and agrees with the working Committee that all Congress members of the various Legislatures, Central and Provincial, to

resign their seats to give effect to this campaign; but having regard to the views expressed by a considerable body of Congress members of the Legislatures and some members outside them, this Committee resolves that the question of withdrawl from the Legislatures do stand over till the forthcoming Congress at Lahore."

সত্য, তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার। অথচ দেশ অপেক্ষায় অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসে যদি তা প্রতিফলিত না হয় তো আর কোথায় হবে? অন্য পথ, হিংসা-অহিংসা-নির্বিকল্প বৈপ্লবিক পথ নিন্দিত, মডারেট বা কংগ্রেসের পথ তা নয়, অথচ ১৯২৯-এর কংগ্রেসের দাবি, এই সংস্থা মডারেট ও বিপ্লবীদের মধ্যবর্তী। সুতরাং স্পষ্টতঃই এ. আই. সি. সি.-র এই প্রস্তাব দুই প্রান্তবর্তী মতের একটা আপোষ এবং এর সমর্থক হিসেবে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র বসু।

লক্ষ করেছো বোধ হয়, প্রস্তাবের প্রথমাংশ সংগ্রামী, শেষাংশ আপোষধর্মী। প্রথমে যেখানে বলা হচ্ছে, দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় এ. আই. সি. সি. মনে করছেন, সময় এসেছে যখন জাতির সকল প্রয়াস ১৯২৯-এর ৩১-এ ডিসেম্বরের পর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতির দিকে প্রধাবিত করতে হবে, দ্বিতীয় অংশে সেখানে বলা হচ্ছে, ওয়াকিং কমিটি যদিও মনে করেন, এই আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করতে কি প্রাদেশিক, কি কেন্দ্রীয় সকল আইনসভারই কংগ্রেস-সদস্যদের পদত্যাগ করে আসা কর্তব্য, তথাপি ঐ সব আইনসভারই বেশ-কিছু সংখ্যক সদস্যের এবং তার বাইরেরও কিছু সদস্যের অভিপ্রায় মতো এই পদত্যাগের প্রশ্নটি লাহোর কংগ্রেস অবধি মুলতুবী থাক।

আপোষ মীমাংসা হিসেবে একথাও রাখা হল যে, তবে যদি কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চান, তাতে বাধা দেওয়া হবে না।

এই এ. আই. সি. সি.-র আর দু'টি-একটি আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু তাৎপর্যে অসামান্য ঘটনার কথা তোমায় বলে রাখতে চাই; নইলে ১৯৩০ ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক মনে হতে পারে।

সেকালে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমলে, মিঃ ডে'র আততায়ী গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেম নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল কংগ্রেসে ; অহিংস-বাদীরা, তার মধ্যে আমিও ছিলাম, রক্তপাত দেখে এমনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা মানতেই রাজি হলেন না, গোপীনাথ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত এবং দেশমাতৃকার বেদীমূলেই উৎসর্গীকৃত। হিংসাশ্রয়ী বলে তাঁদের কাছে ঐ অকুতোভয় স্বার্থলেশহীন তরুণের দেশপ্রেমও মিথ্যা হয়ে গেল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তখনও দুরতিক্রম্য এবং সেকালের বাংলা উনিশশো আটত্রিশোত্তর বাংলার মতো নির্বীর্য নয়, উপেক্ষনীয়ও নয়। সুতরাং, তখনও গোপীনাথের হিংসাপথটুকুকে বিচ্ছিন্ন করে অনস্বীকার্য দেশপ্রেমকে স্বীকার করতে হয়েছে ; বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিকচক্রবালে অস্তমান প্রতীয়মান হলেও সম্পূর্ণ স্তিমিত নয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরই বঙ্গবিরহিত ভারতীয় নেতৃত্বের উদ্ভব হতে পেরেছে।

১৯২৯-এর ২৭-এ সেপ্টেম্বরের এ. আই. সি. সি.-তে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের দেশপ্রেম স্বীকারের প্রস্তাব তুলতে গিয়ে কংগ্রেস সদস্য চাটওয়াই মারাঠা ধাক্কা খেলেন। দেশবন্ধুরই এককালে স্বরাজ্যদলের ঘনিষ্ঠ সহচর মতিলাল প্রেসিডেন্টরূপে এ প্রস্তাব তুলতেই দিলেন না। কারণ ? কারণ, এ প্রস্তাব কংগ্রেসের ক্রীড নন-ভায়োলেন্সের বিরোধী।

প্রথম অহিংসা-মন্ত্র দীক্ষায় দিশেহারা আমি "গোপীনাথ-প্রস্তাবে" সায় দিতে না পারলেও ভগৎ সিং, বটুকেশ্বরের দেশপ্রেমকে অস্বীকার করতে পারিনি ; কোন জিনিসকে এমন একান্তভাবে দেখার দৃষ্টিকেও কানা বলে মনে হল। প্রস্তাবের মর্ম ছিল "appreciating the patriotic spirit of Messrs Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt and sympathising with

them in their hardship which they were forced to undergo by the alien Government."

তোমার কাছে স্বীকার করব, সত্য, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান আমার কাছে নিষ্ঠুরতাই মনে হয়েছিল। দেশের যারা শত্রু তাদের আমরা শত্রু বলতে রাজি নই, তাদের বিপদের সুযোগ আমরা নিতে চাইনে, তাদের অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে জবাব দিতে চাইনে, প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি পরিহার করে চলি শত্রুর বেলায়ও, কেননা, অহিংসার মূল কথা নাকি আত্মপীড়নে অপরের চিত্তজয়। শাসক ইংরেজের বেলায়, দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িকের বেলায়, দেশস্বার্থবৈরীর বেলায় আমাদের এই বীর্যের নীতিই পালন করতে বলা হয়েছে; কিন্তু এই বিপ্লবীদের পথ আমাদের পথ নয় বলে আমাদের চিত্ত বিমুখ কেন হয়? অথবা কেন করতে বলা হয়? বিপ্লবীদের পথ হিংসার পথ—কিন্তু তাঁরা কি দেশের শত্রু? দেশের যারা শত্রু, যারা বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, পথান্তরে চলছেন বলেই বিপ্লবীদের ওদের সগোত্র করাতে হবে? কিন্তু শত্রুর প্রতি যে আচরণ তা থেকেও এঁরা বঞ্চিত। এঁরা দেশদ্রোহী, দেশশত্রু তো নয়ই, এঁরা একনিষ্ঠ দেশসেবক এবং মৃত্যুভয়হীন দেশপ্রেমিক। সেটুকু স্বীকারেও যেখানে কার্পণ্য সেখানে আর যাই থাক মাহাত্ম্য নেই। অসহ্য বেদনা পেয়েছিলাম সেদিন এবং নিজের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, ওঁরা যদি দেশশত্রুই হবেন তবে দেশের প্রকৃত শত্রুরা, বিদেশী শাসকেরা ওঁদের ফাঁসিমঞ্চে কণ্ঠরোধ করে কেন? সে হিংসার নিন্দাও তো আমরা করিনে। আমাদের প্রতিশোধপ্রবৃত্তি নেই বলে শুনি, কিন্তু আমাদের ভাবটা দাঁড়ায়, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল, তোমার কৃতকর্মের জন্য আমার চোখে জল নেই, আমার কাছে তোমার স্বীকৃতি নেই। এ কি নিদারুণ নিষ্করুণ অহিংসা!

অথচ, তোমায় বলব কি সত্য, ঐ এ. আই. সি. সি.-তেই ভগৎ-বটুকের দুশ্চর তপস্যার সহচর যতীন্দ্রনাথ দাসের অসামান্য সাহস, দৃঢ়তা ও ত্যাগের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই দেখ—

"The A. I. C. C. places on record its deep admiration for the great courage and steadfastness underlying the sacrifices of the late Jatindra Nath Das and Rev. Wizaya in having given up lives for ideals cherished by them."

এখানে অহিংসনীতি প্রতিবন্ধক হয়নি। সম্ভবত এই কারণে যে, যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মদান, অভাবনীয় নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনে নিস্তরঙ্গ দাক্ষিণাত্য অবধি সর্বত্র এমনই এক আবেগের সৃষ্টি করেছিল যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা ছিল দুঃসাধ্য। এই অনিচ্ছুক স্বীকৃতির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই। লক্ষ্ণৌর ঐ এ. আই. সি. সি.-তে এবং ২৮-এ সেপ্টেম্বরেই একটি প্রস্তাব হল, জেলে অনশন নিবৃত্তির জন্য। কেননা, যতীনদাস বা ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আমরণ অনশন নিছক একটা রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, অপরিমেয় বিশ্বাসে, সুগভীর ক্ষোভে, প্রতিকারের দুর্জয় সঙ্কল্পে মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে গেছল। অননুকরণীয়, কিন্তু তরুণমাত্রেরই কঠিন প্রতিজ্ঞার দিকে ঝোঁক; ফলে, যাঁরা কেবল একটা জানান্ দিতে অথবা একটা কৌশল হিসেবে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তাঁরাই উদ্বিগ্ন হলেন বেশি করে। আজ এই ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের চেকোশ্লোভাকিয়ায় তরুণদের আত্মদানের অভিযানে যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন চেক্ নেতৃবৃন্দ। কেননা, ওটা সংক্রামক, এবং তারুণ্য বেহিসেবী।

প্রস্তাব হল, বিভিন্ন প্রদেশে অনশনরত বন্দীদের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করেও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অভিমত এই যে, জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে অনশন অবলম্বন করা উচিত নয়। কমিটির পরামর্শ এই, যাঁরা এই আত্মত্যাগের পথ নিয়েছেন, তাঁরা যেন, বিশেষ করে যতীন্দ্রনাথ দাস ও রেভাঃ উইজায়ার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে সে-পথ পরিহার করেন। আরও এই কারণে যে, সরকার একেবারে শেষ মুহূর্তে অনশনব্রতীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছেন এবং পূর্ণ প্রতিকারের চেষ্টাও অবিরাম চলছে। ইংরেজী প্রস্তাবটা পড়ছি—

"Whilst deeply appreciating the motive of the hunger striking prisoners in the various provinces the A. I. C. C. is of opinion that hunger-strikes should not be undertaken, except upon the gravest emergencies. The Committee advises those who have imposed the sacrifice on themselves to end their strike, specially, in view of the self-immolation of the late Jatindranath Das and Rev Wizaya and the fact that the Government have at the eleventh hour yielded to most of the demands of the hunger-strikers and effort is being continuosly made to secure full redress."

লাহোর কংগ্রেসের চত্বরে

সত্য, মাথা নীচু কর, সামনের তোরণটা পার হতে হবে ; এবার আমরা ১৯২৯/৩০-এর লাহোর কংগ্রেসের চত্বরে প্রবেশ করব, লাহোর নয়, লাজপৎ নগর, কলকাতা থেকে লাহোর, কলকাতার যতীন্দ্রনাথ আর লাহোরের ভগৎ সিং ; কেমন একটা নিবিড় নাড়ীর যোগ ছিল, একাত্ম বাংলা-পাঞ্জাব।

১৯২৯-এর ২৭-এ ডিসেম্বর যবনিকা উঠল, জেনারেল সেক্রেটারী তাঁর সুদীর্ঘ বার্ষিক বিবরণী পড়লেন। বহু কথার মধ্যে বললেন :

"বিশে মার্চ বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও ইউ-পি-তে ব্যাপক ধরপাকড় হল রাজদ্রোহের অভিযোগে, শত শত গৃহ তল্লাশি হল। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আটজন এ. আই. সি. সি.-র সদস্য। তাদের আনা হল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ; শুধু ভারতের নয়, বিদেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রধানত প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে তৈরি হল সেণ্ট্রাল ডিফেন্স কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটি বলতে গেলে প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ কাজ করলেন যখন ঐ ডিফেন্স কমিটির তহবিলে দিলেন দেড় হাজার টাকা।

"আরও যে একটি মামলা ভারতের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ; বহু তরুণের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগে মামলা চলতে লাগল। বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও অসদ্ব্যব-

হারের জন্য বিচারাধীন এই বন্দীরা প্রতিবাদে অনশন শুরু করলেন। পাঞ্জাবের অন্যান্য জেল এবং ইউ-পি-র অন্যান্য জেলেও রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন অবলম্বন করলেন। অনেকদিন, অসাধারণ রকমে দীর্ঘকাল চলল এই অনশন, চলল জবরদস্তি খাওয়াবার চেষ্টাও। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত লাহোরে ১৩ সপ্তাহ ধরে এই অনশন চালালেন; তাঁদেরই একজন সহচর বন্দী, যতীন্দ্রনাথ দাস, ৬৪ দিন অনশনে ১৩-ই সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল না, তথাপি এক আঘাতের মত লাগল সারা দেশের গায়ে। বহু বছরের ভেতর আর কোন ঘটনা সাধারণের হৃদয়কে এতখানি স্পর্শ করেনি। সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে ওঠে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯-এ সেপ্টেম্বর আর একজন রাজনৈতিক বন্দী রেভাঃ উইজায়া, বার্মার জেলে বিস্ময়কর ১৬৪ দিন অনশনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এ ছাড়াও নানা জায়গা থেকে 'দলবদ্ধ' মামলা হতে থাকে। কলকাতায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখের বিরুদ্ধে তেমন একটি মামলা চলছে।

"এই মামলা ও কারাদণ্ড ছাড়াও, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, ভারতবর্ষের নানা জেলে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘ মেয়াদী বহু রাজনৈতিক বন্দী আছেন; এঁর মধ্যে আছেন তাঁরাও যাঁদের ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেশান ৩-এর এবং সামরিক আইনে বন্দী; দশ-বছর আগে ১৯১৯-এ সামরিক আইনে পাঞ্জাবে চলেছিল সামরিক শাসন, আছেন তারই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের দণ্ডিত ব্যক্তিরা। আর আছেন ১৯১৪-১৫ তে, অর্থাৎ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত ২৭ জন রাজনৈতিক বন্দী; তাঁদের বিচার ও দণ্ড হয়েছে স্পেশাল কমিশনারদের হাতে—সাধারণ আইন-আদালতে নয়। আজ পনের বছর তাঁরা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন।

"দেশে শ্রমিক বিক্ষোভও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এক বোম্বাই বস্ত্রকলগুলোতেই দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িত; বাংলার পাটকল-গুলোতে আড়াই লক্ষ; জামশেদপুরের কাছে গোলমুড়িতে ধর্মঘটী

টিনপ্লেট শ্রমিকের সংখ্যাও হবে ৩০০০। ১৯২৮-এ এস. আই. রেলওয়েতে ধর্মঘটের জের স্বরূপ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তাঁদের পনের জনকে গত এপ্রিল মাসে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ত্রিচিনপল্লীর জজ।”

দেখ, সত্য, ১৯২৯/৩০-এর কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে অবিস্মরণীয় অপরিহার্য এই উত্তাল উত্তপ্ত পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে বার্ষিক রিপোর্টে এবং এতেই বোঝা যাবে, ১৯৩০-এর রাত বারোটা এক মিনিটে স্বাধীনতা-প্রস্তাবটি শুধু এই পরিস্থিতির ওপর একটা স্বীকৃতির স্বাক্ষর মাত্র।

১৯২৯-এর ২৯-এ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন; রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা। আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে, পনেরো হাজার লোক; তিল ধারণের স্থান নেই।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ কিচলু। বহু হৃদয়কে মন্থিত ও প্রতিধ্বনিত করে উত্থিত হল বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত। যতীন্দ্রনাথের প্রশস্তি করে আরও একটি গান; উঃ, চারদিকে কি হর্ষধ্বনি!

তোমায় বোধ হয় বলা হয়নি, সত্য, যে, এই অধিবেশনেও কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ করা হয়েছিল। গান্ধীজী পণ্ডিত জওহরলালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়েছিলেন। তবু অনেকে অনুরোধ করেছিলেন; লক্ষ্ণৌ এ. আই. সি. সি.-তেও একই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল; কিন্তু গান্ধীজীর এক কথা; এবার অনেকটাই বললেন এবং এই আশ্বাস দিলেন লাহোরে যে-কর্মপন্থাই গৃহীত হোক তিনি তার সামিল থাকবেন: I assure you that in every programme adopted by you at the Lahore Congress I shall be with you.

জওহরলালজীর মানসিকতা

সুতরাং, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই হয়েছিলেন ১৯৩০-এর সভাপতি। তাঁর অভিভাষণে মামুলি কথাগুলো আমি শুধু স্মরণ করি। বলেছিলেন:

"আমার হিন্দুর ঘরে জন্ম; কিন্তু আমি জানিনে নিজেকে হিন্দু বলে অভিহিত করা অথবা হিন্দুদের হয়ে কথা বলা আমার পক্ষে কতটা সঙ্গত।.........তবে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, আমার মুসলমান ও শিখ বন্ধুরা আমার কাছে যা-খুশি চেয়ে নিতে পারেন, আমি কোন প্রতিবাদ করব না, কোন তর্ক করব না।" ইংরেজী বয়ানটাও শোনো, পাছে ভুল অনুবাদের অভিযোগ ওঠে—

> "I was born a Hindu but I do not know how far I am justified in calling myself one or in speaking on behalf of Hindus....So far as I am concerned, I would gladly ask our Moslem and Sikh friends to take what they will without protest or argument from me."

মনে রেখো, সত্য, জওহরলালজী ১৯২৮-এ ছিলেন মাদ্রাজ প্রস্তাবের সমর্থক ও স্বাধীনতাপন্থী, ১৯২৮-এ বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের বিরোধী প্রস্তাবও তুলেছিলেন, কিন্তু তারপর রইলেন অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা করলেন গান্ধীজী, জওহরলালজীর পিতা কংগ্রেসের সভাপতি; প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সর্বদলীয় কংগ্রেসীদের সাথী হলেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের লক্ষ্যে, আপত্তি করেও দিল্লী ম্যানিফেস্টোতে স্বাক্ষর দিলেন। ১৯২৮-২৯-এ এই যে তাঁর দ্বিধাচিত্ততা, গান্ধীজীর সুপারিশে পিতৃদেবের স্থলাভিষিক্ত হয়েও কিন্তু তাঁর দুটো মন এক হয়নি এবং তাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ভাষণে, বিশেষত যেখানে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধানের কথা উঠেছে।

> 'The time has indeed already come when the All-Parties Report has to be put aside and we march forward unfettered to our goals.'

"সত্যিই সময় এসে গেছে যখন আমাদের সর্বদলের রিপোর্টটি পাশে সরিয়ে রেখে মোহমুক্তাবস্থায় আমাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে।"

কথাগুলো মোহমুক্ত ব্যক্তিরই, যাঁর ওপর ১৯৩০-এর সংগ্রাম-

নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে; যাঁরা ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত ছিলেন তাঁদের শুনে ভাল লাগল। ১৯২৯-এ যে সর্বদল-প্রার্থিত সংবিধান এল না তার উল্লেখ করে জওহরলালজী বললেন:

> "It has brought instead suffering and greater repression of our national and labour movements and how many of our comrades are to-day forcibly kept away from us by the alien power! How many of them suffer exile in foreign countries and are refused facilities to return to their motherland! The army of occupation holds our country in its iron grip and the whip of the master is ever ready to come down on the best of us who dare to raise their heads."

রাজনৈতিক পরিস্থিতি চিত্রায়ণে সাহিত্যের স্পর্শ, অনুবাদ করা শক্ত। "ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস আসেনি, এসেছে আরও দুঃখ, আরও পীড়ন, জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক বিক্ষোভে; আমাদের কত সাথীকে বিদেশী শক্তি আমাদের সান্নিধ্য থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! কতজন বিদেশে নির্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করছেন, মাতৃ-ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। দখলদার বাহিনীর লৌহ-নিগড় দেশের সর্বাঙ্গে আর প্রভুর হাতের বেত উদ্যত তাঁদের জন্য আমাদের যাঁরা শিরোমণি, সাহস করে যাঁরা মাথা তুলতে চেয়েছেন।"

একটু থেমে বললেন, বিশ্বাস করো, সত্য, মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে পাল্টা চমকও লেগেছে যখন শুনেছি বলছেন:

> "Recently there has been a seeming offer of peace."

তিনি যেন পারিপার্শ্বিক ভুলতে পারছিলেন না, অবিচলিত পিতৃদেব, প্রশান্ত গান্ধীজী। তবু সেদিন তিনি যুব-ভারতকে প্রতি-নিধিত্ব করেছিলেন তাঁর এই ভাষণের মধ্য দিয়ে, বিশেষ যখন বললেন:

"বৃটিশ কূটনীতি সম্পর্কে সাবধান হবার মতো অনেক অভিজ্ঞতাই তো আমাদের হয়েছে! বৃটিশ সরকার যা আমাদের সামনে প্রসারিত করলেন তার রূপটা অস্পষ্ট······অনেকখানি কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তাকে বলা যায় কলকাতা-প্রস্তাবের সাড়া বুঝি পেলাম।

"Only by the greatest stretch of imagination could it be interpreted as a possible response to Calcutta resolution."

"তারপর এল ব্যাখ্যা আর ভাষ্য—পার্লামেণ্টে এবং অন্যত্র। সন্দেহ যদি কোথাও ছিল তারও নিরসন হল, এবার প্রস্তাবের তাৎপর্য নিঃসংশয়।"

জওহরলালজী বললেন, "ওয়েজউড বেন যে, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথা বলেছেন তা আমাদের পক্ষে একটা ফাঁদ মাত্র, ভারতের শোষণ কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি।

"যদি কলকাতা-প্রস্তাব প্রকৃত হয়ে থাকে, তবে আমাদের লক্ষ্য একটাই—সেটি স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতার অর্থ বৃটিশ আধিপত্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে পূর্ণ মুক্তি। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে অথবা অপর জাতির শোষণ বিস্তৃত থাকতে কোন সত্যকার কমনওয়েল্‌থ হতে পারে না। কোন ধরণের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই ভারতকে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনে; প্রকৃত ক্ষমতার মাপকাঠি হচ্ছে দখলদার সেনাবাহিনীর অপসারণ ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার। সুতরাং, আজ আমরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতারই পক্ষপাতী।"

সংগ্রামের বিপজ্জনক পথ

"And when we do take this perilous path of national strife do so because there is no other way of an honourable peace."

"জাতীয় সংগ্রামের এই বিপজ্জনক পথ বেছে নেবার কারণ সম্মানজনক শান্তিপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ নেই বলে।" কিন্তু কি সেই বিপজ্জনক পথ?

তোমায় বলে রাখি, সত্য, গান্ধী-জওহরলালজী যে পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং যে পথের নিশানা ঠিক রাখার জন্য অবিশ্রান্ত বৈপ্লবিক পন্থা ও বামপন্থীর কঠোর নিন্দা করেছেন তা-ই বারে বারে ধাক্কা খেয়েছে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। তাঁরা সাফল্যের

সঙ্গে বিপ্লবী ও বামপন্থীদের নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য করেছেন শুধু হিংসার নিন্দাতেই, কিন্তু, ভারতীয় রাজনীতির প্যারাডক্স এই যে, তাঁরাই অহিংসায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ও সহিংস লোক-হন্তারক মুসলিম লীগের রক্তপাতমুখে ব্যর্থকাম হয়ে গেছেন। লীগের সদা-উদ্যত রক্তাক্ত ছুরিকা কখনো নিরস্ত তো করতে পারেনই নি, পরিণামে ঐ ছুরিকায় হাত দিয়েই দেশখণ্ডনে হাত বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু ১৯২৯-এই পন্থার ব্যাপারে জওহরলালজীর স্পষ্টতা ছিল। এই স্পষ্টতার জন্যই তিনি সুভাষচন্দ্রের চাইতে বেশি আস্থাভাজন হয়েছিলেন গান্ধীজীর। সে স্পষ্টতা হচ্ছে অহিংসপন্থা সম্পর্কে। তিনি বললেন ঃ

> "Any great movement for liberation to-day must necessarily be a mass movement and mass movement must essentially be peaceful, except in times of revolt. And if the principal movement is a peaceful one, contemporaneous attempts at sporadic violence can only distract attention and weaken it."

"যে কোন বড়রকমের মুক্তি-আন্দোলনই গণ-আন্দোলন হতে বাধ্য এবং গণ-আন্দোলন, বিদ্রোহ-কাল ছাড়া, মূলতঃ শান্তিপূর্ণ হওয়া দরকার। যদি মূল আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হয়, তবে সমসাময়িক বলপ্রয়োগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা কেবল বিভ্রান্তিই ঘটাতে এবং ওকে দুর্বল করে ফেলতে পারে।"

গান্ধীজীও এই অধিবেশনে দিল্লী বোমাবিস্ফোরণের নিন্দাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন :

> "Each bomb outrage has cost India dear."

শহীদের মুকুট কার মাথায়?

আধুনিক ইতিহাস-গবেষক বা ইতিহাসবিদেরা একথা স্বীকার করেন না; তাঁরা বলেন, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—শাসকশ্রেণী প্রতি-সন্ত্রাসে বা যাকে হিংসাত্মক আন্দোলন বলা হয় তাতে, যত বেশি করে ঘাবড়ে যায় এবং শাসন-সংস্কারে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়, ততই

তথাকথিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নিকটতর হয়; ভানটা থাকে যারা শান্তিপূর্ণ বৈধ আন্দোলনকারী তাদেরই কনসেসান দিলাম, আসলে কনসেসানটা তারা দেয় ঐ ভীতিপ্রদ সন্ত্রাসবাদীদেরই। এ অনেকটা হিংসাত্মক আন্দোলন অস্বীকারের এক ধরণের সমঝোতা; উভয়ের মিলটা ঐ তথাকথিত হিংসাত্মক অথবা ভায়োলেন্ট-আন্দোলনের নিন্দাবাদে।

তুমি কি উমা মুখার্জির "টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ" বইখানা পড়েছ ?

না।

সময় পেলে পড়ো। ওতে তিনি বহু তথ্য ঘেঁটে, আমার বুদ্ধিতে অকাট্য প্রতিপন্ন করেছেন:

> "What really caused consternation in the mind of the alien bureacracy in those days was not so much the constitutional agitation led by the Indian National Congress as the policy of violence and terror adumbrated by the leaders of physical force movement"

"বিদেশী আমলাতন্ত্রের মনে সেকালে জাতীয় কংগ্রেসের সাংবিধানিক আন্দোলন যত-না উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল তার চাইতে বেশি করেছিল বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের সন্ত্রাস সৃষ্টির নীতি।"

আগেকার কথা ছাড়াও তিনি বলেছেন—

> "……The British rulers ultimately parted with power from India not so much because of the persuasive logic of the Congress agitations as because of the pressure of the surging revolutionary forces stemming out of the World Wor II."

"বৃটিশ শাসকেরা শেষপর্যন্ত যে ভারতের শাসনপাট গুটোলেন তা যত না কংগ্রেসের সমঝোতার আন্দোলনের ফলে তার চাইতে বেশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উদ্ভূত উত্তাল বৈপ্লবিক শক্তির চাপে।"

ভূমিকার তৃতীয়াংশে এই উপসংহার থাকলেও লেখিকার যেটি প্রতিপাদ্য বিষয় এবং যা, আমি মনে করি, তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন, তা হচ্ছে;

"১৯৩৭-এ ভারতের স্বাধীনতালাভের পর দেশের সামনে গুটি-কয়েক ভাবমূর্তি উৎসৃষ্ট হয়েছে এবং একদল রাজনীতিকের অবিরাম প্রচারের ফলে তাদের ব্যাপক প্রচারও হয়েছে। এদের অন্যতম ভাবমূর্তি হচ্ছে যে, ১৯৪৭-এ যে ভারতের রাজনৈতিক চূড়ান্ত সিদ্ধি-লাভ ঘটল তা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই কর্মকীর্তি এবং বৃটিশ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তারই কঠোর নৈতিক ও সাংবিধানিক সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি। এরই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন রয়েছে আরও এই অসত্য যে, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন কিছু ফেনিল উচ্ছ্বাস ও অন্ধক্রোধ, কিছু মূল্যবান সম্পদ বিনাশ ও অমূল্য-প্রাণ-হননের অতিরিক্ত কিছুই নয়। যে ভাবেই হোক, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিপ্লবীদের ভূমিকা আজও অত্যন্ত নগণ্য মনে করা হয়, সরকারী প্রবক্তারা তো এই দাবীই করে থাকেন যে, স্বাধীনতার জন্য শহীদের শিরোপা কংগ্রেসেরই ন্যায্যতঃ প্রাপ্য······

"অতীত বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগীয় কাগজপত্র ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় নথি-দলিল ইত্যাদি, বিশেষ করে আমাদের সংগ্রামের সন্ধিক্ষণ সম্পর্কিত বিবরণ-আদি দেখার সুযোগ যাঁর আছে, তাঁর পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে ঐ প্রচলিত ধারণা মেনে নেওয়া কঠিন।"

লেখিকা নানা তথ্যবলে দেখিয়েছেন, ভারতে ধাক্কায় ধাক্কায় যে শাসন-সংস্কার প্রতিশ্রুত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে ঐ গুপ্ত ভায়োলেণ্ট আন্দোলনের পাঞ্চ অথবা ব্যাপক গণ-আন্দোলন যখন অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করে বৈপ্লবিক হয়ে উঠতে চেয়েছে। ১৯৩০-এর আন্দোলনেই আমরা তার প্রমাণ পাব।

তবু যে কংগ্রেসের মাথায়ই শহীদের মুকুট এবং কণ্ঠে সাফল্যের বরমাল্য পড়েছে তার কারণ, কংগ্রেস ছাড়া অতবড় ব্যাপক গণ-আন্দোলন আর কেউই করতে পারেনি ; পরে কংগ্রেসের নীতিরীতির রেখায় রেখায় না চললেও, বড় আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্বোধন করতে হয়েছে কংগ্রেসকেই ; বিপ্লবীরা বা বামপন্থীরা কোন সময়ই

ব্যাপক আন্দোলন করতে সমর্থ হননি। সুভাষচন্দ্রও পারেননি। তাঁরা কংগ্রেসের গণ বা ব্যাপক আন্দোলনের সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই।

দিল্লী বোমা-বিস্ফোরণ প্রস্তাব

১৯৩০-এ চারদিকে এমন বৈপ্লবিক অবস্থা সত্ত্বেও কংগ্রেসকেই তা সম্বরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হল। দিল্লী বোমা-বিস্ফোরণের ওপর গান্ধীজীর প্রস্তাবটি ছিল ঃ

> "This Congress deplores the bomb outrage perpetrated on the Viceroy's train and reiterates its own conviction that such action is not only contrary to the creed of the Congress but results in harm being done to the national cause. It congratulates the Viceroy and Lady Irwin and their party including the poor servants on their fortunate and narrow escape."

"এই কংগ্রেস বড়লাটের ট্রেন লক্ষ্য করে বোমা-বিস্ফোরণ পরিতাপজনক মনে করছে এবং আরও একবার এই প্রত্যয়ের পুনরাবৃত্তি করছে যে, এ-জাতীয় কাজ কেবল যে কংগ্রেসের আদর্শ-বিরোধী তাই নয়, একাজ জাতীয় স্বার্থেরও হানি ঘটিয়ে থাকে। বড়লাট ও শ্রীমতী আরুইন এবং তাঁদের ভৃত্য অনুচর-আদি ভাগ্য-ক্রমে অল্পের জন্য অব্যাহতি পাওয়ায় তাঁদের সকলের উদ্দেশে কংগ্রেস অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।"

গান্ধীজীর নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু বিরোধ ছিল। ডাঃ আন্সারী সমর্থক করলেন বটে কিন্তু বিরোধিতা করলেন স্বামী গোবিন্দানন্দ। আর ডাঃ আলম প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বললেন, তাঁরা যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধাবশতঃ অনুকূল ভোট না দেন। প্রস্তাবটি গুরুত্বহীন, অসঙ্গত এবং হানিকর। এটি অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য। এসব প্রস্তাব দ্বারা প্রশাসকদেরই হাত শক্ত করা হয় এবং নিরীহ লোকের হয়রানি হয়। এই প্রশাসকেরা কি লালাজীর মৃত্যুতে এতটুকু অনুতাপ বা শোক

প্রকাশ করেছে ? অথচ মেডিক্যাল ঘোষণায়ই দেখা যাচ্ছে, পুলিশের লাঠির ঘায়েই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কাউন্সিলে তিনি চেষ্টা করেও গবর্নমেণ্টকে একটা তদন্তে পর্যন্ত রাজি করাতে পারেননি।

কিন্তু ডাঃ আলম প্রকাশ্য কংগ্রেসেও হেরে গেলেন। হেরে গেলেন বটে কিন্তু ওঁর অনুকূলে ভোটের সংখ্যাও চোখ কপালে তোলবার মতো গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগবশতঃ ভোট না দিতে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন তা বহুলাংশে সার্থক হয়েছিল, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের ও প্রাধান্যের পক্ষে ৮৯৭—৮১৬-ভোটে জয়লাভ এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়।

আমরা পরবর্তী ইতিহাসের দিকে যত এগোবো ততই দেখতে পাব, গান্ধীজীর জয় শুধু এখানে নয়, ১৯৪৭-এর চরম দুঃখের দিনেও গান্ধীজীর নীতি একইভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে; ১৯২৯-এ আলম যে বিপুল ভোটের অধিকারী হয়েছিলেন ভবিষ্যতে তা শূন্যে বিলীন হয়েছে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আজ তোমায় ফেলে-আসা কথাটা বলব।

তুমি জিগ্‌গেস করেছিলে, গান্ধীজীর স্বাধীনতা প্রস্তাবের সংশোধনী নামে কি পাল্টা প্রস্তাব তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র ? বলি। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রকে কতটুকু স্থান দেওয়া হবে তা নিয়ে বিতর্ক তোলা বৃথা, কিন্তু সেদিন সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর সংশোধনী উত্থাপনের জন্য উঠলেন তখন চারদিক থেকে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হয়। তাঁর সংশোধনীকে গান্ধীজী যে একটা আলাদা গোটা প্রস্তাব বলেছেন তা মূলতঃ মিথ্যে নয়। শুনলে তোমারও তাই মনে হবে। শোনো:

সুভাষচন্দ্রের পাল্টা সরকার

"কলকাতায় কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তদনুসারে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, কংগ্রেসের

লক্ষ্যাদর্শ (creed) হিসেবে যে স্বরাজ কথাটি আছে তার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তারও তাৎপর্য হল সম্পূর্ণ বৃটিশ-সম্পর্ক-ছেদ।

"ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতীয় সহচর-শক্তিকে উৎখাতের জন্য এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এই শপথ নিচ্ছে যে, ভারতে একটি পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিরাম স্বাধীনতা আন্দোলন চালানো হবে। অন্যদিকে যেখানে যখনই সম্ভব কর-বন্ধ ও সাধারণ ধর্মঘটসহ আইন অমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে হবে।

"এই দ্বিবিধ কর্মসূচীকে রূপায়ণের জন্য কংগ্রেস জনসাধারণের উদ্দেশে এই আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা যেন অচিরে যুব-শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য নিপীড়িত ভারতীয়দের সংগঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। এই কর্মসূচীর প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করার জন্য এবং নতুন লক্ষ্যাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলো, সরকার নিযুক্ত কমিটিগুলো, স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলো সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য এবং যারা এখন সদস্য আছেন তাঁদের পদত্যাগের জন্য, কমিটি কাউন্সিল আদালতের সংশ্রব ত্যাগের জন্য ও ভবিষ্যতে নির্বাচনে যোগদানে বিরত থাকবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

"যখন যেমন অবস্থা তখন তেমন ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার এ. আই. সি. সি-কে দেওয়া হচ্ছে।"

সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করে সুভাষচন্দ্র বললেন, "পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য আমি মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আমার দাঁড়াবার উদ্দেশ্য কেবল তাই নয়। আমি মনে করি, আমাদের সামনে যে কর্মসূচী রাখা হয়েছে তা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। এই জন্য আমি আমার সংশোধনীটি উত্থাপন করেছি। আমার সংশোধনীটি পূর্ণাঙ্গ, সামগ্রিক ও কার্যোপযোগী (Complete, whole and workable) এক কর্মসূচী। এর দুটো অংশ; একটি

ধ্বংসাত্মক, আর একটি গঠনাত্মক। জনসাধারণের শুভেচ্ছার ভিত্তিতে একটি পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া কি করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোব আমি বুঝতে পারছিনে। আয়র্ল্যাণ্ডের সিন-ফিনারদের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তার মানে আমি বলছি নে যে, ভারতীয় জনসাধারণ আইরিশ আন্দোলনকেই সমর্থন করুক ; আমার প্রতিপাদ্য হচ্ছে, লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে পাল্টা সরকার গঠনই একমাত্র পথ।"

সুভাষচন্দ্র বললেন, "আমার বিশ্বাস, কংগ্রেসকে যদি আমরা জীবন্ত ও সংগ্রামশীল (virile and fighting), করতে চাই তবে যাঁরা এখনও কংগ্রেসের বাইরে আছেন তাঁদের কংগ্রেসের ভেতরে আনতে হবে। আমি কিষাণ, মজুর ও যুবকদের কথা বলছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযোগ রয়েছে এবং এই কারণেই তাঁরা কংগ্রেসের বাইরে থেকে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের কর্তব্য হবে, এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযোগগুলো দূর করা। শুদ্ধ মাত্র রাজনৈতিক অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টাতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এঁদের আমাদের মধ্যে আনতেই হবে, এঁদের সামর্থ্য ও সঙ্গতিকে সুশৃঙ্খল করতে হবে। কংগ্রেস যদি নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মভাব না হতে পারে, তবে সে কি করে তার রাজনৈতিক কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যাবে আমি তো বুঝতে পারিনে। বর্জননীতি বা বয়কট যদি সার্থক, বুদ্ধিগম্য ও ফলপ্রসূ করতে হয়, তবে লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সর্বাত্মক বর্জনের পন্থাই নিতে হবে। আংশিক বর্জন নীতির আমি কোন অর্থ খুঁজে পাইনে। স্বাধীনতার মতবিশ্বাসের সঙ্গে আদালত যাতায়াতের কোন সামঞ্জস্য দেখতে পাইনে। তেমনি, কলকাতা করপোরেশনে গিয়ে আনুগত্যের শপথ নেওয়াও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের সমগ্র শক্তিকে আমাদের কাজেই নিয়োগ করতে হবে এবং তাই করেই স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে। হয় সব, নয়তো কিছুই নয়—এই-ই আমার নীতি। সুতরাং, যদি বয়কট করতেই হয় তো তা পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। আদালত আর

লোকাল বডিতে গেলাম কিন্তু কাউন্সিল বর্জন করলাম—এর মধ্যে কোন কল্যাণ দেখতে পাইনে। একথা স্বীকার করি, রাজনীতিতে কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটাতে হয়—যেমন সিন-ফিনাররা করেছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়ে পার্লামেণ্টে গেছলেন। কম্যুনিস্টরাও তাই করেছিলেন। কিন্তু এখানে কার্যকারিতার দিক থেকে স্বাধীনতার মত-বিশ্বাস গ্রহণ করার পর লোকাল বডিতে যাওয়া সামঞ্জস্যহীন বলে আমি মনে করি।"

আমি তোমায় বলেছি, সত্য যে, সুভাষচন্দ্র দিল্লী ইস্তাহারে সই করেননি, তার কথা উল্লেখ করেতিনি বললেন, "আমার বক্তব্যের উপসংহার করার আগে আমি মহাত্মা গান্ধী যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার সম্পর্কে দু'টি-একটি কথা বলতে চাই। আমি একথা বলে নিতে চাই যে, দিল্লী ইস্তাহারে যাঁরা সই করেছিলেন আমি তাঁদের দলে নই। সুতরাং, আমি চাইনে যে, আজকে এই ৩১-এ ডিসেম্বর তারিখে দাঁড়িয়ে কেউ এটি সমর্থন করেন। আপনারা কি দিল্লী ইস্তাহার সমর্থন করতে রাজি? আপনারা কি ভারতের বড়লাটের কাজের প্রশস্তি করতে চান? গোলটেবিল বৈঠক একটি মেকি জিনিস। আপনারা কি সচেতন চিত্তে ওর ভূমিকা অনুমোদন করতে পারেন? বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে মহাত্মা গান্ধী দয়া করে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, অন্তত তাঁর ঐ সম্মেলনে যাবার ইচ্ছে নেই। সুতরাং, এই সভাই স্থির করুন, প্রস্তাবে (বড়লাট-প্রশস্তি-সূচক) এই অংশটুকু থাকার প্রয়োজন আছে কি না।"

গোল, না, চার-কোণা বৈঠক ?

"এবার আমি 'গোলটেবিল বৈঠক' কথাটির উল্লেখ করব। আমি জানিনে আমাদের স্বদেশবাসীরা কেন একে গোল টেবিল আখ্যা দিতে উৎসুক। এটা তো গোল টেবিল নয়ই। এ হচ্ছে স্রেফ চার কোণা টেবিল। গোল টেবিল (বৈঠক) হয় দুই যুদ্ধলিপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে এবং সেখানে রাষ্ট্রদূতেরা উপস্থিত থাকেন। এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয় তা উভয়পক্ষে অবশ্য পালনীয়। বলুন তো, আপনারা কি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে, ভারতীয় জন-সাধারণকে তাদের প্রতিভূ পাঠাতে দেওয়া হবে এবং তাঁরা সম-অধিকারে বৃটিশ-প্রতিভূদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবেন ?

"Are you sure that the conclusions arrived at the Conference will be ratified by Parliament ?

"আপনারা সবাই জানেন যে, যখন দু'টি দেশের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তখন তাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৃটেনের মধ্যে এমনি এক সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল। ব্যাকরণগত অশুদ্ধি সত্ত্বেও, বিনা সংশোধনেই তা যথারীতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন-লাভ করেছিল। পার্লামেণ্টে বৃটিশ রাজনীতিকেরা সে ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করতে পারেননি। এর নাম গোল টেবিল বৈঠক। আর এখানে কি ? শুনছি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ইউরোপীয় বণিকসভাও প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন। রাজন্যবর্গ ও ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গেও কি লড়াই চলছে নাকি ? তবে এঁরাও কেন গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন ?"

চারদিকে বার বার হর্ষধ্বনির মধ্যে সুভাষচন্দ্র একথাও বললেন, "এদেশের লোকেরা তো এটিকে গোল টেবিল বৈঠক বলেন, ওদেশের লোকেরা ? বৃটিশ রাজনীতিকেরা কিন্তু তাঁদের বক্তৃতায় সঙ্গত কারণেই 'গোল টেবিল বৈঠক,' কথাটি পরিহার করে থাকেন।"

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ; দলের শৃঙ্খলে বাঁধা দেহ,

দলীয় আবরণে রুদ্ধ কান, দৃষ্টি একচক্ষু হরিণের মতো মানস-নেতার দিকে নিবদ্ধ, মনের ওপর সঞ্চারিত সংস্কারের পর্দা, সাগ্রহে শুনতে চাইনি, তবু শুনেছি, কোন কোন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ সে বক্তৃতা পরে পড়েওছি।

উপসংহারে প্রশ্ন তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র: "কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের যে গঠনাত্মক কর্মসূচী চলছে তাই কি স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট? আমি মনে করি, তা মোটেও নয়। আইন অমান্যের কথা অবশ্য আছে; কিন্তু এও আমি বলতে চাই যে, এই কর্মসূচী নিয়ে আইন অমান্য সংগঠিত করা যাবে না। আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি, যুবক কৃষক শ্রমিক ও অন্যান্য নিপীড়িত গণমানবকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ না করা যায় তবে আইন অমান্য মরীচিকাই থেকে যাবে। সুতরাং, যদি আপনাদের কর্মসূচীকে ফলপ্রসূ করতে চান তবে আমি অনুরোধ করব, সেই ভাবেই কর্মসূচী রচনা করুন যা কালোপযোগী, যা ছাত্র যুবক কৃষক শ্রমিককে আকৃষ্ট করে। গত বছর কলকাতায় আমরা চেয়েছিলাম আমাদের এ যাবৎ অনুসৃত লক্ষ্যাদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাধীনতাকে লক্ষ্যাদর্শরূপে গ্রহণ করতে। কিন্তু তা স্থগিত রাখা হয়। একটা বছর অপেক্ষা করা গেল। আমার প্রশ্ন—পূর্ব লক্ষ্যাদর্শকে অপরিবর্তিত রেখে আপনারা কি কিছু লাভ করেছেন? একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। আমার এ সংশোধনী যদি গ্রাহ্য না হয়, ভগবানের আশীর্বাদে অদূর ভবিষ্যতে, হয়তো বা আগামী বছরেই, এটি গ্রাহ্য হবে।

"মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে দেশের যুবসমাজের সায় থাকবে না। আমি তাই মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতার কাছে করজোড়ে নিবেদন করি, দেশের অবস্থাটা বুঝুন, লোকের ভাবগতি উপলব্ধি করুন; যুবজনচিত্তে এই ভাবগতি উদ্বেলিত।"

আমি বললাম, আমায় ক্ষমা করতে হবে, পট্টভি সীতারামায়ার 'হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এ কিন্তু এর উল্লেখমাত্র নেই।

হঠাৎ তাঁর মুখমণ্ডল কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি কিঞ্চিৎ

সন্ত্রস্ত হলাম। তারপরই মুখমণ্ডলে এক ঝলক রক্ত। যেন কি একটা বেদনা সামলে বললেন, খুব বড় বড় দু'খণ্ড বই, এ যদি শুধু সীতারামায়ার ব্যক্তিগত অভিমত হত, কোনো অভিযোগ থাকত না ; আসলে ওটা ওঁর ডায়েরী, ইতিহাস হতে যাবে কার জোরে? ১৯৩০-এর এত বড় ব্যাপারটাই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, ১৯২৮-এ জওহরলাল যে বিষয় নির্বাচন কমিটিতে অনুপস্থিত থেকে স্বাধীনতা প্রস্তাব কার্যত বাতিল ও গান্ধীজীকে তাঁর আপোস প্রস্তাব উত্থাপনে নিরঙ্কুশ সুযোগ দিয়েছিলেন তারও উল্লেখ নেই। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের ওপর সব দোষ চাপিয়ে বলা হয়েছে, ওটি ওঁদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, আর, প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নাকি সমর্থন করেছিলেন জওহরলাল। "This compromise was, however, not respected in the open congress where an amendment was moved by Subhas Chandra Bose and seconded by Jawarhalal—and both of them parties to compromise." ১ম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় এটি পাবে।

এক্ষেত্রেও পট্টভি সীতারামায়া সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে পাইকারীহারে সব সংশোধনী সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন :

> "The alternative resolutions put forward against Gandhi were either academic or destructive. Men who wanted to stick to 'Independence and no damned nonsense," were keen on not resigning from Councils'. Their attempt was to behead the main resolution or amputate its limbs and thus truncate it altogether."

কিন্তু এই ঢালাও মন্তব্যের সমর্থনে একটা দৃষ্টান্তও উপস্থিত করলেন না কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসবিদ্।

তোমায় বলি, সত্য, আমি অবশ্য সুভাষচন্দ্রের সংশোধনীর অনুকূলে ভোট দিতে পারতাম না এবং, ভাগ্য ভালো, বিরোধিতার প্রাবল্যে ভোট গণনার দাবিও হয়নি, এমনিতেই অগ্রাহ্য হয়ে গেল ;

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যখন বললেন, মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে দেশের যুবসমাজের সায় থাকবে না, তখন চারদিকে অনেকক্ষণ ধরে যে হর্ষ ও করতালিধ্বনি হল তা যেন এখনও আমার কানে বাজে। ১৯২৯-এ ছাত্র বা যুবসমাজের অন্ততঃ তেরটি সম্মেলন হয়েছিল; তার চারটিতেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন সভাপতি, দু'টিতে ডাঃ আলম; কোনটিতেই জওহরলাল নন, সরোজিনী নাইডু ছাড়া অন্য কোন প্রবীণ নেতাও নন। মনে হত ১৯২৯-এর যুব আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য আদর্শ পুত্তলি। কিন্তু কংগ্রেস-মঞ্চে সে প্রভাব বিস্তারিত হতে পারেনি। প্রবীণেরা বা কংগ্রেসের মুখ্য নেতৃবৃন্দ অনেকটা যেন যুব-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। হয়তো ওদের পছন্দও করতেন না। সি. পি. ইয়ুথ কনফারেন্সে, ২৯-এ নবেম্বর, সুভাষচন্দ্র সভাপতিরূপে বলেছিলেন:

"এদেশে এমন অনেক লোক আছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে জনজীবনে বিশেষ খ্যাতিমানও বটেন, যাঁরা আজকের যুব-আন্দোলনকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন অথবা স্বীকার করেন যে, এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেন না। এমন মানুষও অনেক আছেন যাঁরা যুবসম্মেলনকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পেছন সারিতে ফেলতে চান। তাঁরা যুব-আন্দোলনের মর্মার্থ কিছুই বোঝেন না। যুব-আন্দোলন হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষের দর্পণস্বরূপ; বহুকালব্যাপী বন্ধন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে যৌবনের বিদ্রোহ। যুব-আন্দোলন আমাদের জীবনের সমান্তরাল ভাবানুসঙ্গ।"

এ অভিযোগ কতখানি সত্য, অথবা যৌবনোচিত অধীরতা এর জন্য কতখানি দায়ী হিসেব করা মুস্কিল, কিন্তু ভারতবর্ষে যুব-আন্দোলন ট্রপিকাল দেশের যৌবনের মতই ক্ষীণায়ু প্রতিপন্ন হয়েছে, এ কখনো স্বাতন্ত্র্যে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি বা দীর্ঘায়ু পায়নি; ছাত্র-আন্দোলনও কোন-না-কোন দলের ব্যাক-বেঞ্চ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেনি। বিক্ষোভকে তুমি আন্দোলন বলে ভুল কোরো না

যেন, সত্য। ১৯২৯-এ যুব ও ছাত্র-আন্দোলনে সত্যিকারের একটা উদ্দেশ্যনিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে রুগ্নদেহে জ্বরের মতো একটা লক্ষণরূপে প্রকটিত হয়েছে, হ্যাঁ, emblem of dissatisfaction of the present order of things. কিন্তু প্রবীণ নেতৃত্বের হালকে স্খলিত-হস্ত করতে পারেনি, নেতৃত্ব করায়ত্তও করতে পারেনি। ভারতীয় রাজনীতির নেতৃবৃন্দ ও পরবর্তীকালে প্রশাসক গোষ্ঠী চির-প্রবীণ। এখানে তাই যৌবনের রক্তদান ও রক্তমোক্ষণ নয়, অহিংসাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের সমস্যা-পীড়িত শ্রমশক্তির সমাবেশ নয়, বিকেন্দ্রীকৃত কুটিরশিল্পের প্রাচীন প্রশান্তিই কর্মসূচী হয়েছে। সুভাষচন্দ্র যুব-আন্দোলনের পক্ষে থেকেও তার ভাষা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারেননি। একটা অত্যন্ত মৌলিক পার্থক্য উভয়পক্ষের মধ্যে তাই ব্যবধান বাড়িয়ে গেছে বৈ কখনো তা সঙ্কুচিত করেনি। সে মৌলিক পার্থক্য অহিংসা। সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটি উহ্য অথবা অনুচ্চারিত, কিন্তু গান্ধীজী সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং তাঁর উচ্চারণে কোন জড়তা নেই। গান্ধীজী আত্মনির্ভর, তাই ঋজুতা; সুভাষচন্দ্র সেখানে অন্যনির্ভর, তাই দ্বিধা। গান্ধীজীর কাছে অহিংসা কৌশল নয়, বিশ্বাস, সুভাষ-চন্দ্রের ক্ষেত্রে তা নয়, কিন্তু যা ছিল তা প্রস্ফুট হয়নি; অনিবার্য পরিণতিতে তিনি সেই বিপজ্জনক পথেই ক্ষতবিক্ষত পদেই বিচরণ করলেন কিন্তু স্বতন্ত্র আহ্বানে স্পষ্ট হতে পারলেন না, বলতে পারলেন না, by any means violent or non-violent. বরং দেখা যায়, ১৯৩১-এ বাংলাদেশে যখন বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে তখন সুভাষচন্দ্র আতঙ্কিত নেতৃবৃন্দের সুরে সুর মিলিয়ে এর নিন্দা করছেন। ঐ বৎসর ৩রা নভেম্বর কলকাতার এক সভায় সভাপতিরূপে তিনি প্রদেশের 'revolutionary element'-এর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন "to rally round Congress banner and to follw its creed and programme." গান্ধীজী যেমন ইংরেজ শাসনের মৌলিক আইন-কানুন, পিনাল-

কোড ও ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের প্রতি আনুগত্য জানিয়েই অহিংসা, অসহযোগিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সুভাষচন্দ্রও তেমনি গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই তাঁর লক্ষ্যাদর্শে পৌছোতে চেয়েছেন। বিমিশ্র এই মানসিকতা যেমন সুভাষচন্দ্রকে জওহরলালজীর মতো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণে বাধা দিয়েছে, স্বনির্ভর স্বতন্ত্র স্পষ্ট নেতৃত্বের দায়িত্বও তেমনি নিতে দেয়নি ; সুভাষচন্দ্রকে একটা চোখ সর্বদাই রাখতে হয়েছে অনতি-ক্রম্য গান্ধী-নেতৃত্বের ওপর নিবদ্ধ।

লাহোর কংগ্রেসেও স্বাধীনতার লক্ষ্য নিয়ে গান্ধী-সুভাষে মৌলিক বিরোধ ছিল না; ১৯২৮-এ যে ব্যবধান ছিল তাও এখানে ঘুচে গেছে। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা বা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন, তাঁর মাথার ওপর তখন এক রাজদ্রোহ মামলার খড়্গ ঝুলছিল এবং ১৯৩০-এর স্বাধীনতা দিবস পালনের আগেই তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। ১৯৩০-এর গান্ধীজী-চালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার অবকাশ তাঁর হয়নি।

১৯৩০-এর মহাসাগরে

কি পটভূমিকায়, কি অপ্রতিরোধ্য শক্তির চাপে কংগ্রেসকে স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নিতে হল শুধু এইটুকু পরিস্ফুট করার জন্য তোমাকে এত কথা বলা। গান্ধীজীর যে স্বাধীনতা প্রস্তাবটি গৃহীত হল ১৯৩০-এ (১৯২৯-এর শেষ রাত বারোটার পর) সেই প্রস্তাবটি পড়ে নিয়ে, এস, আমরা ১৯৩০-এ ঝাঁপিয়ে পড়ি। তোমায় আমি আগে থাকতেই বলে রাখি, সত্য, যে, ভারতবর্ষে এতবড় গণ-আন্দোলন আর কখনো হয়নি—১৯৪২-এও নয়। বিরাট এই দেশে উপমহাদেশে, বোম্বে, ঢাকা, সুক্কুর এমনি দু'টি একটি জায়গায় সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামি উপেক্ষা করলে বলতে হয়, এ আন্দোলন সকল দল, মত ও স্বার্থের সমন্বিত অভিব্যক্তি, এমনকি, তথাকথিত হিংসা এবং অহিংসারও এক সমান্তরাল অভিসার। স্বাধীনতা প্রস্তাব

গ্রহণের আগে যা ছিল রুদ্ধধারা, প্রস্তাব গ্রহণ ও কংগ্রেস-নেতৃত্বে তাই হল দুকূলপ্লাবী, আরবসাগরতীরে লবণ-সত্যাগ্রহ-লক্ষ্যে মার্চের ডাণ্ডি অভিযান, আর, বঙ্গোপসাগরতীরে অস্ত্রাগার দখল লক্ষ্যে এপ্রিলের বিপ্লবী অভিযান। একই লক্ষ্যে প্রধাবিত। দশ বছর পর এই লাহোরেই মুসলিম লীগ পাকিস্থান ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ১৯৩০-এ ভারতের জনমানসে তা ছিল অভাবিত। সেদিন কংগ্রেসের এই স্বাধীনতা প্রস্তাবই একমাত্র সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল :

> "This Congress endorses the action of the Working Committee in connection with the Manifesto signed by party-leaders including Congressmen on the Viceregal pronouncement of the 31st. October relating to Dominion Status and appreciates the efforts of the Viceroy towards the settlement of national movement for Swaraj.

"তবে কংগ্রেস দেশে অতঃপর যা ঘটেছে এবং তা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতা ও ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফল বিবেচনা করে এই অভিমতে উপনীত হয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস-প্রতিনিধি পাঠিয়ে কিছুই লাভ হবে না। সুতরাং, এই কংগ্রেস গত বছর কলকাতা অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তদনুসারে ঘোষণা করছে যে, কংগ্রেস সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে যে 'স্বরাজ' শব্দটি আছে তার অর্থ হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এও ঘোষণা করছে যে, নেহরু কমিটির রিপোর্টটি অকেজো হয়ে গেল। আশা করা যাচ্ছে যে, সকল কংগ্রেসসেবী অতঃপর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যই একান্ত-ভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। স্বাধীনতা অভিযান সংগঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এবং কংগ্রেসের পরিবর্তিত লক্ষ্যাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে, এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলো, সরকারী কমিটিগুলো সর্বতোভাবে বর্জন করার জন্য সকল কংগ্রেসকর্মী এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের ভবিষ্যত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ না দেবার জন্য

আবেদন জানাচ্ছে এবং বর্তমানে যে সব কংগ্রেস সদস্য আইনসভা বা কমিটিতে আছেন তাঁদের পদত্যাগের জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা Declaration of Indipendence প্রস্তাব গ্রহণ করে। এবং সেটি স্বাধীনতা ঘোষণাই, স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য এইমাত্র ঘোষণা নয়। পাছে কংগ্রেসের ১৯৩০-এর প্রস্তাবকেও লোকে Declaration of Independence মনে করে এজন্য গান্ধীজী বার বার এর সবিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাও সহসা বা বিনা বিরোধিতায় হয়নি। একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, সেখানে হিংসা-অহিংসা, ভায়োলেন্স, নন-ভায়োলেন্স জাতীয় কোন অপার্থিব নৈতিক প্রশ্ন ছিল না, মার্কিন স্বাধীনতাকামীরা সশস্ত্র পথই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন, অথচ স্বাধীনতা ঘোষণার কথায় তখনও সর্বজনীন সায় পাওয়া যাচ্ছিল না। An Outline of American History থেকে একটু পড়ি শোনো—

> "Yet, despite the military involvment and the appointment of a Commander-in-chief, the idea of complete separation from England was still repugnant to many members of Congress and to a large part of the American people. Public opinion was not yet ready for such drastic action............Moderates persuaded themselves they were not fighting the King but the ministry and, as late as January 1776, the King's health was toasted nightly in an officers' mess presided over by General Washington." (পৃ: ৪০)

দেখছ, সত্য, অবস্থাটার কেমন মিল আমাদের সঙ্গে। ১৯২৮-এর অবস্থা এবং ১৯২৯-এর ৩০ কেন ৩১-এ ডিসেম্বরেও আমাদের বন্ধন ছিন্ন করতে লাগছে, প্রশস্তি চলছে রাজপুরুষদের, কিন্তু :

> "No compromise came from England and, on August 23,

1775, King George issued a proclamation declaring the colonies to be in a state of rebellion."

আমরাও ১৯২৯-এর ৩১-এ ডিসেম্বর রাত বারোটা অবধি অপেক্ষা করেছি, তারপর ১৯৩০। অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

> "They were in full rebellion, had an army and navy of their own and governments that ignored Parliament and King. Not to take the final step was the height of incongruity."

আমাদের অবস্থার সঙ্গে অবশ্য এ অবস্থার তুলনা হয় না, আমাদের নিরস্ত্র (হিন্দুস্থান) সেবাদল ছিল, সশস্ত্র স্থল বা নৌ সেনা-বাহিনী ছিল না, ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্টকেও অস্বীকার করা হয়নি—অস্বীকার করার একটা প্রবণতা ছিল মাত্র। তবু কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে চরম শপথ নেওয়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

> "There was common agreement that the Continental Congress should take no such definite step as independence without first receiving explicit instructions from the colonies.........At the same time, the predominance of radicals in the Congress increased as they extended their correspondence, bolstered weak committees, and fired patriot minds with stirring resolutions. Then finally on May 10, 1776, a resolution to 'cut the Gordian knot' was adopted. Now only a formal declaration was needed."

আর আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কল্প

তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল ১৭৭৬-এর ৪ঠা জুলাই—দু'মাস পর। স্বভাবতই সে ঘোষণার সঙ্গে আমাদের ঘোষণার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে এবং গান্ধীজী বার বার বলতে লাগলেন, সাবধান, এ যেন কেউ স্বাধীনতারই ঘোষণা মনে না করে। স্থির হয়েছিল ১৯৩০-এর ২৬-এ জানুয়ারী 'স্বাধীনতা' দিবস পালন করা হবে। স্বাধীনতা দিবস পালন আর স্বাধীনতা ঘোষণা পাছে কেউ একাকার করে দেখে এবং সেরকম আচরণ করে—এই তাঁর উৎকণ্ঠা।

এজন্য তিনি দেশবাসীকে স্মরণ রাখতে বলেছিলেন যে, ২৬-এ স্বাধীনতা ঘোষণার দিন, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের অতিরিক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আমরা পরিতুষ্ট হব না এই কথাটি ঘোষণার দিন। স্মরণ রাখা দরকার, সেদিন আইন অমান্য শুরু হচ্ছে না, শুধু সভা-সমিতি হবে পূর্ণ স্বরাজের জন্য সঙ্কল্প নিতে ও কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলতে। স্মরণ রাখতে হবে, যেহেতু আমরা অহিংস ও সত্যপথে তা লাভ করতে চাই, এজন্য তা কেবল আত্মশুদ্ধির পথেই আমাদের করতে হবে; তদনুরূপ গঠনাত্মক কাজে নিযুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য হবে। স্মরণ রাখতে হবে, এই সব সভা-সমিতিতে কোন বক্তৃতা হবে না; সঙ্কল্পবাক্য প্রাদেশিক ভাষায় আবৃত্তি করা হবে আর হাত তুলে অনুমোদন করতে হবে।

এসব নির্দেশ ছিল গান্ধীজীর স্বাক্ষরিত।

গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব পর্যালোচনার সময় থেকেই এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে আসছিলেন। মূল প্রস্তাবে তিনি জিতেছেন, কিন্তু ব্যবধান উপেক্ষণীয় নয়; ডাঃ আলমের সংশোধনী ও বোমা বিস্ফোরণ প্রস্তাবে যেরকম কান ঘেঁষে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এ. আই. সি. সি.-র প্রতিনিধিসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবে পরাজয় বরণ করেছিলেন (১১১-১০১) তাতে আশঙ্কার কারণ ছিল।

এ সম্পর্কে পট্টভি সীতারামায়া লিখেছেন:

> "It was not without some difficulty that the resolution on the bomb outrage was passed. The resolution was stoutly opposed by a certain section of the delegates and it was by a narrow majority that it could be passed. On the cardinal resolution also, there was considerable objection to the incorporation of the idea of appreciating the efforts of the Viceroy towards settlement of the national movement for Swaraj. A really close division took place on the question of appreciating the Viceroy's efforts. Even on this issue, the difference in voting was 180, while on the question of condemning the bomb

outrage the majority was only 48 in favour of condemnation."

পট্টভি সীতারামায়া লেখেননি, কিন্তু অমৃত বাজার পত্রিকার রিপোর্ট মতো বড়লাট-প্রশস্তিসংক্রান্ত সংশোধনী বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে মাত্র এক (১১৩-১১৪) ভোটে এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে ৬৬৪-৭৬৩, অর্থাৎ ৯৯ ভোটের ব্যবধানে অগ্রাহ্য হয়েছিল। গান্ধীজী তাই সুভাষচন্দ্রের সংশোধনীটির সযত্ন জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন :

"সুভাষচন্দ্রের সংশোধনীটি বস্তুতঃ কোন সংশোধনী নয়, ওটি একটি পৃথক প্রস্তাব।

"আজ চারদিকে যে আবহওয়া বিরাজমান তা আদালত, বিদ্যালয় বয়কট করার অনুকূল নয়।"

> "I live and move for civil disobedience. I swear by civil disobedience. I cannot conceive of freedom by *criminal disobedience* through bomb, sword, violence and knife. India must be freed only through and exclusively by non-violent methods."

এই মৌলিক নৈতিক পার্থক্য। স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয় হোক, স্বাধীনতা আদৌ না আসে না আসুক, কিন্তু স্বাধীনতা ক্রিমিনাল অমান্যের পথে নয়, বোমা, তরোয়াল, বলপ্রয়োগ ও ছুরির সাহায্যে নয়, এও ক্রিমিনাল, হোক স্বাধীনতার মতো পবিত্র লক্ষ্য। ভারতবর্ষকে অহিংস-পথেই স্বাধীনতা পেতে হবে। অন্য পথে নয়। এখানে লক্ষ্যটা গৌণ, পথটাই, উপায়টাই মুখ্য ; সুতরাং, স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে এ স্বাধীনতা কামনার কোন মিল নেই। তবু এখানে যখন একটা পাল্টা সরকারের প্রস্তাব উঠে গেছে তখন তারও জবাব তাঁকে দিতে হল। তিনি বললেন, 'Let me admit to you that conception of parallel Goverment appeals to me.'

"পাল্টা-সরকারের ভাবটি আমারও চিত্তস্পর্শ করে। ভারি সুন্দর ভাবটি। আমার বয়স যদিও ষাট, আমার হৃদয় কিন্তু নবীন। দেহ দুর্বল হলেও যুবকদের মনকে আমি বেশ বুঝতে পারি। খুব

চেষ্টা করব তাদের সঙ্গে চলবার ; কিন্তু বয়সের জন্য আমাকে কিছু প্রশ্রয়ও দিতে হবে। আমি যদিও বললাম, আমি তোমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চাই, অথবা ঘোড়ায় চড়তে চাই, কিন্তু তা আমি পারিনে। তার যোগ্যও আমি নই। এই কারণেই আমি কংগ্রেসের লাগাম নিজে না নিয়ে পণ্ডিত জওহরলালের হাতে দিয়েছি ; সে তোমাদেরই একজন, সে তোমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল তোমাদের সেনাপতি, সে তোমাদের চালে চলতে পারবে। আর কি চাও ? আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার কদমে চলতে প্রস্তুত আছি কিন্তু ঘোড়ায় চড়তে পারব না বাপু। বাষ্পের মতো তোমাদের তেজবীর্যকে সংহত করতেই আমি উপস্থিত হয়েছি ; বাষ্পকে সংহত করতে পারলে তা ট্রেন টেনে নেয় ; সংহত না করলে তা গরুর গাড়ির সঙ্গেও চলতে পারে না।"

সত্য, এটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়, গান্ধীজী ও মতিলালজী অপরিমেয় স্নেহাশ্রয়ে রেখে কিভাবে যুবক নেহরুকে তাঁদের এবং সমগ্র জাতির নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। মতিলালজী এমনিতেই সভাপতি হলেন না, গান্ধীজীর হওয়ার কথা, হলেন না, পিতৃপদে পুত্রকেই তাঁরা যুগ্ম অভিভাবকত্বে অভিষিক্ত করলেন এবং যুব-ভারতকে আর কোন দিকে নয় জওহরলালজীর দিকেই তাকাতে বললেন। গান্ধীজী আর কোন যুবককে নিরাপদ মনে করেননি, সুভাষকে তো নয়ই।

পট্টভি সীতারামায়াও তাঁর ইতিহাস নামধেয় ডায়েরীতে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন: "লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন ঐতিহাসিক হয়ে আছে। অন্যান্য অধিবেশনের মত এরও একজন প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন ছিল। প্রাদেশিক ভোটে গান্ধীজী ১০ ভোট, বল্লভভাই জে. প্যাটেল ৫ ভোট, জওহরলাল ৩ ভোট পেয়েছিলেন। গান্ধীজী যথারীতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন, অতএব সংবিধান অনুসারে তাঁর পরিবর্তস্থল একজনকে করতেই হয়। তদনুসারে ২৮-এ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে

এ. আই. সি. সি.'র এক সভা হয়। গান্ধীজীকে তাঁর অস্বীকৃতি প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়।

> "But he saw the wisdom of installing on the Gadi of the Congress a younger folk of the country.
> Vallabhbhai did not choose to intervene between Gandhi and Jawahar. The attendence at Lucknow was not large and the majority of friends present voted for Jawaharlal."

তাই ওঁরা দু'জনে জওহরলালকে হাত ধরে নিয়ে চললেন এবং পাল্টা-সরকার প্রস্তাবক সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে বললেন :

"আমার কাছে পাল্টা-সরকারের আইডিয়াটি অপরিণত মনে হয়। যদি তোমরামনে কর, তোমরা যথেষ্ট শক্তিমান, তবে আলাদা কথা। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে রাজস্ব অফিসার এবং যে-নামেই ডাকা হোক একজন করে পুলিশ অফিসার আছেন। গ্রামের সংখ্যা ৭০০,০০০। কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে অত গ্রামে কংগ্রেস পরিচিত কিনা। যারা পাল্টা-সরকারের জন্য আগ্রহী তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ; এর দ্বারাই তাদের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করতে হবে।"

গান্ধীজী ও সুভাষ

মূল ইংরেজী প্রস্তাবটির অনুবাদ করতে করতে একটু হাসলেন, কেন বুঝতে পারিনি, তারপর বললেন, যুবকদের ঘোড়ায় চড়ার কথাটি মনে রেখে শোনো—গান্ধীজী বললেন :

> "As regards Sjt Subhas Chandra Bose, I know he is a great worker in *Bengal*. He was our General Officer Commanding in the last year's Congress."

"সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলি। তাঁকে আমি বাংলাদেশের একজন বড় কর্মী বলে জানি। তিনি আমাদের গত বছরের কংগ্রেসে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। পাল্টা-সরকারের ভাবটি চিত্তাকর্ষক হলেও আমি যদি তাঁকে সমর্থন

না করি তবে তার কারণ আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি বলে আমি মনে করিনে।"

গান্ধীজী স্পষ্টতর করে বললেন: "মাদ্রাজে আমরা স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছি। আজকে আমরা আর এক পা অগ্রসর হচ্ছি; আজ আমরা ঘোষণা করছি, স্বাধীনতা কেবল আমাদের আদর্শ নয়, এটি আমাদের আশু লক্ষ্যও বটে। সুভাষবাবু তোমাদের আরও এক কদম আগে যেতে বলছেন এবং পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া সামান্য চাওয়া নয়, প্রস্তাব পাশ করাটাও নিতান্ত নখিভুক্তির ব্যাপার নয়। যদি আস্থা থাকে যে, তোমরা সুভাষবাবুর কার্যসূচী রূপায়িত করতে পারবে তা'হলে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধা কোরো না এবং আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো। তোমরা যদি মনে করো তোমরা পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যদি তোমরা মনে করো, আজ থেকেই আমরা আমাদের স্বরাজ (our own Raj) প্রতিষ্ঠা করতে পারি, জাতীয় আদালত মারফৎ বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারি এবং সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালিত করতে পারি, তবে সুভাষবাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করো।"

উপসংহারে বললেন, "তবে আমার বক্তব্য, ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা তাঁদের পক্ষে দীর্ঘতম পদক্ষেপ (takes the longest step forward which it is possible to take)" এবং এই বলে সর্বশেষে সবাইকে সাবধান করে দিলেন, আর এক পা নিয়েছ কি, পতন!

> "Taking stock of the entire situation, one step more and I am convinced you will fall into pitfall."

একটু থেমে বললেন, গান্ধীজী দেশকে আপাতত গর্তে পড়া থেকে বাঁচালেন। ওঁর প্রস্তাবটিই সর্বোপরি মহিমান্বিত হয়ে উঠল, পেলেন জওহরলালজীকে এবং তাঁর সঙ্গে সম্ভবত বিরাট এক যুব-সমাজকেও। অস্বাভাবিক হয়নি, অসঙ্গতও হয়নি, যখন দেখলাম,

নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্র নেই, সুভাষের সহচরও কেউ নেই। এ নিয়ে খুবই তুলকালাম হল, বাক্‌-বিতণ্ডা হল, কিন্তু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত জওহরলালজীর হাতে অবিচল রইল।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর স্বাধীনতা প্রস্তাব বনাম তাঁর সংশোধনী সম্পর্কে ফ্রী প্রেসের কাছে ১লা জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: "কলকাতা কংগ্রেসে আমার সংশোধনী অগ্রাহ্য হওয়াতে যেমন আমি দুঃখিত হইনি, এবারেও আমার সংশোধনী গৃহীত না হওয়ায় আমি দুঃখিত হইনি। আমার সংশোধনীর তাৎপর্য বোঝবার জন্য দেশ আরও এক বছর সময় পেল এবং আমার মনে লেশমাত্র সংশয় নেই যে, আমার প্রস্তাব অথবা অনুরূপ কোনো প্রস্তাব আগামী কংগ্রেসে গৃহীত হবে। আমার একমাত্র দুঃখ, ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। রাজনৈতিক শিক্ষা কখনো কখনো মন্দগতি হয়, বিশেষ যেখানে কার্যত সকল মুখ্য নেতারই টানটা বিপরীত দিকে।"

সুতরাং, তিনি উপসংহার টেনে বললেন, সুভাষ-পথের বিপরীত-গামীরা ঘনিষ্ঠতর হবার অত্যন্ত স্বাভাবিক উৎকণ্ঠায় যে ওয়ার্কিং কমিটি গড়লেন তার মধ্যে থাকলেন গান্ধীজী, মতিলালজী, জওহরলালজী, শ্রীপ্রকাশ, ডাঃ মামুদ, যমুনালাল বাজাজ, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, শার্দুল সিং, আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, ডাঃ সত্যপাল, পট্টভি সীতারামায়া, জয়রাম দাস দৌলতরাম এবং আমাদের জে. এম. সেনগুপ্ত।

বাংলাদেশের জে. এম. সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর আস্থা-ভাজন ছিলেন, আমিও ছিলাম সেনগুপ্তের পক্ষে, সুতরাং, এই মনোনয়ন সঙ্গত মনে করেছি। কিন্তু অতি সম্প্রতি প্রকাশিত (ভাদ্র ১৩৭৫) "মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র" বইয়ের লেখক শিশির দাশ তাঁর দ্বিতীয় পর্বের ৪৩ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা তোমায় হুবহু উদ্ধৃত করে শোনাই। তিনি লিখেছেন:

"১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসের পূর্বে, কাহারো সঙ্গে পরামর্শ

না করেই গান্ধীজী জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে, সমস্ত আইন সভার কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে বলে প্রস্তাব পাশ করালেন। মতিলাল নেহরু গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও, সুভাষচন্দ্র উহার প্রবল বিরোধিতা করলেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদে এ. আই. সি. সি'র বৈঠক হল। সুভাষচন্দ্র এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন দু'জনই তখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং দু'জনেই তাঁরা আইন সভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন।.........এলাহাবাদ এ. আই. সি. সি.'র অধিবেশনের পরেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর সমর্থন করতে শুরু করেন এবং তখনই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে—বাংলায় রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধের ইতিহাসের সূত্রপাত এখানেই, এই মতভেদই হল বিরোধের মূল কারণ।"

কিন্তু, সত্য, এভাবে ইতিহাস লেখা আমি সঙ্গত মনে করিনে। সুভাষ-সেনগুপ্তের বিরোধ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যদি মালিন্যের সূত্রপাত করে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলাদেশে কি কি বিপরীত শক্তি এই দু'জনকে আশ্রয় করে মন্থিত হয়েছে এবং কিভাবে ক্রমশঃ বাংলার গৌণ নগণ্য নেতৃত্ব ভারতীয় নেতৃত্ব থেকে মুছে গেছে তথ্যের পর তথ্য সমাবেশ করে তা দেখানো ইতিহাস-লেখকের কর্তব্য, নইলে একজনের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে আর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অবিচার হয়ে পড়ে। লেখক একই সঙ্গে বলছেন, সুভাষ-সেনগুপ্ত দু'জনই এলাহাবাদ এ. আই. সি. সি.তে পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রস্তাবে এক ছিলেন, আবার এলাহাবাদ এ. আই. সি. সি.'র পরেই সেনগুপ্ত "গান্ধীজীর সমর্থন শুরু করেন", এইভাবে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। এটা কারও মত হতে পারে, তথ্য কোথায়? জে. এম. সেনগুপ্ত গান্ধীজীর আস্থাভাজন হয়েছিলেন সত্য এবং সুভাষচন্দ্র তাঁর আস্থা হারিয়েছিলেন এও সত্য, কিন্তু ইতিহাস লেখকের কাজ হবে, তথ্য দিয়ে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা।

গান্ধীজী স্বয়ং এই মনোনয়ন গ্রহণ-বর্জনের একটা দিয়েছিলেন। সে যুক্তি নিঃসন্দেহে সকল পক্ষের মনঃপূত হয়নি, বিরোধ যেখানে মৌলিক সেখানে তা প্রত্যাশিতও নয়। তিনি বলেছিলেন ঃ

"They had tried their best to eliminate elderly element and take as many youngmen as possible, but they had not entirely succeeded. তাঁরা চেষ্টা করেছেন প্রবীণদের বাদ দিয়ে যথাসম্ভব তরুণদের নেওয়া। কিন্তু এতে তাঁরা সর্বতোভাবে সফল হননি।" একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার। ১৯২৮-এ বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে যখন জওহরলালজী অনুপস্থিত থাকলেন ও ওঁর স্বাধীনতা-সংক্রান্ত সংশোধনীটি তুললেন না, পক্ষান্তরে গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবটি তোলার নিরঙ্কুশ অবকাশ পেলেন, তখন গান্ধীজীই জওহরলালের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ উপস্থিত করলেন; এক্ষেত্রেও প্রেসিডেণ্ট জওহরলাল নেহরুর যে-কৈফিৎ দেবার কথা (আদৌ যদি কৈফিয়ৎ দিতেই হয়) তা দিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। কেউ তখন প্রশ্ন করলেন না, জওহরের বক্তব্য বারে বারে তাঁকেই বলতে হয় কেন? সুতরাং আজ এ প্রশ্ন অবান্তর। তাই, সেদিন তিনি জওহরের হয়েই বললেন, তাঁরা চেষ্টা করেছেন প্রবীণদের বাদ দিয়ে যতটা সম্ভব নবীনদের নিতে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা সর্বতোভাবে সফলকাম হননি। এই নির্বাচন (?) একটা টেকনিকাল ব্যাপার হলেও, Convention had established a cabinet system so that they could not impose anyone on the President, প্রথাটা দাঁড়িয়েছে মন্ত্রিসভার মতো, প্রেসিডেণ্টের মনঃপূত নয় এমন কাউকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও ডাঃ আন্সারী নিজেরাই অব্যাহতি চেয়েছেন। মিঃ সুভাষ বোস এবং মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়েছেন এবং মানসিকতার (বা মেজাজের) এই অমিল (বা অসামঞ্জস্য)-হেতু তাঁদের পদত্যাগ প্রত্যাহারে অনুরোধ জানাতে

দ্বিধা বোধ করেছেন। বস্তুতঃ, স্বাধীনতালাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া দরকার।”

তবু সত্যমূর্তি প্রস্তাব করলেন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ আলমের নাম কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হোক। “তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ্য সহচরই শুধু ছিলেন না, সংখ্যালঘুপক্ষের মতামতও কমিটিতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।”

গান্ধীজী উত্তরে বললেন, “তাঁরা চান ওয়ার্কিং কমিটি একমনা হোক, কেবল তবেই তাঁদের পক্ষে এই চরম পথানুসরণ করা সম্ভব হবে।”

একজন প্রশ্ন তুললেন: ওয়ার্কিং কমিটিতে সংখ্যালঘুদের মতামত প্রতিফলিত হবে না এ কি ব্যতিক্রম নয়?

গান্ধীজী: আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করব যদি সংখ্যালঘুপক্ষ মনে করেন যে, যেহেতু ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁদের কেউ রইলেন না এজন্য তাঁদের সহায়তা দরকার নেই। এই ধারণা নিয়ে যদি আমরা নতুন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তবে আমাদের আশা নেই।

আবদুর রহিম: ওয়ার্কিং কমিটি কি একটা সংক্ষিপ্তাকার এ. আই. সি. সি. নয়? আমি কোন ওয়ার্কিং কমিটির কথা ভাবতেই পারিনে যাতে সুভাষবাবু নেই।

এ কথায়, আমার মনে আছে সত্য, কেউ কেউ ‘হিয়ার,’ ‘হিয়ার’ করে উঠেছিলেন।

তখন ডাঃ আলম বললেন, এই প্রোগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য; সুতরাং, আমরা সে বদনামের ভাগী হতে যাই কেন? সত্যমূর্তি মশাই, নামের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন।

অবশ্য নাম প্রত্যাহার করা না-করার কোন অর্থ ছিল না, কেননা ওঁরা ওঁদের না নেওয়া স্থিরই করে ফেলেছিলেন। একধর্মী বা সমমতাবলম্বী, হোমোজিনিয়াস ক্যাবিনেটের বা ওয়ার্কিং কমিটির ধারণা এই থেকেই দৃঢ়মূল হয়ে গেল। এতক্ষণে জওহরলালজী সাফ বলে দিলেন, “তিনি এবং মহাত্মা গান্ধী সযত্নে এমনভাবে

নামগুলো চয়ন করেছেন যেন ক্যাবিনেটের মধ্যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অমিল না থাকে।" সুতরাং, এ কেবল গান্ধীজীর পছন্দ অপছন্দের কথা নয়, গান্ধীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বলা যায়, না-বললেও ক্ষতি নেই, এই পছন্দ অপছন্দ জওহরলালের নিজেরও। তিনিই অথবা তিনিও সুভাষচন্দ্র প্রমুখকে তাঁর "ক্যাবিনেটে" রাখা পছন্দ করছিলেন না। তাই ওঁরা বর্জিত হলেন। এ হচ্ছে ওঁর ১লা জানুয়ারির কথা; ২রা তারিখেও বিতর্কের উত্তরে বলেছিলেন:

> "It is not correct that the names proposed by Mahatma Gandhi for the membership of the Working Committee represented the decision of the last Working Committee. The list was prepared by me in consultation with Mahatma Gandhi and several other members of the old Working Committee who were good enough to come to my assistance."

কংগ্রেসের পার্টিচরিত্র

তোমায় বলি, সত্য, ১৯৩০ নিশ্চয়ই উদ্বেলিত জনবিক্ষোভের জন্য অনন্যসাধারণ, কিন্তু তার চাইতেও বড় যে-কথাটি ডায়লেকৃটিক্সের দাবিদার অত্যুগ্র বামপন্থীদেরও দৃষ্টি ও উপলব্ধি এড়িয়ে গেছে সেটি এই যে, এই ১৯৩০-এই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের পার্টিচরিত্র পরিস্ফুট ও নিঃসংশয় হয়ে ওঠে; ১৯২৮-২৯-এ যার আভাষ মাত্র, অস্ফুট উন্মেষ, ১৯৩০-এ তা স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট। এই কথাটি ধরতে না পারাতেই ভারতীয় রাজনীতিতে যত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তথাকথিত বামপন্থীরা একের পর আর এই ভুলই করে এসেছেন যে, এও বুঝি একই মঞ্চে সুরাট দক্ষযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি। আসলে এ যে বিশেষ একটি স্বার্থের মুখপাত্ররূপে সংহত হতে চলেছে, দীর্ঘ ভুজঙ্গ পরিক্রমার আগে তা অনেকের কাছেই ধরা পড়েনি। আমার কাছে তো নয়ই, যাঁরা পরে কোন-না-কোন ছলে বেরিয়ে গেছেন বা বহিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের কাছেও নয়। আমি বরাবর এটিকে একটি সাধারণ সংগ্রাম-

মঞ্চ বলে আঁকড়ে থেকেছি এবং শৃঙ্খলার নামে প্রত্যাদেশ মেনে চলেছি।

১৯৩০-এও যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে অপোজিসানের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেস ডিমক্রাটিক পার্টি গড়লেন তাঁদেরও এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা এন্টিথিসিস হিসেবে প্রতীয়মান থিসিসকেই গিলে খাবেন। আসলে জিনিসটা ছিল একেবারেই উল্টো। প্রতীয়মান থিসিসটিই ছিল এন্টিথিসিস, বিশেষ একটি স্বার্থের ক্রমাধিপত্য, সেই বিশেষ স্বার্থই ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগের ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা, চৌরি-চৌরার হিমালয়ান ব্লাণ্ডারের খোসা ভেঙ্গে উদ্গত হয়েছিল। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন স্টক-এক্সচেঞ্জে ফাট্‌কাবাজির অবকাশ দেয়নি। পরবর্তীকালে বেনিয়া দৃষ্টি পড়েছে স্বদেশী আন্দোলনে। ১৯২৮ থেকেই equal partnership ভ্রূণাবস্থা পেয়েছিল। জওহরলালও সম্ভবত ধরতে পারেননি, তাই তিনি কোন দেশ স্বাধীনতা না চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চায় কি করে প্রথমটা ভেবে পাননি এবং বলেছিলেন, বৃহত্তর সংগ্রামটা হচ্ছে সাম্রাজ্যভোগী আর সাম্রাজ্য-পীড়িতদের সংগ্রাম; সেখানে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই শরিক হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা তাঁর কতখানি হৃদ্গত ছিল এবং কতখানি মস্তিষ্কের শ্রুতলিপি মাত্র, সহসা বোঝা যায়নি। কিন্তু ১৯২৮-২৯-এ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস এবং ১৯২৯-৩০-এ ক্যাবিনেট সিস্টেম মেনে নিয়ে যখন বললেন, ও টি তাঁরই মনোনয়ন, তখন ওঁর প্রবণতাটা পরিষ্কার হয়ে গেছল।

বরং ভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচয় দিলেন তাঁরা, যাঁরা ক্যাবিনেট সিস্টেমের চিত্রটি দেখেও কোন একদিন বদলা নেবার আশায় ওয়াক্ আউট করলেন, নতুন এক সংস্থা কংগ্রেস ডিমক্রাটিক পার্টি গড়লেন; অথচ ওঁরা যে কংগ্রেসেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথাটি প্রকাশ ও প্রচারের জন্যও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এবং শুরু হল পলেমিক্‌স।

ওয়াক্ আউট? আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

বললেন, ১লা জানুয়ারি এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনে হল এই ওয়াক্ আউট, ক্যাবিনেট প্রথায় নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হওয়ায়। তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশের মতো হবে। যাঁরা বেরোলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বাবু গুরদিৎ সিং, সত্যমূর্তি, মুথুরঙ্গ মুদালিয়ার, গোবিন্দানন্দ, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পেশোয়ারের ডাঃ ঘোষ, হিজামুদ্দিন, এস. সি. মিত্র, জে. বি. সেন, আবদুল বারি, শ্রীনিবাসাচারি, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ আলম, কে. ভাস্যাম, আনামালি পিল্লাই, বেঙ্কটরঙ্গম্ নাইডু, পেরুমল স্বামী রেড্ডিয়ার, কুন্দুস্বামী চেট্টি, এস. বেঙ্কটরাম, কে. এস. গোপাল কৃষ্ণণ, পট্টভি রমণ, ভক্তবৎসলু মুদালিয়ার, আফতাবুদ্দিন চৌধুরী, বি. কে. দত্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন এ. আই. সি. সি. সদস্য। প্রদেশগত হিসেবে, বাংলাদেশের ২৪, বিহারের ২, পাঞ্জাবের ৪, উঃ পঃ সীঃ প্রঃ ১, আজমীর ১, কেরালা ১, অন্ধ্র ১, তামিল নাড়ু ১২, মাদ্রাজ ২।

এঁরা বেরিয়ে এসে এক সভা করলেন এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে চেয়ারম্যান, সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ আলমকে যুগ্ম সম্পাদক করে কংগ্রেস ডিমক্রাটিক পার্টি নামে এক নতুন দল গড়লেন।

> "Resolved that the A. I. C. C. Members assembled here to-night (Lahore, Jan. 1) do form themselves into a party within the Congress to be called the Congress Democratic Party and steps be taken to get the signatures of other Members of the A. I. C. C. who felt called upon to oppose the majority party in the Congress now in power."

কয়েকজনকে নিয়ে একটি গঠনতন্ত্র কমিটিও নিয়োগ করা হল এবং পাছে কেউ একে একেবারে বিচ্ছেদ মনে করেন এজন্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এর সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির তুলনা করে বলেন—'definitely a party within the Congress. সুভাষবাবু বললেন, মূলনীতির দিক থেকে তাঁরা কংগ্রেসকে মেনে চলবেন কিন্তু কর্মসূচীর বেলায় তাঁরা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তাঁদের স্বমতে আনবার স্বাধীনতা বজায় রেখে যাবেন।

পট্টভি তাঁর ডায়েরীর ১ম খণ্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন, শুনবে ?

"In any case, the success of Gandhi and Jawaharlal at the Lahore session was undeniable, in spite of the fact that almost immediately after the conclusion of the plenary session, Mr. Srinivasa Iyengar and Mr. Subhas Chandra Bose announced the formation of a new organisation known as Congress Democratic Party, which was supposed by Government at the time to indicate that the attempt to placate the left wing had not really succeeded and that a split was, after all, imminent. These friends desired that the Working Committee should be formed by process of election, and as it was defeated they walked out along with certain South Indian friends. In Lahore, the Working Committee for the next year was formed by preparing two independent lists, one by Pt. Motilal in consultation with Gandhi and one by Seth Jamunalal Bajaj. There was only one name which did not coincide in the two lists. That difference was adjusted, and the Working Committee was formed. But these friends wanted election. That was thrown out, with the result that there was a dramatic exit. In less than ten minutes, the news was broadcast that a new party was formed."

কিন্তু আমার মতে, সত্য, এটি একটি মৌলিক ভ্রান্তি। পার্থক্য তো প্রোগ্রামেই, পথান্তরেই তো মতান্তর। একই ভগবানের নামে শপথ করেই তো পথ-পন্থা নিয়ে এত হানাহানি এত মারামারি। এই পথান্তরেই তো মেনশেভিক ও বলশেভিক এবং রক্তারক্তি।

ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি

তবে এ কিসের পার্থক্য ?

সুভাষচন্দ্র আরও এক বিবৃতিতে বললেন :

"Those of us who, *by a policy of exclusion*, were not given any place in the Working Committee, were not at

all anxious to be in the Working Committee and if we had been consulted we could, by mutual agreement have agreed to step aside, but what annoyed us as well as a very large section of the house were the deliberate attempt on the part of the elders to shut us out...."

"এড়িয়ে যাবার নীতি অনুসরণ করে ওঁরা আমাদের নিলেন না; আমরা কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢোকবার জন্য অস্থির হয়ে পড়িনি; বরং আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে আমরাই সরে দাঁড়াতাম। আমরা বিরক্ত হয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে এই জন্য বিরক্ত হয়েছেন যে, স্রেফ অভিসন্ধি করে আমাদের অন্তরালে নিক্ষেপ করার চেষ্টা হয়েছে।"

বলতে গেলে, বুঝলে সত্য, সুভাষচন্দ্রের এ অভিযোগ অবান্তর; কেননা, ওঁরা কেউ তো একথা অস্বীকার করেননি যে, ওঁদের ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হল। ক্যাবিনেট মনোনয়নটা deliberate-ই। অথচ এই উল্টো বোঝাবুঝির জন্যই সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যতে আরও একবার মারাত্মক ভুল করেছিলেন ১৯৩৮-এ; সুভাষচন্দ্র নিজে গান্ধীজীর অমনোনীত হয়েও যখন সারা ভারতের ইচ্ছাক্রমে, মনোনীত মাত্র নয়, নির্বাচিত হলেন, তখনও তিনি অবিমিশ্র ক্যাবিনেট রীতি মানলেন না, বারংবার কম্পোজিট বা বিমিশ্র ক্যাবিনেটের ওপর জোর দিতে দিতে প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়লেন, বা ছাড়তে বাধ্য হলেন এবং তাতে ওঁর সাহসের অভাবই সূচিত হল; কেননা, অবিমিশ্র ক্যাবিনেটপন্থীদের পক্ষে যিনি প্রেসিডেন্ট হলেন—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—ব্যক্তি-তুলনায় তিনি তাঁর চাইতে কিছু কম ছিলেন না। সারা ভারতবর্ষ যাঁকে নির্বাচন করল তিনি সারা ভারতবর্ষকে নির্ভর করতে পারলেন না। মৌলিক ঐ এক ভুলের জন্য। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের পার্টি-চরিত্রকে একেবারেই ধরতে পারেননি। এবং এই কারণেই তিনি ঐ বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করেছেন:

"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আমি নেতৃবৃন্দের দিল্লী ইস্তাহারের প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলাম; দেশের বৃহত্তর

স্বার্থে নেতৃবৃন্দ আমাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।”

> “It was surprising to learn that so soon after, the larger interests of the country demanded the exclusion of Mr. Iyengar and myself from the Working Committee and that our President has now more in common with the supporters of Dominion Status than with his erst-while collegues in the Independence League.”

কিন্তু এ তো ব্যঙ্গ বা কটাক্ষের ব্যাপার নয়, সত্য, এ হচ্ছে বাস্তব অবস্থা—ফ্যাক্ট। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ অবধি খুব স্পষ্ট করেই কি প্রতিপন্ন হয়নি যে, গান্ধীজীর অবিসম্বাদী মাহাত্ম্য ও নেতৃত্ব থেকে সুভাষচন্দ্র যতখানি দূর দূরান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছেন, জওহরলাল ঠিক ততখানি নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছেন? সুতরাং, এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এত শিগগির দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই সুভাষচন্দ্র আয়েঙ্গার প্রমুখেরা বাদ পড়লেন এবং একদিনকার সহচর ও বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসপন্থীদের দলে নূনের পুতুলের সমুদ্র মাপার মতো লীন হয়ে গেলেন? বিস্ময় এইখানে যে, সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কাছে কেন পরিহার্য হয়ে উঠলেন তিনি তা স্ববুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে পরিমাপ করতে পারলেন না। বস্তুতঃ, সুভাষচন্দ্র যদি এখানেই মোহমুক্ত হতে পারতেন তবে অনেক ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকে ভারতীয় রাজনীতি অব্যাহতি পেত।

সুভাষচন্দ্র আরও এই যে অভিযোগ করেছিলেন তারও মূল্য একটু প্রচারের চমকপ্রদ বুদ্বুদের অতিরিক্ত কিছু নয়। তিনি বলেছিলেন:

> “The step taken by Mahatma Gandhi, in moving a list of ten members in bloc, and President's action in shutting out amendments to the names proposed were against article 24 of the Constitution.”

আইন,-কানুন, নিয়ম-রীতি এসব দুর্বলপক্ষের যুক্তি মাত্র, দলবদ্ধ হতে পারলে কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই; সংগঠনই বল, রাষ্ট্রই

বল, সঙ্ঘবদ্ধতারই আর এক নাম যুক্তি, স্যায়, নীতি, নিয়ম, আইন। আর, তা ছাড়া, যে-কারণে সুভাষচন্দ্র প্রমুখের 'বিদ্রোহ,' 'কংগ্রেস ডিমক্রাটিক পার্টি' গঠন ব্যর্থ হয়েছে, তার পয়লা নম্বর কারণ, সুভাষ-চন্দ্রের মাথার ওপর এক রাজদ্রোহের মামলা ঝুলছিল; তাতেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির কুরুক্ষেত্র থেকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন স্বাধীনতা দিবস পালনের আগেই। দ্বিতীয় কারণ, এই স্বাধীনতা দিবস পালন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র প্রমুখের দ্বিমত বা বিরোধিতা ছিল না। তৃতীয় কারণ, সুভাষচন্দ্র কারান্তরিত থাকতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে লবণ আইন অমান্য সত্যাগ্রহ শুরু হল, তাতেও সুভাষ-আয়েঙ্গার অনুগামীদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। সুতরাং, এখানে অধিবেশনের আনু-ষ্ঠানিক বিদ্রোহ অত্যন্ত স্বল্পায়ু নিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। আপাত-বিরোধ সর্বতোভাবে আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেল।

পক্ষান্তরে' কংগ্রেস-নেতৃত্ব স্বাধীনতা দিবস পালন, আইনসভা বর্জন ও পরিশেষে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিঃসংশয়ে জনচিত্তে দৃঢ়মূল হল। কেননা, এই করেই সুভাষ-আয়েঙ্গার-বিরহিত নেতৃত্ব বিদ্রোহী বা বিরোধীদের পালে যতটুকু হাওয়া ছিল তা নিঃশেষে নিয়ে নিলেন। আর ব্যক্তিগতভাবে, সুভাষচন্দ্র থেকে সর্বতোভাবে পৃথক জওহরলালকে গান্ধীজী যে প্রমাণপত্র দিলেন তা পৃথিবীর যে কোন দেশের রাজনীতিতে অতুলনীয়।

গান্ধীজী ও জওহর

১৯৩০-এর ৯ই জানুয়ারির "ইয়ং ইণ্ডিয়া" সংখ্যায় ১৯২৯।৩০-এর কংগ্রেস অধিবেশনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী যা লিখলেন তা অবিস্মরণীয়; তাঁর সুন্দর ইংরেজি বয়ানেই পড়ি:

> "Pandit Jawaharlal Nehru more than justified the choice of the people. His address, brief and to the point, was bold, extreme in conception but moderate in expression. It bore evidence of a man capable of viewing things with complete detachment. A confirmed Socialist, he wants for his country what only the country can manage. He

is a practical statesman, tempering his ideas to suit his surroundings. But for himself he is an idealist who would ever strive to live up to his ideals."

জনসাধারণ জওহরলালজীকে মনোনীত করেছে একথা সর্বাংশে সত্য নয়। জওহরলালকে প্রেসিডেণ্ট করার সুপারিশ ছিল স্বয়ং গান্ধীজীর; এজন্য তিনি নিজে সরে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী অবিসম্বাদী মুখ্যতম নেতা; সাধারণের কাছে মহাত্মারূপে পূজ্য হয়েছেন। তিনি যদি জনসাধারণের প্রতীক হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই এ জনসাধারণের পছন্দ। অভিভাষণ লেখার দিকে জওহরলাল নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি; কিন্তু একথা যদি সত্য হয় (অন্ততঃ তখন এই কথাই প্রচারিত হয়েছিল) যে, মতিলাল ও গান্ধীজী অভিভাষণটির খসড়া দেখেছিলেন, তবে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, ইউরোপ প্রত্যাগত যুবক জওহরলালের extreme conception বা চরমপন্থী ধ্যান-ধারণার moderate expression বা সংযত অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁদের কল্যাণ হস্তের স্পর্শ আছে। বিশেষ করে যখন একথাটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, জওহরলাল ঝুনো সোশ্যালিস্ট হয়েও মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পেরেছেন এবং দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সে দৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত তিনি, তাঁর ভাবধারাকে পারিপার্শ্বিকতার রসে জারিয়ে নিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিন্তু ভাববাদী এবং আদর্শোচিত জীবনযাপনে উদগ্রীব।

গান্ধীজী আরও বলেছেন:

"As in his address, so in the Chair. He was strong, yet accommodating. His wit came to his rescue in many an akward occasion. He never hesitated when action was required. His tireless energy and entire self forgetfulness, his natural simplicity and affability captivated everyone. No Government that is at all anxious to do what is right can have any reason to fear Jawaharlal Nehru. A wicked Government would soon feel the strength of a

stalwart who counts no price too dear to pay for ridding the country of wicked rule."

"যেমন অভিভাষণে তেমন সভা পরিচালনায়। বেশ কড়া অথচ অপরকে অবকাশ দিতে সদাই প্রস্তুত। অনেক উদ্ভট পরিস্থিতিতে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতি কাজে লেগেছে। যেখানে সক্রিয় হতে হয়েছে সেখানে দ্বিধাচিত্ততা প্রকাশ পায়নি। তাঁর অক্লান্ত সামর্থ্য ও সর্বাঙ্গীণ আত্মবিস্মৃতি, তাঁর সহজ সারল্য এবং তাঁর বিনয়নম্রতা প্রত্যেকের চিত্তাকর্ষণ করেছে।"

শুধু দেশের উদ্দেশে নয়, গবর্নমেণ্টের দিকেও একটা চোখ রেখে গান্ধীজী বললেন, "যথার্থ কার্য সম্পাদনে উৎসুক কোন গবর্নমেণ্টের পক্ষেই জওহরলাল নেহরুকে ভয় পাবার কোন হেতু নেই; পক্ষান্তরে শয়তান গবর্নমেণ্ট মাত্রই বুঝতে পারবে যে, শয়তানি শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি কোন মূল্য দিতেই কার্পণ্য করবেন না।"

যুবকদের একমাত্র আদর্শ-পুত্তলিরূপে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন :

"The youth of the country has every reason to be proud of their representative, the nation may well rejoice to find in Jawaharlal Nehru such a noble and worthy son. May God's blessings descend upon him and may the nation reach her destination during Jawaharlal's year of service."

গান্ধীজী অনায়াসেই year নয়, years of service'ও বলতে পারতেন; কেননা, ভগবানের আশীর্বাদ গান্ধীজী মারফৎ এমন অফুরন্ত উৎসারিত হয়েছিল যে, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে জওহরলাল ছিলেন আমরণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী; গান্ধীজীর জীবদ্দশায় ও মরণোত্তর কালেও তাঁরই সার্থক উত্তরাধিকারী।

গান্ধীজী যে কেবল ব্যক্তি-নেতৃত্বের নিরাপদ অনুসৃতির জন্যই সযত্নের পরিচয় দিয়েছিলেন তাই নয়, যেগুলো তিনি দুর্লক্ষণ মনে করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও অবিশ্রান্ত অভিযান চালালেন। অহিংসা

যেমন ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাস, দেশের স্বাধীনতা বা দেশপ্রেমও যার কাছে গৌণ ও নগণ্য, তেমনি আস্থা ছিল চরকা-খদ্দরের সমাজ-ব্যবস্থায়।

২রা জানুয়ারি আমেদাবাদ থেকে ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়াকে বললেন:

> "There is so much violence in the atmosphere immediately surrounding us that a bomb thrown here and there causes little perturbation. Probably, there is joy in the hearts of some ...."

"আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ভায়োলেন্স বা হিংসা এমনভাবে স্পর্শ করে আছে যে, এখানে ওখানে বোমা পড়লে আমরা মোটেও ঘাবড়াইনে। সম্ভবত, কারও কারও চিত্ত উৎফুল্লও হয়ে ওঠে···।"

ভায়োলেন্স ও হিংসা

ভায়োলেন্সের বাংলা হিংসা চলে আসছে; আমিও তাই ব্যবহার করছি; কিন্তু হিংসা ঠিক ঠিক ভায়োলেন্সের অর্থদ্যোতক নয়; ভায়োলেন্স অর্থ বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি। বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কোমলপ্রাণ, বৌদ্ধ-জৈনদের মতো ধর্মাচরণে মাত্র অহিংস নয়, অকারণ একটা পিঁপড়েরও প্রাণনাশ তাঁরা করতেন না, করতে দেখলেও তাঁদের প্রাণ কাঁদত। তাঁরা কখনই হিংস্র ছিলেন না। হিংসা অর্থে Jealousyও বটে, সে অর্থে বিপ্লবীরা কোনক্রমেই হিংসুক নন; এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অতি মহৎ ভাবে দীপ্ত, সচ্চরিত্র, কোমল-প্রাণ মানুষ। সাধারণের অসহ্য দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্ট করে নিয়ে তা অপসারণের জন্যই বিষয়-নির্লিপ্ত এইসব মানুষ ঘর-ছাড়া। কৃচ্ছ্রসাধনা তাঁদের কোনো লোক-ভিড়-করানো কৌশল মাত্র ছিল না, সকলের অলক্ষ্যেই এ সাধনা চলত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বাঘের বা বন্যশূকরের কি মত্ত হস্তীর উপদ্রব শুরু হলে যেমন সকলের হিতের জন্য—যাকে বিবেকানন্দ বলেছেন জগদ্ধিতায়—দুঃসাহসী শিকারী

নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ঐ জন্তুর পেছনে ঘোরে, এঁরাও তেমনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কিন্তু এঁদের অকারণে হিংসাপন্থী ও হিংস্র ক্রিমিনালদের সঙ্গে তুলনা করে করে লোকের কাছে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিলেন গান্ধীজী এবং বাংলা ভাষায় আমরা তাঁর অনুগামীরা। এর সঙ্গে সুর মিলেছিল এসে গবর্নমেণ্টের ও স্বল্প-শিক্ষিত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নিন্দাবাদ। যেভাবেই হোক্, চারদিক থেকে ছুয়ো ছুয়ো সমস্বর ধ্বনিতে, ভারতের বিপ্লবীরা বিতাড়িত, ক্রমে নিশ্চিহ্ন ও নির্বংশ হয়েছেন। আজ তাঁরা বিদ্রূপের দরিদ্র ভিখারী মাত্র।

গান্ধীজীর অভিযান ছিল এমনই নিষ্করুণ। কংগ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের নিন্দাত্মক প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ২রা জানুয়ারি এই যে তিনি বিবৃতি দিলেন, তাতে তিনি আরও বললেন :

"একবার ভেবে দেখুন দেখি, বড়লাট যদি মারাত্মক আঘাত পেতেন অথবা নিহত হতেন! তা'হলে নিশ্চয়ই ২৩ তারিখে কোনো বৈঠক হত না এবং কংগ্রেস কি পথ নেবে তাও স্থির করা যেত না। (অর্থাৎ বৈঠকই বৃহত্তর ও মহত্তর কথা!) এ পরিণতি অবাঞ্ছনীয়ই হত। তাছাড়া।

> "Every time violence occurred we lost heavily, that is, the military expenditure has risen."

"যতবার হিংসা প্রকাশ পেয়েছে ততবারই আমাদের নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে ; অর্থাৎ সামরিক ব্যয় বেড়েছে।"

গান্ধীজীর এ যুক্তিও অবশ্য বিরোধীপক্ষকে নিরস্ত্র করার জন্যই। কেননা, একথাটিও তাঁর সর্বাংশে সত্য নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতির মধ্যেই সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রশ্নোত্তরটি নিহিত ; তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র অভ্যুত্থানের কপালে একই দণ্ড। সাম্রাজ্যবাদীরা সচেতন বলেই সদা প্রস্তুত থাকে এবং নতুন আগ্রাসনের জন্য আরও প্রস্তুত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ব্যতিক্রম নয়। আর সমরশক্তি অথবা সামরিক ক্রমোন্নতির ভাবনা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ হয় না। বাংলায় বা পাঞ্জাবে বোমা ফাটলে তারপর তারা প্রস্তুত হয়, একথা ঠিক নয়।

তবে স্বাধীনতা কি করে পাওয়া যাবে? এই অনিচ্ছুক সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের মুঠো থেকে? গান্ধীজী বললেন, বিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে। তাদের মেরে নয়।

> "We can establish independence only by adjusting our differences through appeal to head and heart and not by terrorising and killing those who, we fancy, may impede our march."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের পরিবর্তনের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিনা এবং সে হৃদয়ের পরিবর্তন অহিংস অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যই ঘটেছে কি না, এ নিতান্তই কুতর্ক-সাপেক্ষ; কেননা, স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালেও কোন কোন কংগ্রেস নেতাই বলেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, ১৯৪২-এ সারা ভারতব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান (যা অনেকাংশে অহিংস থাকতে পারে নি বা যার নেতৃত্ব বা দায়িত্ব গ্রহণে গান্ধীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করেছেন) এবং ভারতীয় জলস্থল অন্তরীক্ষের সেনা-বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র কিন্তু পরাজিত আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ধাক্কা লেগেছিল তাতেই ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু এ তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, আমাদেরই ভাই ব্রাদার, একই দেশের জলবায়ু মাটীর সহচর, লীগপন্থী মুসলমানদের হৃদয় ও মস্তিকের কিন্তু পরিবর্তন ঘটানো যায়নি অনেক অনশন ও তোষণেও।

তবু সেদিন গান্ধীজীর এই তত্ত্ব আমাদের অনেকের চিত্তকেই আলোড়িত করেছিল এবং স্থির বিশ্বাসে কিছুকাল নিষ্কম্প্র শিখার মতই ছিল। আমরা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম যে, যারা এখনও যুক্তি-বিরহিত হয়নি তারা খোলাখুলি অন্তর দিয়ে এই বোমা দুর্ঘটনার নিন্দা করবে। তখন মনে একবারও প্রশ্ন জাগেনি, তবে কি বিপ্লবীরা যুক্তি-বিরহিত এবং "মোহাচ্ছন্ন দেশপ্রেমিক"? তিনি বলেছিলেন:

> "Let those who are not past reason·····openly and heartily condemn these outrages, so that deluded patriots

might realise the futility of violence and of the great harm violent activity has every time done."

কিন্তু একথা কি কিছুতেই স্বীকার করা যায়, অহিংস আন্দোলনে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকই সচেতন বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরাই আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই "deluded", মাথা-মোটা ও যুক্তি-বিরহিত বলির পশু মাত্র? মডারেট লিবারেলরাও তো কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাবে আঁৎকে উঠেছেন, রাজন্যবর্গের রেড র‍্যাগ দেখে তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউ তো বলেননি, সব যুক্তির আধার হয়েছিলেন ওঁরাই?

কিন্তু তোমায় বলেছি, সত্য, ঘটনাক্রম সর্বতোভাবে অনুকূল ছিল গান্ধীচালিত ওয়ার্কিং কমিটির। স্বাধীনতা দিবস পালন ও কাউন্সিল বর্জনের কর্মসূচী উপচীয়মান বিক্ষোভকে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তা-ই পরিকল্পিত খাতে দু'কূলে প্লাবন ডেকে প্রবাহিত হয়ে গেল। ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ২৬-এ জানুয়ারি, রবিবার, প্রথম স্বাধীনতা দিবস অথবা স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য পাঠের দিন নির্দিষ্ট করে প্রস্তাব নিলেন:

স্বাধীনতা দিবস, কাউন্সিল

"In order to carry the message of Purna Swaraj (complete Independence) to the remotest village in India, this working Committee appoints Sunday, the 26th of January, 1930, as the day of celebration when a declaration will be read to the meeting and the members present at the meeting will be invited to signify by a show of hands their assent to the Declaration."

এ নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ ছিল না। কেননা, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন বা স্বাধীনতা সঙ্কল্প-বাক্য গ্রহণ অনুষ্ঠানে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না, ছিলও না; যা বিরোধ তা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘুরপাক খেয়েছে। সুভাষচন্দ্র প্রমুখের উদ্দেশ্য

ছিল কংগ্রেসকে সংগ্রামশীল করে তোলা এবং সংগ্রামে অবতরণ করানো। সুতরাং, যেখানে সংগ্রামের আহ্বান এসেছে সেখানে তাঁদেরও কোন বিরোধ ছিল না। পট্টভি সীতারামায়া ডায়েরী লিখতে বসে যদি ইতিহাস বিকৃত না করতেন তবে অন্ততঃ এটুকু স্বীকারের ঔদার্য তাঁর হতই।

স্বাধীনতা দিবস পালনের ঘোষণামাত্র সুভাষচন্দ্র যেখানেই গেছেন সেখানেই এই দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তোমায় বলেছি, সত্য, যে তাঁর মাথার ওপর রাজদ্রোহ মামলার খড়্গ ঝুলছিল। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে, ২৩-এ জানুয়ারী, তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হল। সুতরাং সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা দিবস পালনের অবকাশ রইল না। কিন্তু কারাগারে পা বাড়িয়ে দিয়েও শ্রমিকশ্রেণীর, বাংলা দেশের উদ্দেশে এবং সারা দেশের উদ্দেশে তিনি তিনটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সে তিনটি বিবৃতিই তোমায় অমৃতবাজার পত্রিকার কাটিং থেকে পড়ে শোনাই :

"সাথীগণ, আমরা আমাদের ইতিহাসের এক কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি এসে পড়েছি। সরকারী পীড়নের রথচক্র আমাদের নিষ্পেষিত ও অভিভূত করতে চাইছে। সুতরাং, আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসী বা তৎসংশ্লিষ্ট তাঁদের প্রধান কর্তব্য হবে শ্রমিকদের সংগঠন ও সংহতির জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া। আমাকে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচন করে তাঁরা আমাকে যে মার্যদা দিয়েছেন তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমার আফশোষ এই যে, ভারতের সেবায় আমি আমার ভূমিকা পালনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকব। ট্রেড ইউনিয়ানিস্টদের মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হেতু এ. আই. টি. ইউ. সি. অতিরিক্ত এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমি আমার সকল অন্তর দিয়ে সকল ট্রেড ইউনিয়ানিস্ট

এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের কাছে এই আবেদনই জানাব, আসুন, ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসকে সাহায্য করুন এবং এর সঙ্কটে এর পাশে এসে দাঁড়ান। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ানোর অর্থ সুবিচার ও ও মানবিকতার পক্ষেই দাঁড়ানো। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, পরিণামে এই উদ্দেশ্য সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণী যথাযোগ্য সাড়া দিয়ে আন্দোলনকে সাফল্য ও গৌরবে মণ্ডিত করবে।

যে-তারিখে সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড হয়, জানলে সত্য, সেই তারিখে আমাদের রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটি প্রশ্ন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে। লাহোর কংগ্রেসে গান্ধী-সুভাষের মতপার্থক্য তাঁর অজানা ছিল না। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানো না, আমাদের কবিগুরু সুভাষচন্দ্রকে কি অসাধারণ স্নেহ করতেন ; ত্রিপুরী কংগ্রেসে, মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠায় ও সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানে এর আরও পরিচয় আমরা পাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ছিল সীমার মাঝে অসীম, সেখানে গান্ধীজীর মত ব্যক্তির অক্ষুণ্ণ প্রীতির আসনও পাতা ছিল সমাদরে, বহু উপলক্ষে সে পরিচয়ও পাওয়া গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আমন্ত্রণে শুধু নয়, তপশীলিদের আসন নিয়ে অনশনকালেও। সুতরাং, লাহোর কংগ্রেসের পটভূমিকায় এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। খবরটি দিয়েছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া।

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন

"ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে (আমেদাবাদে) বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে এসেছেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গেও দেখা করেন। কবি গান্ধীকে জিগগেস করেন, চলতি বছরে তিনি (গান্ধী) দেশের সামনে কি রাখতে যাচ্ছেন? গান্ধীজী জবাব দিলেন: আমি দিন

রাত এই নিয়ে ভয়ানক ভাবছি। চারদিককার অন্ধতামস থেকে এখনও কোন আলো ফুটে উঠতে দেখছিনে। তবে আমরা যদি কোন একটা ফলপ্রসূ কর্মসূচী ভেবে স্থির করতে না-ও পারি, তবু আমরা তো দেশের লক্ষ্যাদর্শ যে স্বাধীনতাই একথা ঘোষণা করার কাজ থেকে বিরত থাকতে পারিনে—বিশেষ যেখানে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের সেই অর্থ করা হয়েছে, যে-অর্থ আমরা কোনকালেই বুঝিনি।"

অর্থাৎ, গান্ধীজী তখনও স্বাধীনতা-আন্দোলন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস আন্দোলন থেকে কি ভিন্ন রূপ নেবে স্থির করে উঠতে পারেননি। গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার রীতি সম্পর্কে পট্টভি সীতারামায়া "ডাণ্ডি মার্চ" প্রসঙ্গে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন:

> "Perhaps Gandhi himself had no full conception of what was to follow. He saw things as if by a flash and framed his conduct by impulse. To the righteous man, these are two supreme guides of life, not reason nor intellect. Once the march began, people caught the spirit of his teaching and the plan of his campaign .... The idea was released, and the released idea coursed along different channels, seeking various forms of expressions."

এসব কথা তখন শুনলে আমাদেরও রোমহর্ষ হত, inner voice, grouping in darkness ইত্যাদি সাধু-সন্তের কথা শুনলে রাজনীতির দূরদর্শী চুলচেরা অঙ্কশাস্ত্রের হিসেব উঠত না মনে, ভাবতাম অন্তরতম ভগবৎ-প্রেরিত এই নির্দেশ নির্ভুল ও মঙ্গলময় না হয়েই পারে না। কিন্তু আজ বুঝতে ভুল হয় না—statesmanship বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা একেবারেই অন্তরবাণী নয়, বাস্তববাদী ডায়লেকটিক্স, সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘটনাস্রোতের দিকদর্শনটিই আসল কথা, ওটি যিনি ধরতে পারেন তিনিই দূরদর্শী রাজনীতির প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। ভগবৎ সাধনার ক্ষেত্র হয়তো আলাদা, তা রাজনীতি নয়। রাজনীতিতে

নানা রকমের দ্বন্দ্ব ; এই দ্বন্দ্ব লক্ষ করেই সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবৃতি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি সারা বাংলার মানুষের উদ্দেশে :

"কারাগারে পদার্পণ করার আগে আমি বাংলাদেশের সকল কংগ্রেস কর্মীর উদ্দেশে এই আবেদন জানাতে চাই যে, তাঁরা যেন সকল বিভেদ ঘুচিয়ে আমলাতন্ত্রের সামনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যে বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা আজ অনেক মাটির নিচে কবর দিতে হবে।

"এখন এটা স্পষ্ট যে, গবর্নমেণ্ট নিষ্করুণ দমননীতি অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প। গবর্নমেণ্ট যেখানে সুসংগঠিত ও কৃতসঙ্কল্প, সেখানে আমাদেরও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমভাবে সংগঠিত ও দৃঢ়পণ হতে হবে।

"জনসাধারণ জানেন যে, বাংলা সরকারের পীড়ন-নীতির ফলে বিভিন্ন জেলায় আমাদের অধিকাংশ কর্মী অভিযুক্ত হয়ে চলেছেন। এজন্য একদিকে দরকার অর্থবল এবং অন্যদিকে তাঁদের মামলা তদ্বিরের জন্য আইনজীবীর সহায়তা। যতক্ষণ না কংগ্রেস আত্মপক্ষ সমর্থন বাতিল করছেন ততক্ষণ এইসব কর্মীর পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা না করলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি হবে।"

বন্দবিলা বনাম বর্দোলি

সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসে অর্থদানের জন্য এবং বন্দবিলা সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্যও আবেদন জানান।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ ?

হ্যাঁ, সত্য, কথায় কথায় বর্দোলি সত্যাগ্রহের যে-প্রচার হয়েছে, লোকে তা যত বিশদভাবে জানে, কোনো কোনো তথাকথিত ইতিহাসেও যার উপযুক্ত স্থান হয়েছে, বন্দবিলা সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বন্দবিলা বাংলাদেশেরই একটি লোকালয় ছিল ; আজ তা পাকিস্তানের যশোরের অন্তর্গত। কিন্তু সেদিন অখণ্ড বাংলাদেশেরই এই একটি জায়গায় বর্দোলি সত্যাগ্রহের মতো গণআন্দোলন

হয়েছিল; যশোর জেলায় বন্দবিলা ইউনিয়ানে "ইউনিয়ান বোর্ড" প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল এই আন্দোলন। ছ'মাস ধরে চলেছিল। বন্দবিলা কংগ্রেস কমিটি ও কমিটির সেক্রেটারী বিজয় চন্দ্র রায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইউনিয়ান বোর্ড হলে করবৃদ্ধি হবার সঙ্গত আশঙ্কাকে কেন্দ্র করেই তার প্রতিরোধে এই আন্দোলন।

গ্রামবাসীরা কর দিতে অস্বীকার করলেন এবং পুরোদমে কর-বন্ধ আন্দোলন চলল। গবর্নমেণ্ট যথারীতি তাঁদের অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু করে দিলেন এবং মুখ্যকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রামবাসীও অভিযুক্ত হতে লাগলেন। যাঁরাই কর-বন্ধ করলেন তাঁদেরই অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হতে লাগল, কোন কোন সময় গোপনে নীলাম হল। দামী গাই-গরু নামমাত্র দামে বিক্রী হয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার এ বর্দোলির খবর তুমি পট্টভির ডায়েরীতে পাবে না, সত্য। বাংলার বেদনা বাংলাদেশেই গুমরে মরেছে, বাংলার ঐ সীমাবদ্ধ আইন-অমান্য আন্দোলন বাংলা কংগ্রেস ছাড়া কোথাও স্বীকৃতি পায়নি এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদধন্য হয়নি। তবু, বন্দবিলা বর্দোলির মতই ১৯৩০-এর লবণ-আইন অথবা সাধারণ আইন আন্দোলনের নিঃসন্দেহে এক পূর্ব লক্ষণ, বৃহত্তর আন্দোলনের দিশারী। সীতারামায়া ভাই যতই কেননা অন্তরের চমক, flash impulse, তর্কাতীত অনুভূতির কথা বলুন, সারা ভারতে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের ইসারা ছিল যতখানি বর্দোলি সত্যাগ্রহে ততখানি বন্দবিলা সত্যাগ্রহে এবং আমি আরও বলব, বাংলা-বিহার-ইউ পি-পাঞ্জাবের সশস্ত্র আইনভঙ্গের মধ্যেও। ঐ সুবিস্তৃত ফ্যাক্টের মধ্য থেকেই গান্ধীজীর অন্ধ-তমসায় আলো ফুটে উঠেছিল। ডাণ্ডি মার্চ, লবণ-আইন ভঙ্গ, ধর্ষণা লবণ-গোলায় হানা কিছু আকস্মিক স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। বন্দবিলা সরকারী ইতিহাসে স্থান পাক না-পাক, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ইতিহাসে স্থান পাবেই।

হাসলেন। তুমি ভাবছ, আমি খেই হারিয়ে ফেলছি, না,

সত্য ? এত ঘটনা, এত তথ্য যে, যেই হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা অমূলক নয়। সুভাষচন্দ্রের জেলের দিকে পা বাড়িয়ে তিনটি বিবৃতির কথা বলছিলাম। তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে সফল করার আবেদন। তিনি এই বলে শুরু করলেন, "সম্ভবত এটি নিছক ঘটনাচক্র নয় যে, আমরা সারা ভারতে ২৬-এ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালনের আগেই দণ্ডিত হলাম। হতে পারে, গবর্নমেণ্ট মনে করছেন ২৬-এ জানুয়ারির আগেই যদি তাঁরা আমাদের জেলে নিক্ষেপ করেন তবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বিঘ্নিত হবে।

> "I therefore, appeal to the citizens of Calcutta to see into it that in our absence the Independence Day is celebrated in a mannor worthy of the great city of which we are proud to call ourselves citizens."

"আমি তাই কলিকাতার নাগরিকদের কাছে এই আবেদন করে যাই যে, তাঁরা যেন দেখেন, আমাদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যে মহানগরের নাগরিক বলে তাঁদের গর্ব তার উপযুক্ত উৎসবের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়।"

সুভাষচন্দ্রের এ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড তাঁর আবেদনকে মহিমান্বিত করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাধীনতার আবেদন ছিল কলকাতা তথা বাংলার মর্মেই; কোন ব্যক্তির আবেদন নিমিত্ত মাত্র, অন্তরে পূর্বাহ্নেই আবেদন না থাকলে সাড়া জাগে না। সুতরাং, সুভাষচন্দ্রের আবেদনেই সাড়া পড়ে গেছল একথা যেমন সর্বাংশে সত্য নয়, সুভাষচন্দ্র, অন্যান্য জননেতা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগও তেমনি উপেক্ষণীয় নয়। এই দুই-ই সত্য এবং দুইয়ের আন্তঃক্রিয়ায়ই ঘটনা গতিলাভ করেছে। মর্মে বেদনা বা আকুতি থাকাই যথেষ্ট নয়, সে-বেদনাকে মুখর বাঙ্ময় করার জন্যেও চাই প্রবক্তা, নেতা।

হে বিচারক, বিচার কর

সুভাষচন্দ্র প্রমুখের যে-অভিযোগে কারদণ্ড হল তাও এই—এই নেতৃত্ব। ওঁদের দণ্ড দিয়ে বিচারক বললেন,

> "The leader of the procession, accused Subhas Chandra Bose, in his speech delivered that evening has explained its meaning and intention in the most clear language, namely, 'That we may live as freemen under a free sky."

"মিছিলের নেতা 'আসামী' সুভাষচন্দ্র বসু সেদিন সন্ধ্যাকালে তাঁর বক্তৃতায় এর অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার-ভাষায় বুঝিয়ে দেন: 'আমরা যাতে এই উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত মানুষের মতো বিচরণ করতে পারি।' ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে মিঃ গান্ধী ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাব তুললে তার ওপর সংশোধনী এনে তিনি (সুভাষচন্দ্র) তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এই মর্মে সংশোধনী ছিল যে, ভারতীয় জনসাধারণের লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের স্বাধীনতা হতে পারে না। এর অর্থ মোটেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নয় এবং এখানে এ তর্ক বৃথা যে, এক্ষেত্রে বিপ্লব অর্থ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বোঝাচ্ছে, বৃটিশ সম্পর্ক ছেদ করা নয়।

"অভিযুক্ত পক্ষ এ যুক্তিও দিতে চেষ্টা করেছেন যে, আসামীরা কংগ্রেসকর্মী এবং কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়নি; অতএব, তাঁরা অনুগত কংগ্রেসকর্মী হিসেবে পূর্ণ-স্বাধীনতার কথা তো প্রচার করতে পারেন না। কিন্তু ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতে এই একটি অনুচ্ছেদ আছে যে, ১৯২৯-এর ৩১-এ ডিসেম্বরের মধ্যে অথবা তার আগে যদি বৃটিশ পার্লামেণ্ট নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ না করেন তবে কংগ্রেস দেশবাসীকে কর না দিতে

বলে অহিংস অসহযোগ সংগঠিত করবে এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কেউ যদি কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা প্রচার করে তবে তাতে বাধা দেওয়া হবে না। সুতরাং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও মিছিলের পরিচালকেরা সেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন যার লক্ষ্য হল বৃটিশ গবর্নমেণ্টের অবসান ঘটানো ; মিছিলে বাহিত 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক,' 'হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু' প্রভৃতি প্ল্যাকার্ডেই তা প্রতিপন্ন।

"Down with Imperialism" সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক লিখিত প্ল্যাকার্ডটির উল্লেখ করে বিচারক বললেন, এখানে সাম্রাজ্যবাদ অর্থ, ভারতে বৃটিশ সরকার, সুতরাং এর নিপাত হতে পারে তখনই যখন বৃটিশ সরকারের অবসান হবে। এরই সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে আর একটি পোস্টারে এই লেখাটিও : জয় রিপাব্লিকের, Up with the Republic. এদেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করা—কেন না, the British Government is a constitutional monarchy."

খস্ করে একটা কাগজ টেনে বললেন—

Crime of Patriotism শিরোনামায় অমৃতবাজার পত্রিকা লিখলেন :

"গত ১১-ই আগস্ট নির্যাতিত রাজনীতিক দিবস পালনের জন্য মিছিল ও সভানুষ্ঠান হয়েছিল, তাকে উপলক্ষ করে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে ১৯৩০-এর ২৩-এ জানুয়ারি রাজদ্রোহ এবং রাজদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযোগ তোলা হয়।"

'In a dependent country patriotism has always been a crime."

"পরাধীন দেশে দেশপ্রেম সর্বদাই অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সহকর্মীদের মতো উচ্চশিক্ষায় মার্জিত ও সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও অতি সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য বিচারে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

"The law of sedition in this country is elastic; its interpretation is largely determined by the prevailing political atmosphere in the land and specially by the mood and temperament of the Bureaucracy. এদেশে রাজদ্রোহের আইনের ব্যাখ্যা বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের ভাবগতি ও মেজাজের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং, কখন কোন্ জাতীয়তাবাদী এই জালে জড়িয়ে পড়বেন তাও একটা ঘটনা চক্রের ওপর নির্ভর করে। এই মামলায় আদালতের অভিমত এই যে, গবর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্বেষ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন বসু ও তাঁর সহকর্মীরা। হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের এই সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে উচ্চতর আদালতেও। এমনও হতে পারে, এই অকারণ কঠোর দণ্ডাদেশও অপরিবর্তিত থাকবে।

> "But in spite of the judgment of the court of law, people will draw their own conclusion about the merits of the prosecution and the trial."

"জনসাধারণ আদালতের এই রায় সত্ত্বেও এঁদের নিরপরাধ সম্পর্কে অবিচল বিশ্বাস রাখবে এবং এই যে দণ্ড তা দেশপ্রেমের মূল্য বলেই গণ্য করবে।"

আসন্ন স্বাধীনতা দিবস পালন সম্পর্কে ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়—

> "Srijut Subhas Chandra Bose will be doubtlsss very greatly missed during the progress of the Independence campaign. But his compulsory absence from the field of his labours at this crisis will entail a more onerous responsibility in the shoulders of his collegues and followers. And the authorities who might be chuckling over his present fate may rest assured that far from weakening the movement, his punishment will rather give an additional impetus to it."

জওহরলাল এই দণ্ডকে বলেছিলেন "Savage", এবং এও স্বীকার করেছিলেন যে, এই বিরাট সংগ্রামে বাংলাদেশ আবার নেতৃত্ব নিল

এবং তার শ্রদ্ধেয় সন্তানেরা এই বলে গর্ব করতে পারেন যে, স্বাধীন ভারতের সেনাদলে তাঁদেরই হল প্রাগ্রসর হবার সৌভাগ্য।

> "For accompanying a procession they have been awarded the savage sentence of one year's rigorous imprisonment. Bengal has taken the lead again in the great fight and her honoured sons may well be proud that it has fallen to their lot to be the vanguard in the army of Independent India."

অমৃতবাজার পত্রিকা আরও খবর দিয়েছিলেন যে, এই দণ্ডের সংবাদ শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং এর প্রতিবাদে এক সভানুষ্ঠানের আবেদনে স্বাক্ষর দিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবা গুরদিৎ সিং, শেখ মুজিবর রহমান, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, রমাপ্রসাদ মুখার্জি, সামসুদ্দিন আহমেদ, জালালুদ্দিন হাসেমী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জি এবং আরও অনেকে।

রাজদ্রোহ আরও রাজদ্রোহ

শুধু তাই নয়, সত্য, আবহাওয়াটা তুমি এ থেকেও অনুমান করতে পার যে, একদিকে এমনি আরও একটি মামলায় ঐ এক বছর করে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর কারাদণ্ড হল, অন্যদিকে হাইকোর্টে বিচারপতি পিয়ার্সন ও প্যাটার্সন এই বলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখের জামীনে মুক্তির আবেদন নামঞ্জুর করলেন যে, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সভাসমিতিতে যোগ দেবেন না বলে মুচলেকা দিতে রাজি হননি। আবেদনকারীরা বলেছেন, তাঁদের আত্মসম্মান, মান ও মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছুতেই এই মুচলেকায় স্বাক্ষর দিতে তাঁরা রাজি হতে পারেন না।

এই সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ আগেকার প্রবন্ধটিতেই মন্তব্য করলেন :

> "It is a pity that the learned judges of the High Court before whom the bail application was moved on behalf of

the accused could not agree to release them without demanding a humiliting undertaking. The decision of the accused to refuse the offer on this insulting condition was just what was expected of the men of their type."

আর যে একটি রাজদ্রোহের মামলার কথা বলেছি তার নাম ছিল তখন দক্ষিণ কলকাতা কর্মীদের মামলা—South Calcutta Workers' Case. ঐ এক অভিযোগ—রাজদ্রোহ এবং রাজদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্র ; এতে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা যুবসমিতির সেক্রেটারী বিনয়েন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের মেজর সত্য গুপ্ত, প্রেম সিং প্রেম ও সুশীল ব্যানার্জি। এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হল। কিন্তু আবহাওয়াটা কেমন ছিল জানো, সত্য ?

"ম্যাজিস্ট্রেট আসবার আগে আদালত কক্ষ যেন সশস্ত্র পুলিশ ও সাধারণ কনষ্টেবলের সমাবেশে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আদালত-কক্ষের বাইরেকার চত্বরে কঠিন পুলিশ বেষ্টনীর প্রহরা এবং আগমন নির্গমনের পথ সার্জেন্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন।" সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের ডেপুটি কমিশনার এক ডজন ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর নিয়ে গেটের কাছে উত্তেজিত জনতার ওপর নজর রাখছেন ; পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে এই জনগণ সমবেত। আদালত কক্ষের সর্বত্র সশস্ত্র সার্জেন্টদের প্রহরা—যেন তারা একটা জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত। ম্যাজিষ্ট্রেট আসবার অনেক আগে যেখানে যতটুকু সম্ভাব্য স্থান ছিল বসবার তা জুড়ে রয়েছেন বহু উকিল ও কংগ্রেসকর্মী।

যেই ম্যাজিস্ট্রেট বেলা সাড়ে এগারোটায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন অমনি চারদিকে গগনভেদী চীৎকার উঠল, "Long live Revolution", "Down with Imperialism." ম্যাজিষ্ট্রেট কঠোর তিরস্কার উচ্চারণ করে তাঁর রায় পড়তে শুরু করলেন।

তুমি অনুমান করতে পার, সত্য, এই পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস কি ব্যাপক প্রকৃতি লাভ করেছিল ? কিন্তু তোমার সে অনুমানও হবে অসম্পূর্ণ ; কেননা, প্রাক্-স্বাধীনতা দিবানুষ্ঠানের ক্ষুব্ধ কালের এ এক ভগ্নাংশমাত্র।

তোমাকে বন্দবিলা সত্যাগ্রহের কথা বলেছি। বলিনি মুন্সীগঞ্জ সত্যাগ্রহের কথা। সে আর এক সত্যাগ্রহ। মুন্সীগঞ্জ ঢাকা জেলার অন্তর্গত এক মহকুমা—বিক্রমপুর—তারই এক ছোট লোকালয়, আদালত, কাছারী, গঞ্জও ছিল। আর ছিল সেখানে এক কালী মন্দির, গির্জা বা মসজিদ নয়, হিন্দুর দেবীমন্দির, তবে বেশির ভাগ হিন্দুরই ছিল সেখানে প্রবেশ নিষেধ, তারা অস্পৃশ্য এই বিধান দিয়েছিল দুরাচারী কোন ব্রাহ্মণ; স্বামী সত্যানন্দ বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের—সকলের জন্য—সে মন্দির-দ্বার শক্ত হাতে মুক্ত করার জন্য শুরু করেছিলেন সত্যাগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবকেরা বিষয়-জ্ঞানী বিষয়ভোগী ব্রাহ্মণের পক্ষে। মন্দির-দ্বার খুলবে না তারা। কিন্তু এমন মানুষও আছে, সত্য,

> "...............যে শুনেছে কানে
> তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
> সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
> নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
> শুনেছে সে সংগীতের মতো।"

উনি যে এত ভালো আবৃত্তিও করতে পারেন, ভাবিনি, কথা বলতে পারেন আবেগ দিয়ে এই জানতাম, কানে অনেকক্ষণ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সঙ্গীতের মতোই। তিনিও ক্ষণকাল চুপ করে ছিলেন। তারপর বললেন, খুলতে হয়েছে সে মন্দির-দ্বার। শুধু তো মন্দিরদ্বার নয়, খুলল অনেক হৃদয় এবং সে সব হৃদয়ে স্বাধীনতার হাহাকার। বল, সত্য, স্বাধীনতা দিবস পালনের সমিধ নয় এসব?

আর মীরাটে, দিল্লীতে, লাহোরে।

মীরাটে ১১ই জানুয়ারি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ৩১-জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করে আরও এক বিচারক বললেন:

তুমি, তুমি আর তুমি

> "You, in and between 1925 and 1929, within and without British India, agreed and conspired together with one another and with. Amir Haider Khan (absconding accused) and persons and bodies mentioned in the list attached and other persons known and unknown and not before the Court to deprive the King of the Sovereignty of British India and thereby committed an offence punishable under section 121-A of the Indian Penal Code and within the cognizance of the Court of Sessions.
> "And I, herely, direct that you shall be tried by that Court under that said charge."

৩০০ ফুলস্ক্যাপ পৃষ্ঠায় টাইপ করা এই এপিক রায়ের ফাঁক দিয়ে একজন মাত্র অব্যাহতি পেয়েছিলেন; তিনি ধরমবীর সিং। তাঁকে নিয়ে মোট ৩২ জনের মধ্যে জন্মবিচারে ছিলেন ২৪ জন হিন্দু, ৪ জন মুসলমান, ৩ জন (ইউরোপীয়ান) খৃস্টান, ১ জন পার্সী; এক মহামিলনই বলতে হবে। নামবিচারে ছিলেন ফিলিপ স্প্র্যাট, বি. এফ. ব্রাডলে, অযোধ্যা প্রসাদ, সৌকৎ উসমানী, পূরণচাঁদ যোশী, গৌরীশঙ্কর, এল. আর. কদম, ভি. এন. মুখার্জি, এইচ. এল. হাচিনসন, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জি, মুজফ্‌ফর আহমেদ, গোপাল বসাক, সামসুল হুদা, কিশোরীলাল ঘোষ, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, সচ্চিদানন্দবিষ্ণু ঘাটে, চণ্ডি রায় থেংডি, এস. এইচ. ঝাবওয়ালা, কেশব নীলকান্ত, শান্তারাম সবলারাম মিরাজকর, রঘুনাথ শিবরাম নিম্বকর, গঙ্গাধর মোরেশ্বর অধিকারী, অর্জুন আত্মারাম, গোবিন্দরামচন্দ্র কাসলে, সোহনসিং যোশী, এম. এ. মজিদ ওরফে আবদুল মজিদ, কেদার নাথ সেগল।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগে আবহাওয়াটা বুঝে নেবার জন্য তোমায় মনে করিয়ে দেব এসেম্বলিতে বোমা বিস্ফোরণের

মামলা, লাহোরে ষড়যন্ত্র মামলা, কলকাতার কলাবাগান বস্তিতে বোমা পাবার জন্য আর এক প্রস্থ গ্রেপ্তার ও মামলার আয়োজন, জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে স্পেশ্যাল বেঞ্চের দীর্ঘায়তন রায়, লাহোরে আরও এক প্রস্ত গ্রেপ্তার, বাজেয়াপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রদেশ-প্রদেশান্তরে ঢালাও তল্লাশি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে প্রথম রাজনৈতিক প্রচারের উদ্গাতা ও ল্যাণ্টার্ন বক্তৃতার জাদুকর জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর "বিপ্লবী বাংলা"র বাজেয়াপ্তি ও তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা, বাঁকুড়ার এক হেডমাস্টার রামকৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ, বরিশালের দেওয়ালে দেওয়ালে "বিষ-বাণী" পোস্টার। আবহাওয়াটা স্পর্শ করতে পারছ, সত্য?

লাহোরের রামগলিতে বোমা, বাংলার রাজসাহী পুটিয়ায় মেল ডাকাতি, আর চারিদিকে বিপ্লবী ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। এই সব নয়, তোমায় কিছু কিছু বলে যাই।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত এসেম্বলি বোমা বিস্ফোরণের দায়ে তাঁদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করেছিলেন; বিচারপতি ফোর্ড ও এডিসন এই বলে তা নামঞ্জুর করে দিলেন যে:

> "It is no excuse to say that Bagat Singh and Batukeshwar Dutt were sincerely and passionately actuated by a desire to alter the present order of things. We hold that the explosions of the bombs in the Assembly, however carefully the missiles might have been thown were imminently dangerous acts, such as the appellants, must be deemed to know, would in all probability, cause death or atleast, such bodily injury as was likely to cause death."

লাহোর মামলা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল। ১৬-ই জানুয়ারি সিং, দত্ত আর কুন্দনলাল বাদে ১৫ জন স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করে জামীনে মুক্তি প্রার্থনা করলেন, কেননা, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের এটর্নীদের আদালত কিম্বা জেলে দেখা করতে

দেওয়া হয় না, তাঁদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ করলেও ম্যাজিস্ট্রেট কর্ণপাত করেন না, আদালতের ঘটনার জন্য, এমন কি, আদালত অবমাননার জন্যও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা

কলকাতার কলাবাগান বস্তিতে বোমা পাওয়ার জন্য প্রথম দফায় ধরা পড়লেন অপেক্ষাকৃত দু'জন বয়স্ক সহ একদল যুবক; তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, বিভূতি ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নির্মল দাস, রমেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, আনন্দ কুমার দাস, দেবপ্রিয় চ্যাটার্জি, ধরণীকান্ত বসু, নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, সুধাংশু কুমার আইচ।

আরও তল্লাশি আরও গ্রেপ্তার হয়েছিল কলকাতারই জোড়াসাঁকো থানায় মদন চ্যাটার্জি লেনের কাছাকাছি পাঁচু ধোপানী লেন, পার্বতীচরণ ঘোষ স্ট্রীট এবং শ্যামপুকুর থানার কুমারটুলী অভয় মিত্র স্ট্রীটের কয়েকটি বাড়ি থেকে ধরা পড়লেন: মহিমারঞ্জন সেনগুপ্ত, সুবোধ রঞ্জন চক্রবর্তী, শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত, মহেন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্র বসু, সুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল বিশ্বাস, সুধীর রায় চৌধুরী, সুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, সত্যব্রত সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নৃত্যগোপাল রায়, তারাপদ গুপ্ত।

সত্য, কলাবাগান বস্তির বোমা আবিষ্কার থেকে যে মামলা, তার আর একটা নাম মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। এ শুধু একটা গোয়েন্দা কাহিনীমাত্র নয়, এ হচ্ছে বাংলার গুপ্ত বৈপ্লবিক দলে চাপা গুঞ্জনের একটা কবাট উদ্ঘাটন। বোমাটা ফাটতে পারেনি, বোমা পড়েছিল আসলে বৈপ্লবিক দলের নিষ্ক্রিয় দাদাদের মাথায়।

বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর প্রধান দুটো নাম অনুশীলন আর যুগান্তর; অনুশীলন একটিই দল, অপেক্ষাকৃত বড় ও পরিব্যাপ্ত, কিছু প্রাচীনও। কিন্তু যুগান্তর ঠিক একটি দল নয়, অনেক ছোট দলের

একটা ফ্রন্ট বিশেষ। ১৯০৫ থেকে ১৯১০-১১ অবধি বাংলা দেশে যে ক'টি বিপ্লবী দল ছিল, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুরারীপুকুর বা মাণিকতলা বোমার মামলার উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গেই তা স্তব্ধ হয়ে আসে। ১৯১৪-১৫ নাগাদ রাসবিহারী বসু প্রমুখের উদ্যোগে একটা বড় রকমের অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের অহিংস অসহযোগে ছ'মাসি স্বরাজের প্রতিশ্রুতিতে বাংলা দেশের ক্রিয়াকলাপ মুলতুবী হয়ে গেছল, গোপীনাথ সাহার ব্যতিক্রম ছাড়া। তারপর আবার যেসব চেষ্টা হয় তারই বিক্ষিপ্ত ফলশ্রুতি হচ্ছে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা, ককোরী ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি।

বাংলা দেশে প্রবীণ বিপ্লবীরা অহিংস অসহযোগকালে আত্মপ্রকাশ করার পর কংগ্রেস ক্যাপচারের দিকে এবং ম্যাস রিক্রুটের মাধ্যমে দলস্ফীতিতে আত্মনিয়োগ করেন ; দল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ছেলেদের মধ্যে ফিসফিসানি ছাড়া কোন কাজই দিতে পারেন না, সব কিছুই কর্ম-সূচীহীন রহস্যে আবৃত থাকে। শুরু হয় গুঞ্জন ; কিন্তু তখন বড়দের ধমকের ভয় ছিল। শেষে সে ভয়ও কাটল, বড়দাদের ওপর স্তরের নিচে মেজদা-ছোড়দারা হাতড়ে হাতড়ে একে অপরকে আঁকড়ে ধরতে লাগল। কলাবাগানে বা মেছুয়াবাজারে হঠাৎ নিষ্ফল বোমার আবিষ্কারে বিপ্লবীদলের এই অসামঞ্জস্য ও বিদ্রোহ উদ্ঘাটিত হল। দাদারা 'সামাল' 'সামাল' করে প্রকাশ্যেই বলতে লাগলেন, ওরা আমাদের কেউ নয় ; অথচ এই দাদাদেরই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো বৃহৎ কাণ্ডের তরফে অনেককেই কানে কানে বলতে শোনা গেছল, ও আমাদের ছেলেদেরই কাজ। অবশ্যই এ অসত্য বে-আবরু হতে বেশি দেরি হয়নি। কিন্তু ধূমায়িত বিদ্রোহের স্পষ্ট রূপ প্রথম পাওয়া গেল মেছুয়াবাজারেই।

সৌভাগ্যবশত আমার হাতে এক রাজনৈতিক গোয়েন্দার একটি অপ্রকাশিত ডায়েরী এসে পড়েছে। তাতে এই পর্যায়কে বলা হয়েছে "তৃতীয়"। বলা হয়েছে : ১৯২৮-এ সব নেতা ছাড়া পেলেন এবং সন্ত্রাসবাদী অভিযানের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। ১৯২৯-এ

বরিশাল সম্মেলনে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী নেতা সকল সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা একমুখীন এবং একই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সর্বত্র একসময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভব করার উদ্দেশ্যে মিলিত হন। কিন্তু মতানৈক্যের জন্য এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অনুশীলনের উগ্রতর গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে বসল এবং এইভাবে এ. আর. জি.-র উদ্ভব হল। যুগান্তরের কেউ কেউ প্রধান দল থেকে বেরিয়ে এসে এ. আর. জি.-তে যোগ দেন। সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত, প্রতুল ভট্টাচার্য এ. আর. জি.-র মুখ্য সদস্য ছিলেন। যুগান্তরের নলিনী দাস প্রমুখ কয়েকজন এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলা এই গোষ্ঠীরই ক্রিয়াকলাপের ফল। এই মিলন-ব্যর্থতার পর এঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 'একটা-কিছু-চাঞ্চল্যকর' ঘটাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন।

ঐ ডায়েরীরই আর এক জায়গায় আছে : অনুশীলন সমিতির তরুণেরা প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শঙ্কর মঠ সদস্যদের সঙ্গে মিলে এক প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ে তুললেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (অনুশীলন থেকে বিতাড়িত), সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে সুধীর আইচ, সুধীর দত্ত, (ঢাকা অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী-বিতাড়িত) প্রতুল ভট্টাচার্য, কলকাতার বিনয়েন্দ্র রায়চৌধুরী, ঢাকার সতীন রায়, ব্রজেন দাশ এবং জে. কে. ওয়াই. এ. ইত্যাদির একাংশ। সুশীল দাশগুপ্ত, মুকুল সেন, বীরেন কুশারী, ধরণী বিশ্বাস (সংগঠক) প্রমুখের পুটিয়া মেল ডাকাতি, এবং মেছুয়াবাজার বোমার মামলা ও পাঁচু ধোপানী লেনের 'আবিষ্কার'। এঁদের তৎপরতার পরিণতি ১৯. ১২. ২৯.-এ কলাবাগান বস্তিতে বোমা সম্পর্কে সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলা সংগঠনের তালিকায় যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের অধিকাংশই বরিশাল শঙ্কর মঠের।

এও এক তরুণের বিদ্রোহ এবং এই অস্থির মানসিকতা স্বাধীনতা দিবসকে নিঃসন্দেহে পুষ্পিত পল্লবিত করেছিল। স্বাধীনতা দিবস

পালনের আগের বিস্মৃত দিনগুলো থেকে সেই সব রত্ন আহরণ করে তোমায় দিচ্ছি, ঐ দিনটিকে উপলব্ধি করার জন্য।

তারই একটি রত্ন মার্কিণ সাংবাদিক ও সুলেখক জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজের" বাজেয়াপ্তি। আমার বেশ মনে পড়ে 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে যখন ওর অধিকাংশ অথবা সব প্রবন্ধ মাঝে মাঝেই বেরিয়েছে অপূর্ব আস্বাদ নিয়ে পড়েছি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের কোল্ড লজিকে বিমুগ্ধ হতাম। মডার্ন রিভিয়্যুর যোগ্য প্রখ্যাত সাংবাদিক-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসাদে বি. ডি. বসুর "রাইজ অব দি ক্রিশ্চিয়ান পাওয়ার" অথবা ডিগবির বইয়ের পর, নামটা ঠিক এক্ষুনি মনে পড়ছে না, অথবা মিস মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়ার" জবাবে লালা লাজপৎ রায়ের "আনহ্যাপি ইণ্ডিয়ার" পর অনেকদিন এ স্বাদ পাইনি। মডার্ন রিভিয়্যুয়ে যদ্দিন খণ্ড খণ্ড বেরিয়েছে তদ্দিন কিন্তু বৃটিশ সরকারের শ্যেনদৃষ্টি বইটির ওপর পড়েনি। পড়ল বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণের পর। হঠাৎ মনে হল যথেষ্ট রাজদ্রোহ তো ছড়িয়ে গেছে, অতএব, বাজেয়াপ্ত হল। সম্পাদক চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে বইখানির মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপীল করলেন সজনীকান্ত দাস। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ বিচারপতি সুরাবর্দী ও বিচারপতি পিয়ার্সনকে নিয়ে যে স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠিত হল তাঁরা দীর্ঘ এক রায় দিলেন।

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'

বইখানির পুরো নাম 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ : হার রাইট টু ফ্রিডাম'। বাজেয়াপ্তির তারিখ ১৯২৯-এর ১৩ই আগস্ট। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে, দ্বিতীয়বার ১৯২৯-এর মে মাসে।

বিচারকদের মতে লেখকের লক্ষ্য আমেরিকার পাঠক সমাজ। বিচারকেরা বাজেয়াপ্তি সমর্থন করবেন এইটে স্থির করে নিয়েই যেন

বইটি, বইয়ের লেখক ও লেখকের উদ্দেশ্যের বিচার করেছেন এবং বলেছেন :

"বইটির সাধারণ বক্তব্য ও যুক্তি হচ্ছে, গ্রেট বৃটেনের ভারতবর্ষ শাসন করবার কোনো অধিকার নেই, এই শাসন অসঙ্গত, নিপীড়ক ও বিষময়, এ মনুষ্যত্বের ওপর অপরাধ এবং বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির পক্ষে আপদস্বরূপ। বইটির আসল উদ্দেশ্য—আমেরিকায় যে ব্যাপক ধারণা আছে, ভারতে বৃটিশ শাসন তর্কাতীত কল্যাণবহ হয়ে আছে তা দূর করা।..........

"ভারতে বৃটিশ আত্মম্ভরিতা নিদর্শনের জন্য একটি অধ্যায় লেখা হয়েছে; আর একটি হয়েছে ভারতের আইনব্যবস্থার নিন্দাবাদে। লেখকের খবর এই যে, ভারতের আইনব্যবস্থার রচয়িতা মেকলে।

"সুতরাং, প্রশ্ন হচ্ছে, বইটিতে রাজদ্রোহাত্মক বিষয় আছে এবং তার প্রকাশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারানুসারে দণ্ডনীয়—এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত কিনা। আমার মতে এর একটিমাত্র সঙ্গত জবাবই আছে যে, এই বইটিতে ঐ বিধানগুলো বারংবার লঙ্ঘিত হওয়ার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত যে কোন আদালতকে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত করবে। আমার বিচারে এইটিই প্রতীয়মান হয়েছে যে, এতে একনাগাড়ে চেষ্টা হয়েছে বৃটিশ-ভারতে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অসন্তোষ সঞ্চারের। এই বিদ্বেষ ঘৃণা ও অসন্তোষ সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই সরকারের সকল ব্যবস্থা, প্রশাসন অথবা ক্রিয়াকলাপের অপযশ কীর্তন করা হয়েছে।.........

> "............It proceeds indeed upon well-worn lines,—every evil and misfortune, be it drunk curse, opium curse, famine or anything else, is atributed to the English government whose foreign origin and character is insisted upon at every page. The baseness of its motive is the ever ready explanation of its policy,... ....

"চিরাচরিত ধারানুসারে, প্রতিটি আপদ ও দুর্গতি—তা মদ্যপানই হোক, আফিম সেবন হোক, দুর্ভিক্ষ অথবা আর যা কিছু হোক, তার

জন্য দায়ী করা হয়েছে ইংরেজ সরকারকে; উৎপত্তি ও প্রকৃতিতে এ যে বিদেশী সরকার তা প্রতি পাতায়ই বলা হয়েছে। এর নীতি ব্যাখ্যায় এর হীন উদ্দেশ্য আরোপ সতত প্রস্তুত।"

বিচারকেরা তো এইভাবে প্রাণ ভরে বইটি ও বইটির উদ্দেশে নিন্দাবাদ করলেন, কিন্তু যাঁদের স্বপক্ষ সমর্থনে এত অপযশ তাঁদের দু'জন ১৯৩০-এ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণ করায় কি রকম ক্ষ্যাপা সভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন শুনবে?

১৯-এ জানুয়ারি লণ্ডনে আর্ল উইণ্টার্টন বললেন:

> "Let me recall to public memory that during the Non-Cooperation days a highly placed Englishman acting with decisive courage arrested Mr. Gandhi and not a dog barked in all India. And non-cooperation immediately collapsed. The present administration has that golden example to follow in the policy which was followed when the arrest of Mr. Gandhi was decided upon."

একটি নয় আরও একটি: এটি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার নাম জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যালীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। স্যার এম. ও. ডায়ার, লণ্ডনে ৫ই ফেব্রুয়ারী এক ভোজসভায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন:

> "It makes one's blood boil to think that a month ago at the seditious and revolutionary meeting held at Lahore the Union Jack was torn down and the revolutionary flag raised instead. We cannot help feeling if we were in Lahore then it would not have been allowed to occur. India is being sacrificed to futile idealisms. British politicians' question is, is it to be sacrificed?"

একজন স্বাধীনতা-দিবস পালনের আগে, একজন পরে; কিন্তু উপলক্ষ এক, অর্থাৎ, ঐ স্বাধীনতা-প্রস্তাব। "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" বইয়ের বিচারকেরা যত দোষ ওতেই দেখলেন, দেখলেন না, কি মানসিকতা থেকে সিডিসান আর অসন্তোষের উদ্ভব হয়। আর্ল উইণ্টারটন বা স্যার ও. ডায়ার লণ্ডনের কোন বিচ্ছিন্ন মানসিকতা নয়,

এখানেও, এই ভারতবর্ষেও, যেসব ইংরেজ অফিসার ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল তাদের মানস-সহোদর। একথা আর কেউ নয় নির্ভেজাল ইংরেজ মিঃ ব্রেলসফোর্ড নিজে চোখে দেখে লিখে গেছেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এদেশ সফর করেছিলেন এবং ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, স্বাধীনতা-দিবস উদযাপন করে দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের কথা যথাস্থানে তোমায় বলব। তাতে তাঁর মন্তব্যটুকু বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেও সমর্থন করে না, সেটি বলি। তিনি বলেছিলেন-ঃ

> "That the police, even under English officers, often meant to inflict physical punishment for disaffection, I could not doubt."

পীড়নের গর্ভেই জন্মালো অসন্তোষ আর বিদ্রোহ, যখন ভাষা পেল তখন তাই হল আইনের চোখে disaffection, sedition, বিদ্রোহ আইনভঙ্গে আইন অমান্যে ; কিন্তু যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অভিভাবক তারাই আইন ভাঙ্গতে লাগল বেশি করে ; আইনের কেতাব ছেড়ে অর্ডিনান্সের হাতিয়ারে শুধু নয়, সত্যি দু'পায়ে সকল আইন কানুন মাড়িয়ে দিতে লাগল সজ্ঞানে।

কনফ্রেন্টশন !

শুরু হল ২৬-এ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালনের উপলক্ষ্যে। সত্য, কারও সাধ্য নেই এই মহাভারতের সংগ্রাম পর্বকে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করতে পারেন। যাঁরা এর ভেতর দিয়ে এসেছেন তাঁদের পক্ষেও এর গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কেউ তা যথাযথ সঙ্কলন করেননি। এর মধ্য থেকে মোটা দাগগুলো শুধু লক্ষ্য করলেই বহু খণ্ডের মহাকাব্য হবে। আমি সে চেষ্টা করব না। একটা ভগ্নাংশ বলে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে বলে যাই, আমি শান্তিপূর্ণ থাকতে চাইলে বা থাকলে আমি অহিংসা পালন করে ওদের সকল আইনকানুনের শেষ কারাগারে প্রবেশ করলেই আবহাওয়া প্রশান্ত থাকবে এ ধারণা

একেবারেই ভুল, ১৯৩০-এ তা প্রতি পদে প্রতিপন্ন হয়েছে ; সন্ত্রাস-বাদীদের জন্যই মিলিটারি ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে, গান্ধীজীর এই তত্ত্ব যে ভ্রান্ত তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে অপরিমেয় রক্ত-লেখায়। সে লেখাও আমরা পড়ব।

২৬-এ জানুয়ারি চিহ্নিত করে রাখবার জন্য কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের খাদি মণ্ডল একটি সুন্দর স্ট্যাম্প ছেপে বিলি করলেন, খামের ওপর অনায়াসেই টিকিটের পাশে সেঁটে দেওয়া যায়। হলদে কাগজে সুন্দর করে ছাপা। ছোট ছোট ব্যাপার, আজকের দৃষ্টিতে হয়তো তুচ্ছ বা হাস্যকর, কিন্তু মনের অভিব্যক্তি বোঝা যায়।

আশঙ্কিত ইংরেজদের আশ্বস্ত করে গান্ধীজী ২৩-এ জানুয়ারি "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" লিখলেন :

> "But whatever I do and whatever happens, my English friends will accept my word that whilst I am impatient to break British bondage, I am no enemy of Britain."

ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট আশ্বাস সেকালের আবহাওয়ায় কত তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বাধীনতা-দিবস পালনের স্রোতোধারায় এসে মিশেছে অনেক ছোট সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রায় স্রোত, এসে হারিয়ে গেছে প্রধান স্রোতোধারায় ; তার মধ্যে কাউন্সিল বর্জনের কার্যসূচী নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ হয়েছিল ; মদনমোহন মালব্য প্রমুখ ব্যক্তিরা এটি চাননি ; কিন্তু একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার, যাঁরা ডেমক্রাটিক পার্টি গড়েছিলেন তাঁদের মুখ্য প্রবক্তা শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ও সুভাষচন্দ্র এই কার্যসূচী সমর্থন করেছিলেন এবং ক্ষমতাধিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাউন্সিল বর্জনের পক্ষেই সমর্থন জানালেন। কিন্তু পট্টভি সীতারামায়া এই দু'টিকে একাকার করে ব্যঙ্গ করেছেন, গান্ধীজী প্রস্তাবের বিরোধীরা একই মুখে স্বাধীনতা ও কাউন্সিলে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু মালব্যও আন্দোলন শুরু হবার পর কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, যেমন পদত্যাগ করেছিলেন লেজিসলেটিভ এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট ভি. জে. প্যাটেল। ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ বক্তৃতা

দেবার জন্য বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। "ককোরী ষড়যন্ত্র মামলা" বইটির লেখক মণীন্দ্র নারায়ণ রায় ও মুদ্রাকর নির্মল চন্দ্র গুহ বর্মনকে তুই বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট দীর্ঘ এক রায়-লিপিতে মন্তব্য করলেন :

ককোরী ষড়যন্ত্র মামলা

"The whole work is evidently done by a convinced revolutionary to extol revolutionaries, and appeal to present day youths to do likewise. It is pure revolutionary propaganda from first to last. Throughout the Government is treated as the legitimate enemy, and spoken of as such ....I have no hesitation on a fair reading of the whole book in finding that the sole intention of the author was to produce a piece of revolutionary propaganda making full use of the emotion he could stir up out of the history of Kakori Dacoity and subsequene trial."

দেখ সত্য, ম্যাজিস্ট্রেট আইনের চশমায় বিপ্লবীকে ক্রিমিনাল হিসেবেই দেখলেন, নিরুদ্ধ, অবসন্ন, আচ্ছন্ন মানস-চোখে দেখতে পেলেন না ভীরু এক জাতের নির্ভয় জাগরণ। দেখতে পেলেন না কোন্ কোন্ জলধর থেকে, ক্যাচমেণ্ট থেকে স্বাধীনতা-দিবসে চাপ এসে পড়েছিল আইনের স্লুইস গেটের ওপর, কৃত্রিম বাঁধ ভেঙ্গে চুরে সারা ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে নিতে আসন্ন হয়ে পড়েছিল। আইনের প্রহরীরা জাল ফেলল বিধিনিষেধের, যাতে-না ঐ দিবসটি পালন করা সম্ভব হয়—মিছিল, সভা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আইন অমান্যের প্ররোচনা দিল আইন প্রহরীরাই। কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক আইন অমান্য আন্দোলনের দেড় মাস আগে।

আমি তখন কলকাতায়; ২৬-এ জানুয়ারিতে যে কোন অঞ্চল ছিল সারা ভারতের দর্পণ, কলকাতা তো বটেই। আমিও শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় আবৃত্তি করেছিলাম। ভাবলে কেমন একটা অব্যক্ত ভাব জাগে, তোমায় বোঝাতে পারব না। তবু সব কেমন অস্পষ্ট

হয়ে এসেছে, তাই তোমায় অমৃতবাজার পত্রিকায় পরদিন ২৭-এ যে বিবরণী বেরিয়েছিল তারই মর্মার্থ বলে যাব :

"কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া দিয়ে বরাবর কলকাতা ভারতের প্রথম নগরীর যোগ্যরূপেই স্বাধীনতা দিবস পালন করল। গত কয়েক দিন ধরেই আয়োজন চলছিল এবং এই বিশেষ দিনটির উষা জাগল এক চাঞ্চল্যের মধ্যে, নরনারী শিশু সবার চিত্তে এক নতুন উদ্দীপনার স্পন্দন। আটটা বাজবার অনেক আগেই শহরের প্রত্যেক পার্কে সাগ্রহী জনসাধারণের সমাবেশ হল—সমাজের কোন্ স্তর থেকে তারা না এসেছে? একমাত্র লক্ষ্য, পতাকা উত্তোলন দেখবে। অনুষ্ঠানের এই-ই সব।

"দেশবন্ধু পার্কে এক অপূর্ব চিত্তস্পর্শী সমাবেশ হয়েছিল; সেখানে কর্ণেল এম. ঘোষের পরিচালনায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এক র‍্যালি হয়েছিল; তিনি জি. ও. সি. সুভাষচন্দ্র বসুর হয়েই সৈনাপত্য করছিলেন। সোনালীবর্ণের উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে মাঠে; আর তেমনি গম্ভীর পরিস্থিতি; এরই মধ্যে মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত বিউগল্, বন্দেমাতরম্, লং লিভ রিভলিউয়ান ধ্বনির মধ্যে পতাকা তুলে দিলেন।

"নির্দেশ অনুসারে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পদাতিক, অশ্বারোহী ও মোটর সাইকেলারোহী সকাল ৭টার মধ্যেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ইউনিফর্ম পরিহিত অফিসার ও ভলান্টিয়ারও একই সময়ে সমবেত হয়েছিলেন। পতাকা উত্তোলনের সময় নির্দিষ্ট ছিল সকাল ৮টা; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই লোকালয়ের অধিবাসীরাও নানা জায়গা থেকে আগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এসে পড়েছিলেন। গেটের মুখে হাজার হাজার জাতীয় পতাকা বিক্রী হচ্ছিল। গোটা পার্কটিকেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ও ফুলে সুন্দর সাজানো হয়েছিল; আর, পার্কের মাঝখানে ছিল একটি বড় পতাকা-দণ্ড, তারই মাথায় এইমাত্র যে পতাকা উঠেছে তাতে বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

"এই সমাবেশে মেয়র সেনগুপ্ত ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্ত্রী, জালালুদ্দিন হাসেমী, মৃনালকান্তি বসু, অমল হোম, কে. এল. গাঙ্গুলী, মৌলবী সামসুদ্দিন আহমেদ, এস. সি. বসু, লতিকা বসু, নিস্তারিনী দেবী, অরুবালা সেন।

"পতাকাটি তুললেন সেনগুপ্ত, কিন্তু সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করলেন জালালুদ্দিন হাসেমী; কেননা, অসুস্থতা বশত সেনগুপ্ত ছিলেন কাতর।

"মাণিকতলা পার্ক-এ তুললেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির পক্ষে হেমন্ত কুমার বসু; গিরিশ পার্কে গোষ্টবিহারী শেঠ, কর্ণওয়ালিশ পার্কে ডাঃ যতীন্দ্র নাথ মৈত্র; এ ছাড়া, বাদুর বাগান, বেলেঘাটায় উঠল পতাকা; কলেজ স্কোয়ারে তুললেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিনয়েন্দ্র কৃষ্ণ বসু, গড়পারে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি, বিডন স্কোয়ারে সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, তারাসুন্দরী পার্কে মুলচাঁদ আগরওয়ালা; উঠল বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে, হোস্টেলে এবং গেরস্থবাড়িতেও।

"অপরাহ্নে মিছিল বেরোলো মনে হল সারা কলকাতার সব গেরস্থরাই সপরিবারে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়। তরুণ কিশোরদের আপাদকণ্ঠ খদ্দর, বক্ষে ত্রিবর্ণ ব্যাজ, কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিত উত্থিত প্রতিধ্বনিত; অলিগলি সব জায়গা থেকে মিছিলের স্রোত বেরিয়ে আসছে, মিশতে চাইছে এক জায়গায় এসে যেখানে সভা হবে।

"অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের আহ্বানে বহু কলেজের ছাত্র সমবেত হল এসে এসোসিয়েশন অফিসের সামনে। তিনটের মধ্যে ৫০০০ ছাত্রের এক শোভাযাত্রা সাজানো হল হ্যারিসন রোডের ওপর; প্রত্যেকের হাতে জাতীয় পতাকা নয়তো বা নানা রকমের বাণী লেখা পোস্টার। শোভাযাত্রা গেল হিন্দু হোস্টেল, হার্ডিঞ্জ হোস্টেল, রিপন হোস্টেল, বঙ্গবাসী, সিটি কলেজ; তারপর আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট হয়ে থামল এসে

বিডন স্কোয়ারে। যে সব পথে এল এই শোভাযাত্রা তাদের দু'পাশে দর্শকেরা শোভাযাত্রীদের ওপর করলেন পুষ্প বর্ষণ আর মেয়েরা বাজালেন শঙ্খ। 'বি. পি. এস. এফ.-ও এমনি এক বড় মিছিল বের করেছিল।

"একবার কিছু ভিন্ন ধরনের উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। হাজরা পার্কের বিরাট সভাশেষে কয়েক হাজার নরনারীর এক মিছিল এগোলো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের দিকে; সেখানে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সবে তাঁরা কারাদণ্ড নিয়ে এসেছেন। চলল সেখানে বিক্ষোভ অনেকক্ষণ ধরে, জেল-গেটের সামনে; উত্তেজনা ফেটে পড়ছে কণ্ঠে কণ্ঠে: Down with Union Jack, up with national Flag, Down with Imperialism, Up with Revolution, বন্দেমাতরম্।

"কিন্তু পুলিশ এখানে সত্যি ছিল অহিংস নিরুপদ্রব 'অসহযোগী'; সাধারণত যা হয়, তা হয়নি, লাঠি চলেনি, গুলি চলেনি। কাঁদানে গ্যাস তখন ছিল না।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প

এমনি সর্বত্র। কলকাতা ছাড়িয়ে শহরতলী, শহরতলী ছাড়িয়ে মফঃস্বলের শহর-গ্রামাঞ্চল, বাংলা ছাড়িয়ে আসাম থেকে কচ্ছ, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা।

সুভাষচন্দ্রের পাল্টা-সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পক্ষে গান্ধীজীর সব চাইতে বড় যুক্তি ছিল, কংগ্রেস কি ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে পরিচিত?

বুঝলে, সতা, এর কিন্তু একটি জবাবই ছিল এবং আজও আছে। পৃথিবীর ইতিহাস কোথাও তুমি পাবে না যে, কোন রাষ্ট্রবিপ্লবে শতকরা একশটি মানুষ অথবা শতকরা একশটি অঞ্চলই লিপ্ত হয়েছে। এদেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অথবা আহ্বানে অথবা উদ্যোগে যে সব

আন্দোলন হয়েছে সেগুলোই "বৃহত্তম"। তবু তাতে প্রত্যক্ষভাবে কারাদণ্ড হয়েছে সারা ভারতে সর্বসাকুল্যে আশি হাজারের বেশি নয়, অন্যান্যভাবে জড়িত হয়েছে, খুব বেশি হলে দু'লক্ষ, অথবা তুমি এক কোটিই ধর—পঁয়ত্রিশ কোটি তো নয়? এবং তাও প্রধানত বৃটিশ ভারতে, সাতাশো দেশীয় রাজ্যে নয়, ফরাসী, পর্তুগীজ অঞ্চলেও নয়। সেই অর্থে ওগুলো সর্বভারতব্যাপী না হলেও কে বলবে ওগুলো ভারতীয় বা ভারতের আন্দোলন নয়? ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের আমেরিকার, রাশিয়ার, চীনের বা যে কোন দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রত্যক্ষ অংশীদার ক'জন? বড়জোর শতকরা পাঁচজন? এত বড় ভারতবর্ষে হিসেব করলে তাও নয়। তবু এমন বললে অসত্য হবে না যে, সেদিন সারা ভারতবর্ষে ১৯৩০-এর ঐ একটি দিন—২৬-এ জানুয়ারি—এই শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল:

> "We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have necessities of life, so that they may have full opportunities of growth."

"আমরা বিশ্বাস করি যে, যে-কোন দেশের মানুষের মতো ভারতীয় জনসাধারণেরও যাতে পরিপূর্ণ বিকাশের অবকাশ উন্মোচিত হয় এজন্য স্বাধীনতা এবং শ্রমলব্ধ ফল ভোগ ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু লাভে তাদের আছে অবিচ্ছেদ্য অধিকার।"

বিচিত্র ভারতের বিভিন্ন মাতৃভাষায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল:

> We believe also, that if any Government deprives a people of these rights and oppress them, the people have a further right to alter it or to abolish it. The British Government in Indiah as not only deprived the Indian people of their freedom but has based itself on the exploitation of the masses, and has ruined India economically, politically, and spirctually. We believe, therefore, that India must severe the British connection and attain Purna Swaraj or Complete Independence.

"আমরা এও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গবর্নমেণ্ট কোন দেশবাসীদের এইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত করে, তবে সেই দেশবাসীদের ঐ গবর্নমেণ্ট পরিবর্তন ও উচ্ছেদসাধনেরও অধিকার আছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতীয় জনসাধাণকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন তাই নয়, জনসাধারণের শোষণের ওপরই সে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে আছে এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সর্বনাশ সাধন করেছে। সুতরাং, আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে বৃটিশ সম্পর্ক-ছেদ করতে হবে এবং পূর্ণ স্বরাজ অথবা অখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।"

> "India has been ruined economically. The revenue derived from our people is out of all proportion to our income. Our everage income is seven pice (less than 2 pence) per day, and of the heavy taxes we pay 20 per cent are raised from the Land Revenue derived form the peasantry, and 3 per cent from the Salt Tax, which falls most heavily on the poor.
>
> "Village industries, such as handspinning, have been destroyed, learing the peasantry idle for atleast four months in the year, and dulling their intellect for want of handicrafts, and nothing has been substituted, as in other countries, for the crafts thus destroyed."

"ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তা তাঁদের আয়ানুপাতকে ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের দৈনিক গড় আয় সাত পয়সা (২ পেন্সেরও কম) এবং আমরা যে কর দি তার শতকরা ২০ ভাগই কৃষক সমাজের কাছ থেকে ভূমিরাজস্বরূপে এবং শতকরা ৩ ভাগ লবণ কর হিসেবে গরীবের ওপরই পড়ে।

"সূতাকাটা প্রভৃতি গ্রামীণশিল্প ধ্বংস হয়েছে; ফলে কৃষকসমাজ বছরে অন্তত ৪ মাস কর্মহীন হয়ে থাকে; কুটিরশিল্পের অভাবে

তাদের বুদ্ধিভ্রংশও ঘটছে, কেননা, তার পরিবর্তে কিছু অন্যান্য দেশে যেমন হয়েছে এখানে তা হয়নি, শিল্পই গেছে ধ্বংস হয়ে।"

"Customs and currency have been so manipulated as to heap further burdens on the peasantry. British manufactured goods constitute the bulk of cur imports, Customs duties betray clear partiality for British manufacturers, and revenue from them is used not to lessen the burden on the masses but for sustaining a highly extravagant administration. Still more arbitrary has been the manipulation of exchange ratio which has resluted millions being drained away from the country.

"Politically, India's status has never been so reduced as under the British regime. No reforms have given real political power to the people. The tallest of us have to bend before foreign athority. The rights of free expression and free association have been denied to us, and many of our countrymen are compelled to live in exile abroad and cannot return to their homes. All administrative talent is killed and the masses have to be satisfied with petty village officer and clerkships.

'culturally, the system of education has torn us from our moorings and training has made us huy the very chains that bind us. 'Spiritually, compulsury disarmament has made us unmanly and the presence of an alien army of occupotion, employed with deadly effect to crush in us the spirit of resistance has made us think that we cannot look after ourselves or put up defence aganist foreign aggression, or even defend our homes and families from the attacks of thieves, robbers and miscreants.

'We hold it to be a crime against man and god to submit any long to a rule that has caused this four-fold disaster to our country. We recognise, however, that the most effective way of gaining our freebom is not through violence. We will, therefore, prepare ourselves by with drawing, as far as we can, all voluntary association from the British Government, and will prepare for civil

disobedience, including non-payment of taxes with doing violence, even under provocation till the end of this inhuman rule is assured. We, therefore, hereby solemnly rosolve to carry out the Congress instructions issued from time to time for the pupose of establishing Purrna Swaraj."

"বন্দর-শুল্ক ও মুদ্রানীতি এমনভাবেই পরিচালিত যেন আরও বোঝা এসে পড়ে কৃষকসমাজের ওপর। আমাদের আমদানি পণ্যের মধ্যে বিলাতী দ্রব্যই বেশি, বৃটিশ পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দর-শুল্কের পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট; তাতে যে রাজস্ব হয় তা জনসাধারণের বোঝা কমাবার জন্য নয়; অমিতাচার এক প্রশাসনকে পরিপুষ্ট রাখার জন্যই ব্যয় করা হয়। বিদেশী মুদ্রাবিনিময়ের বাট্টাও এমনই স্বেচ্ছাচারী যে তাঁর ফাঁক দিয়ে এদেশের কোটি কোটি টাকা গলে যায়।

তারপর, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বিচারে আমাদের কি দুর্গতি হয়েছে তা পর পর বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রমর্যাদার দিক থেকে বৃটিশ আমলে ভারতের যেমন অবনতি ঘটেছে তেমন আর কখনো হয়নি। কোন শাসন সংস্কারেই এ দেশবাসীকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। আমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকেও বিদেশী কর্তৃপক্ষের কাছে নতশির হয়ে থাকতে হয়। মনের কথা খুলে বলার অথবা খুশিমত সংগঠন করার অধিকার দেওয়া হয়নি আমাদের এবং আমাদের বহু স্বদেশবাসীকে বিদেশে নির্বাসনে কালাতিপাত করতে হচ্ছে, স্বদেশে ফিরতে পারছেন না। এ দেশবাসীর মধ্যে যে প্রশাসনিক মেধা তা বিনষ্ট করা হচ্ছে এবং গ্রামীণ অফিসের ছোট কাজও কেরানিগিরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

"সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের (ঐতিহ্য থেকে) মূলোৎপাটিত করেছে এবং আমাদের এমনই তালিম দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের বন্ধনে সকলেই আমরা চুম্বন এঁকে চলেছি।

"আত্মিক বিচারে, জবরদস্তি নিরস্ত্রীকরণ আমাদের কাপুরুষ

করে দিয়েছে এবং বিদেশী সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ও তাদের মারাত্মক প্রয়োগ-প্রভাবে আমাদের প্রতিরোধ স্পৃহা এমন নিঃশেষ করে দিয়েছে যে, আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি, আমরা আত্মরক্ষা করতে পারিনে, অথবা বিদেশী আক্রমণ প্রত্যাহত করতে পারিনে, অথবা চোর ডাকাত দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্য থেকে আমাদের গৃহ, পরিবার রক্ষা করতে পারিনে।

"আমরা এখন মনে করি, যে-শাসন আমাদের স্বদেশে এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করেছে তার কাছে আর নতি স্বীকার করা মানবতা ও দেবতার প্রতি অপরাধ। আমরা অবশ্য একথা মানি যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের সর্বাধিক ফলপ্রসূ উপায় বল প্রয়োগ নয়। আমরা তাই, যতটা সম্ভব, বৃটিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে সেচ্ছা সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিজেদের প্রস্তুত করব এবং কর বন্ধসহ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হব, যে পর্যন্ত না এই অমানুষিক শাসনাবসান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়; কিন্তু প্ররোচনা সত্ত্বেও কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ করব না। অতএব আমরা পবিত্রচিত্তে এই শপথ নিচ্ছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেমন নির্দেশ দেবে তা পালন করব।"

জানিনে, কি মনে করে উঠে পড়লেন; আমার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েই যেন ছোট্ট জানালার কাছে দাঁড়ালেন; বাইরে রোদের ঔজ্জ্বল্য আর নেই, সন্ধ্যারানী আঁচল ছড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে আসছিল, সূর্য বোধ হয় দিগন্তে নেই অথবা অন্তিমে—।

হঠাৎ ঘুরে বললেন, এই দীর্ঘ অভিশপ্ত জীবনে এই শপথ কতবার যে উচ্চারণ করেছি, কতবার যে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, অনির্বাণ প্রত্যাশায় দিনের পর রাত, রাতের পর দিন গুনেছি তা তোমায় বলতে পারব না, সত্য, সবটা বোধগম্য ছিল না, তবু মনে হত এতো আমার হৃদয়েরই কথা এবং তাই তো মুখের কথায় অমন করে হৃদয় আছড়ে পড়ত।

চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুযোগ বুঝে জিগেস করলাম, আজ পড়ে না?

কেমন অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললেন, না। তারপরই আবার খোলা জানালার দিকে মুখ ফেরালেন। সন্ধ্যারানী ততক্ষণে তার সব কালো চুল ছড়িয়ে দিয়েছে।

পরদিন যেতে বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার কাছে আমার জবাবদিহি আছে। আজ যে, ঐ মুখের কথায় হৃদয় আছড়ে পড়ে না, তার কারণ ওশপথ-মন্ত্র অবিমিশ্র সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভূমিকাটি সুন্দর ও সত্যও বটে। কিন্তু যেখান থেকে চতুর্বিধ সর্বনাশের সবিস্তার বর্ণনা শুরু সেখানে খাদ মিশেছে অনেক। অর্থনৈতিক শোষণটা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নিহিত, সুতরাং, ওটি তর্কাতীত। কিন্তু কৃষকসমাজ অথবা সমগ্র সমাজের দুর্গতি কি তার চরকা জড়িত কুটির শিল্পের বিলুপ্তি সাধনে? কৃষক, ভূমি, ভূমি-রাজস্ব, স্বত্ব স্বামিত্বের মধ্যে কোন বেদনা ছিল না? এক বাংলা দেশেই ১৯৩০-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে গ্রামীণ অর্থনীতি কি ভেঙ্গে পড়েনি? এবসেন্টি ল্যাণ্ডলর্ডের উদ্ভব কি ১৯৩০-এর পর? এরাও তো জমির বিকল্প পণ্যোৎপাদন শিল্পে বিকশিত হতে পারতেন, হননি কেন? সুতরাং বেদনা কি কেবল গুটিকয়েক চরকা আর, তাঁত ঘুনে ধরায়? পরাধীন ভারতবর্ষে এক বোম্বাইয়ের দিকেই শিল্পোদ্যোগ দেখা গেছে। আর বিশেষ কোথাও নয়। যদি চিরকাল ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা নিয়ে জমিতেই আটকে থাকা যেত, চলত ঘরঘর চরকা আর তাঁতের খটখটির জীবন তো মন্দ ছিল না। ছোট শিল্প বা কুটিরশিল্পই কারখানার রূপ পায় বিবর্তনে, তাকে রোধ করবে কে? চরকায়ও তো তা করা যায়নি। উৎপাদন শক্তির শ্রীবৃদ্ধিই আসল শক্তি, যাকে বলা হয় প্রডাকটিভ ফোর্স। সুতরাং, ওতে শুধু পড়ন্ত জমিদারের বিষণ্ণ কান্না আছে, বলিষ্ঠ শিল্প সৃষ্টির শপথ নেই। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা? ভারতের কল্পিত কাল নিয়ে বিলাস

আমি করতে পারব না সত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসে অখণ্ড মানচিত্র বড় বিরল, সুতরাং, সমগ্র ভারতবর্ষের মহিমা মাহাত্ম্যও ক্ষণায়ু; ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য নয়, মারাঠা কনফেজারেসীর ধ্বসে-পড়া আবর্জনার ওপরই উঠেছে ইউনিয়ান জ্যাক। তারপর আর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নেই। পরাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থাকে না; সুতরাং, ওটা আমাদের নালিশ হতে পারে না, ওটা আমাদের অর্জনের কথা হতে পারে এবং তা স্বাধীনতার পরেই, তার আগে নয়। স্বাধীন্ হলেই যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা চির প্রতিশ্রুত এমন নয়, যুদ্ধে হেরে গিয়ে শুধু নয়, কূটনৈতিক ব্যর্থতাও অমর্যাদার কারন হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা—ভিন্‌দেশ, থাক তাদের হেনেস্তার কথা; আমাদের স্বাধীন ভারতের ১৯৪৭-এ কাশ্মীর নিয়ে কূটনৈতিক ব্যর্থতা ও অমর্যাদার জের টেনে চলছিনে আমরা? ১৯৬২-তে চীনের সামান্য সীমান্ত ধাক্কায় স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ধুলোয় ধূসরিত হয়নি?

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে আমাদের ঐতিহ্য থেকে উৎপাটিত হয়েছি একথা সর্বাংশে সত্য নয়, বরং, অনেকাংশে তার উল্টো। শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত-পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে যে শিক্ষা ঐতিহ্যের অভিমান করে থাকি তা বৃহত্তর সমাজের কাছে ছিল দুর্গম বা অজ্ঞেয় এবং ক্রমে ঐ সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণের যক্ষধনও বিলুপ্ত প্রায় হয়; তার অধিকাংশ উদ্ধার করেছে ঐ শাসকজাতের মানুষেরাই, তাঁরাই দিয়েছেন আমাদের আত্মপরিচয় এবং তাঁদেরই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ব্রাহ্মণেতরও নিজেকে মানুষ বলে জেনেছে। গুটিকয়েক হিন্দীওয়ালার এই অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা তোমায় যেন-না কখনো স্পর্শ করে সত্য। স্বাধীনতার কথা, জাতীয়তার কথা, আত্মমর্যাদার কথা ইংরেজদের কাছে শেখা বুলি অন্তরস্থ করতে হয়েছে যন্ত্রণায়। শীর্ষস্থানীয় নেতারা ভালো ইংরেজী লিখতে পারার জোরেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী দুঃসহ পীড়নকে

অস্বীকার করবে কে? কিন্তু সেজন্য আমাদের দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়।

আর এও আমি বুঝিনে, সত্য, অহিংস যেখানে আমার মূলমন্ত্র সেখানে নিরস্ত্রীকরণকে দুষব কেন? তবে তো স্বীকার করতে হয়, অস্ত্রের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ আছে। ওটা কেড়ে নিলে আমার আত্মাও নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। যে অস্ত্রের যোগে আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী সে-ই লাঠি কেড়ে নিলে শোকার্ত হবে। সুতরাং, অহিংসার সঙ্গে disarmament-এর দুঃখ আর এরই অভাবে কাপুরুষ হলাম এই আর্তি মানিয়ে নেওয়া কঠিন। কেন না, শেষ প্যারাটায় অযথা বলপ্রয়োগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা চাওয়া বা পাওয়ার জন্য আকুতি এক কথা, অহিংসা বা বলপ্রয়োগ করা না-করা ভিন্ন কথা।

তবু এই শপথ-বাণীই বহুজনকে অনুপ্রাণিত করেছে; কেননা, ওটি ছিল হৃদয়-আকুতির একটা অবলম্বন, অভিব্যক্তির একটা বাহন, বুদ্ধি দিয়ে তার বিচার হয়নি। সব সময় তার দরকারও হয় না; হৃদয়াবেগে অর্থহীনও অর্থবহ হয়। আমার জীবনেই যা সেদিন হৃদয়াবেগে সর্বাংশে সত্য হয়েছিল, হয়তো কিছু বেশিই ছিল, আজ তাই বিচারকের আলোকে খর্ব হয়েছে।

সুর-ধ্বনিতে অ-সুরের কণ্ঠ

কিন্তু সেদিন যাঁরা এ শপথের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের হৃদয়াবেগও ছিল না, বুদ্ধির প্রাখর্যও ছিল না। উত্তর প্রদেশের যে-অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের আরাবেই পরিণামে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হল তাঁরা স্বাধীনতা-প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন; তাঁরা এক বিবৃতিতে আজান দিয়েছিল:

> "We are in fundamental disagreement with the Resolution of Independence passed by the Indian National Congress. We are strongly of opinion that the Resolution is

dangerous. Our community will take no part in any action by Congress to effectuate its demands."

মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকৎ আলি, সফি দাউদি ও নবাব ইসমাইল খান আর এক বিবৃতিযোগে মুসলমানদের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করলেন ; এর কারণ হিসেবে তাঁরা বললেন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা-সমাধানে কংগ্রেস নেতারা কোন চেষ্টা করেননি।

তুমি খেয়াল রেখে যেও, সত্য, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে দুটি বড় সর্তের কাঁটা ছিল; একটি গান্ধীজীর অহিংসা, আর একটি এই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। অথচ এ দু'টির কোনটির সঙ্গেই স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। এ যেন অনেকটা হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা। ফলে স্বাধীনতা-দিবসেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে মিশোলো ধর্ম-সংস্কার অহিংস নীতির পাশে। চাকা ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলল দিনের পর দিন ; স্বাধীনতার বেদীমূলে নয়, ধর্মান্ধতা ও অহিংসনীতির বেদীমূলে চলল অব্যাহত রক্ততর্পণ।

আর, দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে পাতিয়ালার মহারাজা তাঁর এক দরবারে . বললেন, "স্বাধীনতার লক্ষ্যাদর্শের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর কোন সংশ্রব নেই এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্ট যে দমননীতিই অনুসরণ করুন না কেন রাজন্যবর্গ তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।"

কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভ্রান্তি হয়নি। ২৫-এ জানুযারী—স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগের দিন—বড়লাট এসেম্বলিতে এক ভাষণ দিলেন। সদুপদেশেভরা সেই দীর্ঘ ভাষণের উত্তরে কাউন্সিল বর্জন বিরোধী "ন্যাশানালিস্টগণ এক বিবৃতিতে বললেন ঃ

"বড়লাটের ভাষণ শোনার পর আমাদের মনে হল, এটি সাধারণ ভাবে এই ধারণারই সৃষ্টি করবে যে, ভারতের পক্ষে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সুদূর পরাহত এবং দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর সে-লক্ষ্যে পৌছোনো যেতে পারে।

"It is unfortunate that in this connection the Viceroy stresses the distinction between journey and its end.······ We hold the view that in the early establishment of Dominion Status lies the solution of the present difficulties."

আর গান্ধীজী লিখলেন, "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়", তাতে দিলেন কতকগুলো শর্ত ; সে সব শর্ত পালন করলে বড়লাট—"will hear no talk of Civil Disobedience and the Congress will heartily participate in any Conference where there is a perfect freedom of expression and demand."

গান্ধীজীর শর্তগুলো ছিল :

(১) মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ ; (২) এক শিলিং চার পেন্সের অনুপাত হ্রাস ; (৩) ভূমি-রাজস্ব অন্তত অর্ধেক হ্রাস এবং এটি আইনসভার এক্তিয়ারভুক্ত করা ; (৪) লবণ কর প্রত্যাহার ; (৫) সামরিক ব্যয় অন্তত অর্ধেক হ্রাস ; (৬) বড় বড় পদের বেতন অর্ধেক অথবা তারও কমে এমনভাবে ধার্য করা, যাতে কমানো রাজস্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় ; (৭) বিদেশী বস্ত্রের ওপর শুল্ক ; (৮) উপকূল-জাহাজ-রক্ষা বিল ; (৯) হত্যাপরাধে দণ্ডিতের ছাড়া সকল কারাবন্দীর অব্যাহতি, ১২৪ (ক) ধারা, রেগুলেশন ৩ ও ঐ জাতীয় বিধান প্রত্যাহার এবং নির্বাসিত সকলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনুমতি ; (১০) সি.আই.ডি ও তাদের আধিপত্যের অবসান।

এসব মেনে নিলে বড়লাট আর আইন অমান্য আন্দোলনের কথা শুনবেন না এবং কংগ্রেস আহ্লাদের সঙ্গে এমন যে-কোন সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি আছে যেখানে বলবার ও দাবি উত্থাপনের স্বাধীনতা থাকবে।

কিন্তু ৭-ই ফেব্রুয়ারি বড়লাট যে বিবৃতি দিলেন তাতে এই উপদেশই ছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকলে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি। স্বাধীনতায় অপরিমেয় দুঃখ ও সর্বনাশ।

"Prosperity is in store for India if she remains satisfied with being in that position which she occopies to day in the British Empire. While independence will being for her irresponsible misfortune and disaster."

জনচিত্ত বিস্মৃত স্বদেশী

ইতিমধ্যে যাঁরা তথাকথিত "হিংসাশ্রয়ী" আন্দোলনে কারান্তরিত ও জনচিত্তে বিস্মৃতপ্রায় তাঁরাও এক চিঠি দিলেন রাজদরবারে ম্যাজিস্ট্রেট মারফৎ তাঁদের দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার-দাবিতে; অন্যথায় আবার অনশন। চিঠিতে তাঁরা বললেন: পাঞ্জাবর জেলে আটক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দী পাঞ্জাব জেল-তদন্ত কমিটির সদস্যগণের প্রতিশ্রুতিতে অনশন ধর্মঘট স্থগিত রেখেছিলেন; প্রতিশ্রুতি ছিল যে অল্প-কালের মধ্যেই আমাদের সন্তোষমত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের প্রশ্নটি মীমাংসিত হবে। তা ছাড়া, আমাদের মহান্ শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর পর বিষয়টি লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে উত্থাপিত হয় এবং স্যার জেমস ক্রোবরও প্রকাশ্যে ঐ প্রতিশ্রুতি দেন। তখন ঘোষণা করা হয় যে, হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের প্রশ্নটি গবর্নমেণ্ট গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন; দেশের বিভিন্ন জেলে যাঁরা এখনও অনশন ধর্মঘট করে ছিলেন তাঁরা এ.আই.সি.সি.-র অনুরোধে তা প্রত্যাহার করে নেন। ঐ প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এবং কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেই এ.আই.সি.সি. এক প্রস্তাবক্রমে ঐ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

"তারপর সব প্রাদেশিক সরকারই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন, বিভিন্ন প্রদেশের জেলগুলোর ইন্সপেক্টর জেনারেলদের সভাও সমাপ্ত হয়েছে দিল্লীতে। সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়েছিল গত ডিসেম্বরে। তারপর এক মাসেরও কিছু বেশী কাল অতিবাহিত

হয়েছে, কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট চূড়ান্ত সুপারিশগুলোর একটিও বলবৎ করেননি। গবর্ণমেণ্টের এই টালবাহানার জন্য শুধু আমাদের নয়, জনসাধারণের মনেও এই আশঙ্কা জেগেছে যে, বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে গেছে। গত চার মাসে অনশন ধর্মঘটী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যে প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করা হয়েছে তাই থেকে এই ধারণা আমাদের দৃঢ়মূল হয়েছে। কি কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে বিভিন্ন জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা আছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন, তবু যতটা জানা গেছে বলছি ঃ

(১) শ্রীযুত বি. কে.ব্যানার্জি ; দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায়র ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করছেন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে তিনি গতবছর অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। এখন তারই শাস্তিস্বরূপ তিনি এযাবৎ যে রেমিশন পেয়েছিলেন তা থেকে প্রতি অনশন দিবস পিছু দুদিন করে রেমিশন কেটে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে তাঁর কারামুক্তি চারমাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ জেলেই আছেন ৭০ বৎসর বয়স্ক বাবা শোভন সিং, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগী। মিনওয়ালি জেলের এস. কে. কাবুল সিং, এস.গোপাল. সিং এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলে মাস্টার মোটা সিংকেও এমনি প্রতিহিংসামূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

(২) একই অভিযোগে আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে আটক শচীন্দ্র নাথ সান্যাল, রামকৃষ্ণ ছত্রী ও সুরেশ ভট্টাচার্য, রাজকুমার সিংহ, মন্মথনাথ গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ বক্সী ও ককোরী যড়ান্ত্র মামলার "আরও কয়েকজন বন্দীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সান্যালকে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে সেলে আটক রেখেছে এবং তাতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। বেরিলি জেলের বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পদস্থ পুলিশের হুকুমে ২৩ ও ২৪ অক্টোবরে বিচারাধীন বন্দীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে।"

চিঠির উপসংহারে বললেন ঃ

"We still hope that the Government will carry into effect without further delay its promise made to us and to the public so that there might not be another occasion for resuming the hunger strike, unless and until we find a definite move on the part of the Government to redeem its promise, in the course of the next few days we shall be faced to resume hunger strike. (আবার অনশন ধর্মঘট অবলম্বনে বাধ্য হব)।

৬-ই ফেব্রুয়ারি অনশন অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। সবরমতীতে ১৪/১৫/১৬-ই ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে দুঃখ করে বলা হয় যে, গবর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে ; এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে ২৮-এ সেপ্টেম্বর এ. আই.সি.সি. এক প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন ; পরিতাপের বিষয় গবর্নমেণ্ট সে প্রতিশ্রুতি পালন করেননি এবং লাহোর বন্দীরা আবার অনশনে ধর্মঘট অবলম্বনে বাধ্য হয়েছেন।"

তাঁরা এর বেশি কিছু বললেন না। তবে একদিকে অনশন ও আর একদিকে এই স্মারক প্রস্তাব একেবারে নিষ্ফল হয়নি, ১৯-এ ফেব্রুয়ারি সরকার প্রকাশ করলেন সংশোধিত কারাবিধি। সতের দিন অনশনের পর ২৩-এ তারিখে বন্দীরাও অনশন ভঙ্গ করলেন।

জাতির ভালে চন্দন তিলক

১৪। ১৫। ১৬ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশনের কথা বললাম, তাতেই আসন্ন আন্দোলন স্থির হয়ে গেল :

> "In the opinion of the Working Committee, Civil Disobedience should be initiated and controlled by those who belife in non-vidence for the purpose of achieving Purna

Swaraj as an article of faith and as the Congress cont-
-ains in its organisation not merely such men and women
but also those who accept non-violence as a policy esse-
-ntial in the existing circumstances in the country, the
working committee welcomes the proposal of Maha-
tma Gandhi and authorises him and those working with
him who believe in non-violence as an article of faith
to the extent above indicated, to start civil disobedience
as and when they desire and in the manner and to the
extent they decide.

"ওয়ার্কিং কমিটি বিশ্বাস রাখেন যে, অভিযান যখন সত্যই আরম্ভ হয়ে যাবে তখন কংগ্রেসসেবী ও অন্য সকলে যত রকমে সম্ভব আইন অমান্যকারীদের সহযোগিতা করবেন এবং যে প্ররোচনাই আসুক না কেন তাঁরা সর্বতোভাবে অহিংস থাকবেন। ওয়ার্কিং কমিটিও আরও আশা রাখেন যে, গণআন্দোলন যদি শুরু হয়ই তবে যাঁরা আজও স্বেচ্ছায় সরকারের সহযোগিতা করছেন, যেমন আইনজীবী এবং সুবিধাভোগী ছাত্র তাঁরাও সহযোগিতা প্রত্যাহার ও সুবিধা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

তারিখটা সঠিক ছিল ১৫-ই। জাতির বৃহত্তম সংগঠন কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের উদ্যোগ ও দায়িত্ব এইভাবে প্রকৃতপক্ষে এক আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আশ্রমবাসীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অনন্যসাধারণ; জাতীয় সংগ্রামের চাইতেও আশ্রমিক নীতি যেখানে প্রবলতর। এবং এই প্রস্তাবের একাধিক ভাগ। প্রথমভাগ: কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি বিরাট সংগঠনের প্রতিভূ হয়েও এই বলে দায়মুক্ত হল যে, তার মতে পূর্ণ স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন তাঁদের দ্বারাই সূচিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, অহিংসাকে যাঁরা বীজমন্ত্র হিসেবে আত্মস্থ করেছেন।"

ভেবে দেখ, সত্য, কংগ্রেস নয়, তার চাইতে ক্ষুদ্রতর কিন্তু প্রতিনিধিমূলক এ. আই. সি. সি নয়, কংগ্রেসের ক্ষুদ্রতম এ. আই. সি.

সি-র প্রতিভূ ওয়ার্কিং কমিটি নয়, ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম এক সদস্য, এক ব্যক্তি, মহাত্মা আখ্যা বিভূষিত হলেও তিনি ব্যক্তি অতিরিক্ত কিছু নন, তাঁরই ওপর জাতীয় আন্দোলনের ভার সমর্পণ করা হল এবং স্পষ্টতঃই বলা হল, কংগ্রেসে অহিংসায় অবিশ্বাসী লোকও আছে ; অহিংসা নীতির বিচারে নিঃসন্দেহে তারা নিকৃষ্টতর। কেননা, অহিংসা তাঁদের কাছে একটা চাল মাত্র। এই শ্রেণী বিন্যাস বা স্বীকারোক্তির মধ্যে সরকারী গোয়েন্দাদের এবং খোদ সরকারের যে এক মারাত্মক হাতিয়ার শাণিত রইল, ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু আন্দোলন সহিংস উপায়ে দমনের অমোঘ যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে সরকার কিছুমাত্র দ্বিধা বা কার্পণ্য করেনি। প্রস্তাবে বলা হল ঃ "যেহেতু কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এমন সব নর-নারী আছেন যাঁরা দেশের অবস্থা বিবেচনায় অহিংসাকে একটা পলিসি (নীতি নয়) বা পন্থা হিসেবে মেনে নিয়েছেন মাত্র, এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবটি কমিটি সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের যখন ও যেমন খুশি সেই ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অধিকার দিচ্ছেন।"

সবরমতী আশ্রমের একটি একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী, মতিলাল, রাজা গোপালাচারি, সর্দার প্যাটেল, যমুনালাল বাজাজ, শার্দূল সিং কবিশের, সীতারামায়া, সত্যপাল, দৌলতরাম, সৈয়দ মামুদ, শ্রীপ্রকাশ।

প্রস্তাবের দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে যেখানে পরোক্ষ এই স্বীকৃতিও রয়েছে, সূচনা যে বা যারাই করুক, জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপ্তি পেতে হলে, তা যতই মহৎ বলে গণ্য হোক, একটি মাত্র আশ্রমবাসীর সাধ্যায়ত্ত নয়। আরও স্বীকার করা হল, সূচনায় পবিত্রতা রক্ষা করা গেলেও, গতি বা ব্যাপ্তিলাভে সে পবিত্রতা না থাকলেও চলবে,

অহিংসা যাদের কাছে দেশের বর্তমান অবস্থায় পলিসি মাত্র তারাও যোগ দিতে পারবে। অর্থাৎ, আন্দোলনের গতিমুখে ভেজালে আপত্তি নেই। তাদের উদ্দেশে উপদেশ দেওয়া যায় বটে যে, প্ররোচনা সত্ত্বেও (পলিসি হিসেবে) অহিংস থাকবে, কিন্তু বিপরীত অভিব্যক্তি ঘটবে না, অথবা নীতির চাইতেও স্বাধীনতা লাভের আবেগ প্রবলতর হয়ে উঠবে তার প্রতিশ্রুতি কোথায়? তার একমাত্র প্রতিশ্রুতিতে চৌরিচৌরার আকস্মিক "হল্ট চীৎকার"? অথবা ১৯৪২-এর ঘটনা পারম্পর্যের নিন্দাবাদ ও দায়িত্ব অস্বীকার?

এর তৃতীয়ভাগে আছে আইনজীবী ও ছাত্রদের উদ্দেশে আহ্বান, তাঁরা যেন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা সরকারী অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেন।

১২-ই মার্চ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা এবং ৬-ই এপ্রিল গান্ধীজীর কার্যতঃ লবণ আইন ভঙ্গের পর ছাত্রদের উদ্দেশে আরও এক জোরদার প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করেছিল এলাহাবাদে ২৭-এ জুন ঃ

কমিটির মতে এখন সময় হয়েছে যখন ভারতীয় কলেজসমূহের ছাত্রেরা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে, এই উদ্দেশ্যে প্রদেশ কমিটিগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেন ছাত্রদের কংগ্রেসের অধীনে দেশসেবায় তৎপর হবার মত আহ্বান জানায়; এমন কি লেখাপড়া বন্ধ রেখেও কি ভাবে এবং কি পর্যন্ত তারা এই জরুরী অবস্থায় আত্মনিয়োগ করবে তাও বলে দেবে। কমিটির বিশ্বাস, ছাত্রেরা সাগ্রহে এই আহ্বানে সাড়া দেবে।"

বলা বাহুল্য, কলেজগুলো কোন আশ্রম নয় এবং এখানে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে, অহিংসার ওপরে নয়।

ওয়ার্কিং কমিটির ঐ অপরিবর্তনীয় বা তর্কাতীত প্রস্তাবটি আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত এ.আই.সি.সি.-র অধিবেশনেও সমর্থিত হল;

এই অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী, শ্রীমতী নাইডু, শ্রীমতী অনুসূয়া, শ্রীমতী আম্বালাল, শ্রীমতী কমলা দেবী শ্রীমতী উমা, শ্রীমতী রুক্মিণী, নাগেশ রাও, শম্বমূর্তি, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, আব্বাস তায়েবজী, কার্লেকর।

ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থক প্রস্তাবটির নির্দেশনা ছিল—

> "While full preparation should be carried on inspite of any Governmental interference, civil disobedience shall not start till Gandhiji has reached his destination and has actually committed a breach of the salt laws and given the word."

এটিও গান্ধীজীর ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। কেননা, ৬-ই এপ্রিল কার্যতঃ লবণ আইন ভঙ্গের পর গান্ধীজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন:

> "Now that the technical or ceremonial breach of the Salt Law has been committed, it is now open to anyone who would take the risk of prosecution under the Salt Law to manufacture salt wherever he wishes and wherever it is convenient."

হিংসা-অহিংসার বাধা নিষেধ না রেখেই বললেন, অহিংস আশ্রম বাসীরা ছাড়াও, এখন যে কেউ যেখানে খুশি ও যেখানেই সম্ভব লবণ আইনভঙ্গের ঝুঁকি নিতে পারেন।

১৫-ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে নিরঙ্কুশ অধিকার দিলেন, ১৯ তারিখে যুক্তপ্রদেশের গবর্নর স্যার ম্যাকম হেলি কাউন্সিলে ঘোষণা করলেন,—

> "If the extreme wing started civil Disobedience the Government would use every legal means to defeat it and in the event of legal resources proving insufficient, the Government hoped that it would receive the support

of the public and the Council in securing such fresh legal provision as was required."

বলা বাহুল্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা সবরমতী আশ্রমের অহিংস সাধু-সন্তদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের নীতি নির্ধারণ করেননি, করেছেন ওয়ার্কিং কমিটির স্বীকারোক্তি মত কংগ্রেস অন্তর্ভুক্ত অহিংসায় অবিশ্বাসী কংগ্রেস কর্মীদের দিকে তাকিয়েই; প্রচলিত আইনে যদি চরমপন্থীদের (এক্ষেত্রে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাবকদের) নিবৃত্ত করা যায় ভাল, নইলে অপ্রচলিত নতুন বিধানের আশ্রয় নিতে হবে। হুমকিটা একেবারেই প্রচ্ছন্ন নয়।

গান্ধীজীরও ভাবনা ছিল, আইনগত না হোক, নীতিগত। তিনি বন্দী হবেনই। যখন হবেন তখন কে এই নির্ভেজাল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবেন? তিনি এমন মানুষ তো দেখতে পাচ্ছেন না। ২৭-এ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী তাঁর "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" এক প্রবন্ধে বললেন:

> "I must confess that at the present moment, I have no all India successor in view............This peremptory condition must be patent to all, that he must be an out and out believer in the efficacy of non-violence for the purpose intended."

গান্ধীজীর নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী একমাত্র তিনিই হতে পারবেন যিনি সর্বতোভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অহিংসার কার্যকারিতায় বিশ্বাসী। উত্তরাধিকারের এই শর্ত, যে কোন পথে স্বাধীনতা লাভ নয়, অহিংসপথে স্বাধীনতালাভের প্রতিশ্রুতি যিনি দিতে পারবেন এবং তা, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন তিনিই হবেন অদ্বিতীয় নেতৃত্বের দ্বিতীয়।

গান্ধীজী নিজের সম্বন্ধে বললেন:

"আমার দিক থেকে কথা এই যে, আমার ইচ্ছে আমি কেবল আশ্রমবাসীদের এবং যাঁরা এর আশ্রম-আচার মেনে নিয়েছেন ও আত্মস্থ করেছেন, তাঁদের নিয়েই আন্দোলনের সূচনা করি।"

একদিকে গান্ধীজীর নীতিগত উৎকণ্ঠা আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাজপুরুষদের প্রশাসনগত উৎকণ্ঠা, এই দুই বিপরীত কিন্তু একই জায়গায় এসে মিলেছিল—তা হল, পাছে এই পরিকল্পিত আন্দোলন ভায়োলেন্সে পর্যবসিত হয়। তাই দুই দিককার প্রস্তুতি ও সাবধানতা ছিল একই লক্ষ্যে। কেন? তোমায় এক নিঃশ্বাসে তারই একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়ে যাব। ১-লা ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত ২-রা মার্চ অবধি—যেদিন গান্ধীজী রেনল্ডস নামে জনৈক ইংরেজের হাতে দিলেন তাঁর আইনভঙ্গের চরমপত্র বড়লাটের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য। ছত্রিশ ঘণ্টা মেয়াদের চরমপত্র।

ছিন্ন গতি তপ্ত মহাকাল

মহাকালের গতিকে একটা জায়গায় থামিয়ে দিয়ে টানছি ১-লা ফেব্রুয়ারির তারিখ।

চলছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ল্যাংফোর্ড জেমস করলেন উদ্বোধন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলছে, তাঁরা দিলেন অনশন ধর্মঘটের চরমপত্র, চারদিকে "দেশের ডাক" বই নিয়ে, বক্তৃতা নিয়ে, বক্তাদের নিয়ে আইনের হুলুস্থুলু। মাসুয়া ডাকাতির প্রতিধ্বনি শোনা গেল, যখন খবর এল ময়মনসিংহ জেলে প্রবীর গোস্বামী ও জগদীশ ভট্টাচার্য চক্ষুপীড়ায় ভুগছেন। ওঁরা নাকি কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। মেছুয়া বাজার বোমার মামলা সম্পর্কে তল্লাশি হল ঢাকায়। অনশনব্রতী সতীন সেনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে শোনা গেল। রাজদ্রোহের দায়ে বোরস্টাল জেলে আটক হলেন "মিলাপ" সম্পাদক লালা কুশলচাঁদ। "ককোরী দিবস" পালন উপলক্ষ্যে রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন পণ্ডিত দেবনন্দন সিং দীক্ষিত। শুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার জেলবন্দীদের অনশন ধর্মঘট। বন্দবিলা সত্যাগ্রহ বা কর অমান্য আন্দোলন চলছে। কর্মী ধর্মঘটে জি.আই.পি. রেলওয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বারাণসীতে বাঙ্গালীটোলা

কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘের সেক্রেটারী সারনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িসহ এগারো জায়গা তল্লাশি হল বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খোঁজে। মোরাদাবাদের বোমা বিস্ফোরণে এক কনস্টেবল আহত হল। "রক্ত বিনা হে দেশভক্ত দেশ না স্বাধীন হবে", "দেশ দশ চিত্রাবলী" শিরোনামায় দুটি ইস্তাহার হল বাজেয়াপ্ত। এল রাজসাহী-পুটিয়ার ডাক-লুট মামলার খবর। বাঁকুড়া রাজদ্রোহ মামলায় দণ্ড হল হেডমাস্টার রামকৃষ্ণ দাস ও হেডমাস্টার শিশুরাম মণ্ডলের। "বারবের শের" সংবাদপত্রের শিখ সম্পাদক সেবা সিংকে গ্রেপ্তার করা হল রাজদ্রোহের অভিযোগে। আই.সি.এস. পাঠার্থী হরিপদ সেনকে গ্রেপ্তার করা হল বারাণসীতে, দেখতে এসেছিলেন রুগ্ন পিতাকে। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর কারাদণ্ড বহাল রইল, অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জির বিরুদ্ধে রুজু হল রাজদ্রোহের মামলা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক কর্তৃপক্ষ আর ছাত্রীদের মধ্যে এক লজ্জাকর বিরোধ ঘটল। "ভারতমে আংরেজি রাজ" নামে আর.সাইগলের, একখানি বই বাজেয়াপ্ত হল। "Brittania and Eve" নামে আর একখানা বইও। "বিপ্লব" শিরোনামায় এক পোস্টারের খোঁজে পুলিশ মাঝরাতে হানা দিল লাহোরে নবজীবন ভারত সভার প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত রামকিষণের বাড়িতে আর বিরজানন্দ প্রেসে। দিল্লীর পুলিশ সুপার পনের হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন দিল্লী বোমা দুর্ঘটনার নায়ককে ধরে দেবার জন্য। গয়া জেলে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন শুরু করলেন। সিউড়িতে চলছে বিপিন দাস, সুরেন সরকার, জগদীশ ঘোষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা। "ভারতমে আংরেজি রাজ" নিয়ে শুরু হল ফুল বেঞ্চে শুনানী, এলাহাবাদে ১০-ই জানুয়ারি বিচারক বয়েজ, ব্যানার্জি ও মস কিং। উর্দু এক শ্রমিক পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা। নয়াদিল্লীর গুরুকুল ধর্মশালায় অনিল নামে এক বাঙালী

যুবকের গ্রেপ্তার রহস্য সৃষ্টি করল। একদল বন্দবিলা সত্যাগ্রহী ডাকাতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেন। গত স্বাধীনতা দিবসে লাহোরের টাউন হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেওয়ায় গুজরানওয়ালা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মানিকলাল খান সরকারী আদেশে অপসারিত হয়েছিলেন, প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন ছ'জন জাতীয়তাবাদী সদস্য। বাংলাদেশে সাপ্তাহিক স্বাধীনতা সম্পাদক চারুচন্দ্র মুখার্জির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপিত হল। মূলতানে এক বোমা বিস্ফোরণে তিনজন আহত হল। "ফিলজফি অব বম্ব" সম্পর্কে বেনারস ইয়ুথ লীগের এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী কেদার প্রসাদের বিরুদ্ধে হল মামলা রুজু। বাংলাদেশে মাদারীপুরে এক বিস্ফোরণের ফলে আহত অজিত দাশগুপ্ত ও রমেন্দ্র কলকাতায় গ্রেপ্তার হলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল রাজদ্রোহের। আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ ২৭ জন ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হল; রাজসাহীতে আর এক স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের সামনে পুটিয়া মেল ডাকাতির মামলারও খবর পাওয়া গেল, ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে জবরদস্তি খাওয়াবার চেষ্টা চলছে অনশনব্রতী সুকিয়া স্ট্রীট বোমা মামলায় সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত রবীন্দ্র করগুপ্তকে। কলাবাগান বা মেছুয়াবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী ধরণী বসু চাঞ্চল্যকর তথ্যোদঘাটন করতে গিয়ে বলল, রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা হয় না। উর্দু শ্রমিক সাপ্তাহিকের সম্পাদক মহম্মদ সিদ্দিক আবদুল রহমানের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। কৃষ্ণনগরেও চলল এক রাজদ্রোহের মামলা কংগ্রেস কর্মী তারক দাস-ব্যানার্জি প্রমুখের বিরুদ্ধে। "পলাশী অবসানে শীর্ষক বইয়ের খোঁজে ওড়িয়া সাপ্তাহিক "প্রজাতন্ত্রের" অফিসে পুলিশের হানা। লাহোরে পুলিশ বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরির উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ অপহরণের

জন্য ধরল ছ'জন যুবককে। হাজারিবাগ রাজদ্রোহ মামলায় কারাদণ্ড হল রামনারাণ সিংহ ও কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের। ভূসোয়াল বোমা মামলা চলার সময়ে একজন বিচারাধীন বন্দী অকস্মাৎ এক পিস্তল উদ্যত করে একজন সাক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত বন্দীদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থাকল্পে এলবার্ট হলে এক জনসভা ডাকলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, কুমুদশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু, মদন মোহন বর্মন, সতীশচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, জে. সি. গুপ্ত, পি. কে. চক্রবর্তী, জে. বি. সেন, সত্যানন্দ বসু, পদ্মরাজ জৈন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, মহবাবুল হক, মৃণালকান্তি বসু, তুষারকান্তি ঘোষ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, হেমচন্দ্র নাগ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ নিয়োগী, তারকনাথ মুখার্জি, বি. সি. চ্যাটার্জি, জে. চৌধুরী, রামানন্দ চ্যাটার্জি, সামসুদ্দীন আমেদ, জালালুদ্দীন হাসেমী, কে. সি. রায় চৌধুরী, লতাফৎ হোসেন ও এ. সি. মুখার্জি।

সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় এত নাম পড়ে শোনালাম কেন বলতো, সত্য? নিজেই জবাব দিয়ে বললেন, নামগুলোর মধ্যেই বুঝতে পারবে সেকালে রাজনৈতিক শুচিবাই আজকের মত অত প্রগাঢ় হয়নি এবং হিংসা-অহিংসার দাগটাও দুর্লঙ্ঘ্য রকমে স্থূল হয়নি।

আরও একটি বিস্তারিত দৃষ্টান্ত তোমায় দেব; তাতে পাবে তুমি বিচার-বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত; তথাকথিত হিংসাশ্রয়ী মামলায় বিচারাধীন বন্দীরা কিভাবে দণ্ডিত হয়েছেন এবং একবার দণ্ডিত হবার পর অহিংস কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাঁরা কিভাবে অপাংক্তেয় হয়েছেন সাধারণ বন্দীমুক্তির বিচারকালে, সেই বেদনাও ফুটে উঠবে এতে। বাংলাদেশের ঘটনা, কিন্তু মাদ্রাজের "হিন্দু" থেকে তোলা।

"২৪-এ তারিখে আকস্মিক যবনিকাপাত হয় পুটিয়া ডাক লুট মামলার ওপর। এখানে ধৃত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক নিয়মে বিচার

হয়নি, হয়েছে জরুরী বিধি ফৌজদারী সংশোধিত আইনমতো ও স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে। দেখা গেল, সরকারপক্ষের ব্যবহারজীবীর সওয়াল অকস্মাৎ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কৌঁসুলীকে সওয়াল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তিনি বললেন, ৪৯ জন সাক্ষ্য দিয়েছে; দুদিন আগে তিনি তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের জন্য আবেদন করেছেন; ওগুলো সযত্নে না পড়ে তিনি সওয়াল করে উঠতে পারবেন না। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট কেবল যে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন তাই নয়, এমন ঘোষণাও করলেন যে, তিনি পরদিন সকাল ১১-টায় রায় দেবেন। কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেও হয়নি। তিনি সংশ্লিষ্ট পক্ষদুটিকে বেলা তিনটা অবধি অপেক্ষা করতে বললেন। যেই তিনটা বাজল, যে কমিশনাররা চলে গেছলেন তাঁরা ফিরে এসে আসন গ্রহণ করলেন এবং অভিযুক্ত পক্ষের কৌঁসুলীকে সওয়াল করতে বললেন। কৌঁসুলী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অপ্রস্তুত অবস্থায় সওয়াল করতে গররাজি হলেন। তক্ষুণি মিঃ প্রিংলে তাঁর রায় পড়তে লাগলেন—নির্দিষ্ট সময়ের ২০ ঘণ্টা আগে রায় দিলেন: রাখালচন্দ্র দাস ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; সুশীল দাশগুপ্ত ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; ধরণীকান্ত বসু ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।"

ভূসোয়াল বোমা মামলায় সদাশিবের ১৫ বছরের দ্বীপান্তর, ভগবান দাসের ৯-বছর কারাদণ্ড হল।

লাহোর ম্যাজিস্ট্রেট ই. এস. লুইসের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা হল, পিস্তলের গুলি মোটর গাড়রি শার্সি ভেদ করে যায়; কিন্তু গাড়িতে লুইস ছিলেন না, ছিলেন তাঁর এক কাজিন, অল্পের জন্য বেঁচে যান।

গান্ধীজীর চরমপত্র

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বলে যাচ্ছিলেন ঘটনাক্রম—এক নিঃশ্বাসেই বলা যায়। তারপর যেন স্বস্তি-শ্বাস ফেলে বললেন, এসে পড়েছি, সত্য, সারা ভারতের উত্তপ্ত মরু পার হয়ে এসে পড়েছি শান্ত

তপোবন, যেখানে শাস্ত্রী হাত বাড়িয়ে দিলেন আলটিমেটাম—চরমপত্র!

"Dear Friend," বড়লাট লর্ড আরুইনকে বন্ধুরূপে সম্বোধন করে লিখলেন গান্ধীজী—

> "Before embarking on Civil Disobedience and taking the risk I have dreaded to take all these years, I would fain approach you and find a way out. ......While I hold the British rule to be a curse, I did not intend to harm a single Englishman or any legitimate interests he may have in India."

"বন্ধুবর, এত বছর যে ঝুঁকি নিতে আমি ভয় পেয়ে এসেছি সেই আইন অমান্যে অবতীর্ণ হবার আগে আমি কোন একটি পথানুসন্ধানে সাগ্রহে আপনার সমীপবর্তী হতে চাইছি। আমি বৃটিশ শাসনকে এক অভিশাপ বলে গণ্য করি বটে কিন্তু আমি কোনো ইংরেজের অথবা ভারতে তাঁর ন্যায্য স্বার্থের হানি করতে চাইনি।

"বৃটিশ শাসনকে কেন অভিশাপ মনে করি আমি? ক্রমবর্ধমান শোষণ নীতি, সর্বনাশা সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনব্যয় কোটি কোটি মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে, এই ব্যয়ভার বহন দেশের পক্ষে দুঃসাধ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থা আমাদের দাসত্বে পর্যবসিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দিয়েছে ভেঙ্গে এবং নিরস্ত্রীকরণের নীতি অনুসরণে আমাদের আত্মিক অবনতি ঘটিয়েছে।

> "Lacking inward strength, we find reduced by all but universal disarmament to a state of cowardly helplessness."

"আমার দেশবাসী অনেকের সঙ্গে আমিও আশা লালন করে এসেছি যে, প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক হয়তো বা একটা সমাধান আনবে। কিন্তু আপনি যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভা পূর্ণ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের পরিকল্পনা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, তখন বোঝা গেল, যে-সমাধানের জন্য মুখর ভারত

সজ্ঞানে এবং মূক জনসাধারণ অজ্ঞাতসারে উন্মুখ হয়ে আছে, গোল টেবিল বৈঠক হয়তো বা তা দিতে পারবে না। বলা বাহুল্য, পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারকে কখনই নিরোধ করার প্রশ্ন ওঠেনি।

> "Needless to say, there never was any question of Parliament's verdict being anticipated."

"যদিও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে বৃটিশ মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের অভিমত পাওয়ার আগেই কোন একটা বিশেষ নীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হওয়াতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও আমার পক্ষে ১৯২৮-খৃষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করার পন্থা অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

> "But the Resolution of Independence should cause no alarm, if the word 'Dominion Status,' mentioned in your announcement had been used in its accepted sense."

"ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের যে-অর্থ সর্বজনগৃহীত, আপনার ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস' শব্দও যদি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে স্বাধীনতা-প্রস্তাবে আশঙ্কার কিছু নেই। কেননা, দায়িত্বশীল বৃটিশ রাষ্ট্রপ্রাজ্ঞেরাই কি স্বীকার করেননি যে, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস কার্যতঃ স্বাধীনতাই ? অবশ্য আমার আশঙ্কা, ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে ডোমিনয়ান স্ট্যাটাস দেবার কোন ইচ্ছাই কখনো প্রকাশ পায়নি।"

অর্থনৈতিক শোষণ ও অপব্যয় সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, "মনে হচ্ছে, একটি বড় বৃটিশ রাজনৈতিক দলও ভারতের লুণ্ঠন ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গ্রেট বৃটেন, দিনের পর দিন, ভারতের সর্বজনীন বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেও এই কাজে প্রবৃত্ত রয়েছে। যাই হোক, জাতি হিসেবে ভারতবর্ষকে যদি বাঁচতে হয়, অনশনে তিল তিল করে ভারতবাসীর মৃত্যু যদি বন্ধ করতে হয়, তবে আশু ত্রাণের একটা উপায় বের করতেই হবে। প্রস্তাবিত সম্মেলনে নিশ্চয়ই সে উপায় নেই।

"অনেকে মনে করেন, অহিংসা কোন শক্তি নয়। নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ হলেও, আমার অভিজ্ঞতা এই যে, অহিংসাও প্রবল সক্রিয় শক্তি হতে পারে। আমার উদ্দেশ্য এই শক্তিকে কেবল বৃটিশ শাসনে সুসম্বদ্ধ বলের বিরুদ্ধে নয়, বিক্ষিপ্ত বল-প্রয়োগে বিশ্বাসী ক্রমবর্ধমান পার্টিগুলোর বিরুদ্ধেও সক্রিয় করে তোলা।

> "It is my purpose to set in motion that force as well against the organised violent force of the British rule, as the unorganised violent force of the growing party of violence."

"নইলে, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার অর্থ ঐ দুই শক্তির হাতে রাশ ছেড়ে দেওয়া।

"আমি আপনার স্বজাতীয়দের কোন হানি করতে চাই নে। আমি তাঁদের ১৯১৯ অবধি নির্বিচারে সেবা করেছি; কিন্তু আমার যখন চোখ খুলল এবং মনে অসহযোগের অঙ্কুরোদ্গম হল তখনও তাদের সেবাই ছিল আমার উদেশ্য। দেশবাসী যদি আমার সঙ্গে যোগ দেয়, আমি অবশ্য আশা করি যে, তারা দেবে, তবে বৃটিশ জাতি নিবৃত্ত না হলে যে দুঃখ তারা পাবে তা পাষাণ হৃদয়ও গলিয়ে দেবে। আমার আইন অমান্যের পরিকল্পনা হল যেসব দুষ্প্রবৃত্তির কথা বললাম তাদের মোকাবিলা করা। আমরা যে বৃটিশ সম্পর্ক ছেদ করতে চাই তার কারণই হল এই সব দুষ্প্রবৃত্তি নিরস্ত হলে পথ হয়ে যাবে সহজ এবং সৌহার্দপুর্ণ আলোচনার পথও উন্মুক্ত হবে। ভারতের সঙ্গে বৃটিশ-বাণিজ্য যদি লোভ-বর্জিত হয়, তবে আপনাদের পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করা কঠিন হবে না।

"কিন্তু আপনি যদি এই সব দুষ্প্রবৃত্তির মোকাবিলার কোন উপায় দেখতে না পান এবং এ চিঠি যদি আপনার অন্তর স্পর্শ না করে, তবে আমি এ মাসের ১১ তারিখে আশ্রমের যতজন সম্ভব সহকর্মী নিয়ে লবণ আইন অমান্যের জন্য যাত্রা করব।

"যদি আপনি মনে করেন আমার চিঠিতে কিছু বস্তু আছে,

যদি বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন এবং সেজন্য যদি চিঠির প্রকাশনা স্থগিত রাখতে বলেন, তবে আমার এই পত্রপ্রাপ্তির পর আপনার কাছ থেকে সেই মর্মে টেলিগ্রাম পেলেই আমি সানন্দে এর প্রকাশনা বন্ধ রাখব।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই বিশুষ্ক কঙ্কালটির ভেতরে কি আলোড়িত হচ্ছে বাইরে থেকে সহসা বোঝা মুস্কিল, কিভাবেই বা সে তুমুল ঝড় অতটুকু সীমার মধ্যে আছাড় খেয়ে খেয়ে প্রশমিত হচ্ছে কে তার থই পাবে? চোখ বোজেননি, একপাশে তাকিয়েছিলেন, সেই চোখ ফেরালেন আমার দিকে। তেমনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, আমার উৎকণ্ঠিত মনে এও দীর্ঘ কাল ঠেকল—

কি জবাব দিয়েছিলেন বড়লাট তোমার মনে হয়, সত্য? যাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয় তার পক্ষ হয়ে ওর উপসংহার অবধি পত্রলেখক ভারতীয় সেনাসংগ্রহে বৃটিশ শাসকের সহযোগিতা করে প্রত্যাশা করেছিলেন প্রতিদান কিছু দেবে সাম্রাজ্যভোগীরা; সে আশা নিষ্ফল হলে মনে জেগেছিল অভিমান, অসহযোগিতার অভিমান। তারই আর এক নাম অহিংস অসহযোগ। কিন্তু এবার যে আইন অমান্য, তার লক্ষ্য বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী সুসংগঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই শুধু নয়, ভারতীয় বিপ্লবী পার্টিগুলোরও মোকাবিলা করাও তার উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে সাধু এবং সাধুসন্তদেরই উপযুক্ত কাজ। কিন্তু জগতে এই মিথ্যা ঘোষণা করার মতো বুকের পাটা কার আছে যে, তিনি এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনেই সফলকাম হয়েছেন? একটু পরেই দেখবে এবং ১৯৪৭ অবধি দেখবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সুসম্বদ্ধ বলপ্রয়োগের পাষাণ সংগঠন থেকে তিনি এতটকু অশ্রু উদ্গত করতে পারেননি, কিন্তু বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী ভারতীয়দের বিপ্লব প্রচেষ্টা চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, আর তা, ব্যর্থ আইন অমান্য আন্দোলনের নিঃশেষিত শক্তির প্রায় সমসাময়িক। ভারতীয়দের

পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা করেনি, অহিংসার আচার্যরাই করেছেন। বৃটিশের নিরস্ত্রীকরণ নীতিতে যে আত্মিক শক্তির অভাব ঘটেছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি স্বদেশবাসীর নৈতিক আন্দোলনে তা পূরণ করতে পারেননি—যেখানে যখনই নির্বিচার মার হয়েছে সেখান থেকেই সন্ত্রস্ত পশুর মত পালিয়েছে ভারতীয়েরা—সাতচল্লিশে তোমায় দেখাব কি নিদারুণ রক্তপাতের মধ্যে অহিংসবাদীদের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে। আরও ট্রাজেডি এই, যদি বা কোটি মানুষকে নীতিবলের বিশ্বাসে নিরস্ত্র করা গেছে, অপ্রতিরোধে কয়েক কোটি মানুষের হাতে ঝল্‌কে উঠেছে ছোরা এবং লক্ষ লক্ষ অসহায় পলায়নপর দেহকে শুধু নয়, তারা দেশকেও বিদীর্ণ করেছে। কিন্তু গান্ধীজীর সেদিনকার কাতর আবেদনে লেখা চিঠির কি জবাব দিয়েছিলেন গবর্নর জেনারেল আরুইন?

নিয়মকেতা-তুরস্ত বড়লাট "Dear friend"-এর প্রতি কোন সৌজন্য প্রকাশ করেননি, নিজে জবাব দেননি, জবাব দিয়েছেন বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী জি. কানিংহাম।

> "He regrets to learn that you contemplate a course of action which is clearly bound to involve a violation of the law and a danger to public peace."

"তিনি শুনে বড় দুঃখ পেলেন, আপনি যে কার্যক্রমের কথা ভাবছেন তা আইন অমান্য ও শান্তিভঙ্গের বিপদে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য।"

গান্ধীজী তাঁর চরমপত্রের শেষে বলেছিলেন, "আমি জানি, আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবার পথ খোলা রইল আপনার সম্মুখে। কিন্তু আমি আশা করছি, সেই অবস্থায় আমার পথানুসরণে সুশৃঙ্খল হাজারো মানুষ এগিয়ে আসবে এবং যে বিধানটি আইনগ্রন্থকে কলঙ্কিত করে রেখেছে সেই লবণ-আইন অমান্য করে দণ্ড বরণ করবে।"

"যাত্রা হল শুরু"

গান্ধীজীর এই প্রত্যাশা মিথ্যে হয়নি; চারদিকে যে-হতাশা, যে-সঙ্কল্প, যে-অভিব্যক্তি প্রকট হয়ে উঠেছিল তা তোমায় বলেছি, গান্ধীজীর পদযাত্রা তাকে পূর্ণ স্যাংসন দিল এবং সত্যি সত্যি, হিংসা-অহিংসার নীতি-বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে "তামাম হিন্দুস্থান" উথলে উঠল। একই সঙ্গে পদ্মা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-কাবেরী, আরব সাগর-বঙ্গোপসাগরে উদ্‌ভ্রান্ত ঝড়।

"Victory or Death" এই ছিল মোটো; "জয় নয় ক্ষয়" এই শ্লোগান; 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই ছিল জপ।

১২-ই মার্চের সকাল সাড়ে ছ'টা। গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে শুরু করলেন পদযাত্রা। লক্ষ্য আরব সাগরতীরে ডাণ্ডি। যাত্রাপথের দু'ধারে জনতার সারি; কণ্ঠে কণ্ঠে "গান্ধী-কি জয়।"

এক্ষুণি গ্রেপ্তার হবেন এমনি গুজব আমেদাবাদ শহরের আকাশ বাতাসকে যেন আরও গম্ভীর আরও ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল; হাজার হাজার মানুষ অতন্দ্র রজনী যাপন করছিল আশ্রমের বাইরে, আশ্রমের গেটে গেটে নারী-প্রহরী। তবু মানুষের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে আশ্রমের প্রান্তসীমায়। সকাল ছ'টার আগেই আশ্রমমুখী সকল পথ, ইলিস ব্রিজে মানুষের সারি। যাত্রাপথের অনেক জায়গায় পতাকা-পল্লবে সুসজ্জিত তোরণ।

প্রভাতী প্রার্থনার পর ঠিক সাড়ে ছ'টায় গান্ধীজী যাত্রা শুরু করলেন; অনুগামীদের কাঁধে একটি করে ঝোলা, ওতেই সর্বস্ব, আর একটি লাঠি; গান্ধীজীকে সর্বাগ্রে রেখে ওঁরা তিন সারির মিছিলে চললেন।

এই চলা থেমেছে আসলৈয়ে ১২-ই, বরেজা, নব গাঁওয়ে ১৩-ই, বাস্‌নায় ১৪-ই, মাতার নদিয়াদ বোরিয়াভি ওধাবনে ১৫-ই, আনন্দে ১৬-ই/১৭-ই, বোরসাদে ১৮-ই, এমনি করে গাজিরা ব্রোচে ২২-এ,

নবসারিতে ৩-রা এপ্রিল। এখানে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন ঃ

> "Either I return with what I want or my dead body will float in the Ocean."

এরই আর একটি ভাষ্য শোনা গেছল' "My body will float on the Arabian Sea, if I cannot bring Swaraj." আমরা মুখে মুখে এ কথাটি আবৃত্তি করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

৫-ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে গান্ধীজীর এই যাত্রা সমাপ্ত হল। ৬-ই এপ্রিল তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করেন। ডাণ্ডির পথে গান্ধীজী যখন ১৬-ই মার্চ আনন্দে ছিলেন, সেই রাতে পূর্ব বাংলার কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেণ্ট পশ্চিম বাংলার কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য সদলে যাত্রা করলেন। বাংলাদেশে এঁরাই ছিলেন প্রথম সত্যাগ্রহী দল। কলকাতা হয়ে বাঁকুড়া পৌঁছেছিলেন। ২৬-এ মার্চ সকাল সাড়ে ছ'টায় "বন্দেমাতরম্" "পূর্ণ স্বরাজ কী জয়" ধ্বনির মধ্যে যাঁরা বাঁকুড়া ছেড়ে গন্তব্যস্থলের দিকে এগোলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ ৪৮-বছর বয়স্ক ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির নেতৃত্বে ডাঃ নিবারণচন্দ্র দে সরকার, জগদীশচন্দ্র পালিত, ননীগোপাল গুহরায়, দীনেশচন্দ্র লোধ, সুকুমার ঘোষ, রমেশচন্দ্র ধর, আনন্দহরি মিত্র, চপল কুমার তালুকদার, হরিদাস সাহা, সন্তোষ চন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জি, সুধাংশু ভূষণ ব্যানার্জি, প্রিয়ভূষণ দত্ত, রতীন্দ্রমোহন নাগ, রতিমোহন দে, মৃগাঙ্ক মুখার্জি, হিমাংশু ভৌমিক, প্রবোধ কুমার রায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র চৌধুরী এবং মোহিতচন্দ্র রায়।

"ধন্য চট্টগ্রাম"!

তোমায় কি একথা বলেছি যে, বাংলার দুটো ধারা—একটি সবরমতী হয়ে ডাণ্ডি, ডাণ্ডি থেকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে কাঁথিতে এসে মিশেছে, আর একটি ১৯০৮-খ্রীষ্টাব্দ থেকে গোপন

পরিক্রমার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খুঁড়ে সদ্য কলাবাগান বোমা মামলা ভেদ করে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলকে উত্তাল করে তুলেছে? সেদিনকার এক সাপ্তাহিক পত্র "স্বাধীনতা" বাংলার ঐ গোপন অন্তরকে প্রতিধ্বনিত করে লিখেছিল 'ধন্য চট্টগ্রাম!' সবরমতী-ডাণ্ডি-কুমিল্লা কাঁথির সুরে সুর মেলানো আমার, সে কি শুধু কণ্ঠে? নইলে চারদিকে ধন্য ধন্য ধ্বনিতে হৃদয়তন্ত্রীটা ঝন্ ঝন্ করে চমকালো কেন? লবণ-তোলা হাত হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন? তারপর বুদ্ধি দিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছি, ভুলতে চেয়েছি। কিন্তু আজ ইতিহাসের পুরোনো পাতা উল্টোতে গিয়ে ভারতের একান্তে বাংলা দেশের চট্টগ্রামে বৃটিশের অস্ত্রাগার দখলের কাহিনী পরিহার করার মতো নৈতিক মিথ্যাচারী আমি হতে পারব না, কেননা, আমি কোনো সরকারী ইতিহাস-লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইনি। এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু নেই। এ কাহিনীর দু'জন লেখক আনন্দ গুপ্ত ও অনন্ত সিং এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন—সর্বাংশে না হলেও প্রথমাংশে। এর সঙ্গে জড়িত নন, তবু তুমি চারু বিকাশ দত্তের "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" বইটাও পড়ে নিও। জালালাবাদ পাহাড়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অধিনায়ক লোকনাথ বল বইখানির ভূমিকা লিখেছেন। তুমি কি শুনে আশ্চর্য হবে, লোকনাথ, পরিণত বয়সে, কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি কমিশনার থাকতে, এ কাহিনী বলেছিলেন নিজে, আমার কাছে? শেষ করে যেতে পারেন নি, কিন্তু যা বলেছিলেন, দুটো খাতার মতো হয়েছিল, তারই খানিকটা তোমায় পড়ে শোনাই:

"১৮-ই এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে লবণ সত্যাগ্রহের নামে বেশ আড়াল করা গেছল। যাঁরা লবণ সত্যাগ্রহে প্রস্তুত তাঁদের মধ্যে গুপ্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সৈন্যদের আনাগোনা চালিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা কঠিন হয়নি। তাদের আরও নিঃসংশয় করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেস সম্পাদক সূর্য সেনের স্বাক্ষরে এক ইস্তাহার বেরোলো: 'দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা

যাইতেছে। সর্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম 'আরম্ভ হইয়াছে।……
কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ-আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমরাও আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি—ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই—লোক ও টাকা চাই।'

"১৮-ই এপ্রিল সকালবেলা কংগ্রেস অফিসে ছোট ছোট দল—এরা সেই বাছাই দল। মাষ্টারদা প্রত্যেক দল ও দলনেতাকে সুস্পষ্ট কার্যক্রম দিলেন। যাঁরা রেললাইন তুলবেন তাঁরা আগের দিন রওনা হয়ে গেছেন। আজকে রাত্রি ৯টা ৪৫-মিনিটে যে যাঁর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠবেন।………

"রাত্রি দশটা। আমাদের গাড়ি এসে থামল গেটের কাছে। কিন্তু যে ছেলেটির গেট খুলে দেবার কথা সে তো নেই। জীবন ঘোষাল নেমে গেল গাড়ি থেকে, ঠেলে গেটটা খুলে দিল। তারপর উঠে এল গাড়িতে। গাড়ি গেট পেরিয়ে অস্ত্রাগার ভবনের প্রাঙ্গণে ঢুকল—অস্ত্রাগারের দিকে এগোতে লাগল।

"সান্ত্রী হাঁক দিয়ে উঠল: হল্ট, হুকুমদার!"

"ফ্রেণ্ডস।"

"ফ্রেণ্ডসদের গাড়ি সিঁড়ি ঘেঁষে থামল। আমি একাই নামলাম, আমার ডানহাতটা পেছনে, হাতে রিভলভার। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলাম। সান্ত্রী আর আমার দূরত্ব সাত কি আট হাত। ওকে ডাকলাম। ও এগিয়ে এসে আমায় একটা 'বাট স্যালিউট' করল। আমি তড়িৎগতিতে ওর রাইফেলটা বাঁ হাতে ধরে ফেললাম, ডানহাতের রিভলভার উদ্যত করে বললাম, ছোড়ো। সে কিন্তু ছাড়ল না। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে, আমাকে চিনেছে, ফ্রেণ্ড নই একেবারেই। সে ছিনিয়ে নিল ওর বন্দুক এবং তা দিয়ে আমায় মারতে উদ্যত হল। উপায় ছিল না, রিভলভার গর্জন করে উঠল, ও পড়ল লুটিয়ে।

"কাছেই আর তিনটি সান্ত্রী ছিল বসে। অদূরেই ছিল রাইফেল রাখার র‍্যাক—এবং রাইফেল। গুলির শব্দে ওরা লাফিয়ে উঠল—আমার বন্ধুরাও লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে, আমরা সবাই গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। আর কেউ আহত হয়নি। সান্ত্রীরা মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সাক্ষ্য রইল র‍্যাকের রাইফেলগুলো।

"সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারলের ওপর ছিল এই অস্ত্রাগারের ভার। অস্ত্রাগার প্রাঙ্গণেই ছিল তাঁর বাংলো। আমার রিভলভারের প্রথম গুলির শব্দ তাঁর কানে গেছল। তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন তক্ষুনি। হাঁক দিলেন: কে তোমরা?

"আমরা জবাব দিলাম: 'আমরা ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সেনানী। প্রেসিডেণ্টের আদেশ মতো আমরা অস্ত্রাগার দখল করেছি। তুমি যদি কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা করো, মারা যাবে।'

"বলা বাহুল্য, ইংরেজীতেই বলেছিলাম কথাগুলো। সাহেব মুহূর্তকাল ভাবল, তারপরই ছুটে বাংলোর ভেতরে গেল। কিন্তু বাংলোর দিকে তাক্ করে আমাদের শান্তি নাগ তাঁর হাতের বি-এল গান ধরে ছিল। আমি তাকে প্রস্তুত থাকতে বললাম। অনুমান ঠিকই হয়েছিল। ফ্যারেল একটি রিভলভার নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছিলেন। শান্তির গুলি এসে লাগল তাঁর দেহে। ফ্যারেলের গতিরোধ হল। ফ্যারেল পড়ে গেলেন।

"আমরা গলা ফাটিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে চলেছি। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে, কণ্ঠে শতকম্বুর শক্তি পেয়েছি, আকাশ হাত বাড়িয়ে আমাদের ধ্বনি নিয়েছে, ঈথর তরঙ্গমালায় ছড়িয়ে দিয়েছে চাঁটগায়, চাঁটগা ছাড়িয়ে দূরে আরও বহু দূরে। আমাদের রিজার্ভ ফোর্স এসে জুটল। স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি বাতাসে, নতুন দৃষ্টিতে দেখছি পৃথিবীকে—এই অস্ত্রাগার আমাদের।······

"অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগারটি ছিল রাস্তার ওপরেই; তাই আমি নির্দেশ দিলাম যে, কোনো গাড়ি যেন এ পথে না যায়। কড়া নজর রাখতে হবে। নজর রাখতেই একটা গাড়িকে শহরের দিক

থেকে এদিক পানে আসতে দেখা গেল। ড্রাইভারকে থামতে বলা হল। আমাদের গ্রাহ্য না করেই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে গুলি করা হল।

"এর পর একটা উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হল। আমাদের হাতের রিভলভার ও পিস্তলগুলো 'জাম' হয়ে গেল। এই অস্ত্রাগারে কোন কার্তুজও আমরা পাইনি। অস্ত্রাগার দখল করেও এই অবস্থায় অত্যন্ত নিরুপায় বোধ করতে লাগলাম।

"আর ঠিক এই সময়ে পাহাড়তলীর দিক থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমরা উদ্বিগ্ন হলাম, আমাদের সান্ত্রী তাদের থামতে বলল। কিন্তু গাড়িটি আমাদের সান্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অস্ত্রাগারের বড় গেটের সামনে এসে থামল। চারজন বৃটিশ মিলিটারী অফিসার। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। আমাদের চরম সঙ্কট: অস্ত্রাগারে ওদের সান্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া রাইফেলেও কার্তুজ নেই, আমাদের রিভলভার পিস্তলগুলো তো 'জাম'।

"হাল ছাড়লাম না। বৃটিশ অফিসারদের উদ্দেশে বললাম, তারা যদি অস্ত্রাগার প্রাঙ্গণে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে আমি তাদের চার্জ করার আদেশ দেব। তখন আমাদের সংখ্যা হবে ১২।

"বিফল হলাম। ওরা বলল, ক্যা তোম লোগ বাঙালী কুত্তা চার্জ করে গা"?

"Bombs ready, Dynamite ready, Fire! (বোমা প্রস্তুত, ডিনামাইট প্রস্তুত, চালাও গুলি!)

"অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া গেল। উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নের এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর কখনো দেখিনি; যে বীরেরা রিভলভার হাতে এইমাত্র আমাদের বাঙালী কুত্তা বলে সম্ভাষণ করছিল, তারা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

"আমরাও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। দেশমাতৃকাকে আর একবার ভরা গলায় বন্দনা করলাম। পরে জেনেছি ঐ বীর চতুষ্টয়ের মধ্যে মেজর বেকার ও ক্যাপ্টেন টেটও ছিলেন।

"আমাদের চেষ্টা হল স্ট্রংরুমটা ভাঙবার। ওটা আটকানো ছিল, চাবিও নেই। একটা মোটা দড়ির মাথা স্ট্রংরুমের গেটটার হাতলে জড়ালাম আর একটা মাথা বাঁধলাম ডজ গাড়িতে, তারপর স্টার্ট দিয়ে—এক ঝটকা। বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হল। ভেতরে গেলাম। পেলাম লুইস গান, রাইফেল আর রিভলভার। কিন্তু কার্তুজ পাওয়া গেল না একটাও। তছনছ করে খোঁজাখুঁজি হল, না, নেই, একটাও নেই।......

"কিছুক্ষণ পর পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে অনন্ত সিং, টেগরা, নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা মাস্কেট নিয়ে এল। মনোবল আমাদের কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হয়নি, ওরা এসে পড়াতে তা চতুর্গুণ বেড়ে গেল, আর ঠিক এই সময় এল আর একটি গাড়ি। শহরের দিক থেকে। হাঁক দিয়ে পরিচয় চাওয়া হল। বৃটিশ কণ্ঠে জবাব এল—ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সঙ্গে সঙ্গে মাস্কেটগুলো গর্জন করে উঠল এবং আমাদের কেউ কেউ গাড়ির দিকে ছুটে গেল।

"ম্যাজিস্ট্রেটের গার্ড মারা গেছে। ড্রাইভার আহত হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটকে রক্ষা করেছে প্রকৃতির অন্ধকার। পালিয়েছেন।.......

"......আমরা গাড়ি চালিয়ে পুলিশ-অস্ত্রাগারে এলাম। যে দু'টি দল ইউরোপীয়ান ক্লাব ও পোস্টস এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে গেছল তারা ইতিমধ্যে এখানে এসে সামিল হয়েছে। এসেছিলেন মাস্টারদাও।....

"এরপর আমরা আমাদের পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপ নেব এমন সময়—ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্ শব্দ, লুইস গান থেকে কারা গুলি ছুঁড়ছে আমাদের লক্ষ্য করে। ঐ ওয়াটার ওয়ার্কসের মাথা থেকে।..."

যেমন অকস্মাৎ থামলেন তেমনি অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, ঠিক এইসময়ে ২১-এ এপ্রিল, রাজসাহীতে বসেছিল এক রাজনৈতিক মেলা। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুল গাঙ্গুলী, বঙ্কিম মুখার্জি, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী যথাক্রমে মনোনীত হয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ইয়ং কমরেডস লীগ ও ওয়ার্কার্স কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট। চট্টগ্রাম সংলগ্ন বে অব বেঙ্গলের গর্ভ থেকে রাজসাহীর

ঐ মেলা-চত্বরে উঠল এক নিদারুণ অর্ডিনান্সের ঘূর্ণি, সব প্রেসিডেন্ট সমূলে উৎক্ষিপ্ত-নিক্ষিপ্ত হলেন কারাপ্রাচীরের ভেতরে—বিনা বিচারে বন্দী! ঐ ঘূর্ণিপাকে পড়েছিলেন আরও অনেকে, ওখানে এবং সারা বাংলা জুড়ে। অহিংস কংগ্রেস আর সহিংস মন্ত্র-শিষ্যেরা একাকার হয়ে গেলেন, বাংলাদেশের এ এক বিশেষ রূপ এবং সারা ভারতে তার তুলনাও নেই।

তবু ১৯৩০-এ চট্টলা-বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন একক অদ্বিতীয় ঘটনা নয়, বাংলাদেশে এ যেমন দিয়েছিল বহু বাধার অবরোধে বন্দী তারুণ্যকে পূর্ণ মুক্তি, সারা ভারতেও তেমনি ১৯৩০-এর অহিংস আইন অমান্যকে উপলক্ষ্য করে ঘটেছিল রুদ্ধকণ্ঠ গণশক্তির অসামান্য অভিব্যক্তি। ১৯৩০-এ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ, স্বাধীনতা দিবস পালন, আইন অমান্য আন্দোলন, কাউন্সিল বর্জন, এমনকি ছাত্রদেরও কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান, ভারতীয় বণিক সমাজের প্রত্যক্ষ সহযোগ ও সমর্থন জনসাধারণের মনে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের এমন একটা প্রত্যাশা জাগ্রত করেছিল যে, তারা সর্বস্বত্যাগ সর্বস্ব পণ করে ১৯৩০-এর আন্দোলনকে একেবারে চূড়ায় উৎক্ষেপ করেছিল। কোনো দুঃখকেই দুঃখ মনে করেনি, উদ্যত লাঠির নীচে মাথা, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির সুমুখে বুক এগিয়ে দিয়েছে, কারাবরণ করেছে, মৃত্যুকে ভয় পায়নি। তারই কিছু ক্ষীর-নির্যাস তোমায় বলব, তারপরেই তুমি দেখবে, সত্য, চারটি মাসও যায়নি এবং এই আন্দোলন যখন একেবারে শীর্ষে তখনই কারান্তরিত নেতৃবৃন্দ, স্বাধীনতা নয়, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের জন্য, লোকদৃষ্টির আড়ালে আপোষের সুড়ঙ্গে আনাগোনা শুরু করেছেন।

৪-ঠা মে গান্ধীজী কারান্তরিত হন। করাদি ক্যাম্পে মধ্যরাত্রিতে তিনি বন্দী হলেন। তারপর যারবেদা জেলে। ইচ্ছে ছিল ডাণ্ডির পর ধর্ষণার লবণগোলা দখল করবেন এবং, এই মর্মে চিঠিও লিখেছিলেন বড়লাটকে। বন্দী হবার ঠিক আগের মুহূর্তে চিঠির খসড়া শেষ হয়েছিল। তিনি আর পাঠাতে পারেননি। পাঠিয়েছিলেন

আব্বাস তায়েবজী। ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্যের আগে প্রথম চিঠি, ধর্ষণা লবণগোলা দখলের জন্য যাত্রামুখে দ্বিতীয় চিঠি।

গান্ধীজীর দ্বিতীয় চিঠি

"God willing, it is my intention to set out for Dharsana and reach there with my companions and demand possession of the Salt Works."

"ভগবান করুণা করলে, আমার ইচ্ছে আছে ধর্ষণার উদ্দেশে যাত্রা করব এবং সদলে সেখানে পৌঁছে লবণ কারখানাটি দাবি করব।

"……একদিকে প্রখ্যাত নেতাদের সঙ্গে মোটামুটি আইন মোতাবেক আচরণ করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অশোভনভাবে প্রহার করা হয়েছে (often savagely and in some cases even indecently assaulted)।

"মথুরায়, এসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নাকি একটি দশ বছরের ছেলের হাত থেকে জাতীয় পতাকা কেড়ে নিয়েছেন। জনতা বেআইনী ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া পতাকা ফেরত দেবার দাবি করতে থাকলে, তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। বাংলাদেশে, দেখা যাচ্ছে লবণ নিয়ে কারাদণ্ড বা প্রহারের ঘটনা তেমন হয়নি বটে কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পতাকা কেড়ে নিতে অভাবনীয় নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়েছে। ধানক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া এবং খাদ্যবস্তু কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। সরকারী কর্মচারীদের কাছে আনাজ বেচবে না বলায় গুজরাটের সব্জীবাজার তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।

"এখন আপনি দেশের ওপর প্রেস অর্ডিনান্স নিক্ষেপ করেছেন, এটি ভারতের পূর্বেকার সকল অর্ডিনান্সকে অতিক্রম করে গেছে। (surpassing any hitherto known in India)।

"You have found a short cut through the laws, delay in the matter of the trial of Bhagat Singh and others by

doing away with the procedure. Is it wonder if I call this official activities and inactivities, a veiled form of Martial Law? Yet, this is the fifth week of the struggle."

দ্বিতীয় চিঠি খানি লেখার সময় গান্ধীজী কিন্তু কারান্তরালে যাননি, সুতরাং দেশব্যাপী ঘটনাক্রমে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যাননি; কেন না, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের" আগেই কলকাতায় ১২-ই এপ্রিল সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার এবং ১৩-ই এপ্রিল জওহরলালের গ্রেপ্তারে বিক্ষুব্ধ জনতা দুটি ট্রাম পুড়িয়ে দেয়, আর একটির ক্ষতি করে; একটি বাঙালি ছেলে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এফ. ডি. বার্টলেকে আঘাত করে বন্দী হয়। আর, করাচীতে ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানীর বিচার সম্পর্কে কুড়ি হাজার লোকের এক সমাবেশের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। গান্ধীজী স্বভাবতঃ আন্দোলনের গতিক্রম লক্ষ্য করে ১৭-ই এপ্রিল নাগাদ মন্তব্য করেছিলেন :

"If non-violence has to fight the people's violence in addition to the violence of the Government, it must still perform its arduous task at any cost."

তারপর "চট্টগ্রাম" হয়েছে, ২৩-এ এপ্রিল থেকে পেশোয়ারে নিদারুণ হাঙ্গামা হয়েছে, ২৪-এ নীলায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে, পুলিশ মাদ্রাজে ২৫-এ চালিয়েছে লাঠি, ২৭-এ গুলি এবং ইতিমধ্যে, ২৭-এ এপ্রিল এসেম্বলির প্রেসিডেণ্ট ভি. জে. প্যাটেল পদত্যাগ করেছেন। গান্ধীজীর দ্বিতীয় চিঠিতে তার কিছুই প্রতিফলিত হল না কেন, সহসা বোধগম্য হয় না। রাজনীতির আসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই সময় জওহরের শূন্যস্থানে পিতা মতিলাল প্রেসিডেণ্ট পদে পুনরাভিষিক্ত হলেন। তোমার মনে আছে বোধ হয়, জওহরই এবছর পিতার পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন? সম্ভবতঃ লড়াই চলছে বলেই নেতৃত্ব রদবদলে এই সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতা।

পেশোয়ারে আর এক চট্টগ্রাম

কিন্তু ভারতব্যাপী সংগ্রাম সীমান্ত অতিক্রম করেছিল পেশোয়ারে ২৩-এ এপ্রিল। এখানে এমন কাণ্ড হয়েছিল এবং রাজপুরুষেরা এমনভাবে তা চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, পরে ভি. জে. প্যাটেলের নেতৃত্বে, এক বেসরকারী তদন্ত কমিটি হয়েছিল। তাঁরা সরেজমিনে তদন্তের পর যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা গবর্নমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে দেন। সে রিপোর্টের নকল "বেআইনী পথে" ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিভাবে আমার কপিটি হারিয়ে গেছে বলতে পারব না। আমি এর আর সন্ধান পাইনি ; সীতারামায়ার ইতিহাসে সামান্য যা আছে সরকারী বিবৃতির পরে তাও তোমায় পড়ে শোনাব। এ থেকে তুমি গণ-অভ্যুত্থানের একটা চেহারা ও প্রকৃতি আঁচ করতে পারবে। গবর্নমেণ্ট বললেন :

সাত মাস ধরে কংগ্রেস ও নওজোয়ান ভারত সভার প্রচারকেরা (এজিটেটরের ভালো বাংলা আর কি করব ?), খানিকটা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে, খানিকটা স্থানীয় অভিযোগ-সূত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অসন্তোষ সঞ্চারের চেষ্টা করে আসছিল। কংগ্রেস দল সর্বতোভাবে আইনসভায় সরদা আইনের সব চাইতে উৎসাহী সমর্থক হলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীরা জনসাধারণ ও গবর্নমেণ্টের মধ্যে অসদ্ভাবের বীজ ছড়াবার প্রয়াসে এই আইনের উদ্দেশ্য ও বিধানগুলো এমন বিকৃতভাবে উপস্থিত করেছে যেন এটি একটি পীড়নমূলক আইন। এই ধর্মীয় আবেদনের পাশাপাশি নওজোয়ান ভারত সভার সদস্যেরা পেশোয়ার জেলার গ্রামে গ্রামে কম্যুনিস্ট ভাবধারা ছড়াবারও চেষ্টা করেছে। এই অবস্থা থেকে প্রদেশবাসীদের রক্ষার জন্য প্রাদেশিক সরকার কংগ্রেসের ও যুব-আন্দোলনের কোন কোন নেতা যে,

তথাকথিত "সংগ্রাম পরিষদ" (War Council) গঠন করেছিলেন ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেন ২৩-এ এপ্রিল। ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল ; তাঁদের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হল, কোন গোলমাল হল না। কিন্তু অপর তু'জনকে জনতা নাকি জোর করে মুক্ত করে নিয়েছিল (rescued)। ব্যাপারটা তক্ষুনি ডেপুটি কমিশনারের গোচরে আনা হয় ; তিনিও অবিলম্বে নিজের গাড়িতে করে শহরের কাবুলি গেটের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনটি সাঁজোয়া গাড়ি। পথে তিনি শুনতে পান যে, ঐ তুই ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে। একথা শুনে তিনি সাঁজোয়া গাড়ি ক'টিকে অপেক্ষা করতে বলে বিনা প্রহরাই কাবুলি গেটের দিকে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে পুলিশ সুপারের দেখা হয়। পুলিশ সুপার বলেন যে, কাবুলি গেটের কাছে রয়েছে এক উন্মত্ত জনতা এবং পুলিশ অবস্থার মোকাবিলা করতে পারছে না। এসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রস্তর-নিক্ষেপে আহত হয়েছেন।

"ডেপুটি কমিশনার তখন সাঁজোয়া গাড়িগুলোকে আনিয়ে নেন এবং নিজের গাড়িতে এগিয়ে যান। কাবুলি গেটের কাছে গিয়ে দেখেন রিজার্ভ পুলিশ উত্তেজিত এক জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। জন-নেতাদের মধ্যে একজনের হাতে একটি কুড়ুল এবং জনতার মধ্যে অনেকের হাতেই ইটের টুকরো। ডি. সি. (মানে ডেপুটি কমিশনার) প্রথম সাঁজোয়া গাড়িটায় ঢুকলেন এবং গেট পার হয়ে গেলেন ; জনতা পথ ছেড়ে দিল, কিন্তু ইট-পাথর ছুঁড়তে লাগল। ডি. সি. যে সাঁজোয়া গাড়িতে ছিলেন তা ধীরে ধীরে বাজার বরাবর গেল, তারপর ফিরতি পথে কাবুলি গেটের দিকে এগোতে লাগল। সেখানে দ্বিতীয় সাঁজোয়া গাড়িটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার চাকার নিচে পড়েছিল এক সাইকেলারোহী পিয়ন। শোনা গেল, লোকটিকে জনতারই কেউ কেউ মাথায় বাড়ি মেরে সাইকেল থেকে ফেলে দিয়েছে, আর সাঁজোয়া গাড়ি দিয়েছে তাকে চাপা। হতবিহ্বল

হয়ে ঐ গাড়ির চালক জনতারও একজন কি দু'জনকে চাপা দিয়েছে। জনতার উত্তেজনা এ দুর্ঘটনায় আরও বেড়ে গেছে।

"ডি.সি. সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে এবং জনতাকে বুঝিয়ে ছত্রভঙ্গ করবেন বলে। তিনি যখন হাঙ্গামাকারীদের সঙ্গে তর্ক করছিলেন তখন তিনি নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরে আহত হলেন। ইতিমধ্যে হাঙ্গামাকারীদের একজন সাঁজোয়া গাড়ির এক মিলিটারী অফিসারকে আক্রমণ করে বসল এবং তাঁর পিস্তলটি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার চাপ বাড়তে শুরু হল এবং পুলিশ থানার সিঁড়িতে উঠে আসতে বাধ্য হল। ডি. সি. ও পুলিশ সুপার তবু জনতাকে শান্ত করতে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হবার জন্য বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু ডি. সি. একটি ইটের আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন; তাঁকে থানার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল, অন্যান্য পুলিশ ও অফিসারকেও সেখানে সরে আসতে হল। ইতিমধ্যে জনতা সাঁজোয়া গাড়িগুলো আক্রমণ করেছে এবং একটিতে আগুনও ধরিয়ে দিয়েছে; ফলে সাঁজোয়া গাড়ি থেকে সেনারা নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় সাঁজোয়া গাড়িটার ওপর হাঙ্গামাকারীরা কুড়ুল, লোহার ডাণ্ডা ও পাথর নিয়ে ভীষণ আক্রমণ চালায় এবং এই সময়ই ডি. সি. সংজ্ঞা ফিরে পান এবং সাঁজোয়া-সেনাদের গুলিচালনার আদেশ দেন। জনতা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়।"

গবর্নমেন্ট স্বীকার করেছেন এটি সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ সংবাদ এবং ব্যাপারটি আরও তদন্তসাপেক্ষ এবং এরপর তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা চলতেই থাকে, তাদের শান্ত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সীতারামায়ার ডায়েরীতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা স্বভাবতই সরকারী বিবরণ থেকে পৃথক। এতে দেখা যায়, "সারা ভারতের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং কংগ্রেস এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেয় যে, ২৩-এ এপ্রিল থেকে

মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হবে। ২২-এ এপ্রিল এ. আই. সি. সি.র এক প্রতিনিধিমণ্ডলী সীমান্ত বিধিবিধান কিভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তার তদন্ত করবার জন্য পেশোয়ারের দিকে যাত্রা করেছিল; তাদের পথরোধ করা হয় এবং এই প্রদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে পেশোয়ারে এক মিছিল বেরোয় এবং শাহ্-ই-বাগে এক জনসভা হয়। পরদিন সকালবেলা ন'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও দু'জনকে সকাল ন'টায় গ্রেপ্তার করা হয়। যে-লরীতে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটি বিকল হয়ে যাওয়ায় তাঁরা নিজেরাই থানায় হাজির হবেন বলেন এবং তাই তাঁদের করতে দেওয়া হয়। তদনুসারে তাঁদের নিয়ে এক মিছিল চলতে থাকে এবং কাবুলি গেট থানায় পৌঁছোয়, কিন্তু থানা ছিল বন্ধ। একজন পুলিশ অফিসার ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হন। জনতা ধ্বনি দিচ্ছিল আর জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল। ঘোড়সওয়ার অফিসার অদৃশ্য হয়ে যান এবং পরক্ষণেই অকস্মাৎ দু'তিনটি সাঁজোয়া গাড়ি এসে পড়ে এবং একেবারে জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঠিক এই সময়ে একজন ইংরেজ মোটর সাইকেলে ছুটে আসতে আসতে সাঁজোয়া গাড়িতে এসে ধাক্কা খায়, পড়ে যায় আর চাপা পড়ে। সাঁজোয়া গাড়ি থেকে কে গুলি চালায়, একটা সাঁজোয়া গাড়িতে আচম্‌কা আগুনও লেগে যায়। ডি. সি. তাঁর সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং থানায় ঢোকবার সময় সিঁড়িতে পড়ে যান এবং কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়েন। খুব শিগগিরই জ্ঞান ফিরে পান। এরপর সাঁজোয়া গাড়ি থেকে গুলিচালনা শুরু হয়। জনতা মৃতদেহগুলো অপসারণের চেষ্টা করে। আবার গুলীচালনা শুরু হয় এবং থেকে থেকে তিন ঘণ্টাকাল। গবর্নমেণ্ট বলেছেন হতাহতের সংখ্যা ৩০।৩৩; জনসাধারণের মতে এর সাত থেকে দশ গুণ (অর্থাৎ নিহতের সংখ্যা ২১০ থেকে ৩০০; আহতের সংখ্যা ২৩১ থেকে ৩৩০)। সন্ধ্যেবেলা সৈন্যবাহিনী কংগ্রেস অফিসে হানা দেয় এবং ব্যাজ ও পতাকা অপসারিত করে। ২৫-এ এপ্রিল সেনা-

বাহিনী, এমনকি সাধারণ পুলিশও, অকস্মাৎ সরিয়ে নেওয়া হয়। ২৮-এ এপ্রিল আবার আবির্ভূত হয় এবং কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে শহরের দখল ফিরে নেয়। ৪-ঠা মে (গান্ধীজীর গ্রেপ্তার দিবসে) স্বেচ্ছাসেবকেরা শহর পাহারা দিচ্ছিল। শহর সেনাবাহিনী দখল করে।

জালালাবাদের রক্ত লেখা

পেশোয়ারের আরও সব মর্মান্তিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ দিতে পারি যেমন শুধুমাত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর বহু বীরের উপাখ্যান। ২২।২৩ এপ্রিলে যখন পেশোয়ারে এই অবস্থা তখন চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে আর এক সংগ্রাম চলছে :

"শত্রুপক্ষীয় সেনাদল ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ছুটে আসছে। এক একটা ক্ষণ যেন এক একটা যুগ। জাতীয় পতাকা সাক্ষী রেখে আমি শত্রু সেনাদলের উদ্দেশে চীৎকার করে উঠলাম : 'হল্ট'! জানিনা, কেমন করে সে ভয়ঙ্কর পাহাড়-কাঁপানো শব্দ আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছিল ; আজ কোনো অবস্থায়ই সেই ভয়ঙ্কর শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে পারব না। চারদিককার পাহাড়ে সেই একটি শব্দ গম্ গম্ করে প্রত্যাঘাত করতে লাগল, একটি শব্দ সহস্র-লক্ষ কণ্ঠের নাদ পেল যেন। শত্রুপক্ষের সেনাদল এই অপ্রত্যাশিত আদেশে হকচকিয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীদের উদ্দেশে বললাম : 'ফায়ার!'

"শত্রুপক্ষের ওপর অগ্নিবর্ষণ হল অবিশ্রান্ত। ইংরাজের বীর সৈন্যদল পলায়নের পথ খুঁজে পায় না, পড়ি-মরি করে দৌড়, বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ। আমাদের এদিকে রণ-হুঙ্কার—'বন্দেমাতরম্' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ইংরেজের ভাড়াটে সৈন্যদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করল—পাহাড়গুলো যেন দৈত্যদানবের মতো আমাদের প্রতিধ্বনি করতে লাগল।

"আমরা জানতাম, শত্রুপক্ষ তখন পেছপা হলেও আবার ফিরবে

এবং একবার যখন আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছে, ওরা আক্রমণ থেকে সহজে নিরস্ত হবে না। আমরা প্রস্তুত রইলাম, ওরা পথান্তরে এগোলো। ওরা এ পাহাড় থেকে ৫০ গজ দূরে একটি, ১০০-গজ দূরে আর একটি পাহাড়ে ঘাঁটি পাতল, তারপর শুরু করল গুলি চালনা।

"আমরাও বিরতি দিলাম না। আমাদের মাস্কেটগুলো অবিরাম গর্জন করে চলল। বন্দুক বা রিভলভার কিছুক্ষণ চললেই অচল হয়ে পড়ে, এগুলোকে আবার সচল করার ভার নিলেন নির্মলদা, আর মাষ্টারদা নিলেন যোদ্ধৃবৃন্দের পেছনে অচল ও সচল আগ্নেয়াস্ত্রগুলো দেয়া-নেয়ার বিপজ্জনক ভার। অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে বিস্ময়কর জাদুকরের মতো তাঁরা এই কাজ করে চললেন।... .....

"ওদিকে ইংরাজ-শাসনরক্ষী প্রথম সৈন্যদের পেছনে আরও সৈন্য এসে ওদের শক্তিবৃদ্ধি করতে লাগল। বাঁ দিক থেকে একটি দল রাইফেল লুইসগান নিয়ে আক্রমণ চালালো। ক্রমে তিন দিক থেকে আমাদের ওপর গুলিবৃষ্টি হতে লাগল।......

"আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, আমাদের কারো কারো মধ্যে ক্রমেই একটা বেপরোয়াভাব সঞ্চারিত হচ্ছে। গুলিচালনার বিধি-বিধান পরোয়া না করার দিকে ঝোঁক, আত্মরক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থেকে কোনক্রমে শত্রুকে ঘায়েল করার প্রবণতা, ফুটন্ত জলের মতো টগবগ করছে ওরা, উৎসাহের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠছে, উঠে দাঁড়িয়ে তাক করছে। ফল হাতে হাতেই ফলল, আমার ভাই টেগরা (হরিপদ বল) শত্রুপক্ষের সহজ শিকার হল। ও বরাবরই দুরন্ত, অস্থির এবং আবেগের তরঙ্গস্বরূপ। সে শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই লুইস গানের অনর্গল গুলি ওর দেহ ঝাঁঝরা করে দিল। প্রথম মারাত্মক মৃত্যু আমাদের দিকে হাত বাড়ালো।......

"সবাইকে শুয়ে পড়ে গুলি চালাতে নির্দেশ দিলাম। কিন্তু বিপ্লবী তরুণদল তখন বেপরোয়া, ফুটন্ত জলস্তম্ভের মতো উত্তাল। জানতাম

এ অসমান যুদ্ধ, এক পক্ষে বৈপ্লবিক আবেগ কিন্তু শস্ত্রাভাব; অপর পক্ষে চাকুরীর কর্তব্য কিন্তু শস্ত্র-প্রাচুর্য। আমার নির্ভয় সাথীরা একে একে ভূমিলগ্ন হতে লাগল, জালালাবাদ পাহাড়ের মাথায় শহীদদের রক্ততর্পণ ও আখর পড়তে লাগল।......"

থামলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি সেই লোকনাথ বলেরই—

তিনি কিছু সলজ্জ হাসি মিশিয়ে বললেন, হ্যাঁ, লোকনাথ-কথিত আমার লিখিত।

পরক্ষণেই হাসি মিলিয়ে গেল, বললেন, আমি তোমাকে মাদ্রাজ, দিল্লীর, লক্ষ্ণৌর, পাটনার জনচিত্তের করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের অভিব্যক্তি বিশদ বলে যেতে পারতাম, সব তথ্য আমার হাতে জমা, কিন্তু, সত্য, ইতিহাসের নির্মম খড়্গাঘাতে অনেক পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়; মানুষের দাঁড়াবার সময় নেই, ইতিহাসও দ্রুতলয়ে চলে। তবু বলি, শোলাপুর বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শোলাপুরে সে এক বিদ্রোহ

বুঝলে, সত্য, গবর্নমেণ্ট কক্ষণো সত্য কথা বলতে পারে না এবং এবিষয়ে সব গবর্নমেণ্টেরই গোত্র এক। শোলাপুরে মে মাসের ঘটনা-বিবরণে গবর্নমেণ্ট ও-বিধির ব্যতিক্রম ঘটাবেন এমন নিশ্চয়ই তুমি আশা কর না, সুতরাং, শোনো বোম্বাই সরকারের ইস্তাহার:

"গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর এক নির্দেশনামা জারী হল দ্বিতীয় দিনের হরতাল পালনের জন্য। তদনুসারে ৭-ই মে সকালে শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিংয়ের শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এলেই গোলমালের সূত্রপাত হল।

"শোলাপুরে আরও যেসব মিল আছে তাদের শ্রমিকদের বের করার জন্য এগোলো, একদল গেল 'হট্টগোলকারী' আর 'দুর্বৃত্তের' সঙ্গে মিশে শহরের দিকে। যাবার পথে এই জনতা ট্রেন লক্ষ্য করে ইট-

পাটকেল ছোঁড়ে এবং একটি মিউনিসিপাল চৌকিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওরা যতই এগোয় ইটপাটকেল ছোঁড়াও তত বাড়তে থাকে। ডি. এস. পি. ও অন্যান্য অফিসার সামান্য আহত হন, দু'জন কনস্টেবলকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। হাজার দশেকের জনতা হবে; এদেরই একদল মদের দোকানগুলো পোড়াতে শুরু করল। জি. আই. পি. রেলওয়ে ব্যাটালিয়ান, এ. এফ. আই. এবং এক লরী পুলিশ নিয়ে ডি. এস. পি. এসে না-পৌঁছোনো পর্যন্ত একটি ছাড়া শোলাপুরের সব মদ ও তাড়ির দোকানেই আগুন দেওয়া হয়। বল-প্রয়োগের পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়।

"৪-ঠা মে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ডি. এস. পি.কে জানানো হয় যে, ৯০০-লোক দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে তাল-গাছ কাটতে বেরিয়েছে। জেলাম্যাজিস্ট্রেট এবং ডি. এস. পি. দুই লরী পুলিশ নিয়ে তাদের জনাছয়েককে গ্রেপ্তার করেন। ফেরার পথে তাঁরা দেখতে পান তাদের পথ অবরোধ করে রয়েছে এক বিরাট সুসংগঠিত জনতা; লাঠি নিয়ে এক লরী লোক। তারা পুলিশের উদ্দেশে ইটপাটকেল ছুঁড়তে লাগল।

"ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। এতে রাস্তাটা পরিষ্কার হল বটে কিন্তু মাঠ থেকে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলল। লোক বেড়ে বেড়ে হাজার দশেকের জনতা হল; পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিলপাটকেল ছুঁড়তে লাগল, পুলিশ-লরীগুলো আক্রমণের জন্য এগোতেও লাগল। আবার গুলিচালনার আদেশ দেওয়া হল। এবার কত গুলি ছোঁড়া হয়েছিল বলা কঠিন, তবে ৪০টির কম হবে না।

"ফিরে এলে ডি. এম. ও ডি. এস. পি.কে খবর দেওয়া হল যে, শহরে পুলিশেরা আক্রান্ত হচ্ছে। আবার তাঁরা দুই লরী পুলিশ, এ. এফ. আই. কনটিনজেন্ট ও একটি লুইস-গান ডিট্যাচমেন্ট পাঠালেন। তাঁরা দেখতে পেলেন থানার সামনে দুটি অর্ধদগ্ধ পুলিশের দেহ ও জেলা আদালত জ্বলছে। মিল এলাকা ও রেলকলোনীর অসামরিক

পদস্থ কর্মচারীদের তিনশ নারী ও শিশুকে পুনায় নিয়ে যাওয়া হল। ইতিমধ্যে শহরের পুলিশবাহিনীকে কোতোয়ালী থানায় সমবেত করা হল এবং লরী-বাহিত সশস্ত্র পুলিশ শহর টহল দিতে লাগল। এরই একটি লরী কয়েকবার আক্রান্ত হল এবং গুলি চালাতে বাধ্য হল। যাতে চৌরাচৌরির পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য সন্ধ্যা নামতেই পুলিশবাহিনীকে কোতোয়ালী থানা থেকেও সরিয়ে নেওয়া হল।

"রাত্রি ১১-টায় পুনা থেকে সেনাবাহিনী এল এবং মিলিটারী ও পুলিশ মিলে শহর টহল দিয়ে ফিরতে লাগল। তারপর সব ঠাণ্ডা।

"৯-ই মে সকালবেলায়ও ঠাণ্ডা। সকাল ১১-টা অবধি হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল: ২ জন পুলিশ নিহত, ৮ জন নিখোঁজ, হাঙ্গামাকারীদের ৫ জন নিহত, ২৬ জনকে শুশ্রূষা করতে হয়। সহরে ১৪৪-ধারা জারী।

"১০-ই মে। ঈদগা প্রার্থনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। সন্ধ্যার দিকে অমান্যের লক্ষণ দেখা গেল। একটি মিলিটারী লরী বিকল হয়ে পড়েছিল; তাকে ঘিরে ধরেছিল জনতা; ছত্রভঙ্গ হতে বললেও হল না।

"১১-ই মে। ২।৪-বোম্বে গ্রেনেডিয়ারের আরও একটি কোম্পানি এসে পৌঁছোলে স্থির হল শহর পুনরাধিকার করতে হবে—স্থায়ী ফাঁড়িগুলো এগিয়ে এগিয়ে ও ভ্রাম্যমান টহলদার নিয়োগ করে। ৪নং মিউনিসিপাল স্কুলে এক কোম্পানি পদাতিক সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং টহলদার সৈন্য পাঠানো হয়। তারা খবর দিল, কোতোয়ালী থানার রেকর্ড-রুম ভেঙ্গে ফেলে নথিপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা এমন ভান করছে যেন তারা শহরের প্রশাসন চালাচ্ছে।

"জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাধীনে সর্বদা মোতায়েন রয়েছে ২৫০ জন ভারতীয়, ৩৮ জন এ. এফ.আই. ৬০ থেকে ৮০ জন পুলিশ। অবস্থা এই যে, মিলিটারী দেখলেই জনতা অদৃশ্য হয়ে যায়, পুলিশ

দেখলে ভয়ঙ্কর মারমুখী হয়ে ওঠে। কোন সহকর্মী নিহত হওয়ায়, অনেকে আহত হওয়ায় এবং পরিবারদের নিরাপত্তার উৎকণ্ঠায় পুলিশেরাও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে এবং কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, জনতা যদি তাদের আক্রমণ করে তবে তাদের নিরস্ত করা কঠিন হবে। সুতরাং সাময়িকভাবে পুলিশদের স্থানান্তরিত করা এবং বিশ্রাম করতে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই অবস্থায় শহরের নিয়ন্ত্রণভার নেবার জন্য আর আশু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে মনে হয়েছে।

"১২-ই তারিখে অবস্থাটা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা হল। পুনা থেকে আরও বাহিনী আনা হল এবং ও. সি. ডি. এম-এর সঙ্গে এই সুপারিশ করেছেন যে, আরও বাহিনী এসে গেলে সামরিক আইন জারী করা উচিত হবে।

"পুনা থেকে তক্ষুনি ২নং ব্যাটালিয়ান রয়াল আলস্টার রাইফেল্‌স পাঠানো হল। তারা রওনা হয়ে যেতে ১২-ই মে রাত্রি সাড়ে আটটায় সামরিক আইন জারী করা হল। মধ্যরাত্রের আগেই রয়াল আলস্টার রাইফেলস পৌঁছে গেল।

"১৩-ই মে ভোর সাড়ে চারটায় সেনাবাহিনী শহর দখল করল। আর কোনো হাঙ্গামা হয়নি ; গুলিও আর চালাতে হয়নি। ১৬-ই মে মিলগুলো খুলতে লাগল। ইতিমধ্যে মিলিটারী ট্রাইবিউনালও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনৈক প্রাইভেট ডাক্তারের হিসেব মতো "হাঙ্গামাকারীদের" মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৩, আহতের সংখ্যা ৫০। গুলি ছোঁড়া হয়েছিল ১০৩টি, বাক্‌সট ১০। রিভলভার থেকে কত গুলি ছোঁড়া হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায়নি।"

মেদিনীপুর-চেচুয়াহাটের ভোলানাথ

চেচুয়াহাটের ঘটনাটা একটু আলাদা। ৫-ই জুন তারিখের সরকারী ইস্তাহার থেকেই বলি। "মেদিনীপুর জেলা,ঘাটাল মহকুমা, দাশপুর থানায় চেচুয়াহাট। ৩-রা জুন সাব-ইন্সপেক্টর ভোলানাথ

ও এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধ সামন্ত চারজন কনস্টেবল নিয়ে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তারের জন্য চেচুয়াহাটে যায়; স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং করছিল ও রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিচ্ছিল।

"গ্রেপ্তার করার পর চারজন স্বেচ্ছাসেবককে কনস্টেবলদের তত্ত্বাবধানে রেখে এস.আই. ও এ এস.আই. আর সবার খোঁজে চলে গেলেন। তাঁরা আক্রান্ত হয়ে যেখানে কনস্টেবলদের রেখে গেছলেন সেখানে হটে আসতে বাধ্য হলেন। হটে এলেন কিন্তু অক্ষত দেহে নয়। দুপুরবেলা নাগাদ ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে পুলিশদল দাশপুর থানার দিকে এগোলো; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক পরিচালিত এক বিরাট জনতা ওদের অভিভূত করে ফেলল। এস.আই. এবং এ.এস. আই.কে কনস্টেবলদের কাছ থেকে আলাদা করে নেওয়া হল। কোন সন্দেহ নেই ভোলানাথকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ.এস. আই.র ভাগ্য অজ্ঞাত। কনস্টেবলরা কোনক্রমে থানায় ফিরে আসতে পেরেছে।

"এ খবর পৌঁছোলো মেদিনীপুরে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ১৮জন সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে চেচুয়াহাট তদন্তে রওনা হয়ে যান এবং ৫-ই জুন সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছোন। পরদিন, যে-নন্দনপুর গ্রামে বহু স্বেচ্ছাসেবকের সমাবেশ হয়েছিল সেই গ্রামে গিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হল; সারাদিন তদন্ত চলল। অপরাহ্ণে সংবাদ পাওয়া গেল যে, যেখানে পুলিশ শিবির ফেলবে ঠিক করেছিল তারই কাছাকাছি জায়গায় বহু লোক জড় হয়েছে। জায়গাটা তীরবাঁধা শুকনো নদীর পুব দিকে; আর নদীর বঙ্কিম গতিপথ গেছে এই শিবিরের তিনদিক ঘিরে। দেখা গেল, হঠাৎ হাজার ছয়েক লোক পেছন থেকে আসছে। আরও হাজার চারেক খালের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক থেকে অসংখ্য শঙ্খ ও হুইসিল ধ্বনি হচ্ছে। সূর্য অস্ত গেছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনতাকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বললেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃবৃন্দ যাদের আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মুক্তি দাবি করলেন। বলা বাহুল্য, এ দাবি অগ্রাহ্য হল এবং জনতা যখন খাল পার হয়ে ছুটে আসতে লাগল তখন চলল গুলি। জনতার মধ্যে অন্ততঃ একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, সে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। জনতা একটু হটে গেল বটে কিন্তু হুইসিল ও শঙ্খধ্বনি চলতেই লাগল। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। পুলিশদল বিপন্ন হয়ে পড়েছে ; তাই তারা হাটের ক্যাম্পে চলে গেল ; কিন্তু এটিরও আক্রমণাশঙ্কা থাকায় স্থির হল তারা ঘাটালে ফিরে যাবে। পথিমধ্যে পুলিশদলকে আর এক জনতা আক্রমণ করে কিন্তু একটা গুলি ছুঁড়তেই ওরা সামলে যায়। পুলিশ দল ৭-ই জুন বিকেল ছুটোয় ঘাটাল পৌঁছোয়।

"অবস্থা স্পষ্টতঃই অতীব সঙ্গীন বিবেচনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল ১০০ সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ৮-ই জুন সন্ধ্যায় চেচুয়াহাটের দিকে রওনা হয়ে গেলেন এবং ৯-ই জুন সেখানে পৌঁছোলেন। কোথাও কোন বাধা পেলেন না এবং লক্ষ্য করলেন আশেপাশের গ্রামগুলো জনশূন্য।"

সত্য, একটা জাতি যখন জাগে, এইরকম অখ্যাত অজ্ঞাত এবং যারা চিরবিস্মৃত হবার জন্যই প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে জন্মায় ও বিলীন হয়ে যায় নেতৃত্ব-কৃতিত্বের দাগে অক্ষয় করতে, এই চেচুয়াহাটের সূর্যাস্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের অস্পষ্ট ছায়াছবিগুলো দেখছ? অথচ ১৯৩০-এর ইতিহাসে শঙ্খ-হুইসিল-করধৃত এই মানুষগুলো সিলুয়েটের অতিরিক্ত তো কিছু নয়। হিংসা-অহিংসা নীতির বালাই নিয়ে যতই এদের চুলচেরা বিচার করো, এদের বাদ দিলে ১৯৩০ বা ভবিষ্যৎ ১৯৪২-এর সংগ্রামের থাকে কি? কি নিয়ে বারগেন-কাউন্টারে তাঁরা দাঁড়াতেন বা দাঁড়িয়েছিলেন? নৈতিক চালুনিতে ছেঁকে নিলে খাঁটি লবণের বা খাঁটি আশ্রম-পরিস্রুত সত্যাগ্রহীর আইন অমান্য আন্দোলনের পরিধি, ব্যাপ্তি ও তীব্রতা কতটুকু? নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে তার যতটুকু স্থান তার বেশি দাবি যেন শুচিবাই অহিংস

নীতিবাগীশেরা না করেন, কেননা, মোহমুক্ত ইতিহাস তাঁদের পরিমিত স্থানের বেশি দেবে না।

সন্দেহ নেই, পরিমিত হলেও, সেখানে স্বাধীনতাকামীদেরই—ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসপন্থীদের নয়—প্রাণপণ পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসপন্থীরা তখন হয় নিরাপদ জেলে নতুবা গণ-আন্দোলন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বৃটিশ শাসক-প্রশাসকদের সান্নিধ্য লালন করে চলেছেন।

গান্ধীজী বড়লাটের কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রে ধর্ষনা লবণ গোলায় হানা দেবার পরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই ৪-ঠা মে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান; ধর্ষনার লবণ গোলায় প্রথম হানা দেওয়া হয় ১৬-ই মে। বোম্বে ছোট আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি হুসেন তায়েবজী, কে. নটরাজন, সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট জি. কে. দেওধর ধর্ষনা হানা দেখে এক বিবৃতি দেন এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে। তাঁরা তাতে বললেন, "তাঁরা এসেছিলেন উনটাডিতে; কারণ, তাঁরা ধর্ষনা হানায় সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছা-সেবকদের ওপর, এমন কি, যাঁরা এতে অংশ নেননি, কেবল দর্শক ছিলেন মাত্র, তাঁদের ওপরও অত্যধিক বলপ্রয়োগ এবং অসভ্যোচিত অরাজকতার অভিযোগ শুনেছেন এবং খবরের কাগজে পড়েছেন। তাঁরা উনটাডি ও বুলসার হাসপাতাল ঘুরে দেখেছেন, এই হাসপাতাল দু'টি কংগ্রেসকমিটিগুলোই প্রতিষ্ঠা করেছেন; এখানে একদল নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ডাক্তার আহত বীর স্বেচ্ছাসেবকদের শুশ্রূষা করেন। মৃতের ও কঠিন ক্ষতদুষ্টির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও আহতের সংখ্যা বিস্তর। উনটাডি গ্রামে সত্যাগ্রহীদের ক্যাম্প কিচেনটি গবর্নমেণ্ট দখল করে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছেন। তায়েবজী ওঁরা সেটিও দেখে এসেছেন। তাঁরা তখন দেখতে চাইলেন লবণ গোলায় হানা এবং কিভাবে তা প্রত্যাহত হয়।

"এই উদ্দেশ্যে তাঁরা এমন দূরত্বের একটি মাঠের দিকে অগ্রসর হলেন যেটি কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না

বা তাঁদের পক্ষে আপত্তিকরও হবে না। সেটি লবণ গোলার আধমাইল দূরে—সত্যাগ্রহীরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে অন্ততঃ এক ফার্লং তো হবেই। যখন তাঁরা এখানে দাঁড়িয়েছিলেন, একজন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক এসে তাঁদের বললেন যে, তাঁদের নিরাপত্তার জন্যই তাঁদের গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত। এর অর্থ কি, পরবর্তী ঘটনাক্রমেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁরা দেখলেন, লবণ-গোলা-হানাদারদের লবণ-গোলার অনেক দূরেই থামানো হল; কিভাবে তাঁদের থামানো হল এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানিয়ে কিভাবে তাঁদের উনটাডিতে ফিরিয়ে আনা হল তাও দেখলেন।

"বার বার এই এক অভিযোগ শোনা যায় যে, গ্রেপ্তার করে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যাওয়া শুধু নয়, লাঠি দিয়ে মারতে মারতে, তাঁদের পাঁজড়ায় লাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে নিয়ে চলে। স্বেচ্ছাসেবকদের সীমারেখার ২০০ গজ অবধি ভেতরে যেতে দেওয়া হয়, তারপর ফিরে আসতে হুকুম করা হয়, গররাজি হলে সীমারেখায় না পৌঁছোনো পর্যন্ত এবং তারপরও খানিকটা দূর অবধি মার চলতে থাকে। এর পর তাঁদের পেছনে তাড়া করে ঘোড়সওয়ারেরা। ইতিমধ্যে তাঁরা অনেক লাঠির বাড়িই খেয়েছেন। এর পরের দৃশ্য হচ্ছে: বহু সংখ্যক আহতের স্ট্রেচারে আনয়ন, কারও দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন, কেউ কেউ সংজ্ঞাহীন। স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করার পর কঠিন আঘাতে জর্জরিত করা হয়, এ থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

"বিশ্রী সব গালমন্দের অভিযোগও শোনা গেছে এবং এগুলো সত্যাগ্রহীদের মনে বড় লেগেছে। শরীরের বিশেষ কোনো কোনো নরম জায়গায় চাপ দিয়ে ব্যথা দেবার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

"এর চাইতেও মারাত্মক ঘটনা তাঁরা নিজে চোখে দেখেছেন। সত্যাগ্রহীদের লবণ-এলাকার সীমার বাইরে তাড়িয়ে দেবার পর, ইউরোপীয়ান ঘোড়সওয়ারেরা পুরো বেগে ছুটে গেছে আর হাতের লাঠি দিয়ে যাকেই সত্যাগ্রহী সমাবেশের স্থান ও গ্রামের মধ্যবর্তী

জায়গায় পেয়েছে তাকেই হাতের লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। পুরো বেগে রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়ে নরনারী শিশুকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ভয় দেখিয়েছে।"

কিন্তু উন্মত্ত গবর্নমেণ্টের এই বেতাল তৎপরতায় লজ্জা পেয়েছিলেন একজন ভদ্র ইংরেজ সাংবাদিকই। তিনি "ডেলী হেরল্ডের" মিঃ শ্লোকোম। ১৮-ই মে লিখেছেন :

> "It was humiliating for an Englishman to stand among this ardent, friendly, but deeply moved crowd of volunteers and sympathisers and watch the representatives of his country's administration engaged in this ludicrous, embarrassing business. It was even more humiliating to stand shortly outwards, outside the barbed wire entanglements charged with electricity round the empty tenement buildings at Worli outside Bombay, hurriedly prepared for the reception of 6000 prisoners, expected as a result of to-day's and other incidents of the Civil Disobedience campaign and see the windows of those ugly buildings full with white Gandhi-caps and hear the prisoners shout 'Down with Union Jack.'

গান্ধীজী তাঁর বয়ানে বহু 'মিলিটান্ট' শব্দ ব্যবহার করলেও তাঁর সংগ্রামকে তিনি কখনো বৈপ্লবিক বিশেষণ দেননি, পক্ষান্তরে বলেছেন, তাঁর সংগ্রাম বৈধ অথবা সাংবিধানিক (constitutional)। বস্তুতঃ, আইনের বিধান মেনেই তাঁর আইন অমান্য; যে-আইন মানেন না সে-আইন অনুসারে ধরলে বা দণ্ড দিলে তিনি আর প্রতিরোধ করবেন না, দোষ, দণ্ড মেনে নেবেন। তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন সর্বথা সর্বতোভাবে অবৈধ বা বেআইনী অথবা বিপ্লবী না হয় এজন্য তাঁর সবিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রথমাবধি সর্তে সর্তে একে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ রাখার জন্য তাঁর সাবধানতার শেষ ছিল না। সেই বৈধ বা সাংবিধানিক পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছিল এই সময়? কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সেণ্ট্রাল এসেম্বলি যদি সকল বিধান-বৈধতার ভারকেন্দ্র হয়ে থাকে তবে তার প্রেসিডেণ্ট ভি. জে. প্যাটেলই বলুন কি হয়েছিল এর দশা।

প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের দাদা ভি. জে. প্যাটেল ছিলেন ঐ সংবিধানের আশ্রয় সেন্ট্রাল এসেম্বলির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট। কিন্তু থাকতে পারলেন না। কেন?

প্যাটেল বড়লাটকে ২৫এ এপ্রিল পদত্যাগ প্রসঙ্গে লিখলেন: "অবস্থা যতই কঠিন হোক, আমি অবিচল নিষ্ঠায় ঐ দুই নীতি অনুসারে কর্তব্য পালন করে গেছি, তবু আমার মাথায় আমলাতন্ত্রের ক্রোধ বর্ষণ হয়েছে। এটি নিঃসংশয় সত্য যে, আমলারা কিছু দূর পর্যন্ত আমার ঐ নীতি-নিষ্ঠা সহ্য করেছেন, কিন্তু যেই তা তাঁদের স্বার্থ স্পর্শ করেছে তখনই তাঁদের ভাবান্তর ঘটেছে। রাজশাসন চালাতেই হবে; এমন কি, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এসেম্বলির স্পীকারের কাছেও তাঁরা অনুগতের আচরণ, আমলাতন্ত্রের পক্ষে সহজ নমনীয়তা প্রত্যাশা করেন। আমি তাঁদের কোন আমল দিই নাই এবং তাঁদের বিচারে অপরিহার্য বলে গণ্য কোন ব্যাপারেও প্রশাসনের অংশবিশেষ হতে অথবা তাঁদের তাঁবেদার হতে অস্বীকার করেছি। ফল হয়েছে এই যে, অন্ততঃ বিগত তিন বৎসর যাবত আমার ভাগ্যে জুটেছে হয়রানি ও পীড়ন। আগাগোড়াই এই সভাপতিপদ হয়েছে আমার পক্ষে কণ্টকশয্যা। তাঁরা এসেম্বলি প্রেসিডেন্টকে সামাজিকভাবে বয়কট করার সকল আয়োজন পর্যন্ত করেছেন।

"আমি কিন্তু প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারিনি, মনোভাব ব্যক্তও করতে পারতাম না। বরাবর মুখ বুজে এই সব সহ্য করে এসেছি।

"যেন এও যথেষ্ট নয়, এই মনে করে প্রেসিডেন্টকে উপলক্ষ্য করে অধস্তনদের একটা গোষ্ঠী অপযশ, গালমন্দ ও বিকৃতির অভিযানে বদ্ধপরিকর হয় এবং এদের অবাধ প্রশ্রয় দেওয়া হতে থাকে।

আপনাকে আমার সম্পর্কে বিরূপ করে তোলা ছিল তাদের আর এক কাজ। কোন কোন পত্রিকার সংবাদদাতার পক্ষে এই গোষ্ঠী হয়েছে সহজগম্য এবং এদের কাছে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছে। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য এই সব সংবাদপত্রের স্তম্ভ ছিল অবারিত। ফলে, কেবল সদরে নয়, মফঃস্বল অঞ্চলেও সাধারণ শ্বেতকায় মানুষের কাছে এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি চক্ষুশূল হয়ে পড়ে।

> "In these circumstances it should not surprise Your Excellency to learn that I find shadowed and my movements have been constantly watched."

ভদ্র সাংবাদিক শ্লোকোম শুনে নিশ্চয়ই কানে আঙুল দিয়ে বলেছেন: It was even more humiliatnig to listen...... । কিন্তু আমরা ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর যে-কোন রকম অসভ্যোচিত আচরণে অভ্যস্ত; আমদের মধ্যে যিনি tallest তিনিও ওদের কাছে অসম্মানের পাত্র। মিথ্যা ঠাঁট। এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট তো কোন্ ছার। প্রশাসনের আর এক নাম প্রেস্টিজ; অন্ধ অভিমান; আর শাসক-ইংরেজের জাত্যাভিমান। সুতরাং, প্যাটেলের একথায় আমাদের চমক দেয় না—ইচ্ছে করেই এসব ষড়যন্ত্র চলেছে যাতে আমি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করি, আর, ওরা সেই অছিলায় প্রচার করতে পারে যে, ভারতীয়েরা এসব দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য নয়।

"ভারত গবর্নমেণ্টের, কি, তাঁদের পদস্থ ব্যক্তিদের যে আমার প্রতি কোন 'প্রেম' ছিল না, একথা কে না জানত? সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব-বলে আমাকে অপসারণের উপায়ান্তর নেই বলেই আমাকে সহ্য করতেন মাত্র। এরকম প্রস্তাব পাশ করাবার মতো ভোটাধিক্য সম্পর্কে তাঁরা কখনই সুনিশ্চিত ছিলেন না।

"এইসব হয়রানি ও পীড়ন সত্ত্বেও আমি যদি মনে করতাম এর দ্বারা আমি দেশের কোন সেবা করতে পারব তবে আমি নিশ্চয়ই এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে যেতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট হিসেবে

আমার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। ভারত সরকার যেভাবে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের (সাম্রাজ্যবাদী আনুকূল্যের) নীতি-গুলো অনিচ্ছুক এসেম্বলির গলাধঃকরণ করিয়েছেন, তার প্রতিবাদে বিরোধীপক্ষের নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও তাঁর অনুগামীরা পদত্যাগ করে এসেম্বলি বর্জন করায়, এসেম্বলির প্রতিনিধিমূলক চরিত্রই গেছে হারিয়ে।

"আমার স্বদেশবাসীরা স্বাধীনতার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমার উপযুক্ত স্থান আমার দেশবাসীদের মধ্যেই; তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোই স্থির করেছি আমি, এসেম্বলির প্রেসিডেণ্ট-আসনে বসে থাকা নয়।"

অথচ, তুমিতো দেখেছ, সত্য, এই প্যাটেলই এমন একটা পরিস্থিতি নিবারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল-কাম হননি।

মুসলিম জাহানে বিচিত্র সুর-লহরী

আর, ভারতবর্ষের মুসলিম জাহানে চলছে বিচিত্র সুর-লহরী; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন তাদের স্বার্থোপযোগী একটিকে বেছে নিতে ভুল করেনি, জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ কিন্তু শেষ নির্বাচন পর্যন্ত বাছাবাছির একটানা ভুল করে গেছে।

১৯২৯-এর ৩০।৩১ ডিসেম্বরে সারা ভারত মোসলেম কনফারেন্সের কথা তোমায় বলেছি? এই সম্মেলনে বড়লাটের ট্রেন যে বোমা-দুর্ঘটনায় পড়েছিল তার জন্য নিন্দাসূচক ও বড়লাটের অব্যাহতি-লাভে অভিনন্দনসূচক প্রস্তাবটির সঙ্গে কংগ্রেস প্রস্তাবের পার্থক্য নেই। পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল, লণ্ডনে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণায় আনন্দ প্রকাশে। তার চাইতেও বড় কথা এই সতর্কবাণী উচ্চারণে যে—

"No Constitution will be acceptable to the Muslims,

until and unless adequate safeguards are provided for their rights, interests as laid down in the resolution unanimously adopted at the All India Moslem Conference held at Delhi under the presidency of His Highness the Aga Khan."

১৯৩০-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে হল অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশন; প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এম. এ. জিন্না। গতবার সভাভঙ্গের পর কাউন্সিলের এই প্রথম সভা; ছিলেন: আবদুল কৈয়াম, মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, আবদুল মতিন চৌধুরী, রাজা গজনফর আলি খাঁ, মহম্মদ রফিক, আবদুল কাদির সাদিক, তোফাইল আমেদ, আবদুল হক, জুলফিকার আলি খাঁ, নবাব সুজাত আলি ও এস. এম. আবদুল্লা।

১৯৩০-এর ১৮ই মার্চ হল মুসলিম অল পার্টিজ কনফারেন্স; এরই নামান্তর নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন।

এই সম্মেলন স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু-আহূত সর্বদল সম্মেলনকে মোটে স্বীকারই করতে চাইল না। পরিষ্কার বলা হল যে, ওতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবেই ছিলেন; যদি হিন্দু-মুসলমানে কোন সমঝোতা হয়ই, তবে তা এই নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে অনুমোদন ও সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হবে।

এই সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। এই সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবক্রমে যেমন দুই মুসলিম দলের পুনর্মিলনে আনন্দ প্রকাশ করা হল এবং লীগকে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হল, আর একটি প্রস্তাবক্রমে তেমনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হল যে, মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না। কারণটা বেশ কৌতুকপ্রদ:

"It was felt that Mussalmans could not take part in this civil disobedience movement as it was not really a movement for independence but a movement calculated to frighten the Government into accepting Dominion

Status with the communal settlement embodied in the Nehru Report."

আর যে যুক্তপ্রদেশ ছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশখণ্ডন ওরফে বৈরী রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রেরণাস্থল এবং যে হতাশ মুসলিম বাংলা-শেষ বা চরম পর্যায়ে মদদ জুগিয়ে পাকিস্তান হাসিল করল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেদিন আশ্চর্যরকমে বিপরীতমুখীন।

১৯।২০।২১-এ এপ্রিলে হল যুক্তপ্রদেশ মুসলিম সম্মেলন। রাজা সৈয়দ আমেদ আলি খাঁ ছিলেন সভাপতি। গোল টেবিলের পক্ষপাতী এই সম্মেলনে পৃথক নির্বাচনের ওপরই জোর দেওয়া হল। ১৩টা দাবি, তার মধ্যে এটিই মুখ্য। সভাপতি রাজার মতে "it forms the pivot of the whole structure of Indian Constitution in so far as the protection of Muslim riots are concerned. We firmly believe that in the existing conditions when communal feeling are so dreadfully rampant separate electorates are absolutely indispensable."………

যুক্তপ্রদেশের এই দুষ্টক্ষত সারা ভারতে নালী ঘা'র সৃষ্টি করেছিল ; এর বিষময় ফল অখণ্ড ভারতবর্ষকে কতকাল ভুগতে হবে আজ কারও সাধ্য নেই সে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রের অনিবার্য পরিণতি ; ভারতেরইতিহাসে এক বিচিত্র গতি। ভারতবর্ষের হিন্দু শেঠ বা বুর্জোয়াশ্রেণী পলাশি বা সিরাজী সামন্ততন্ত্রের অন্তিমকাল থেকে যেমন বৃটিশ-বুর্জোয়ার অনুগামী, গৌণ ভূমিকায় হাতধরা, ভারতীয় অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ও তেমনি বণিকীসভ্যতায় হিন্দু বৈশ্যদের পশ্চাদ্‌গামী—লেট-কামার। অসামর্থ্য অক্ষমতা সত্ত্বেও, অনুকরণপ্রয়াসী হয়েও হিন্দু বণিকেরা যেমন বৃটিশ বণিকদের সমৃদ্ধি ও আধিপত্যে ছিল ঈর্ষাপরায়ণ এবং কালক্রমে ১৯২১-২২ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্তরালবর্তী উদীয়মান শক্তি, প্রথমে equal partnership, মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসে, শেষে কমনওয়েলথের

ভেতর স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক, কালানুস্থত পশ্চাদ্গামী মুসলিম বণিকদেরও ঠিক তেমনি এই তিন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে ঐ অসূয়াদগ্ধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। রাজনৈতিক দাবির ধাপগুলো আসলে এরই প্রতিচ্ছবি : শোষণে কিঞ্চিৎ অংশ, ১৪ দফা হ'লেও চলে কিছু প্রেফারেন্স, কিছু সংরক্ষণ, কিছু রিজার্ভেশন, তারপর সমান, equal partnership, তাতেও সন্তুষ্টি হয় না, হতে পারে না, গোটা ভারতবর্ষে যেখানে হিন্দু বণিকের প্রাধান্য, তেমনি চাই একটা গোটা দেশ যেখানে থাকবে মুসলিম বণিকদের নিরঙ্কুশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপ—পাকিস্তান; ইংরেজবণিকের রাজদণ্ডমুক্ত হিন্দুস্থান, হিন্দুবণিকের আধিপত্যমুক্ত মুসলিম-স্থান। দেশখণ্ডনের এই অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার দিকটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অনেকেরই। ভারতবর্ষকে ভারতীয় জনসাধারণ কেটে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র গড়েনি, সত্য, এটি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক বণিক-স্বার্থই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের জন্য রাজনৈতিক প্রবক্তাদের দিয়ে এই রক্তাক্ত রূপরেখা টেনেছে। যুক্তপ্রদেশের সব চাইতে শিক্ষিত সব চাইতে অভিজাত মুসলমানেরা একদিকে এবং বোম্বাইয়ের অগ্রসর হিন্দু বুর্জোয়ারা অন্য-দিকে নিয়েছিল এই নেতৃত্ব; হাড়-মাংস দিয়েছে বাংলাদেশের মতো ভাবপ্রবণ বা ধর্মপ্রবণ প্রান্তগুলো। তারাই এই মহাপূজার বলি।

কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ঠেকছিল; হয়তো আমার চোখে সেই কাতরতা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। বললেন, বলছি, বলে যাব, আপনিই বুঝতে পারবে।

১৯৩০-এর ২১এ এপ্রিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে হয়েছিল এক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম রাজনৈতিক সম্মেলন। তুমি কি শুনে অবাক হবে যুক্তপ্রদেশের ড্রাগন যখন বিষবাষ্প ছাড়ছে তখন বাংলা দেশের মুসলমানেরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে সামিল হবার নিঃশর্ত শপথ নিচ্ছেন? চট্টগ্রাম সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো যথেষ্ট বাঙ্ময়, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না :

> "This political conference identifies itself entirely and whole-heartedly with the national goal of complete

independennce for India, the common Motherland of all sister communities."

আজকের খণ্ডিত ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শুনলে বিস্ময় জাগে, না, সত্য ? সব সম্প্রদায়ের এক মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ ; তার পূর্ণ স্বাধীনতা জাতীয় লক্ষ্য ; সর্বতোভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে এই সম্মেলন, মানে, সম্মেলন-উদ্যোক্তারা, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা, বৃহত্তর মুসলিম সমাজের প্রতিভূরা।

যেখানে ধর্মবোধ প্রবল সেখানে ধর্মের দোহাই না দিয়ে উপায় নেই। স্বরাজ ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ইসলাম বা কোরাণ সম্মত, অর্থাৎ, বিরোধী নয়, সুতরাং, পরিহার্য নয়। একে পাবার জন্য যে-কোন সঙ্গত প্রচেষ্টায় সামিল হবার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আবেদন রইল।

"এই সম্মেলন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আহ্বান জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন সবাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য হন ; সকলজাতীয় ক্রিয়াকলাপে এবং জাতীয় সাংবিধানিক স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করে, নিজেদের পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক মুক্তি ও বিকাশের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

"সম্মেলন আশা করে, মুসলমানেরাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মতো আত্মত্যাগ করবেন, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ্য ভূমিকা নেবেন এবং তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে একযোগে ভারতে বৃটিশ সরকারের নীতিবিরুদ্ধ লবণে একচেটিয়া অধিকার ভেঙে দেবেন, গোপন না করে আল্লার কৃপায় পাওয়া সমুদ্রজল ও নোনা মাটি থেকে লবণ তৈরি করবেন।"

আহা, সত্য, আমার মনের বড় অভিলাষ, এই দিনটি এই কালটি যদি ফিরে পেতাম!

নাঃ, সেদিন সেকাল আর ফিরবে না, মহাকাল সমুদ্রে একবার

যা পড়ে তা ফিরে আসে না। আসে না জানি, তবু তো মনে মনে ফিরে যেতে হয় সেখানে, কেমন করে যেন তন্ময় হয়ে যাই।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণের পর এবং গান্ধীজীর ডাণ্ডি-যাত্রার আগে ১৪।১৫ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে হয়েছিল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন। সভাপতি ছিলেন বর্তমান ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ামক বিরলা পরিবারেরই অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি।

আমি যেন চমকে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

তিনি বললেন, ঘনশ্যামদাস বিরলা। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের এই রেখাঙ্কন রাখলেন অধিবেশনে: "(১) বিপুল বিদেশী ঋণের দায় নিয়ে জাতিহিসেবে আমরা অধমর্ণ, (২) দায় মিটাতে আমাদের বর্তমান সঙ্গতি যথেষ্ট নয়, (৩) এই দায় যথাযথ মিটাতে পারছিনে বলে আমাদের দায়ের পরিমাণ ভয়াবহগতিতে বেড়েই চলেছে, (৪) সুতরাং, একেবারে সর্বনাশে পতিত হতে না চাইলে আমাদের দরকার হচ্ছে উদ্বৃত্ত রপ্তানি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তাই থেকে দায় মিটানো, সম্ভব হলে, ঋণের কিছুটা পরিশোধ করা, (৫) আমাদের উৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করেই কেবল এই উদ্বৃত্ত রপ্তানি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।"

তিনি আরও বললেন যে, "বর্তমান অসন্তোষের মূলে রয়েছে জনসাধারণের নিদারুণ দুর্দশা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিছক জীবনরক্ষায় কঠিনতম সংগ্রাম করে চলেছে, তারা ভয়ঙ্কর বেকারীর কবলগ্রস্ত। আর যারা একেবারে নীচের তলাকার মানুষ তাদের অবস্থার বর্ণনা বাহুল্য মাত্র।

> "They do not seem to be suffering from unemployment to a similar extent because their standard of living is so low that nothing could possibly be lower."

"কিন্তু চিরকাল এমন অবস্থা থাকতে পারে না। ইতিমধ্যেই ঐ জনসাধারণের নিস্তরঙ্গ সন্তোষ বিঘ্নিত হয়েছে। কোন এক সময় একটা কীটও বেঁকে দাঁড়ায়, এবং কারণ যদি দূর করা না যায় তবে এই কোটি কোটি মূক জনসাধারণের অসন্তোষ একদিন ফেটে পড়তে

বাধ্য। সমৃদ্ধ ভারত মানেই পৃথিবীর শান্তি, বুভুক্ষু ভারত পৃথিবীর বিপদস্বরূপ।"

সমৃদ্ধ ভারত ও পৃথিবীর শান্তিলাভের কি উপায়? আমেদাবাদ মিল মালিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট শেঠ চমনলাল পারেখ ২৬এ জুলাই বাৎসরিক সভায় বললেন, "সে উপায় অবিলম্বে ভারতে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠা।"

ডাণ্ডি মার্চের মাস পাঁচেক পরও আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায়নি। শেঠজীই বলছেন: "Whole of India is in a state of upheaval," এবং ১৯৩০-এ গৃহীত স্বাধীনতা-প্রস্তাব অবলম্বনে স্বাধীনতালাভের জন্যই এই অভ্যুত্থান। কিন্তু বুর্জোয়া মুখপাত্র শেঠজী জুলাই মাসে নির্দ্বিধায় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথাই বললেন, "all the political parties in the country declared that the direct and honourable course of settlement lies in the definite establishment of Dominion Status without delay."

সপ্রু-জয়াকরের দৌত্য

এজন্য শেঠজীকে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে, ১৯৩০-এর অসামান্য অব্যাহত জনতরঙ্গ-বিক্ষোভের কালেই কারান্তরিত নেতৃবৃন্দও বৃটিশ কূটনীতির উর্ণনাভ যে জাল ছড়িয়েছিল তাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমরা যারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম তারা জানতেও পারিনি যারবেদা-নৈনী জেলে কি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল; যখন জেনেছি, তখন আবেগহীন নিরুত্তাপে তা গ্রহণ করতে পারিনি। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের আপোষ আলোচনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল, দৃশ্যের পর দৃশ্যান্তরে তা উন্মোচিত হয়েছে, আজ আমাদের সামনে তার কতকগুলো চিঠি ছাড়া আর কিছু নেই। ১৯৩০-এর ৫ই সেপ্টেম্বর বিগত দু'মাস ধরে যেসব চিঠি চালাচালি হয়েছিল সপ্রু-জয়াকর তা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সপ্রু-জয়াকরের দৌত্য

ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পত্রালাপ সম্ভব হয়েছিল তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরুইনের আনুকূল্যেই। বেদনাদায়ক—কিন্তু আমার মনে হয়, ইতিহাসে বেদনার ভারই বেশি।

সেদিন আর কিছু বললেন না। সম্ভবত নিজের বেদনাভারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছলেন। পরদিন বললেন :

ডাণ্ডি মার্চের পর চার মাস কেটে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যাহ্নসূর্য।

২০এ জুন মতিলাল নেহরু লণ্ডন 'ডেলি হেরল্ডের' স্পেশ্যাল করেসপণ্ডেণ্ট জর্জ শ্লোকোমকে (George Slocomb) এক ইণ্টারভিউ দেন। গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে তাঁর কি অভিমত এই ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন।

কিছুকাল পরই বোম্বাইয়ে শ্লোকোম মতিলালের সঙ্গে এক আলোচনায় বসেছিলেন; শ্লোকোম এই থেকে কয়েকটি মীমাংসা শর্তের এক খসড়া রচনা করেন; মতিলালকে তা দেখানো হলে তিনি বোম্বাইয়ের একটি ছোট্ট বৈঠকে তা অনুমোদন করেছিলেন; বৈঠকে ছিলেন মতিলাল, জয়াকর ও শ্লোকোম। মতিলালের সম্মতিক্রমেই শ্লোকোম তাঁর খসড়ার একটি কপি জয়াকরকে দিয়েছিলেন, যাতে জয়াকর এই নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন।

একথা মনে রাখা দরকার, সত্য, যে, ১৯২৯।৩০-এর কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল ছিলেন প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন জওহরলাল। জওহরলাল কারান্তরিত হলে মতিলাল আবার প্রেসিডেণ্ট হন। শ্লোকোমের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি ছিলেন কারামুক্ত।

শ্লোকোম স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুকেও ঐ খসড়ার একটি কপি গেঁথে এক চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি সপ্রুজীকে জানান যে, ঐসব শর্তের ভিত্তিতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে তাঁদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করতে মতিলাল সম্মত আছেন। বিবৃতিটি বোম্বাইয়ে ২৫এ জুন মতিলালের হস্তগত হয়।

চিহ্ন দেওয়া একটা বই খুলে পড়তে লাগলেন :

"If in certain circumstances the British Goverment and the Government of India, although unable to anticipate the recommendations that may in perfect freedom be made by Round Table Conference on the attitude which the British Parliament may reserve for such recommendations, would nevertheless be willing to give private assurance that they would support the demand for full responsible government for India subject to such mutual adjustments and terms of transfer as are required by the special needs and conditions of and by her long association with Great Britain and as may be decided by Round Table Conference.

ঘরোয়া প্রতিশ্রুতি

পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, শর্ত-কণ্টকিত স্বাধীনতাও নয়, এ এক এমন দায়িত্বশীল গবর্নমেণ্ট যার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘকালীন সম্পর্ক ও গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত। এমন যে গবর্নমেণ্ট তার দাবি সমর্থনের "ঘরোয়া প্রতিশ্রুতি" দেবেন বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, ঘরোয়া প্রতিশ্রুতি মানে? বললেন, ওর মানে নেই, ইংরেজি আছে, private assurance. আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির পথে প্রতিবন্ধক আছে একথা মেনেই নেওয়া হল। এই ঘরোয়া প্রতিশ্রুতিই হবে আপোষ আলোচনার ভিত্তি। আমি জানিনে, সত্য, কংগ্রেস তথা আইন অমান্য আন্দোলনের এমন কি বেপরোয়া অবস্থা হয়েছিল যাতে ঐ রকম একটা গবর্নমেণ্টের প্রার্থনায় নিদেন "ঘরোয়া প্রতিশ্রুতি"-ই যথেষ্ট মনে হয়েছিল। কি অতলস্পর্শী বিশ্বাস! অথচ এঁদেরই মুখে শুনেছি, history of British India is a history of broken pledges. চরম বিশ্বাসে আইন অমান্য প্রত্যাহারের কথাও রইল ঐ বিবৃতিতে :

"If such assurance were offered and accepted, it would

render possible a general measure of conciliation which should entail the simultaneous calling off of the civil disobedience movement, the cessation of Government's present repressive policy and generous measure of amnesty for political prisoners and would be followed by Congress participation in the Round Table Conference on terms to mutualy agreed upon."

এই ঘরোয়া প্রতিশ্রুতি পেলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে, সরকারের চণ্ডনীতি নিবৃত্ত হবে, রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্তির উদার ব্যবস্থা হবে—আর উভয়সম্মত শর্তানুসারে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবে।

বললাম, তাহলে তো সন্ধিশর্তে লাভ তুটি—

বাধা পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, এক নম্বর, কারাবরণ থেকে কারামুক্তি; তুই নম্বর, প্রথম গোল টেবিলে না গিয়ে দ্বিতীয় গোল টেবিলে যাওয়া।

হাসলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। বললেন—সপ্রু-জয়াকর এই "দলিল" হস্তগত করে জুলাই মাসের প্রথমভাগে একাধিকবার বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পর একটি পত্র দেন।

"আমরা জানি, ইয়োর একসেলেন্সি, একদিকে যেমন আইন অমান্য আন্দোলন প্রতিরোধে বাধ্য অপরদিকে সাংবিধানিক কর্মসূচীর একটি সর্বসম্মত সমাধানের উপায় বের করার জন্যও তার চাইতে কিছু কম উৎকণ্ঠিত নন।" ইত্যাদি কথা বলে তাঁরা গান্ধীজী, মতিলালজী (কেননা, মতিলাল ইতিমধ্যে জেলে এসেছেন) ও জওহরলালজীর সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। উদ্দেশ্য, দেশের স্বার্থে যাতে তাঁরা তাঁদের আবেদনে সাড়া দিতে পারেন।

বড়লাট জবাব দিয়ে বললেন, দেখা আপনারা করতে চান, করতে পারেন। এতে যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে আসুক, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়:

"It is evidently not possible for me to anticipate the

proposals that will be made by Government of India after they had time to Consider the Simon Commission's Report or by Round Table Conference and still less the decision of the Parliament.

জওহরকে গান্ধীজীর চিঠি

লর্ড আরুইন প্রস্তাবিত সাক্ষাতে বাধা দিলেন না। সপ্রু-জয়াকর এবার দু'টি "দলিল" নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে যারবেদা জেলে ২৩ ও ২৪এ জুলাই দেখা করলেন। গান্ধীজী নৈনী জেলে জওহরলালকে প্রত্যর্পণের জন্য ওঁদের হাতে একটি চিঠি দিলেন।

"আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, অন্তর্বর্তীকালে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় কি কি রক্ষাকবচ থাকবে গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনা যদি তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে তো আমার আপত্তি নেই, তবে একথাও বলা রইল যে, কেউ যদি স্বাধীনতার প্রশ্ন তোলেই তো তা বাতিল করা হবে না।

"কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগদানের প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপনের আগে আমাকে জেনে নিতে হবে কাদের নিয়ে এই সম্মেলন হতে চলেছে।

"গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে যদি কংগ্রেস নিঃসংশয় হয় তবে, স্বভাবতই, আইন অমান্য প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু গবর্নমেণ্ট নিজেরা যদি মদ ও বিদেশী বস্ত্র (বিলাতী নয়) নিষিদ্ধ না করেন তবে বিদেশী বস্ত্র ও মদের জন্য পিকেটিং চলবে। জনসাধারণের লবণ তৈরি চালু রাখতে হবে এবং লবণ আইনের দণ্ডনীয় বিধানগুলো প্রয়োগ করা হবে না, পক্ষান্তরে সরকারী বা বেসরকারী লবণ গোলায়ও আর হানা দেওয়া হবে না। I will agree even if this clause is not made a clause in these terms as an understanding in writing.

"আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ অথবা হিংসার প্ররোচনায় সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারাদণ্ডিত অথবা বিচারাধীন সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিতে হবে। লবণ আইনে,

রাজস্ব আইনে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের কাছ থেকে অথবা প্রেস আইনে আদায়ীকৃত জরিমানা ও জামানত ফেরত দিতে হবে। গ্রামের অফিসারসহ যে সকল অফিসার পদত্যাগ করেছিলেন অথবা আইন অমান্য আন্দোলনকালে পদচ্যুত হয়েছেন কিন্তু আবার কাজে যোগ দিতে চান তাঁদের ফিরিয়ে নিতে হবে।"

"বড়লাটের অর্ডিনান্সগুলো বাতিল করতে হবে। আমার এই অভিমত একান্তভাবে সাময়িক; কেন না, আমি মনে করি, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ-বিরহিত বন্দীর বাইরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে না বলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর অভিমত প্রকাশ করার অধিকার নেই। সুতরাং, আমি আন্দোলনের সংস্পর্শে থাকলে আমার অভিমত সম্পর্কে যে গুরুত্ব দাবি করতে পারতাম এক্ষেত্রে সে-দাবি করতে পারিনে।

"সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশিত হতে পারবে না। এটি বর্তমানে বড়লাটকেও দেখানো চলবে না।"

পত্রটি এম. কে. গান্ধী স্বাক্ষরিত, তারিখ ২৩এ জুলাই।

মতিলালের কাছে গান্ধীজীর পত্র

গান্ধীজী মতিলালকে লিখলেন:

> "My position is essentially awkward. Being temperamentally so built, I cannot give a decisive opinion on matters happening outside the prison walls."

গান্ধীজী মতিলাল নেহরুর কাছে এই প্রসঙ্গে ও উপলক্ষে যে চিঠি লিখলেন তাতেও এই কথাই বললেন যে, কারাপ্রাচীরের মধ্যে থেকে বাইরে যা ঘটছে তার ওপর কোন সুনিশ্চিত অভিমত দেওয়া যায় না।

জানতে চাইলাম, তবু দিলেন কেন?

বিঃ দ্রঃ—এটি অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তারও ব্যাখ্যা আছে, লিখেছেন।

"সুতরাং, আমি যা আমাদের বন্ধুদের দিয়েছি তা হচ্ছে আমাকে যা সন্তুষ্ট করতে পারে তারই একটা মোটামুটি খসড়া। আপনি হয়তো না-ও জানতে পারেন যে, আমি মিঃ শ্লোকোমকে কোন কিছু দিতে গররাজি ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম তিনি যেন এই বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু আমি তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি এবং আপনার সঙ্গে দেখা করার আগেই সাক্ষাৎ-সংবাদ প্রকাশ করতে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে চাই যে, সম্মানজনক মীমাংসার উপযুক্ত সময় যদি এসে থাকে তবে আমি তার প্রতিবন্ধক হতে চাইনে। এ সম্পর্কে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জওহরলালের কথাই হবে চূড়ান্ত। আপনি ও আমি তাকে কেবল পরামর্শই দিতে পারি। সপ্রু ও জয়াকরের কাছে আমি আমার যে স্মারকলিপি দিয়েছি তাই হচ্ছে আমার শেষ সীমা। কিন্তু জওহরলাল ও আপনি আমার এই অভিমত কংগ্রেসের মৌলিক কর্মনীতি (policy) অথবা জনগণের মেজাজের বিচারে সামঞ্জস্যহীন মনে করতে পারেন। লাহোর প্রস্তাবের প্রত্যেকটি অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কঠোরতর মনোভাব অবলম্বনে আমার দ্বিধা থাকা উচিত নয়। আমার স্মারকলিপি যদি আপনাদের উভয়ের হৃদয়ে অনুকূল সাড়া না জাগায় তবে তার ওপর কোন গুরুত্বই আরোপ করবেন না। বড়লাটের কাছে লেখা আমার প্রথম চিঠির ১১টি বিষয় আপনাদের যে উৎসাহিত করেনি তা আমি জানি। আমি জানিনে, আপনি এখনও সেই অভিমত পোষণ করেন কিনা, ওগুলো সম্পর্কে আমার মন পরিষ্কার। আমার কাছে ওগুলোই হচ্ছে স্বাধীনতার সারাংশ। ওগুলো অচিরাৎ কার্যকর করার মতো ক্ষমতা জাতি না পেলে অন্য কোন কিছুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

"In restricting myself to the three in the Memorandum, I have not waived the other eight, but three are

now brought out to deal with the Civil Disobedience. I would be no party to any truce which would undo the position at which we have arrived to-day."

হাতের কাগজটা সশব্দে নেড়ে চেড়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই মানবে সত্য, মতিলাল বা জওহরলাল, বিশেষ করে জওহরলাল—যাঁর কথা গান্ধীজী চূড়ান্ত গণ্য করেন—কি বলেন এ বিষয়ে মনে দ্বিধা থাকলেও এই ত্রুটিতে গান্ধীজীর মানস-সরোবরটির স্বচ্ছতা লক্ষণীয়; সেখানে একটি আপোষকামী মীন স্বচ্ছন্দে বিহার করছে। বার বার মনে একথা জেগেছে বটে যে, কারাপ্রাচীরে থেকে একটা সুনিশ্চিত অভিমত দাঁড় করানো সমীচীন নয়, কিন্তু মন তাঁর একটা জায়গায় স্থির হয়ে গেছে; মীমাংসার উপযুক্ত অবস্থা যদি হয়ে থাকে হোক মীমাংসা এবং থাক আইন অমান্য। সে মীমাংসায় উপনীত হতে স্বাধীনতা-প্রস্তাব থেকে সরে এলেও ক্ষতি নেই; স্বাধীনতার সারাংশ হলেই হল। আইন অমান্য তো একটা উপায় মাত্র—নিতান্তই টোকেন, বিপ্লব তো নয় যে, দণ্ডবিধি কার্যবিধির কেতাবগুলোরও বহ্ন্যুৎসব হবে। এজন্যই একান্তভাবে "বিলাতী" নয়, "বিদেশী" বস্ত্রের বর্জন। যদি গোল টেবিলে যাবার মতো হয়, যাব, কিন্তু এই এই শর্তে; সব কটি শর্তই কঠোর নিগড়ে রাখতে হবে তা নয়, একটা সমঝোতা হলেও চলবে। আর, আপাততঃ সব গোপন, অপ্রকাশ্য; কোনরকমে প্রকাশ যেন না হয়। কেননা, বাইরের মেজাজ জানা নেই; কারাপ্রাচীরের বাইরে কি হচ্ছে তা অজ্ঞাত; তবু, এই আমার চিত্তপটলেখা; আপনারা পড়ুন, কিন্তু যদি মন সায় না দেয় কোনো গুরুত্ব দেবেন না।

কারাপ্রাচীরের বাইরে কি সে অজ্ঞাত ঘটনাবলী শোনাবার বা দেখবার জন্য আপোষ-মীমাংসায় স্থির গান্ধীজীর মনও উদ্বিগ্ন?

জয়াকরের সঙ্গে কথা হল। তাঁদের ইচ্ছাক্রমে, আমাদের নোটে কিছু রদবদল করলাম। তাতে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়নি। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার এবং এ সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই। আশা করি, আপনি তা উপলব্ধি করবেন।"

এর পর জয়াকর একাই দেখা করলেন গান্ধীজীর সঙ্গে—৩১এ জুলাই, ১লা ও ২রা আগস্ট।

এ সময় কারাপ্রাচীরের বাইরে কি অবস্থা ছিল?

সাহেবদের দৃষ্টিতে

স্যার হিউবার্টকার ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার সভায় বলেছেন: It was new thing in Indian Politics that Indian ladies of good standing should come out in public streets in protests inspired by political ideas.

অর্থাৎ বিদেশীদের চোখে পড়বার মতো। ভারতীয় নারীরা গৃহে পর্দানসীন থাকেন এই তাঁরা দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু 'ভারতীয় রাজনীতির এটি একটি নতুন কথা হল, ভদ্রঘরের মেয়েরা রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় বেরিয়েছেন।'

অথবা, আমি বলব, আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা গৃহপ্রাচীরকে দিয়েছে ধূলিসাৎ করে, সলাজ বিনম্র আনত সান্ধ্য বধূর হাতে প্রদীপের বদলে ঝকঝকে উদ্যত-উদ্ধত কৃপাণ!

আর কি? আর, ইংলণ্ডেশ্বর বললেন: অর্থাৎ ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কি ধরণের গবর্নমেণ্ট হবে তার প্রস্তাব আনবার জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্ট শিগ্‌গিরই একটা কাঠামো তৈরি করে ফেলছেন; এজন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূদের একটা সম্মেলন ডাকা হচ্ছে লণ্ডনে। গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অঙ্ক অভিনয়ের জন্য স্টেজ প্রস্তুত।

আর ভারতবর্ষে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হল। তাঁরা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের স্মৃতিতে বোম্বাইয়ে একটি

মিছিল নিয়ে বেরোন এবং পুলিশের হুকুমে মিছিল ভেঙ্গে দিতে রাজী হননি। এই ছিল অপরাধ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্দার প্যাটেল, মদন মোহন মালব্য শেরওয়ানী, জয়রাম দাস দৌলতরাম, হরদিকর।

আর গুলী চলল বালিয়ায়। লাঠি যশোরে।

দেশের এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় কারাপ্রাচীরের ভেতরে গান্ধীজী এই নোটটি ডিকটেট করলেন: "(১) কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনাই তাঁর গ্রহণযোগ্য হবেনা যাতে এই একটি ধারা নেই যে, সাম্রাজ্য থেকে খুসীমত বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকবে ভারতবর্ষের এবং আর একটি ধারা, যাতে তাঁর ১১টি দফার সন্তোষ-জনক নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে। (২) বড়লাটের এটি আগেই জানা থাকা দরকার যেন পরে তিনি গোল টেবিলে এসব কথা তুলতে গেলে ওগুলোকে 'আকস্মিক' মনে না করেন। বড়লাটের এও জানা থাকা দরকার যে, গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে এই একটি ধারা তুলতে চাইবেন যে-ধারাবলে অতীতে বৃটিশের দাবী দাওয়া ও কনসেসান বিচার করতে পারবে একটি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্রাইবিউনাল।"

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দাবী

এর পর ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট যারবেদা জেলে একদিকে সপ্রু ও জয়াকর, অন্যদিকে গান্ধী, মতিলাল, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, সৈয়দ মামুদ, জয়রামদাস দৌলতরাম ও সরোজিনী নাইডুর এক সমষ্টিগত মোলাকাৎ হল। বলা বাহুল্য, ভারত তথা বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যেই এটি সম্ভব হয়েছিল।

কারাপ্রাচীরের বাইরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন চলেছে সামরিক শাসন আর অমৃতসরে লাঠি।

যারবেদা কারাগারে সমবেত নেতৃবৃন্দ সপ্রু-জয়াকরকে উদ্দেশ করে বড়লাটকে দেখাবার জন্য একটি পত্র দিলেন:

"প্রিয় বন্ধুগণ, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টায় আপনারা যে ব্রতী হয়েছিলেন এজন্য আমরা গভীর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের ও বড়লাটের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে তা পড়ে এবং আপনাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে ও নিজেদের মধ্যে আলাপ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমাদের দেশের পক্ষে সম্মানজনক মীমাংসা লাভের উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি।"

সত্য, এ যেন রুদ্ধ ঘরে শ্বাসরোধকারী দূষিত হাওয়ার বদলে দরজা-জানালার খানিকটা অবরোধ খোলা নতুন সজীব হাওয়া। সমবেত নেতৃবৃন্দের কয়েকজন কারাপ্রাচীরের বাইরে থেকে এসে অর্গলরুদ্ধ জানালা-কবাট আংশিক খুলে দিলেন এবং গভীর যবনিকা একটু উন্মোচিত হল।

"বিগত পাঁচ মাস ধরে যে গণ-জাগরণ দেখা গেল তা নিঃসন্দেহে অত্যাশ্চর্য, বিভিন্ন ধর্মমতবিশ্বাসীদের সকল স্তর ও শ্রেণীর লোকের দুর্গতিও হয়েছে অপরিসীম, তবু আমাদের ধারণা, আশু লক্ষ্যসিদ্ধির পক্ষে ঐ দুঃখবরণ যথেষ্ট হয়নি। বলা বাহুল্য, আপনারা এবং বড়লাট যে বলছেন, আইন অমান্য আন্দোলন দেশের ক্ষতি করেছে অথবা অকালে কিম্বা সংবিধানবিরোধী হয়েছে, আমরা তা কোনক্রমেই মানিনে। বৃটিশ ইতিহাসে রক্তাক্ত বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত অঢেল; ইংরাজেরা তাদের অকুণ্ঠ গুণকীর্তন করেছেন এবং তা অনুসরণের শিক্ষাও দিয়েছেন। সুতরাং, এদেশে যে-বিদ্রোহ প্রধানতঃ শান্তিপূর্ণ রয়েছে তার নিন্দা বড়লাট কিম্বা কোন প্রাজ্ঞ ইংরাজের মুখে সাজে না। বর্তমান আইন অমান্য আন্দোলনের নিন্দাবাদ, তা সরকারীক্ষেত্রেই হোক কি বেসরকারীক্ষেত্রেই হোক, নিয়ে কলহ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আন্দোলনে জনসাধারণের মধ্যে যে বিস্ময়কর সাড়া পাওয়া গেছে, আমরা মনে করি, তাই এর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছে। তবে এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, সম্ভব হলে এই আইন অমান্য একেবারে বন্ধ অথবা স্থগিত রাখার ইচ্ছায় আমরা সানন্দে কণ্ঠ মিলোতে পারি। দেশের নর নারীকে, শিশুদের অকারণ কারাগারে, লাঠী গুলীর মধ্যে ফেলে দেওয়া আমাদের

আনন্দের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং, আপনারা আমাদের বিশ্বাস করুন সম্মানজনক শান্তিলাভের পথাবিষ্কারে কোন উপায়ই আমরা বাদ রাখব না, কিন্তু একথা স্বীকারেও কোন দ্বিধা নেই যে এখনও দিগন্তে এমন কোন আভাস দেখতে পাচ্ছিনে। বৃটিশ সরকারী মহলে এই মতাবলম্বনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যে, ভারতের নর-নারীকেই ভারতের পক্ষে যা কল্যাণতম তা স্থির করতে দিতে হবে। সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের ভাল ভাল, শুভবুদ্ধি প্রণোদিত, সস্নেহ ঘোষণাবলীতে আর আমাদের বিশ্বাস নেই। এই প্রাচীন দেশের মানুষেরা ইংরাজদের যুগ যুগব্যাপী শোষণে এমন অক্ষম হয়ে পড়েছে যে, শোষণের ফলে যে নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা ঘটেছে তাও সহসা তাদের নজরে পড়ে না।

> "They cannot persuade themselves to see, that one thing needful for them to do is to get off our backs and do some reparaton for the past wrong by helping us to grow out of the dwarfing process that have gone on for a century of British domination, but we know you and some of our learned countrymen think differently."

ইত্যাদি ইত্যাদি। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গোলটেবিল বৈঠকে যাবার অভিপ্রায়ও অনুক্ত রইল না। "আপনাদের চিঠির জবাবে বড়লাট যা বলেছেন তার ভাষা এতই অস্পষ্ট যে,গত বছরকার লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, এবং দরকার হলে, এ. আই. সি. সি.-র সম্মুখে বিষয়টি উত্থাপন না করে অবিসম্বাদীভাবে কিছু বলার মত অবস্থাও আমাদের নয়; তবে ব্যক্তিগতভাবে আমরা বলতে পারি যে, কোন সমাধানই সন্তোষজনক হবে না যদি না—

১। (ক) বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার স্বীকৃত হয়; (খ) দেশরক্ষাবাহিনী ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং গান্ধীজীর ১১-দফাসহ ভারতবর্ষকে দায়িত্বশীল বা পূর্ণ জাতীয় সরকার দেওয়া হয়; (গ) জাতীয় সরকারের মতে যেসব সরকারী

কারাপ্রাচীরের বাইরে কি?

২০এ জুন হয়েছিল মতিলাল-শ্লোকোম সাক্ষাৎ এবং তারই অবিচ্ছিন্ন জের টেনে ২০এ জুলাই নাগাদ হল গান্ধী-সপ্রু-জয়াকর সাক্ষাৎ। কি ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছিল এই একমাসকাল কারা-প্রাচীরের বাইরে? এবং তারও একমাস আগে ২০এ মে তারিখে গান্ধীজী-শ্লোকোম সাক্ষাৎ যখন হয়েছিল? অর্থাৎ, এ দুটি মাস আগেই গান্ধীজীর কতকগুলো সর্ত সম্পর্কে মনঃস্থির ছিল। কিসের ভিত্তিতে? ৪ঠা মে থেকে গান্ধীজী কারাপ্রাচীরে ছিলেন। মাত্র ১৬ দিন পরেই তিনি কারাপ্রাচীর থেকে কতকগুলো সর্ত শ্লোকোমের কাছে পেশ করেছিলেন, সপ্রু-জয়াকরের উৎসাহে তারই পুনরাবৃত্তি করলেন দু'মাস পর। আপোষ-মীমাংসার সর্তগুলো নিশ্চয়ই গ্রেপ্তারের পর ষোলো দিনে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়নি; এগুলো ১২ই মার্চের সংগ্রাম অভিযাত্রী গান্ধীজীর মনের মণিকোঠায় বিন্যস্ত ছিল। কারাপ্রাচীরের বাইরের বা কারাপ্রাচীরের ভেতরের ঘটনাক্রম নয়, তাঁর মনের বিস্তারে যা সাজানো ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে; কারাপ্রাচীরের বাইরের ঘটনাক্রমের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

পক্ষান্তরে নিদারুণ বয়কটের ফল কি হয়েছিল? তারই দুটো হিসেব দিলেন স্টেটসম্যান ৯ই জুলাই আর ১৭ই জুলাই।

প্রথম তারিখে বললেন:

> "............almost every dhooti manufacturer has stopped production in the absence of any orders from this side. Quotations for grey dhooties are followed by phrases relative to shipment which can only be given one month after the termination of the boycott, and from this it can only be assumed that no producers are available........ Everybody admits the gravity of the situation, and all classes of traders are seriously affected by prevailing stagnation."

এদিক থেকে অর্ডার না পাওয়ায় প্রায় সব ধুতি তৈরির কলই

বন্ধ হয়ে গেছে। সকলেই স্বীকার করছেন যে, অবস্থা ভয়াবহ এবং এই অচলাবস্থায় সব রকমের ব্যবসায়ীই ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয় তারিখে বললেন :

"কলকাতায় বয়কট শুরু হবার পর থেকে ১লা মে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন কারবারীই এখন আর আগাম কেনার কথা ভাবছেন না। চুক্তিবদ্ধ জিনিষগুলো কিভাবে বেচে ফেলা যায় এই একমাত্র ভাবনা। কিন্তু বয়কট অভিযান এমনই অব্যর্থ হয়েছে যে, সৎ অসৎ কোন উপায়েই চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।"

> "The result of the boycott movement which has, without doubt, been very thorough, has had its toll on suppliers. It is staggering to learn that there are about 100 miles closed in Blackburn—which is the biggest centre for weaving the Bengal Dhooti, causing long quenes outside the Employment Exchanges all over Lancashire tell their own story. Never there has been so much unemployment in times of strike or lockouts."

"বয়কট আন্দোলনের ফল ফলেছে পুরোমাত্রায়। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ব্ল্যাকবার্ণ হচ্ছে বাংলার ধুতি তৈরির সবচাইতে বড় কেন্দ্র; এখানে ১০০ কল বন্ধ হ'য়ে গেছে; সারা ল্যাঙ্কাসায়ার জুড়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলোর সামনে লম্বা কিউ দেখলেই দুর্দশাটা বোঝা যায়; ধর্মঘট বা লক-আউট হলেও কখনো এমন বেকারী দেখা যায়নি।"

সুতরাং আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব বা সর্ত যদি কারও দিকে অনিবার্য হয়ে থাকে তো কংগ্রেসের দিকে নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু শ্লোকোম-সপ্রু-জয়কর। মতিলাল-গান্ধীজীর সাক্ষাতে বিপরীত চিত্র ও চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

শান্তি-পারাবতেরা নৈনী জেলে এসে পিতা-পুত্র মতিলাল-জওহরলালের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট দলিল পত্র নিয়ে দেখা করলেন। গান্ধীজীর ২৩এ জুলাইয়ের চিঠি দেখে তাঁরা বললেন, গান্ধীজী ও অন্য সহচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনা না করে তাঁরা সপ্রু-জয়াকরের

এবং গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলতে নারাজ। "হয়তো আমরা গান্ধীজীর ২ ও ৩ নং বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি সহমত হতে পারি কিন্তু তাও বিস্তারিত আলোচনা-সাপেক্ষ, বিশেষ করে ১নং নিয়ে।"

গান্ধীজীর কাছে জওহরের চিঠি

জওহরলালজী ২৮এ জুলাই লিখলেন :

"ডঃ সপ্রু ও মিঃ জয়াকর কাল এসেছিলেন এবং পিতৃদেব ও আমার সঙ্গে তাঁদের অনেকক্ষণ কথা হল। আজ তাঁরা আবার আসছেন। তাঁরা আমাদের সব তথ্য দিয়েছেন এবং আপনার নোট ও চিঠি দেখিয়েছেন। আমরা ভাবলাম, আমরা উভয়ের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোবো। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করব। অবশ্য যদি নতুন কিছুর উদ্ভব হয়, আমরা আগেকার অভিমত পাল্টাতে প্রস্তুত থাকব। আপাততঃ, আমাদের সিদ্ধান্ত একটি নোটে লিপিবদ্ধ করলাম; নোটটি আমরা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও এম আর জয়াকরকে দিচ্ছি। একথা বলতে পারি যে, আমাদের মনোভাব কি হবে সে বিষয়ে পিতৃদেব ও আমি সম্পূর্ণ একমত। স্বীকার করছি, সংবিধান সম্পর্কে আপনার ১নং বিষয়টি আমাদের মন জয় করতে পারেনি।

"আমাদের লক্ষ্য, শপথ ও আজকের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এ কিভাবে খাপ খাওয়ানো যায় আমি ভেবে পাইনে। আমরা এবিষয়ে আপনার সঙ্গে সর্বাংশে এক মত যে, আমরা এমন কোন সন্ধিসর্তের অংশীদার হতে পারিনে যা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে কোনরকমে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ঠিক এই কারণেই চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে পরিপূর্ণ বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন।

"স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, আমি কিন্তু অপরপক্ষের কোনো লক্ষ্যণীয় গরজ দেখছিনে এবং আমার খুবই আশঙ্কা যে, এটি আমাদের

পক্ষে দুর্বল ভ্রান্ত ও প্রচেষ্টা হচ্ছে। আমি খুব নরম করেই একথা বললাম।

"আমার কথা বলতে পারি, আমি সংগ্রামেই আনন্দ পাই। তাতে অনুভব করতে পারি আমি বেঁচে আছি। ভারতবর্ষের বিগত চার মাসের ঘটনা আমার অন্তরকে উল্লসিত করেছে এবং ভারতীয় নর, নারী, এমনকি শিশু আমাকে এমন করে আগে আর কখনো ভাবায়নি। তবু আমি জানি, অধিকাংশ লোক সংগ্রাম প্রবণ নয়, শান্তিকামী এবং তাই আমি নিজেকে কঠোর সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করি এবং শান্তিপূর্ণ দৃষ্টীভঙ্গী অবলম্বন করি।

যাদুস্পর্শে আপনি নতুন ভারতের সৃষ্টি করেছেন বলে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

"ভবিষ্যতে কি আছে আমি জানিনে, কিন্তু এই অতীত আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে বেঁচে থাকার সার্থকতা এবং গদ্ধময় অস্তিত্বে মহৎ মহাকাব্যের স্পর্শ। এই নৈনী জেলে বসে অস্ত্র হিসেবে অহিংসার আশ্চর্য কার্যকারিতা নিয়ে আমি ভেবেছি এবং আগের চাইতে অনেক বেশী প্রত্যয় নিয়ে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি।

"অহিংসা নীতি সম্পর্কে দেশে যে সাড়া পাওয়া গেছে, আশা করি, আপনার তাতে অসন্তোষের কারণ ঘটেনি। হয়তো এখানে ওখানে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে, কিন্তু আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়ের সঙ্গে নিশ্চয়তার সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দেশ অহিংসা-নিষ্ঠ থেকেছে। মাপ করবেন, আমি এখনও আপনার এগারোটি পয়েন্টের প্রতিবাদী। ওর কোনটা সম্পর্কে আমি যে দ্বিমত পোষণ করি তা নয়। ওগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি আমি মনে করিনে ওগুলো স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে।

> "But certainly I agree with you that we should have 'nothing to do anything that would not give the nation power to give immediate effect to them.'

"পুনশ্চঃ আমাদের আবার স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও এম

করেই বলেছেন, আমাদের ১৫ই আগস্টের লেখা চিঠির ভিত্তিতে কোন আলোচনা অসম্ভব; তাই তাঁর এই উপসংহার যথার্থ যে, তাঁদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।"

ঐ পত্রের বিষয়গুলোর পুনরুক্তি করে তাঁরা এ চিঠিতে বললেন, প্রশ্নগুলোয় নিষ্পত্তি হলেই কেবল লণ্ডন বৈঠক কাদের নিয়ে হবে ও কংগ্রেসের কে বা কারা যাবেন তা স্থির হতে পারে। লর্ড আরুইন বলেছেন, এ নিয়ে আলোচনারও কোন ভিত্তি নেই। বিষয় ছাড়াও চিঠির সুর ও বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, তাঁদের শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা নেই। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা হবার বিজ্ঞপ্তি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কমিটিকে বেআইনী ঘোষণা করা ও সদস্যদের গ্রেপ্তার করার মধ্যে আর কোন অর্থ নেই। সরকারের কোন কোন ক্রিয়াকলাপ "অসভ্যোচিত" মনে করলেও আমরা এ নিয়ে নালিশ করছি নে। বরং, এসব আমরা বরণই করব (we welcome them)। কিন্তু আমরা মনে করি, একই সঙ্গে শান্তি কামনা ও যে সংস্থা শান্তি আনতে পারে তার ওপর আক্রমণ চলতে পারে না। সারা ভারতবর্ষে ওয়ার্কিং কমিটি নিষিদ্ধ করার একটি অর্থই হতে পারে—তা হচ্ছে, জাতীয় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

"আমাদের ও লর্ড আরুইনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান বিরাজমান তাতে বিস্তারিত আলোচনা নিরর্থক; কিন্তু আপনার কাছে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। আমরা আমাদের চিঠিতে বলেছি, প্রতিরক্ষা-বাহিনী ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণসহ পূর্ণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোথায় কি রক্ষাকবচ হবে-না-হবে তা ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ও বৃটিশের দাবীদাওয়া ও কনসেসান সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বড়লাট আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

"বন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে লর্ড আরুইনের কথা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অসন্তোষজনক। আমরা এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার ও পদস্থ

ব্যক্তিদের ঔদার্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে রাজী নই। আইন অমান্য আন্দোলনের আগেও অনেকে বন্দী হয়েছেন ; উদাহরণস্বরূপ মীরাট মামলার বন্দীদের কথা বলা যায়, বিচারাধীন অবস্থায়ই তাঁদের দেড় বছর কেটে গেছে, তাঁদেরই বা কি হবে ?

"যাঁরা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে বন্দী হয়েছেন আমরা তো তাঁদের মুক্তি দাবী করিনি, একারণে নয় যে, তাঁদের মুক্তি দিলে আমরা খুশী হব না। এই কারণ আমাদের আন্দোলন যখন অহিংস তখন ঘুলিয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

তাঁরা লিখলেন, পিকেটিংও লবণ আইন সংক্রান্ত জবাবও মোটে সন্তোষজনক নয়। আপনি আমাদের এ নোটটি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বল্লভ-ভাই প্যাটেল ও জয়রাম দাস দৌলতরামকে দেখাবেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সপ্রু-জয়াকরকে জবাব দেবেন।

এবারকার মতো শেষ চিঠি

সপ্রু-জয়াকর যারবেদা জেলে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন ৩রা, ৪ঠা, ৫ই সেপ্টেম্বর। তাঁরা ৫ তারিখে একখানা চিঠি দিলেন তাঁদের হাতে—এবং এবারকার মতো এটিই চূড়ান্ত। এম কে গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল, জয়রামদাস দৌলতরাম-স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে সব বিষয়েরও সব বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি আছে ; সুতরাং, ওর মধ্যে নতুন দু একটি কথা ছাড়া আর উল্লেখ করব না।

"প্রিয় বন্ধু!"

সকল কাগজ পত্র দেখে ও সপ্রু-জয়াকরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁরা নিশ্চিত বুঝেছে যে, গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন মিলন-ক্ষেত্র নেই। "সুতরাং, শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে কোথায় বাধা আমরা সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করে যাব।"

এই পত্রে স্লোকোমের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বড়লাটের বিভিন্ন সময়ের

বিবৃতি ইত্যাদি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "আমরা মনে করি, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মস্ত ফারাক রয়েছে।"

পড়া থামিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই মন্তব্য করলেন:

গান্ধীজী প্রমুখের এই চিঠিতে সম্ভবত: এই প্রথম "সমঅংশীদারত্বের" (equal partnership) কথাটার উল্লেখ হয়েছে।

> "If India is now to attain full responsible government or by whatever other terms it is to be known, it can only be on an absolutely voluntary basis, leaving each party to sever the partnership or association at will. If India is to remain no longer a part of the British Empire but is to become an equal and free partner in the Common-wealth, she must feel the one and warmth of that assceiation and never otherwise."

"যতক্ষণ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ জনসাধারণ এটি (কমনওয়েলথভুক্ত সমঅংশীদারত্ব) অসম্ভব ও অগ্রাহ্য মনে করছেন, ততক্ষণ, আমাদের মতে, কংগ্রেসকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যেতে হবে।

"লবণের ব্যাপারে গবর্নমেণ্টের মনোভাবটি আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

> "It is as plain as daylight to us that, from dizzy heights of Simla, the Rulers of India are unable to understand or appreciate the difficulties of the starving millions living in the plains whose incessant toil makes Government from such a giddy height at all possible."

লবণের বদলে আয়ের কোন একটি বিকল্প উপায় বলে দেবার কথাও নেতৃবৃন্দ 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটের' সঙ্গে (adding insult to injury) তুলনা করেছেন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আমার মতে এটা ব্যর্থতার স্বীকৃতিও বটে যে, শাসক সম্প্রদায়, তাঁরা যে অস্ত্র প্রয়োগ করে স্বাধীনতা পেতে চাইছেন তা মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। হয়তো মাত্র কয়েকমাসের দুঃখবরণ তাঁদের চিত্ত আলোড়ন করতে পারেনি।

আরও দুঃখবরণ চাই।

"The nation has resorted to a weapon which the rulers being unused to it. Will take time to understand and appreciate. We are not surprised that a few months suffering has not converted them."

সত্য, এ সেই হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা। এজন্য আরও একবার বল হল, না, ইংরাজদের সঙ্গে কোন বিবাদ নেই। বৃটিশ আধিপত্যই অসহ্য। বললেন, শান্তি আলোচনার এখনও সময় হয়নি। তাছাড়া, বন্দী হিসাবে তাঁদের অসুবিধেও আছে; খবর যা-কিছু তা নিতান্তই পরোক্ষ, তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক। এজন্য যাঁরা বাইরে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে বন্দীদের সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। গবর্নমেণ্ট ইচ্ছে করলে সে ব্যবস্থাও করতে পারেন।

হঠাৎ হাসতে লাগলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক্। মুখে হাসি রেখেই বললেন, পরশুরামের "চিকিৎসা সঙ্কটে" তারিণী স্যানকে মনে পড়ে? খুল্লনের মৈত্রী বাবুকে যিনি একদলা চ্যবন প্রাশ দেবার কথা বলে জিগগেস করেছিলেন, তারপর কি হল কও দিকিন? কিন্তু পা গজালো কিনা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছাগলাদ্য ঘৃতের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তুমিও যদি আমাকে জিগগেস কর, এরপর কি হল? আমি সোজা জবাব দেব না।

কারা প্রাচীরের বাইরে লেখা

বলব, ইতিমধ্যে কারা প্রাচীরের বাইরে ইতিহাসের বেশ কয়েকটি পাতা উল্টে গেছে। শব্দটা আজ আর তুমি শুনতে পাবে না। কিন্তু কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চালস টেগার্টকে লক্ষ্য করে সেদিন একটি বোমা বিস্ফোরণের নিদারুণ শব্দ চমকে দিয়েছিল ড্যালহৌসী স্কোয়ারকে। সেদিন ২৫এ আগষ্ট। স্কোয়ারের ঐ দক্ষিণ পূর্ব কোণে; সকাল বেলা ১১টা নাগাদ গাড়ীতে করে যাচ্ছিলেন অফিসে; গাড়ীটা মোড় ঘুরতেই ছুটো বিস্ফোরণের শব্দ। গাড়ীটা একটু এগিয়ে গেল, তারপর ঘুরল পেছনে। গুলী চালনার শব্দও শোনা গেল। এক বাঙালী তরুণ রক্তাপ্লুত; স্কোয়ারের রেলিং

ঋণ অসঙ্গত অথবা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থপরিপোষক নয় তৎসহ ইংরাজদের সকল দাবী ও সুবিধা, প্রয়োজন হলে, কোন নিরপেক্ষ ট্রাইবিউনালে পেশ করতে ভারতকে অধিকার দেওয়া হয়।

২। ওপরের বিষয়গুলো যদি বৃটিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং তদনুসারে একটি সন্তোষজনক ঘোষণা করা হয়, তবে আমরা আইন অমান্যের উদ্দেশ্যেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয় বলে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে সুপারিশ করব কিন্তু গবর্নমেণ্ট যদি-না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মদ ও বিদেশী বস্ত্র নিষিদ্ধ করেন তবে সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলবে।

এর মূল ইংরাজী বয়ানটা পড়ি, সত্য, বাংলা অনুবাদটা আমার তেমন মনঃপূত হচ্ছেনা, এর চাইতে ভালো বাংলা আমি করতেও পারছিনে: "We should commend to the Working Committee the advisability of calling off Civil Disobedience, that is to say, disobedience of certain laws for the sake of disobedience, but peaceful picketing of foreign cloth and liquor will be continued."

সত্য, এগুলোর পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র, এগুলো গান্ধীজীর জুলাই মাসের চিঠিতেই ছিল। মতিলাল, গান্ধী, শ্রীমতী নাইডু, সর্দার প্যাটেল, দৌলতরাম, সৈয়দ মামুদ, জওহরলাল-স্বাক্ষরিত বর্তমান চিঠিতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, যার নাম কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চিঠি তাতে আসলে ঘরে-বাইরের, কারাপ্রাচীরের ভেতর ও বাইরের, গান্ধীজীর ও আর কারও কারও মতসঙ্ঘর্ষ ও মতসমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছে বটে, কিন্তু উচ্ছ্বাস ও বিজিনেস, নরমে-গরমে এই চিঠির মধ্যে যেটি মুখ্য সেটি গান্ধীজীর গোটা চিঠিরই পুনরুক্তি। চিঠিটি আয়তনে বৃহত্তর হয়েছে কিছু দার্শনিক তত্ত্বে এবং বাইরের চলতি আন্দোলনের উত্তাপে; সেখানেই জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে এবং তারই জোরে সর্তগুলো দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীকে বাইরেকার চাপেই একটু পিছিয়ে যেতে

হয়েছে, কিন্তু গান্ধীজীর কথাগুলোও প্রায় সর্বাংশেই স্থান পেয়েছে। তবু এই যে খানিকটা পিছোতে হল এবং শেষ পর্যন্ত প্রথমবারের শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হল, তাই গান্ধীজীকে হয়তো আর ক'মাস পর আর একটি চুক্তি সম্পাদনকালে যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়েছিল।

তেজবাহাদুরকে বড়লাট

আপাততঃ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চিঠিখানি নিয়ে ২১এ আগস্ট জয়াকর একাই গেলেন সিমলায় এবং বড়লাটের সঙ্গে আলাপ হল। সপ্রু তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ২৫এ আগস্ট। বড়লাটের সঙ্গে এবং কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আরও কথা হল ২৫এ থেকে ২৭এর মধ্যে। তারপর বড়লাট সপ্রু-জয়াকরকে একখানি চিঠি দিলেন এলাহাবাদ ও পুণায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে দেখাবার জন্য: "Dear Sir Tej Bahadur………"

কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সপ্রু-জয়াকরের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চিঠির নকল প্রভৃতির প্রাপ্তি সংবাদ স্বীকার করে বড়লাট তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে তিনি কি বলেছিলেন তার উল্লেখ করলেন। ৯ই জুলাই আইনসভায় তিনি যে দুটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন তারও পুনরুক্তি করলেন। "প্রথমত এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সমগ্র সাংবিধানিক সমস্যা পর্যালোচনার অবাধ অধিকার থাকবে; দ্বিতীয়ত, সম্মেলনে যে মীমাংসা হবে তাই হবে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পার্লামেণ্টে প্রস্তাব পেশ করার ভিত্তি। কিন্তু আমার আশঙ্কা, আশা করি আপনিও স্বীকার করবেন যে, আপনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যে চিঠি এনেছেন তা এই মীমাংসার পক্ষে সহায়ক হবেনা।" ঐ চিঠির সুর, বক্তব্য ও কংগ্রেস নীতির পরিণামে দেশের যে ক্ষতি হয়েছে তার নিরাবরণ অস্বীকৃতি তাঁর পছন্দ হয়নি; তাই তিনি মনে করেন না যে, ঐ চিঠিতে যে-সব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার কোন জবাব দেওয়ার স্বার্থকতা আছে।

সুতরাং এই ভিত্তিতে কোন আলোচনাও অসম্ভব। আবার যদি আপনি ওঁদের সঙ্গে দেখা করেন তো একথাটি স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন।

কারাদণ্ডিত অথবা বিচারাধীন বন্দীদের আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিতে পারেন না; তবে এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারদের বিবেচনা করবার সুপারিশ করবেন—এইটুকু বলতে পারেন। অর্ডিনান্সগুলো প্রয়োজনবোধেই করা হয়েছে এবং তার প্রয়োজন এখনও রয়েছে।

তিনি অবশ্য এ আশ্বাস দিলেন, সম্মেলনে কংগ্রেসের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধে হবেনা। "অবস্থা যদি তেমন হয়, কংগ্রেস যদি প্রতিনিধিদের একটা নামের প্যানেল দেয় তাও আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি।"

বড়লাট লর্ড আরুইন এই পত্রালাপ প্রকাশ বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন; সপ্রু-জয়াকরের সঙ্গে তাঁর অন্য যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশেরও অনুমতি দেন।

আবার নৈনী জেলে

সপ্রু-জয়াকর ২৮এ আগস্ট সিমলা ছেড়ে এলেন এবং এলাহাবাদে নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে ৩০।৩১ তারিখে মতিলাল, জওহরলাল, সৈয়দ মামুদের সঙ্গে দেখা করে বড়লাটের চিঠিখানি দেখালেন, তাঁদের আলোচনা-ফল জানালেন। এই আলোচনা থেকে সপ্রু-জয়াকরের ধারণা হয় যে, এই কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে আপোষ-মীমাংসা হতে পারে:

"বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের প্রশ্নটি গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে তুলতে পারবেন কিনা এই প্রশ্ন সম্পর্কে বড়লাটের অভিমত, ওটি এখন না তোলাই ভাল। তবু গান্ধীজী যদি শেষ পর্যন্ত ওটি তোলার জন্য জেদ করতে থাকেন তবে ভারত সরকার গান্ধীজীর এই অভিপ্রায়ের কথা ভারত-সচিবের গোচরে আনবেন। গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের আর্থিক দায়-দায়িত্বের

প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোলা যাবে ; কিন্তু সকল ঋণেরই অস্বীকৃতির কোন প্রস্তাব বড়লাট মেনে নিতে পারেন না।

"লবণ আইনের ব্যাপারে বড়লাট বলেছেন, সাইমন কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হলে বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারে যাবে ; ইতিমধ্যেই রাজস্বের অনেক ক্ষতি হয়েছে ; সুতরাং, গবর্নমেণ্ট এই রাজস্বের পথটা রুদ্ধ করতে চান না। তবে যদি আইনসভায় আইনটি বাতিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন বিকল্প অর্থাগমের প্রস্তাব আসে তবে প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখা হবে। কিন্তু যদ্দিন আইন বহাল আছে তদ্দিন খোলাখুলি আইনভঙ্গ গবর্নমেণ্ট বরদাস্ত করবেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এই ব্যাপারে দরিদ্রদের কিভাবে কষ্ট-লাঘব করা যায় তা স্থির করার জন্য বড়লাট সানন্দে নেতৃবৃন্দের একটি ছোট্ট বৈঠক ডাকবেন।

"পিকেটিং যদি জবরদস্তি হয় তবে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পিকেটিং সংক্রান্ত অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। যেসব অফিসার পদত্যাগ করেছেন অথবা পদচ্যুত হয়েছেন তাদের আবার কাজে নেবার প্রশ্নটি ক্ষেত্রানুসারে বিচার করা হবে। বাজেয়াপ্ত ছাপাখানাগুলো প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেবে না। রাজস্ব আইনে যেসব জরিমানা অথবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাদের প্রত্যর্পণও ক্ষেত্রানুযায়ী বিচার বিবেচনা করে করা হবে।"

গান্ধীজীর উদ্দেশে আর একটি নোট

মতিলাল, জওহরলাল, সৈয়দ মামুদ এই মীমাংসার সর্তগুলো গ্রহণে রাজী হন নি ; তাঁরা গান্ধীজীর উদ্দেশে সপ্রু-জয়াকরের হাতে এই একটি নোট দিলেন ৩১ এ আগস্ট :

"গতকাল আমাদের সপ্রু-জয়াকরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশে ২৫এ আগস্ট তারিখে লেখা লর্ড আরুইনের একখানি চিঠির নকলও দিয়েছেন তাঁরা। তাতে বড়লাট স্পষ্ট

ধরে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল; হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রক্তপ্রবাহেই মারা গেল। আরও একজন রক্তাক্ত অবস্থায় ধরা পড়ল—দীনেশ চন্দ্র মজুমদার। টেগার্টের কিছু হয়নি। ১৮ই সেপ্টেম্বর দীনেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। ২৭ তারিখে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটি বেআইনী ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করা হল ডাঃ আন্সারী, পণ্ডিত মালব্য, সর্দার প্যাটেল, মথুরাদাস ত্রিকমজী, লালা দুনিচাঁদ, দীপনারায়ণ সিং, ডাঃ বি. সি. রায়, সর্দার মঙ্গল সিং, চৌধুরী আফজল হক ও রাজা রাওকে; তাঁদের ছ'মাস করে কারাদণ্ড হল। আমার যতটা জানা, ডাঃ রায় এই প্রথম ও শেষবারের মতো জেলে গেছলেন।

২৮এ তারিখে এ. আই. সি. সি-ও. বেআইনী হল।

২৯এ আগষ্ট বাংলায় পুলিশ আই. জি. লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপার ই-হডসন গুলীবিদ্ধ হলেন ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার সময়; লোম্যানের গায়ে দুটো, হডসনের গায়ে তিনটি গুলী লেগেছিল। কিন্তু লোম্যান মারা গেলেন ৩১এ আগষ্ট, হডসন আহত অবস্থায় বেঁচে রইলেন। বিপ্লবীরা পালাবার সময় একটি রিভলভার ফেলে যান; কিন্তু দ্বিতীয় রিভলভার দিয়ে পেছন-ছোটা লোকদের নিরস্ত করে অদৃশ্য হয়ে যান। বিনয়-বাদল-দীনেশের পরিচয়ে এঁরা আবার শুশুকের মতো ভেসে উঠেছিলেন ৮ই ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ।

ময়মনসিংয়েও শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ; পড়েছিল গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর পবিত্র কুমার বসুর বাড়িতে। ধরা পড়ল আঠার বছরের মেয়ে শোভারাণী দত্ত।

কিন্তু চন্দননগরে হয়েছিল সরাসরি 'যুদ্ধ'—২রা সেপ্টেম্বর, সপ্রু জয়াকর তখন যারবেদা জেলের দিকে রওনা দিয়েছেন। চন্দননগরের এই বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের কয়েকটি বীর। স্যার চার্লস টেগার্ট পেয়েছিলেন খবর এবং সদলে এলেন গোঁদলপাড়ার সেই বাড়িতে; ঢুকতে যেতেই গুলী ও পাল্টা

গুলী। পালাবার পথ নেই। ২৩ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক চারজন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হল; দু'জন মহিলাকেও। যুবকদের অন্যতম লোকনাথ বল। বাড়িতে পাওয়া গেল তিনটি রিভলভার, কার্তুজ ও বোমার সরঞ্জাম। লড়াইয়ে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছিলেন।

আর রাজসাহীতে ডাকলুট হল ৩রা সেপ্টেম্বর। ৫ই সেপ্টেম্বর সপ্রু-জয়াকর এক যুক্ত বিবৃতেতে বললেন: We regret to announce that the present negotiations have failed—দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বর্তমান আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।"

অনেকদিন আগেকার মত নিজের মুখের ওপর ডানহাতের পাঁচটা আঙ্গুল ছড়িয়ে দিলেন; আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগলেন আমাকে। ঠোঁটে মুখে সে হাসি নেই। কেমন পাণ্ডুর।

বললেন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর পার হয়ে ১৯৩১ এর ২২ এ জানুয়ারীর পাতাটা খোল, দেখবে, সেখানে শুরু হয়েছে আবার আপোষ-আলোচনা—সেই বড়লাট, সেই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। সাড়ে চার মাস পর।

শোলাপুরের বীরদের ফাঁসী

কি হয়েছিল এই সাড়ে চারমাস? কি বেগ বা আবেগ আবারও আপোষ-মীমাংসার সেই বৃত্তে নিয়ে এল একই অভিনেতাদের?

ঠিক চারদিন আগে ১৯৩১ এর ১৮ই জানুয়ারী বহরমপুর থেকে মালদার পথে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। আর দশদিন আগে শোলাপুরের মালপ্পা ধনসেটি, শ্রীকিষেণ সর্দা, জগন্নাথ সিন্দে ও আবদুল রসুল কুর্বাণ হুসেনের ফাঁসী হয়ে গেল। শোলাপুরের ঘটনা তোমার মনে পড়ে, সত্য? কোন্ জেলে হল, তুমি অনুমান করতে পারো?

বললাম, না।

বললেন, ঐ যারবেদা জেলেই। কিন্তু ওঁরা তো পরিত্যক্ত।

এঁদের জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের চোখে জল নেই, থাকতে নেই। ওঁরা তথাকথিত 'হিংসাত্মক' কর্মের ফলভোগ করবেন, করলেন। সাড়ে চারমাস আগে যে আপোষ-আলোচনা হয়েছিল তাতেও ওঁরা বাইরের লোক। সাড়ে চার মাস পরে যে আপোষ-সন্ধি হতে চলেছে তাতেও ওঁরা 'বিদেশী' বলেই ন-গণ্য হবেন। হিংসা! শোলাপুরের 'হাঙ্গামা' আইন অমান্য আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবু বৃটিশ সরকার ও অহিংসপন্থী কংগ্রেসের খাতায় ওঁরা ব্ল্যাক-লিষ্টেড, বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসের এইটেই ছিল সেতু। তবু কোথাও ছিল এঁদের জন্য করুণাধারা, জনসাধারণের মধ্যে; পুলিশের বিপরীত হুকুম সত্বেও এক বিরাট শোক-মিছিল সারা পুণাসহর ঘুরে বেড়ালো এবং পুলিশ সত্যিই অহিংস রইল প্রথমবার। তারপর আরও থেকে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বিকেলের দিকে, আর পুলিশের লাঠিচালনা বারবার। কংগ্রেস হাসপাতালে ভর্তি হল ১৮৫ জন আহত। ১২ই জানুয়ারী ১৯৩১।

এরও সাড়ে তিনমাস আগে আর এক রক্তাক্ত সত্যাগ্রহ-সংঘর্ষ হয়েছিল। ২৫এ সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলীচালনায় প্যানভেলে নিহত ৮, আহত ৫০। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, নিহতদের মধ্যে ছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন ফরেষ্ট রেঞ্জার। প্যানভেল ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা বন-সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল। ধৃত ব্যক্তিদের হাতে হাতকড়া দেখে তারা দাবী করল, ওটা খুলে নিতে হবে। ইন্সপেক্টর করলেন আপত্তি। জনতার দাবীও জোরদার হল। সরকারী 'ভাষ্য অনুসারে ওরা সব গাছের ডাল কেটে করল ছুঁড়ে মারবার হাতিয়ার—বুনো মিসাইল। ইন্সপেক্টরকে স্বেচ্ছাসেবক ও ধৃতব্যক্তিরাই ঘিরে ধরে বাঁচালেন। পালিয়েও গেল ইন্সপেক্টর। হঠাৎ গুলীবৃষ্টি; অদূরে পনের জন সশস্ত্র পুলিশ—ম্যাজিস্ট্রেট চীৎকার করে বললেন, কে গুলী ছুঁড়ল, কে হুকুম দিল। কথাও শেষ হলনা, প্রথম ঝাঁক গুলীতেই তিনি ধরাশায়ী। গুলী শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা থামেনি। কমসে কম ১০০টা গুলীতো বটেই।

ঐদিনই দাসপুর হাঙ্গামায় সাব-ইন্সপেক্টর ভোলানাথ ঘোষের হত্যার দায়ে ১৪ জনকে, মেদিনীপুর-ঘাটালে আইন অমান্য আন্দোলন দমনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ২৬ জনকে আর একজনকে জুনিয়ার এস-আইকে অপহরণ করার জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল অভিযুক্ত করলেন। তবু এঁরা আইন অমান্য আন্দোলনের কেউ নন। কেননা, হিংসার স্পর্শ লেগেছিল।

২৬এ মোরাদাবাদে চলেছে গুলী। ২৯এ বড়লাট লর্ড আরুইন সিমলায় এক বিদায়ী ভোজসভায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুমুখো নীতির অভিযোগ আনলেন। বললেন, গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেওয়া "বিশ্বাসঘাতকতারই" সামিল: "of a tragic lack of foresight and bankruptcy of Statesmanship." শুধু তাই নয়, সেই যে "private assurance' সেই সম্পর্কে বললেন, তিনি ঘেন্না করেন এই ধরণের "secret diplomacy to buy off Civil Disobediance Movement. আমাদের কিন্তু ঘেন্না ছিলনা, সত্য।

৪ঠা অক্টোবর লাহোর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর আবদুল আজিজকে লক্ষ্য করে ১৫টা গুলী ছুঁড়েছিলেন বিপ্লবীরা, ড্রাইভার আর সাথী কনষ্টেবল আহত হলেও আজিজের কিছু হয়নি। আজিজ ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সরকারী তদ্বিরকার। তিনদিন পর বেরোলো লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর হল ফাঁসীর হুকুম। কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয় কুমার সিং, শিব বর্মা, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব, কমলনাথ তেওয়ারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কুন্দলালের ৭ বছর, প্রেমদত্তের ৩বছর, 'আর অজয় কুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সান্যাল, দেশরাজের মুক্তি।

অন্যান্য জায়গায় একের পর আর কংগ্রেস কমিটি বেআইনী ঘোষিত হচ্ছে, ইউ. পি, কোলাবা, বোম্বাই, কানপুর, সুরাট, বিহার, উড়িষ্যা। আগষ্ট অবধি আইন অমান্যে দণ্ডিতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৩, ১৩৬, বললেন ওয়েজউড বেন। ভায়োলেন্স-লিগেরা এ সংখ্যায়

নেই। এ যেন অনেকটা অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি, বিপ্লবীদের কথা উচ্চারণেও কুণ্ঠা।

গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন

১২ই নবেম্বর ইংলণ্ডেশ্বর উদ্বোধন করলেন গোল টেবিল বৈঠক; বৃটিশ ইতিহাসে এই প্রথম ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট কোন সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন এবং "রাজকীয় আশীর্বাদ" বর্ষণ করলেন। লর্ডসভার রয়াল গ্যালারীতে হয়েছিল এই সম্মেলন।

আর সারা ভারতে হরতাল।

২৭এ বেয়োলো আইন অমান্য বহির্ভূত আর এক মামলার রায়—কলকাতা বোমার মামলা। ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর হল ২০ বছরের দ্বীপান্তর; অম্বিকা রায়, অদ্বৈত দত্ত যতীন ভৌমিকের ১২ বছরের দ্বীপান্তর, সুরেন দত্ত, রসিক দাসের ১৫ বছর, আর রবীন অধিকারীর ১০ বছর।

১লা ডিসেম্বর পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জী চট্টগ্রাম থেকে আসছিলেন কলকাতাগামী মেল ট্রেণে, চাঁদপুরে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নামতেই দুই যুবকের হাতে রিভলভার গর্জে উঠল। পুলিশের আই. জি. ও তাঁর আর্দালির রিভলভারও গর্জালো। কিন্তু বিপ্লবীরা সরে পড়তে পারলেন। তারিণী মুখার্জির অবস্থা উদ্বেগজনক।

৬ই ডিসেম্বর—সে আর এক মৃত্যু। মাণিকলাল সেন, ১৭ বছর বয়স। মুর্শিদাবাদ জেলে অনশন করেছিলেন অখাদ্য খাবার দেবার প্রতিবাদে। তাঁর পূতভস্ম গেল বারাণসীতে গঙ্গাজলে বিসর্জনের জন্য। আজ কেউ এই মাণিকের নামও জানেনা।

কিন্তু পদধ্বনি শুনছ, সত্য, রাইটার্স বিল্ডিংসয়ের সিঁড়িতে? প্রহরী সুরক্ষিত রাইটার্সে? মৃত্যু-পাগল যৌবনের পদধ্বনি। ওঁরা তিনজন; বিনয়-বাদল-দীনেশের ঢাকা সূত্রটা টেনে আনছি কলকাতায়। ওঁরা কারাগারের আই. জি. লেঃ. কর্নেল এ. এক.

সিমসনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বলা হল, কাজে ব্যস্ত, নাম, পরিচয় লিখে দাও। উহুঁ, বলে ওঁরা চাপরাশিকে দিলেন ঠেলে, সুইং ডোরে লাগল দোল; লেঃ কর্নেল সিমসন ফাইল দেখছিলেন, চমকে উঠলেন ওঁদের উদ্দাম প্রবেশে; কিন্তু মুহূর্তমাত্র, সঙ্গে সঙ্গে গুলী। তারপর আর পেছন নয়, বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলেছেন মরণ অভিযাত্রীত্রয়; যুদ্ধ; চলছে গুলী; একটি গিয়ে লাগল জে. ডবলিউ. নেলসনের গায়ে, জুডিসিয়াল সেক্রেটারী। এসেছিলেন ওঁদের বাধা দিতে। প্রস্তুত বিপ্লবীরা আত্মহননে উদ্যত হলেন। গুলী আর পটাসিয়াম সাইওনেড। বাদল বা সুধীর গুপ্ত পুরোপুরি সফলকাম হলেন; বিনয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন ১৩ই ডিসেম্বর; বিফল হলেন দীনেশ গুপ্ত, নিরাময় হয়ে ফাঁসীতে প্রাণ দিতে হল।

আবার সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা

একমাস পর শুরু হল আবার আপোষ মীমাংসার আনাগোনা, ১৯৩১ এর ২৫এ জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হল এবং গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন কারামুক্ত হলেন তখন ভারতের নিকটতম দিগন্তে প্রলম্বিত ছিল শোলাপুরে চার শহীদের দেহ, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আর কালীপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দীপান্তরাদেশ।

কারামুক্ত হলেন গান্ধীজী, জওহরলাল, যমুনালাল, শিবপ্রসাদ, আবুলকালাম, জয়রামদাস, শার্দুল সিং, রাজাগোপালাচারি, বল্লভভাই, সেনগুপ্ত, পট্টভি, সত্যপাল, আন্সারী, আরও অনেকে।

কারামুক্তির যুক্তি হিসাবে গবর্নমেণ্ট বললেন, প্রধানমন্ত্রী ১৯এ জানুয়ারী যে বিবৃতি দিয়েছেন তা বিবেচনা করে দেখবার অবকাশ সৃষ্টির জন্যই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিলেন।

জিগগেস করলাম, প্রধানমন্ত্রী কি নতুন কথা কিছু বলেছিলেন?

"ইতিমধ্যে যাঁরা বর্তমানে আইন অমান্যে লিপ্ত তাঁরা যদি

বড়লাটের আবেদনে সাড়া দেন তবে তাঁদের সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থাও করা হবে।" এ যদি কোন নতুন কথা হয় তো নতুন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধী-আরুইন আলোচনা হল চারঘণ্টা ধরে; ১৯এ দেড় ঘণ্টা। মুসলিম লীগকে আশ্বাস দিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। ওয়ার্কিং কমিটি ২৪এ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিলেন আপোষ করবার।

এমন সময় এলাহাবাদের নাগরিকেরা চমকে জেগে উঠলেন সাতাশের সকালবেলায়; আলফ্রেড পার্কে গুলীর শব্দ। শব্দ নয় যুদ্ধ; পুলিশ কাদের খোঁজে ফিরছিল। গোয়েন্দা বিভাগের এক স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটি গাছের আড়ালে এবং এক বিপ্লবী আর একটি গাছের আড়ালে; ৫০ গজ ব্যবধানে আধ ঘণ্টা চলল গুলী বিনিময়। দেশমাতৃকার কোলে নিষ্প্রাণ দেহ রাখলেন—বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ। গুলী ফুরিয়ে গেছল দু'দিকেই; কিন্তু পুলিশের হাতে নতুন রসদ সরবরাহের লোক ছিল, আজাদের চারদিকে হিংস অহিংস শত্রু, তাকে কে রসদ জোগাবে? এই একলা চলার পথ ওঁরা জানতেন, তাই এই বিকল্প কাহিনীই সত্যি মনে হয় যে, রসদ ফুরিয়ে যেতে চন্দ্রশেখর নিজের প্রাণ নিজ হাতে নিয়েছেন।

৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হল।

চুক্তিটা এমন কিছু নয়, তার চাইতেও গুরুতর হয়েছিল একটি নেপথ্য নাটক। দ্বিতীয় আপোষ-আলোচনা সূত্রপাতের আগের দিন ২১এ জানুয়ারী বিকেল চারটেয় তখন যে ওয়াকিং কমিটি ছিল সেটি এলাহাবাদের স্বরাজভবনে এক প্রস্তাব নিয়েছিল। প্রস্তাবের সার মর্ম হচ্ছে, সংগ্রাম চালিয়ে যাও, আপোষ-মীমাংসার কোন ভিত্তিই নেই, অর্থাৎ ৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সেই পুরোনো সুর। তবে এই প্রস্তাবে এ স্বীকৃতি আছে যে, একদিকে যেমন সরকারী দমননীতি পুরোদমে চলছে তেমনি এ. আই. সি. সি., ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যগণসহ হাজার হাজার নর-নারী জেলে আবদ্ধ রয়েছেন।

নাটক সত্যিই প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও প্রকাশিত হয় নি। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন প্রেসিডেন্ট। এর প্রকাশনা নিয়ে দ্বিমত হওয়ায় অন্ততঃ পরদিন পর্যন্ত প্রকাশ স্থগিত রাখা হল। তারপর ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। লণ্ডন থেকে সপ্রু-শাস্ত্রীর এক কেবল্ এল; তাঁরা গোল টেবিল বৈঠকের পর লণ্ডন ছেড়ে আসার উদ্যোগ করছিলেন। কেবলে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা না আসা পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি যেন কোন সিদ্ধান্ত না নেয়।

অনেক চাপাচাপি সত্ত্বেও খবরটা গবর্ণমেন্টের গোচরে ঠিকই গেছল। বড়লাট ২৫ তারিখে ঘোষণা করলেন নেতৃবৃন্দের কারামুক্তি।

কারামুক্তি পেয়ে গান্ধীজী বললেন:

"আমি জেল থেকে বেরোলাম একেবারে খোলা, শত্রুতাবিমুক্ত ও বিতর্কে নিরপেক্ষ মন নিয়ে।" প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন তা নিয়ে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও আরও সব ফিরে এলে তাঁদের সঙ্গে সব দিক থেকে আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত। কয়েকজন ডেলিগেট লণ্ডন থেকে এ রকম ইচ্ছা করাই আমি এই বিবৃতি দিলাল।"

পট্টভিসীতারামায়া এই কারামুক্তি ও বিবৃতির ভাষ্য করলেন:

গান্ধীজী অনুভব করলেন, কেবল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কারামুক্তি কঠিন অবস্থাকে অসম্ভব করে না তুললেও কঠিনতর করে তুলতে পারে। কর্তৃপক্ষ এটি হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, এই আন্দোলন জনসাধারণের এতই হৃদগত হয়েছে যে, নেতারা যতই প্রখ্যাত হোন না কেন, কোন একটা বিশেষ পথনির্দেশে তাঁরা ব্যর্থকাম হবেন। এজন্য তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে পিকেটিং ও লবণ তৈরির ওপর জোর দিলেন।

গান্ধীজী তাড়াতাড়ি এলাহাবাদ এসে পৌঁছোলেন এবং অপ্রকাশিত

প্রস্তাবের বদলে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত ও প্রকাশিত হল: "ওয়ার্কিং কমিটি শাস্ত্রী, সপ্রু ও জয়াকরের ইচ্ছাক্রমে ২১ তারিখের প্রস্তাব প্রকাশ না করায় একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছে। এ কথাটি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে কারণ সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

অর্থাৎ চুক্তিটা সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত বারুদ প্রস্তুত রাখতে হবে: to keep the powder dry. পট্টভি গান্ধীজীর বিবৃতির যে ভাষ্য করেছেন তা তোমায় বললাম। কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থাটা কি? গান্ধীজীই বললেন: "It was black repression continuing unabated on all sides, unprovoked assaults on innocent persons still continue. respectaple people are summarily and without apparent reason deprived of their movable and immovable property." ইত্যাদি ইত্যাদি।

পট্টভি বলছেন, "ঘরোয়া নির্দেশ" চলে গেল, আন্দোলন চলবে। তবে নতুন কোনো অভিযানে নেমো না। অর্থাৎ, বারুদ শুকনো থাক, কিন্তু এর বেশী নয়।

ওয়ার্কিং কমিটির আবার সভা হল ১৩ই ফেব্রুয়ারী। তার আগে গোলটেবিলের ২৬ জন প্রতিনিধি এক বিবৃতিতে এই দৃঢ়-বিশ্বাস ঘোষণা করলেন যে, "ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের আগমন নিয়ে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

তারপর গান্ধীজীর চিঠি লেখালেখি আনাগোনায় আলোচনায় উঠতি-পড়তি হতে হতে চুক্তি সম্পন্ন হল।

BE THE SALT

আমার নিজের কথা বলতে পারি, সভ্য, সেদিন গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে আমার কারামুক্তিটাই সব চাইতে বড় মনে হল, আর সব

কিছুই শূন্য মনে হয়েছিল। অথচ মুক্তি আমি মুচলেকা দিলেও পেতাম; কিন্তু সেটা আমাকে দিতে হয়নি, আমার হয়ে দিলেন নেতারা। নইলে দেখ, ফেডারাল কাঠামোয় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রত্যাশায় প্রথম গোলটেবিলেই যেতে পারতাম। তা বর্জন করে লাঠি-গুলী-ফাঁসী ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন যুক্তি নেই, যেমন যুক্তি ছিল না সাইমন কমিশন বর্জনেও। কারামুক্তির জন্যই কি আমরা আন্দোলন করেছিলাম? জানি, তুমি বলবে—লবণ। লবণে কি হল? ওটি চুক্তিপত্রের ২০নং বিষয়। বলা হয়েছে, গভর্নমেণ্ট লবণ আইন ভঙ্গ "চোখ বুঁজে" দেখতে পারবেন না, ভঙ্গ করলে সাজা পেতে হবে; বর্তমান আর্থিক অবস্থায় লবণ আইনের সংশোধনও সম্ভব নয়। তবে গরীবদের কষ্টলাঘবের জন্য লবণ এলাকার লোকেরা ব্যবহারের জন্য লবণ তুলতে পারবে, বিক্রীর জন্য কিছুতেই নয়।

এই হল লবণ আন্দোলনের পরিণতি। শাসনসংস্কারের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা অশেষ। আর আইন অমান্য প্রত্যাহার অর্থে বোঝাবে—সঙ্ঘবদ্ধ আইন অমান্য, খাজনা, কর-বন্ধ, আইন অমান্যের সমর্থনে প্রচারপত্র প্রকাশ, সামরিক অসামরিক ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে পদত্যাগে সচেষ্ট হওয়া, অর্থাৎ, কিছুই করা চলবে না।

বিলাতী নয় বিদেশী বর্জন

বয়কটের ব্যাপারটা আরও হাস্যকর। ইংরাজ প্রভুরা ভণিতা করে বললেন, দেশী শিল্পবাণিজ্যেকে নিশ্চয়ই উৎসাহ দেওয়া হবে, কিন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জন বলতে আইন অমান্য আন্দোলনকালে "বিলাতী বস্ত্র" বর্জনটাই মুখ্য হয়ে পড়েছিল; আর ওটা যে রাজনৈতিক চাপ দেবার জন্যই তাও স্বীকৃত; সুতরাং—

"এটি মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, একদিকে এই ধরণের বয়কট করা বা তা সংগঠন করা আর একদিকে শাসনতন্ত্র নিয়ে বৃটিশ ভারত, দেশীয়-রাজ্য, বৃটিশ সরকার ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে

কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মন-খোলা আলোচনায় বসা—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। সুতরাং এই স্থির হচ্ছে যে, আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার অর্থে বোঝাবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রত্যাহার···।" এক্ষেত্রে জবরদস্তি, ভীতি-প্রদর্শন, বাধাদান, বিরূপ বিক্ষোভ ইত্যাদি চলবে না। মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই। গান্ধীজী পুলিশী পীড়নের আতিশয্য সম্পর্কে একটি তদন্ত চেয়েছিলেন, গবর্নমেণ্ট তাতেও রাজী হন নি। আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেসব অর্ডিনান্স হয়েছে সে সব প্রত্যাহৃত হবে, সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত কোন অর্ডিনান্স নয়। মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি ব্যাপারে প্রদেশ সরকারগুলো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন, তবে ভায়োলেন্সে জড়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরাসরি 'না'। অবশ্য গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের সায় ছিল। চুক্তিমতো যে জরিমানা আদায় হয়ে গেছে তা আর ফেরৎ দেওয়া হবে না, সম্পত্তিও না, পিটুনী করও না। অস্থাবর সম্পত্তি হাত-ছাড়া হয়ে গিয়ে থাকলে পাবে না, থাকলে পাবে। চাকরীতে পুনর্বহাল ক্ষেত্রেও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা হবে।

এই সর্তনামা পড়লে আজ যে কেউ প্রশ্ন করবেন, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যেতে আপত্তি হল কেন? সংগ্রামে অবতীর্ণ ও সংগ্রাম চলা-অবস্থায় চুক্তিনামা সম্পাদনের পক্ষে গান্ধীজী বলেছিলেন:

"It would be folly to go on suffering when the opponent makes it easy for you to enter into a discussion with him upon you longings"; কিন্তু যে প্রশ্ন আমাকে এখনও উত্তেজিত করে তোলে এবং এখনও যার জবাব আমি পাই নি, এবার তোমায় সে কথাটি বলি। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুর কণ্ঠরোধের জন্য সরকারী ফাঁসীর দড়ি প্রস্তুত। যে সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চলছে তাদের হাতেই ঐ দড়ি। গান্ধীজী এঁদের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে রূপান্তরিত করা সম্ভব কিনা এই নিয়ে বার বার বড়লাটের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

মৃত্যু-মার্জনা বড়লাটেরই এক্তিয়ার। কিন্তু বড়লাট রাজনৈতিক কারণেই বলেছিলেন—না।

বড়লাট বললেন, 'তথাস্তু'

শেষ পর্যন্ত মৌখিক একটি চুক্তি হল। এ আমাদের পরম লজ্জা, সত্য। বড়লাট এইটুকু রাজী হলেন যে, করাচী কংগ্রেসের আগে তাঁদের ফাঁসী হবে না। বড়লাটের পক্ষে এইটুকু করুণামাত্র—কিন্তু আমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে এ কি অসামান্য অপমান! এ নইলে করাচী কংগ্রেসে—গান্ধী-আরুইন চুক্তি পাশ করানো যাবে না এই তুচ্ছ আশঙ্কার জন্য এই কনসেসান! তাই রুদ্ররূপ ভয়াল জনসাধারণকে মিথ্যা আশ্বাসে প্রশান্ত রাখার জন্য আপাততঃ ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে; গান্ধী আরুইন চুক্তি একবার পাশ হয়ে গেলে আর কিছু ভয় নেই। বড়লাট এইটুকু বর দেবেন না? বড়লাট বলেছিলেন—তথাস্তু।*

কিন্তু বড়লাট মৌখিক সে-কথাটুকুও রাখেন নি। ভগৎ-রাজগুরু শুকদেবের ফাঁসী হল ২৩এ মার্চ; করাচী কংগ্রেস শুরু হল ২৯এ মার্চ। তবে গান্ধী-আরুইন চুক্তি নির্বিঘ্নেই সেখানে পাশ হয়েছিল। আশঙ্কিত উত্তাল গণ বিক্ষোভ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রেড ফ্ল্যাগ ও রেড সার্টের বিরূপ বিক্ষোভেই নিঃশেষ হয়েছিল। করাচী কংগ্রেসের জন্য করাচীতে পৌছোলে গান্ধীজীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দকে ভীষণ বিরূপ বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। তার তীব্রতা ছিল, ব্যাপ্তি বা গভীরতা ছিল না। করাচী থেকে তের মাইল দূরে মালিরে ট্রেন থেকে নামলে এক ঝাঁক কালো পতাকা আন্দোলিত এবং "নেতৃবৃন্দ ফিরে যাও" "সন্ধিচুক্তি বরবাদ" ধ্বনিত হতে লাগল। গান্ধীজীর দলে ছিলেন প্যাটেল, মালব্য, আন্সারী। রেড সার্টেরা একটি লরীতে করে ওঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন—তাঁদের দাবী: ভগৎসিংয়ের হত্যা-

*The History of the Indian National Congress, B. Pattabhi Sitaramaya, Vol I. P. 438.

কারীকে চাই", সংবাদদাতা বলছেন। "অর্থাৎ গান্ধীজীকে"। জওহরলাল ওঁদের প্রশান্ত করার ভার নিলেন। শ্রীশিশির দাস তাঁর মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র গ্রন্থে লিখছেন: "গান্ধী করাচি পৌঁছোলে একদল যুবক তাঁকে কালো ফুলের মালা পরিয়ে বলল—গান্ধী ফিরে চাও। করাচীতে একমাত্র সুভাষচন্দ্র ব্যতীত নেতাদের সকলকেই যুবক দল কালো ফুলের মালা দিয়ে বিরূপ অভ্যর্থনা জানাল—মনে হল গান্ধী-আরুইন চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাবতেও লজ্জা হয় যে, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে মাত্র কিছু সংখ্যক বামপন্থী প্যাক্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন, এমন কি, ভোট দাবীর মত অবস্থা পর্যন্ত তাঁদের ছিল না।"

পক্ষান্তরে, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর "নেতাজী সঙ্গ প্রসঙ্গ" বইয়ে লিখেছেন: "গভীর রাত্রি।...গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে গেছেন নিভৃতে।...দীর্ঘআলোচনার পর নেতা ফিরে এলেন শিবিরে। গান্ধী-সুভাষ চুক্তিহয়েছে। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধী-প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না কিন্তু আর সর্বত্র তাঁর মত প্রকাশের থাকবে অবাধ স্বাধীনতা...গান্ধী-সুভাষ চুক্তির কথা জানা-মাত্র কংগ্রেসের প্রধান আকর্ষণ কমে গেল।"

সম্ভবতঃ এই দুই লেখকই স্মৃতি-নির্ভর "ইতিহাস" লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন যমুনাদাস মেহতা। সুভাষচন্দ্র ২৭ এ মার্চ ঐ করাচীতেই অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন থেকে পৃথক নওজোয়ান সম্মেলনে ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসীর উল্লেখে অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন: এইসব বীরদের জীবনই যেখানে বাঁচানো গেল না সেখানে এই সন্ধি চুক্তির কি সার্থকতা? কিন্তু কংগ্রেসে তিনি কিছু বলেছেন বলে কোথাও পাইনি।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন করাচী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ সেই ত্রয়ীর। গান্ধী-প্যাটেল-নেহরুর একজন, ১৯৩০এ যাঁদের একজনার প্রেসিডেন্ট হবার কথা ছিল। তিনি ইতিমধ্যে গান্ধীজীর "পানটারশিপের" মতাবলম্বী

হয়েছেন।* তিনি যমুনাদাসের সংশোধনী প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। প্রস্তাবটি ছিল: This Congress repudiates the personal settlement arrived at between Mahatma Gandhi and Lord Irwim as inconsistent with the resolution of independance passed at Lahore and directs the Working Committee to desist from any further negotiations on this behalf."

তিনি একে গান্ধী-আরুইনের ব্যক্তিগত মীমাংসা বলে অভিহিত করে ওয়ার্কিং কমিটিকে আলোচনায় বিরত হবার জন্য বললেন। বললেন, কেকটা খাবও আবার রাখবও — দুটো একসঙ্গে হয় না। গোলটেবিলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। "সেফ-গার্ড" যা-কিছু তা স্বাধীনতার অনুকূলে হতে পারে না; চেমসফোর্ড ক্লাবে বড়লাটের বক্তৃতার পর নিঃসংশয় হওয়া উচিত। আর "পাব্লিক ডেট" ভারতের ঋণ? তার একটি পয়সা অবধি চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে পয়সা ফিরে চাওয়ার সাহস এই চুক্তিকারীদের নেই। (all debt that has been really incurred against the interests of India has been paid out aleady. ...People who make this provisional settlement will not have the courage to demand the payment back . Not one rupee will be refnded .")

গান্ধীজী এসব কথার জবাব দেননি। চারহাজার ডেলিগেটের মধ্যে মাত্র ১০টি প্রতিকূল হাত উঠলো, জবাব দেবেনই বা কেন?

একটু থেমে বললেন, পরম লজ্জায় তোমার কাছে স্বীকার করব, সত্য, এই ব্রুট মেজরিটির আমিও অংশীদারী ছিলাম।

*"Independence does not exclude the possibility of equal partnership for mutual benifit" —প্যাটেলের অভিভাষণ ১৯৩১

মূল প্রস্তাবে এই চুক্তিকেই বলা হয়েছে "advance of India towards Purna Swaraj." জওহরলাল তুলেছিলেন। ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসীতে শোক করার জন্য প্রস্তাবটি তুলেছিলেন জওহরলাল। প্রস্তাবের খসড়াটা গান্ধীজীর। প্রস্তাবটি যথারীতি "While dissociating itelf from and disapproving of political violence" ইত্যাদি কথায় পরিশোধনের পর ওঁদের বীরত্বের ও ত্যাগের প্রশংসা করা হয়েছে। চারদিককার আবহাওয়ার দিকে খেয়াল রেখে ওটুকু না করলে কালোফুলের মালাগুলো কাঁটা হয়ে বিঁধতে পারত। কিন্তু এ প্রস্তাব পাশ করাতেও ভগৎ সিংয়ের পিতা সর্দার কিষেণ সিং মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছিল। এই ফাঁকি যাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, সেই ডি এল শাস্ত্রীকে বলতেই দেওয়া হল না। তিনি নোটিশ দিয়েছিলেন এক সংশোধনী প্রস্তাবের; এমনি সময় মাইকের বৈদ্যুতিক সংযোগ গেল ছিন্ন হয়ে। তাঁর সংশোধনীতে তিনি এই বাঁ হাতের দাক্ষিণ্যের প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন, "half-hearted stinting grudging compliments." লাউড স্পীকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর প্রেসিডেন্ট বললেন, সময় উত্তীর্ণ, বসে পড়ুন। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থন করার কথা। তিনিও অনুপস্থিত। প্রেসিডেন্ট বললেন, সময় উত্তীর্ণ। কে একজন ক্লোজার মোসান তুলল; পাশ হয়ে গেল। শাস্ত্রী বললেন, ভোট গণনা হোক। প্রেসিডেন্ট বললেন, না।

কংগ্রেস-মঞ্চে বিপ্লবীদের সমর্থক নিঃশেষ হয়ে গেছল। কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। তাই লাহোরে ভগৎ সিংয়ের উদ্দেশে বলিদান হল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জেম্স পেডি শিকার করে ফেরার পথে যখন সন্ধ্যাবেলা শিক্ষা প্রদর্শনী মেলায় এলেন তখন শিকার হলেন বিপ্লবীদের।

৭ই এপ্রিল, তিনটি গুলী লেগেছিল পিঠে, দুই হাতে। ৮ই এপ্রিল সকালে সাম্রাজ্যবাদের বেদীমূলে দেহরক্ষা করেন।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চে গেছল; সত্যব্রত সেন আর আট জন খালাস হলেন; নিরঞ্জন সেন ও আরও আটজনের দণ্ড বহাল রইল, মেয়াদ কিছু কমল। ২২এ এপ্রিল।

লাহোরে আবার একটা পুলিশ-বিপ্লবী সজ্ঘর্ষ হল ৩রা মে। কলেজের এক ছাত্রের কাছে খবর পেয়ে এক পদস্থ পুলিশ ৬০। জন কনষ্টেবল নিয়ে লাহোর থেকে ৪ মাইল দূরে সালামার গার্ডেন ঘিরে ফেলে; দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার দু'জন সন্দেহভাজন সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আকস্মিক ঘেরাওয়ে চমকে উঠে ওঁরা গুলী চালান। পাল্টা গুলীতে দু'জনের একজন জগদীশ—নিহত হন; আহত দ্বিতীয় জন—সুখদেবরাজ—বন্দী হন।

৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হল। জুন মাসে তিনি মাকে লিখেছিলেন: "মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট্ট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুদিন আগে আসিল বলিয়াই কি এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব?"

এই, সত্য, এই। বারংবার বহুনিন্দায় এঁরা কলঙ্কিত হয়েছেন এবং আজ এঁদের শ্রদ্ধাশীল ইতিহাস লিখতেও পবিত্র অহিংসের কলম কাঁপে।

কিন্তু যে অখ্যাত-অজ্ঞাত তরুণ দিনদুপুরে লোকাকীর্ণ আদালতে দীনেশ গুপ্তের বিচারক, আলিপুরের জজ আর. আর. গার্লিককে লক্ষ্য করে রিভলভার তুলেছিল তার হাত কাঁপেনি একটুও। কেননা সে, শুধু প্রাণ নিতে আসেনি, দিতেও এসেছিল, শুধু যেন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী মুখর হয়ে ওঠে। গার্লিককে মৃত্যুদণ্ড দেবার পরে পরেই সে

সায়োনাইডে মৃত্যুর মুখে চুম্বন এঁকেছিল। ভূপেন রক্ষিত রায় তাঁর "বিপ্লব তীর্থে" তরুণটির নাম দিয়েছেন কানাই ভট্টাচার্য; তারিখ দিয়েছেন ২৮এ জুলাই, হবে ২৭এ জুলাই।

বিপ্লববাদের "গুণ্ডামি"

এই নিদারুণ উত্তপ্ত প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার আবহাওয়ার নিন্দাবাদে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যাবার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিলেন। উপলক্ষ্যটা হয়েছিল ২২এ জুলাই পুনায় বোম্বাইয়ের গবর্নরের প্রাণ-হননের ব্যর্থ চেষ্টায়। ছাত্র বাসুদেব বলবন্ত দুটি রিভলভারসহ ধরা পড়েছিলেন। গান্ধীজী ৩০ তারিখে গবর্নর স্যার ই-হটসনের অব্যাহতিলাভে অভিনন্দন জানিয়ে গভীর মনস্তাপে লিখলেন: "Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable harm to the country. Bhagat Singh's character about which I heard so much from reliable sources, carried me away and identified me with the cautious and balanced resolution passed at Karachi. I regret to observe that the caution has been thrown to the winds, the deed itself being worshipped as if it is worthy of emulation. The result is goonda-ism and degradation wherever this mad worship is being performed. It was the peremptory duty of the A. I. C. C. to condemn at the forth coming meeting of the trecherous outrage and reiterate its policy of non-violence in unequivocal terms."

গান্ধীজী জানতেন যে, একই সঙ্গে মীমাংসা-প্রস্তাব আর ভগৎ সিংদের নিন্দা আর বিপ্লবীদের "গুণ্ডা" আখ্যা কংগ্রেসকে অসম্ভব করে তুলবে। জানতেন বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগৎ সিং প্রস্তাবের খসড়া তাঁকে করতে হয়েছে এবং একান্ত আস্থাভাজন জওহরলালকে

তুলতে হয়েছে। নইলে তাঁর লণ্ডনের পথও কুসুমাস্তীর্ণ থাকত না।

গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা

মীমাংসা প্রস্তাবেই গান্ধীজীকে নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়ে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছিল। গান্ধীজী স্বয়ং ঐ প্রস্তাবকেই সমর্থন করে বলেছিলেন, "আমি এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনে যে, কংগ্রেস-প্রতিনিধিমণ্ডলী (বলতে তিনি একাই) স্বাধীনতা এনে দেবেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, অধিকতর বন্ধন (greater bondage) নিয়ে আসবেন না।"

এই পরম আশ্বাসের বাণী দিয়ে ২৯এ আগষ্ট গান্ধীজী "রাজপুতনা" জাহাজে করে দেবদাস, দুই সেক্রেটারী, মিস শ্লেড বা মীরাবেনকে নিয়ে লণ্ডন যাত্রা করলেন। পরেরদিন চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্যা বিপ্লবীর হাতে প্রাণ হারালেন।

এর আগে, ৭ই এপ্রিল, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের চতুর্থ বাৎসরিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গান্ধীজী; লালা শ্রীরাম ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। সেখানে জি. ডি. বিরলা যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা অম্লান তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে:

"মহাত্মা গান্ধীর ওপর বণিক শ্রেণীর অগাধ বিশ্বাস আছে এবং স্বরাজের জন্য তাঁরা সকলরকমে সহায়তা করবেন। তবে, কংগ্রেসে বণিকশ্রেণীর যোগদান সম্পর্কে কথা এই যে, ক্যাপিটালিস্ট শব্দটা নিয়ে বড্ড ভুল বোঝাবুঝি হয়; তা যাতে না হয় সেজন্য তাঁরা কংগ্রেসের ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকে সাহায্য করতে চান।"

সোস্যালিষ্ট-কমুনিষ্টদেরও বুঝতে দেরী হয়েছিল, বুঝলে সত্য, যে, কংগ্রেস ১৯৩১ সালে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আস্থালাভ করেছে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে, জি. ডি. বিরলাও অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদেরই একান্ত আস্থাভাজন মুখপাত্ররূপে কি না জানিনে, গান্ধীজী ম্যাঞ্চেস্টারবাসীদের উদ্দেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আবার

পার্টনারশিপের কথা বললেন : "If England and India, work in a friendly partnership, instead of drifting apart, he would favour Lancashire for the cloth that they could not yet produce in India." ২৩-এ সেপ্টেম্বরের এই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন ২৭এ সেপ্টেম্বর—"provided satisfactory settlement was reached, he would agree to prohibiting of all foreign cloth except Lancashire cloth." এখানে 'হি' মানে কংগ্রেস।

বিলাতী পণ্য, নিদেন বিলাতী বস্ত্র বর্জনে উৎসাহীরা শুনে নিশ্চয়ই খুসী হয়েছিলেন, কি বল, সত্য ? কিন্তু এর ব্যাখ্যা তো সর্দার প্যাটেলই রেখেছিলেন তাঁর সভাপতির অভিভাষণে "boycott of British goods is a political and punitive measure. Now that there is atleast temporary peace and we seek to reach our goal through consultation and conference, we must withdraw the political weapon. We cannot be sitting at a friendly conference table and outside making designs to hurt British interests."

এই অসীম উদারতায় সেদিন চারহাজার ডেলিগেট নিশ্চয়ই গর্ববোধ করেছিলেন; আপত্তি কিছু হয়নি। সুতরাং, গান্ধীজীর লণ্ডন উক্তিতেও আপত্তির কিছুই ছিলনা। হৃদয়ের পরিবর্তন সত্যি ঘটেছিল, কিন্তু সে কোন দিকে ?

গান্ধীজী লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন ১২ই সেপ্টেম্বর ; তাঁর মিশন যে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে যাওয়া নয়, তার চাইতেও মহত্তর, অথবা স্বাধীনতালাভ যদি তাঁর লক্ষ্য হয়ও তবে তা যে গৌণ, মুখ্য অন্যকিছু, একথা তিনি প্রথম সুযোগেই, আমেরিকার উদ্দেশে বেতারে জানিয়ে দিলেন : "রক্তাক্ত পথে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চাইতে তিনি বরং দরকার হলে যুগ যুগ অপেক্ষা করতে রাজী আছেন (He would personally wait, if necessary, for ages rather

than seek to attain freedom of India by bloody means)"।

লণ্ডন থেকে হিজলী

১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলীতে তার নিঃসংশয় জবাব পাওয়া গেছল। কংগ্রেস-মঞ্চে বারংবার নিন্দিত বিপ্লবীদের এক বন্দীশালা ছিল হতভাগ্য বাংলার হিজলীতে। বিপ্লবী দলে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে, চিত্তরঞ্জনের ভাষায়, সেখানে ছিল ইংরাজের নির্দয় হাতে চয়ন-করা বঙ্গ-পুষ্পরাজি—flowers of Bengal. সরকারী ও বেসরকারী নানা ভাষ্য; কিন্তু গুলী চলেছিল সরকারী তরফেই; বন্দীদের মধ্যে সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে প্রাণ দিতে হল, আহত হলেন ২০ জন। সারা বাংলার ক্ষুব্ধ দুঃখকে ভাষা দিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা টাউন হলের সভায় কবিকণ্ঠ সিংহনাদ করে উঠল: "এই যে হিজলীর গুলিচালনা......তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।...ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতে হবে যে ভারতে বৃটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে। আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটেছে। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে প্রজা রক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেই সব শাসনকর্তা এবং তাঁদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।"

কিন্তু গান্ধীজীর লণ্ডন মিশনের ব্যর্থতা ছিল তাঁরই মধ্যে। তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ওপর অপরিমেয় বিশ্বাস। মানুষ যতই মহত্বের দাবী করুক কোথাও তার একটা সীমা আছেই, আলেকজান্দার, নেপোলিয়ান, হিটলার সম্পর্কে যে-কথা, পৃথিবীর তাবৎ মহাত্মা সম্পর্কেও সেই কথা। নইলে ঐ মাহাত্ম্যগুণে আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে এক ধর্ম, এক আচরণ, এক রীতি ও এক মহাত্মাই সর্বজনীন হয়ে থাকত। তা যে হয় না, পৃথিবীতে আজ যে মাত্র একটি ধর্ম, এক আচরণ ও এক রীতি, এক পূজানুষ্ঠান হয়না, তারকারণ মহাত্মার সংখ্যাও যত, পথ ও মত ও তত। বাস্তব পৃথিবীতে এই মত ও পথ-সঙ্ঘর্ষ-অনিবার্য। সেখানে কোটী কোটী লোকের পক্ষ থেকে একক প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এক সেই কল্পিত সীমাহীন জ্ঞানের আধার, যাকে বলা হয় omnipotent, omniscient, omnipresent ছাড়া কারও সাধ্য নেই বহন করতে পারে। গান্ধীজী এই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ সর্বত্রগামীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই অসম্ভব দায়িত্বের মধ্যেই ব্যর্থতার বীজ ছিল। বাইরের যেসব বাধা ছিল—মুসলিম, তপশীল সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ, ইউরোপীয়ান প্রভৃতির স্বার্থ সংঘাত—ওঁর বিশ্বাস ছিল, এসব তিনি তাঁর মাহাত্ম্যগুণে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। পারেন নি, পারা সম্ভব নয়; গোলটেবিলে অকারণে বহু বিপরীত স্বার্থের সমাবেশ করা হয়নি। অত স্বার্থের সমাবেশে তাঁর শতকরা ৯৫ জনের প্রতিনিধিত্ব দাবী গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব।

১৯৩০এর প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কেউ যোগ দেন নি; সেটি হয়েছিল ১২ই নবেম্বর থেকে ১৯৩১এর ১৯এ জানুয়ারী; দ্বিতীয়টি হয়েছিল ১৯৩১এর ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর অবধি। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম অধিবেশনের অতিরিক্ত ৩১

জন ডেলিগেট যোগ দিয়েছিলেন। এই অতিরিক্তদের মধ্যে ছিলেন বৃটিশ প্রতিনিধি ৫, দেশীয় রাজ্য ৬, বৃটিশ ভারত ১৯, তার মধ্যে গান্ধীজী একক কংগ্রেসের।

সত্য, প্রথম অধিবেশনের "জনারণ্য" দেখলেই তুমি বৃহৎ ব্যাপারটি উপলব্ধি করবে। বৃটিশ প্রতিনিধির মধ্যে ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ সতের জন; দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ছিলেন ভূপালের নবাব প্রমুখ ষোল জন; বৃটিশ ভারতের পক্ষে ছিলেন আগা খাঁ, মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আম্বেদকর, ফজলুল হক, লেঃ কর্নেল গিডনী, স্যার হিউবার্টকার, এম. আর. জয়াকর, এম. এ. জিন্না, এইচ. পি. মোদি, ডঃ বি. এস. মুঞ্জে, দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদালিয়র, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার মহম্মদ সফি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, চিমনলাল শীতলবাদ, জফরুল্যাখাঁন প্রমুখ ৫৬ জন।

দ্বিতীয় বৈঠকে এরও অতিরিক্ত ৩১ জন; বৃটিশ ভারতের ১৯ জনের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজী ছাড়া স্যার সৈয়দ আলি ইমাম, মৌলানা সৌকৎ আলি, ই. সি. বেন্থল, জি. ডি. বিরলা, স্যার মহম্মদ ইকবাল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস।

আমি তোমায় সব নাম বললাম না, কিন্তু ধর এই যে সোয়াশ'র মত ডেলিগেট, এঁদের কেউই কারও চাইতে কম যান না। সমস্যাও একটি দুটি নয়, বৃটিশ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ, বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা, বৃটিশ ভারতে বর্ণহিন্দু সমস্যা, হিন্দু মুসলিম সমস্যা, রাজা-প্রজা সমস্যা, ব্যবসাবাণিজ্য সমস্যা রয়েছে। যে-কোন একটা সমস্যাই সম্মেলনের ভরাডুবির পক্ষে যথেষ্ট এবং শেষ পর্যন্ত বানরের হাতেই পিঠে ভাগের দায়িত্ব দিতে হয়েছে। তারই নাম, কম্যুনাল এওয়ার্ড এবং তারই সর্বশেষ সর্বনেশে নাম—থাক্, সে-কথা যথাসময়ে।

অর্থাৎ, গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল অমীমাংসা ও ব্যর্থতার

মধ্যে রেখে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন এবং আবারও এক ব্যর্থ আন্দোলনের আহ্বান দিয়ে কারান্তরিত হলেন।

ইউরোপীয় মুখপাত্রের সার্কুলার

সেকালে বেঙ্গল সার্কুলার যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ এতদূরে দাঁড়িয়ে ঐ সার্কুলারটির দুটি একটা কথা সেকালের অপ্রতিরোধ্য ঘটনাক্রমের ওপর কিছু আলো ফেলতেও পারে। খুসীতে ডগমগ এই সাহেব, বৈঠকে উপস্থিত মুসলমানদের সঙ্গে কি ধরণের আঁতাত করেছিলেন তা বলেছিলেন :

> "They were solid and enthusiastic team : Ali Imam, the Nationalist Muslim, caused no division. They played their cards with great skill throughout ; they promised us support and they gave it in full measure. In retun they asked that we should not forget their economic plight in Bengal and that we should without pampering them do what we can to find places for them in European firms so that they may have a chance to improve their material position and the general standing of their community."

গান্ধীজী-প্রসঙ্গে এই সার্কুলারে বলা হয়েছে, "নতুন ভারতীয় ডেলিগেটরা তো লণ্ডনে গেছলেন (বৃটিশ) ব্যবসায়িক ও আর্থিক রক্ষাকবচ আক্রমণের জন্যই ; কিন্তু তা যেখানে ছিল সেখানেই অবিচল রয়েছে।" বলেছিলেন :

> "If it did nothing else, it showed to the world the constructive vacuity of Gandhi's mind."

"দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল বৈঠক আর কিছু না করুক, অন্ততঃ পৃথিবীর কাছে গান্ধী-মনের গঠনাত্মক শূন্যতা প্রকট করে দিয়েছে। কেবল লণ্ডনে নয়, প্যারিসে ও রোমেও যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের কাছেও উনি দুর্বোধ্য থেকে গেছেন।

বেন্থলের সার্কুলার নিঃসন্দেহে অসৎ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে চারপাশে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের না নিয়ে গিয়ে সবই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের রাজনৈতিক বুকনিতে সেরে আসা যাবে এই আশার আতিশয্যই হয়েছিল কাল। রাজনৈতিক প্রয়োজনেও যদি একজন বিশ্বস্ত 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান', একজন জাতীয়তাবাদী অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং জাতীয়তাবাদী একজন দেশীয় খৃষ্টান, জাতীয়তাবাদী একজন বণিক নিয়ে যেতেন, তাহলে কংগ্রেসের জাতীয় দাবী প্রকাশ করা যেত। তাও করেননি। অথচ তার অবকাশও ছিল। কেননা, বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের কাছে একটি নামের প্যানেলও চেয়েছিলেন। কংগ্রেসকে পেয়ে বসেছিল টোটালি-টেরিয়ানিজম—নিরঙ্কুশ এক-নায়কত্ব। তার মূল্য দিতে হয়েছে শুধু কংগ্রেসকে নয়, পোড়াকপাল সারা ভারতবর্ষকেই।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১লা ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সমগ্র পরিকল্পনাটি প্রকাশ করলেন, ২৮এ ডিসেম্বর সকাল আটটায় গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন। ৭ই ও ৮ই নবেম্বর বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজী যে কেবল্ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তাঁকে ফিরে আসার অনুরোধ জানানো হল: "his further continuance in the Round Table Conference appeared to them to be unnecessary." তবে তিনি যেহেতু সেখানে আছেন সেইহেতু অবস্থা বুঝে যদি দরকার মনে করেন, থাকবেন। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে যে বাংলাদেশে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে ও অন্যত্র অবস্থা অবনতির দিকে গেছে তার প্রতি গান্ধীজীকে অবহিত করে প্রস্তাবে বলা হল, শিগগিরই তাঁর ফিরে আসা বাঞ্ছনীয়, ইউরোপ সফর এখন ঠিক হবেনা।

জিগগেস করলাম, কি হয়েছিল বাংলা, সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশে ?

বললেন, চট্টগ্রামে আসানুল্যা হত্যার পর সুযোগ বুঝে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর ব্যাপক মুসলিম গুণ্ডাবাজি চালিয়ে দিল, তারা প্রাণ ভরে "বদলা" নিল। মৌলানা আক্রাম খাঁ, বি. এন. শাসমল, ডাঃ জে. এম দাশগুপ্ত, তুলসী চন্দ্র গোস্বামী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি, জে. এম. সেনগুপ্ত ও এন. সি. সেনকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি হয়েছিল। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ৩০এ আগষ্ট রাত্রে যা হয়েছে তা বেসরকারী ইউরোপীয়ান, ইউরোপীয়ান অফিসার ও মুসলিম পুলিশের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের ফল। ৩১এ আগষ্টের লুট-তরাজ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের প্ররোচনায়ই হয়েছে, পুলিশ প্রহরাধীনেই তা শুরু হয়েছে ও চলেছে। মফঃস্বলের হাঙ্গামাও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হয়েছে।

১৯৩১এর ৩রা আগষ্ট বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয়। রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জির হত্যার দায় চেপেছিল তাঁর ওপর। মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে রামকৃষ্ণ মাকে লিখেছিলেন :

"যতদিন নিজের নিজের করিয়া মায়েরা কাঁদিবেন, ততদিন দুঃখ বাড়িবেই. কমিবে না। দুনিয়ায় এত ছেলে মেয়ে আছে ; তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন মায়েরা নিজের ছেলের স্বরূপ দেখিতে পাইবেন তখনই তাঁহাদের মাতৃত্ব সার্থক হইবে।"

সত্য, এই ছেলেরাই তখন জন্মেছিল। আর হিংসার নামে নাক টেনে যাঁরা এঁদের ক্রিমিনাল বলে সরকারের কাছে বাহাদুরি নিতেন তাঁরাই এখন নির্বাচনের ফাটকাবাজিতে রকবাজ সমাজ-বিরোধীদের 'আপন জন' করে নিয়েছেন—নিচ্ছেন।

২৮এ অক্টোবর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এল. জি. ডুর্নো দুপুর বেলা এক মসলার দোকান থেকে ফেরবার পথে গুলীবিদ্ধ হলেন। লোকের তাড়া খেয়েও আততায়ী সরে পড়তে পেরেছিল।

যে প্ররোচনার ফলে হিজলী বন্দীশিবিরে নির্বিচারে গুলীচালনা

হয়েছিল তার অন্যতম কারণ সেকালের ভারতবন্ধু স্টেটসম্যানে প্রকাশিত ইউরোপীয়দের নানা ঢঙের চিঠি।

তার জবাব দিতেও এগিয়ে গেছল বাংলার বিপ্লবী তরুণ দল। ঢিলা পায়জামা ও মুসলমানী ফেজ পরা বিমল দাশগুপ্ত ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের ভিলিয়ার্সকে 'চাঁদমারি' করেছিল। পিঠে-লাগা গুলীটা তেমন মারাত্মক ক্রিয়া করেনি। বিমলের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

দেশের এক বিশেষ ভদ্রমহলে এবং আমাদের মতো অহিংস মহলে এই বিপ্লবীদের প্রতি ঘৃণার অবধি ছিলনা। বঙ্গীয় প্রদেশিক কমিটি এই জাতীয় হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের নিন্দার জন্য জনসভা আহ্বান করেন। সে আহ্বান কতদূর পৌঁছেছিল কে জানে, অন্ততঃ কুমিল্লার ফয়েজ উন্নেসা গবর্নমেণ্ট হাইস্কুলের অষ্টম মানের দুটি মেয়ে শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরীর কানে বা হৃদয়ে পৌঁছোয়নি। কুমিল্লায় সাঁতার প্রতিযোগিতার আবেদন পেশের ছলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি. জি. বি. স্টিভেন্সকে লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে। ম্যাজিস্ট্রেট বলতে যাচ্ছিলেন, তারা যেন এ নিয়ে হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু তার আগেই রিভলভার দুটি কথা বলে, স্টিভেন্স চিরকালের জন্য নির্বাক হয়ে যান।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলনে খান আবদুল গফফর খাঁন, কাজী আতাউল্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রেগুলেশন ৩ (১৮১৮) আইনে বন্দী হন।

যুক্তপ্রদেশে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল কৃষক বিক্ষোভ; এখানেও খাজনা বন্ধ আন্দোলন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারপর এক সিদ্ধান্ত নিতেই জওহরলাল, শেরওয়ানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন ২৬এ ডিসেম্বর।

গান্ধীজী দেশে ফিরে বড়লাটকে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে এক টেলিগ্রাম করেন। এই প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যাত হয়।

তেতো মুখে সব তেতো

ঐ ২৯এ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩২-এর ১লা জানুয়ারী অবধি ওয়ার্কিং কমিটির চারদিন ব্যাপী বৈঠকে নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি তাঁদের কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়েছে এবং তাতে তাঁরা মনে করেছেন প্যাক্টের (মানে গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের) আর কোন অর্থ নেই। সুতরাং, হতাশায়ও আশা রেখে বলা হল:

> "In the event of a satisfactory response not forthcoming, the Committee calls upon the nation to resume civil disobedince.....

অহিংসার ওপর জোর এবং খুবই জোর দেওয়া হল যেন অত্যাচারীর হৃদয়-পরিবর্তন হয়। যে-প্রদেশ, জেলা বা তহশীল কি গ্রাম এই সংগ্রামের অহিংস প্রকৃতি না বুঝবে, অহিংসা ও তার তাৎপর্য না বুঝবে বা প্রাণ সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি বা দুঃখবরণে প্রস্তুত না হবে সে যেন এতে না আসে। কথায় ও কাজে অহিংসা পালন করতে হবে, হোক প্রচণ্ড প্ররোচনা,—

> "it being understood that the campaign is not one of seeking revenge or inflicting injuries on the oppressor but is one of converting him through self-suffering and self-purification."

প্রতিহিংসা নয়, কিন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জন, তা বিলাতী হোক কি অন্য দেশের হোক। একদিন বিলাতী বস্ত্র বর্জন নিষিদ্ধ ছিল, নইলে বন্ধুভাবে বৈঠকে বসা যায়না, এখন তার কৈফিয়ৎ হল—

> "Even in a non-violent war boycott of goods manufactured by the oppressor is perfectly lawful in as much as it is never the duty of a victim to promote or retain commercial relations with the oppressor ..."

দেখছ, সত্য, ননভায়োলেণ্ট লজিকও কেমন অবস্থা-সাপেক্ষ।

সুতরাং, অনুগত কংগ্রেসসেবক আমি—চরকা, খদ্দর, অহিংসার থলিটা নিয়ে দুঃখবরণে বেরোতে হল।

আবারও পত্রালাপ

ইতিমধ্যে গান্ধীজী লিখলেন বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে: আমাদের বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল এ কি তারই লক্ষণ? অথবা আপনি কি চান আমি কংগ্রেসকে কি পরামর্শ দেব সে বিষয়ে আপনি আমাকে পথ বলে দেবেন?

গান্ধীজীর ২৯ তারিখের এই চিঠির উত্তরে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখলেন: বাংলাদেশে অফিসার ও নাগরিকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই ওসব ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যুক্তপ্রদেশে প্রাদেশিক সরকার যখন সকলরকম কষ্টলাঘবের চেষ্টা করছেন তখন কংগ্রেস কমিটি খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে দিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খান বক্তৃতার পর বক্তৃতায় জাতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছেন; আপোষ-আলোচনায় বসতে রাজী নন। আরও অনেক কথা লিখে শেষে জানালেন: "But His Excellency feels bound to emphasise that he will not be prepared to discuss with you the measures which the Government of India with approval of His Majesty's Government have found it necessary to adopt in Bengal, the United Provinces and the North West Frontier Province."

গান্ধীজী তাঁর ১লা জানুয়ারীর চিঠিতে লিখলেন: "এ আপনার উপযুক্ত হয়নি। আমি চাইছিলাম আলো, আর আপনি বললেন, আমার অন্তরঙ্গ সাথীদের ঝেড়ে ফেলতে। আর তা করলেও জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন না।

গান্ধীজী তাঁর দীর্ঘ চিঠিতে আবদুল গফফর খান ও যুক্তপ্রদেশের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করে কংগ্রেসী ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ সমর্থন

করলেন। বড়লাটের অভিযোগগুলো মেনে নিলেন না। মেনে নিলেন বাংলা দেশের ব্যাপারে, নিন্দা করলেন ঐ সব সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, তবে এও বললেন যে গবর্ণমেণ্টেরও উচিত নয় বিধিবদ্ধ সন্ত্রাসের স্বষ্টি করা।

> "As to Bengal the Congress is at one with Government in condemning assassinations and cooperate with the Government in measures that may be found necessary to stamp out such crimes."

এই সুদীর্ঘ চিঠির উত্তরে বড়লাটের একান্ত সচিব আবার লিখলেন ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারী: গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, আপনি আবার আইন অমান্যের হাতিয়ার উদ্যত করে বড়লাটের কাছ থেকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করছেন।

গান্ধীজী ৩রা জানুয়ারী লিখলেন, আপনি এটিকে 'হুমকি' মনে করলেন? আপনার কি মনে নেই, আইন অমান্য যখন চলছে তখনই দিল্লীতে আপোষ আলোচনা চলে। আলোচনা শেষে ওটি প্রত্যাহৃত হয় না, স্থগিত হয়?

গান্ধীজী কারান্তরিত

১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজীকে বোম্বের "মনি ভবন" থেকে ১৮২৭-এর ২৫ রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটি অবৈধ ঘোষিত হয় এবং চারটি নতুন অর্ডিনাস জারী করা হয়। বলা কঠিন, গান্ধীজী-কথিত খাঁটি অহিংস-বাদীরাই একান্তভাবে ১৯৩২-এর আইন অমান্য-আন্দোলন করেছিলেন কিনা এবং উৎপীড়কের হৃদয়-পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা।

THE CARAVAN PASSES ON

স্যার স্যামুয়েল হোড় ২৮-এ জানুয়ারী কমন্সসভায় ঘোষণা করলেন: বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়নি; অন্ততঃ মিঃ গান্ধী এমন কোনো অভিযোগ করবেন না।

"তথাকথিত চুক্তির অবসান হয়েছে একথা সত্য। এ আমাদের দোষে নয়। The smashing of the pact is due to Congress and Congress alone.

"আর হুমকির জবাবে আমি প্রাচ্যের এই প্রবচনই আওড়াব: হাথথি চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার। As for the threats I will answer them in the words of the Eastern proverb: 'though the dogs bark, the caravan passes on."

বাংলার বিপ্লবীরাও 'একলা চলার পথে' একান্ত সঙ্গোপনে যেন স্যামুয়েল হোড়েরই প্রতিধ্বনি করছিলেন।

২৭এ জানুয়ারী শান্তি-সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল বটে, ৬ই ফেব্রুয়ারী আর এক বঙ্গনারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভীড় ভেদ করে সরকারী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে উত্থিত হলেন; হাতে তাঁর রিভলভার। লক্ষ্যস্থল বাংলার গবর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। সমাবর্তন ভাষণ পড়ছিলেন। পাঁচটি গুলীই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। জ্যাকসন পড়তে লাগলেন। অদূরে ব্যর্থকামা বন্দিনী। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার বেণীমাধব দাসের মেয়ে, ডায়োসিসান কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী বীণা দাস। গ্রাজুয়েট বোন কল্যাণী দাসও সাম্প্রতিক অর্ডিনান্স বলে ন'মাসের মেয়াদে বন্দিনী! বাড়ি অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামে। বি-এ ডিগ্রী নিতে এসেছিলেন কনভোকেশন গাউন পরে। কলেজ হোস্টেলে তাঁর ঘর খুঁজে পাওয়া গেল আরও পাঁচটা তাজা কার্তুজ।

বিচারক সি. সি. ঘোষ, এম. এন. মুখার্জি ও এম. সি. ঘোষকে নিয়ে গঠিত এক স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের সামনে বীণা দাস অপরাধ স্বীকার করে এক বিবৃতি দিলেন; ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিচারকেরা দিলেন ৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

বীণা দাসের "শৃঙ্খল ঝঙ্কার" এ তো এই বিবৃতিটি খুঁজে পাই নি —আমি বললাম।

বললেন, আমরা পেয়েছিলাম, ওটি ছেপে বিলি হয়েছিল আরপুলি লেনে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির কর্মাধক্ষ্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গোপন উদ্যোগে, আজ হারিয়ে ফেলেছি। মিত্রের য়্যানুয়ান রেজিস্টার-এ যে ইংরাজী ভাষ্য আছে তার একটু তোমায় শোনাতে পারি আমার বাংলায়—

"অবরুদ্ধ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি গবর্নরকে গুলী করেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার দুঃখের নিবৃত্তি হবে যদি আমি দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে মৃত্যু বরণ করি। ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হয়েছি আমি; কিন্তু গবর্নমেণ্টের বেকানুন এমন এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, আমার মতো ক্ষীণশক্তি নারীকেও তার কোমল-প্রকৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আমি সকলের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করতে চাই। তবে আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মানুষ হিসেবে স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই; তিনি আমার পিতৃতুল্য; লেডী জ্যাকসনও আমার মায়ের মতো। কিন্তু বাংলার গবর্নর একটা শাসন ব্যবস্থার প্রতিভূ মাত্র; এই শাসন-ব্যবস্থা আমার স্বদেশের ত্রিশ কোটী নর নারীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে।............"

২৪এ ফেব্রুয়ারী ৪৯-১৮ ভোটে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্ট পাশ হল। ১লা মার্চ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার রায় বেরোলো। জে. য়ুনি (J. Youni) এন. এন. লাহিড়ী, খানবাহাদুর আবদুল হাইকে নিয়ে গঠিত স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল দণ্ড দিলেন: অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রনধীর দাশগুপ্ত—প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অনিলবন্ধু দাস—বোরস্টাল স্কুলে তিন বছর। নন্দ সিং—দু' বছর। আর ষোলো জন খালাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টে বন্দী হয়ে গেলেন। বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

৩০এ এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর ডগলাস ডিস্ট্রীকট বোর্ড অফিসে বসে কাগজপত্র সই করছিলেন। হঠাৎ রিভলভার ছোঁড়ার শব্দ, পর পর পাঁচটা। ছ'টা এসে লাগল ডগলাসের গায়ে। চার গজ দূর থেকে আক্রমণ করেছিলেন দু'জন। একজন পালিয়ে যেতে পারলেন। আর একজন পালিয়ে যাবার পথে ধরা পড়লেন। ডগলাসও বাঁচেন নি।

১২ই জুন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর সুরেশ চন্দ্র বসুকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হল রাজবাড়িতে; কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

পরদিন, ১৩ই জুন, পটিয়া মিলিটারী ক্যাম্পের চার মাইল দূরে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে ২৮নং গোর্খাবাহিনীর ৭জন সেপাই, এক হাবিলদার এবং একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন কনষ্টেবল নবীন চক্রবর্তীর বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল রাত নটায়। বাড়িতে ঢুকতেই শোনা গেল, কারা সব সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। হাবিলদারকে আগে রেখে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। হাবিলদার প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল উঠোনে; তার পরই ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের গলায় বুকে এসে লাগল গুলী, তাঁর নিষ্প্রাণ দেহও পড়ল নীচে। বিপ্লবীদের একজন দ্রুত ছুটে নেমে এসে এক সেপাই-এর রাইফেল কাড়তে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন; সেপাই বন্দুক তাগ করে ঘুরে দাঁড়াতেই পালাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু গুলী ছুটো ছিল অব্যর্থ। পরদিন দেহ পাওয়া গেল ঝোপে; অপূর্ব সেন ওরফে ভোলার। আর একজন জানালা দিয়ে গলে পালাতে চেষ্টা করছিলেন; সেপাই গুলী করতেই পিছিয়ে যান। আরও সৈন্য সামন্ত এসে গেল। তারপর বিজয় গৌরবে সৈন্য বাহিনী ভেতরে গিয়ে দেখে আরও এক নিষ্প্রাণ বিপ্লবীর দেহ —নির্মল সেনের। ধরা পড়লেন সাবিত্রী দেবী, তাঁর ১৯ বছরের ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, আর ১৩ বছরের মেয়ে স্নেহলতা।

সাফল্যের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন সূর্য সেন আর সীতারাম বিশ্বাস।

২৯এ জুলাই এডিসানাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ ই. বি. এলিসান (E. B. Ellison) সাইকেলে করে অফিস থেকে বাংলোয় আসছিলেন; এমন সময় লাগল গুলী। তাঁর দেহরক্ষী পাণ্টা গুলী চালিয়েছিল বটে কিন্তু এলিসন ঢাকায় মারা গেলেন ৫ই আগষ্ট।

ঐ তারিখেই 'স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনের প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়েছিল; কিছু হয়নি। তখন বেলা তিনটে। সম্পাদক দুপুরের খাওয়া খেয়ে অফিসে ফিরছিলেন। একটি বাঙালী তরুণ লাফ দিয়ে গাড়ীর ফুটবোর্ডে উঠল, গাড়ীটা খানিকটা টালখেল, গুলী গেল স্যার এলফ্রেডের কান ঘেঁষে, জানালার শার্সি ভেঙ্গে চুরচুর। দারোয়ান আর এক কনষ্টেবল জাপটে ধরল ছেলেটিকে। ছেলেটি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোনরকমে হাতটা ছাড়িয়ে নিজের পকেটে হাত দিল, কি একটা বেরোলো, মুখে ফেলে দিল। হাসপাতালে যাবার পথে দেখা গেল তার দেহ প্রাণহীন। ধুতি আর কোট পরা ছেলেটির নাম জানা গেল পরে। খুলনা-সেনহাটির অতুল কুমার সেন, বছর ২২ হবে, যাদবপুরের প্রাক্তন ছাত্র।

কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, বাংলাদেশে এত উৎপীড়ন, ফাঁসী, কারাদণ্ড, অহিংস-সহিংসদের অবিরাম অপযশ কীর্তন সত্বেও তথাকথিত বিপ্লব-বাদীদের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে চলেছে। অতএব এ দণ্ড যথেষ্ট নয় স্থির হল নির্বাসন। নির্বাসনের স্থান আগেই ছিল এবং পূত-পবিত্র হয়েছিল বাংলার প্রথম বিপ্লবীদলের বিচরণে। তার নাম আন্দামান। ১৯৩২ এর ১৫ই আগষ্ট 'দ্বীপান্তরিত' প্রথম দলকে পাঠানো হল আন্দামান।

রাজনৈতিক বজ্রপাত

এমন সময় নিদারুণ এক বজ্রপাত হল সারা ভারতবর্ষের ওপর। ক্ষতিগ্রস্ত হল সব চাইতে বেশী বিপ্লবী বাংলা ও পাঞ্জাব। ১৯৩২ এর

১৬ই আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' ঘোষণা করলেন।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে একই সঙ্গে ঘোষণায় যা বলা হল তার মর্মার্থ হচ্ছে : "মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের পৃথক নির্বাচন ; অনুন্নত শ্রেণী সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলীতে (জেনারেল কনস্টিটিউয়েন্সীতে) ভোট দেবেন ; কিন্তু তাঁদের জন্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীরও সৃষ্টি করা হবে। এই ব্যবস্থা ২০ বছর চলবে ; তবে ঐ সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে তার আগেও এই ব্যবস্থার অবসান ঘটতে পারবে। মুসলমানরা যেখানে যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে সেখানে তাঁদের প্রচলিত ওয়েটেজ অপরিবর্তিত থাকবে।

বলা হল : "দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের শেষে ১৯৩১এর ১লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ সরকারের তরফে যে বিবৃতি দেন তা অব্যবহিত পরেই পার্লামেন্টের উভয় সভায়ই অনুমোদিত হয়। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, যদি গোলটেবিলে ব্যর্থকাম ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সকল দলের পক্ষে গ্রহণীয় কোন সমাধানে পৌঁছোতে সমর্থ না হন তবে বৃটিশ সরকার দেখবেন যেন এজন্য ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত না হয়। অর্থাৎ, তাঁরা নিজেরাই অন্ততঃ সাময়িক কোন উপায় অবলম্বন করে এই প্রতিবন্ধক দূর করবেন।

"গত ১৯এ মার্চ বৃটিশ সরকারকে জানানো হয় যে, ওদের বার বার কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ব্যর্থতা নতুন সংবিধান রচনার কাজ ব্যাহত করে চলেছে। আরও বলা হয় যে যেসব বিতর্ক-মূলক প্রশ্ন উঠেছে বৃটিশ সরকার তার জট ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। এখন তাঁরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, নতুন সংবিধানে সংখ্যা-লঘুদের অবস্থান-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর অন্ততঃ কয়েকটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে না এলে সংবিধান রচনার কাজে আর অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না।

অতএব বৃটিশ সরকার স্থির করেছেন যে :

"Election to the seats allotted to Mahomedan, European and Sikh Constituencies will be by voters voting in separate communal electorates covering between them the whole area of the province.

"Provision will be made in the Constitution itself to empower revision of the electoral arrangements after 10 years with the assent of the Communities affected, for the attainment of which suitable means will be devised.

"All qualified electors who are not voters either in Mahomedan, Sikh, Indian Christian, Anglo-Indian or European Constituency will be entitled to vote for a general constituency."

লক্ষ্য কোরো, সত্য, সংবিধান রচয়িতারা বা বৃটিশ প্রবক্তারা কখনো হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেন নি, ভারতবর্ষে হিন্দুর অস্তিত্ব তাঁরা বিপ্লবীদের অপযশ কীর্তনের ক্ষেত্র ছাড়া সরকারীভাবে কখনো স্বীকার করেন নি। তাই সেকালে দুটি শব্দ মাত্র প্রচলিত ছিল; তা হচ্ছে, মুসলমান এবং অমুসলমান। বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমানই মুখ্য, আর সব গৌণ। কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিতেই যদি তা সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে হয়তো হিন্দুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত। কংগ্রেসের পরম লজ্জা ও আশঙ্কা পাছে কেউ তাকে হিন্দু আখ্যা দেয়—যদিও ১৯৪৭এ এই মরণই তার হয়েছে। কংগ্রেস মহলও ঐ বৃটিশ কূটনীতির ভাষায় খুশী হল—মুসলমান ও অমুসলমান। তথাকথিত বিপ্লবী বামপন্থীদেরও ঐ এক লজ্জা ও আশঙ্কা—হিন্দু হয়ে যাবার ভয়। সুতরাং, তাঁরাও বৃটিশের দেওয়া এই পরিভাষায় পরিতৃপ্ত থাকলেন।

বাংলা ও পাঞ্জাবের আসন এই পরিভাষা অনুসারেই বণ্টন করা হল; এখানে হিন্দুর নাম গন্ধও নেই:

"বাংলা: সাধারণ আসন ৮০ (তার মধ্যে দু'জন মহিলা); অনুন্নত শ্রেণী (আপাততঃ শূন্য); মুসলমান ১১৮ (তার মধ্যে দুজন মহিলা); ভারতীয় খৃষ্টান ২; য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ৪ (একজন মহিলা); ইউরোপীয়ান ১১; বাণিজ্য ইত্যাদি ১৯; জমিদার ৫; বিশ্ববিদ্যালয় ২; শ্রমিক ৮; মোট ২৫০।"

"পাঞ্জাব : সাধারণ আসন ৪৩ (একজন মহিলা); শিখ ৩২ (একজন মহিলা); মুসলমান ৮৬ (দুজন মহিলা); ভারতীয় খৃষ্টান ২ ; য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ১ ; ইউরোপীয়ান ১ ; বাণিজ্য ইত্যাদি ১ ; জমিদার ৫ ; বিশ্ববিদ্যালয় ১ ; শ্রমিক ৩ ; মোট ১৭৩ ।"

এওয়ার্ডের নেপথ্য কাহিনী

১৯৩১ এর ৮ই অক্টোবর লণ্ডন বৈঠকের সংখ্যালঘু শাখা-কমিটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন গান্ধীজী বলেছিলেন, "সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে সর্বসম্মত সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। তা পাওয়া না গেলেও সংবিধান রচনার কাজ এতে ব্যাহত হওয়া উচিত নয়।" কিন্তু তারপর যে কথাটি বলেছিলেন, তাই মারাত্মক শেলের মতো বিঁধে গেল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে। তিনি বলেছিলেন : 'if a solution of question was impossible, he would support any scheme of private arbitration.' যদি সমাধান অসম্ভবই হয় তবে তিনি বেসরকারী সালিশীর যে কোন স্কীম সমর্থন করবেন! "সুতরাং, এখন সংখ্যালঘু কমিটির অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী থাক।" স্যার এম. সফি এই মুলতুবী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে বললেন, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান না হলে ফেডারাল স্ট্রাকচার কমিটির কাজ চালানো অসম্ভব। ডঃ আম্বেদকরও মুলতুবী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কমিটির সভাপতি; তিনি বললেন, হ্যাঁ, সংবিধান রচনার আগে এ প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া দরকার। কিন্তু হয়নি।

এর চাইতেও মজার কাহিনী তোমায় শোনাই শোনো—যে-কাহিনী সবিশদ অপ্রকাশিত থাকায় ভবিষ্যতে অনেক মারাত্মক কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল।

বিলেতে সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠক চলছে; মীমাংসায় আর কিছুতেই পৌঁছোনো যায় না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সভাপতির আসনে বসে আছেন। তারিখটা ১৩ই নবেম্বর। স্যার চিমনলাল শীতলবাদ

প্রস্তাব করলেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সমাধানের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীই নিন ; ঐ সমাধান সবাই মেনে নেবেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, বেশ, আপনারা তবে প্রত্যেকে সই করে লিখে দিন, আমার সিদ্ধান্ত আপনারা মেনে নেবেন। (Will you, each of you, every member of the Committee, sign a request to me to settle the community question and pledge yourself to accept my dicision that I think is very offer ?)

ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী : আমরা এদিকে সবাই রাজী।

প্রধানমন্ত্রী : না শুধু একাংশ বা একজনের কথা নয়। এই কমিটির সব সদস্য একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করবেন ; তাতে আমাকে অনুরোধ করা থাকবে একটা সিদ্ধান্তের জন্য—সে সিদ্ধান্ত যদি সাময়িকও হয়, তাতে ও তাঁরা সম্মত হবেন। আমি এক্ষুনি চাইছিনে। কিন্তু আমার কথা : Will you put your name to it and give that to me with the assurance that the decision come to will be accepted by you and will be worked out by you to the best of your ability, in course of the working of the the new constitution ? আপনারা কথা দিন, যে—সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছোব তা গ্রহণ করবেন ও নতুন সংবিধান চালু হলে তা যথাসাধ্য কার্যকারী করবেন ?

পরদিন পণ্ডিত মালব্যের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি ঐ মর্মে এক চিঠি দিয়ে জানালেন, they would abide by the Prime Minister's decision and would recommend that course to those whom they represented. তেজ বাহাদুর ও আর একদল প্রতিনিধিও অনুরূপ চিঠি দিলেন। মুসলমানেরা লিখলেন, সবাই যদি সমর্থন করে আমরাও করব।

দুদিন পর গান্ধীজী লিখলেন : মালব্যের চিঠিতে আমার স্বাক্ষর না থাকায় এ বোঝায় না যে, the Congress had indicated

that it would not approve of any solution acceptable to the three parties concerned, Hindus, Muslims, Sikhs.

এত সব হয়ে যাবার পর ১লা ডিসেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কে গোলটেবিলে যে বিবৃতি দেন এবং যে বিবৃতি কংগ্রেস অসন্তোষজনক মনে করেন, তাতেও তিন নম্বর দফায় বলা হয়েছিল যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলো যদি নিজেরা কোন মীমাংসায় না আসতে পারে তো বৃটিশ সরকারই তার একটা সমাধান করে দেবার ইচ্ছে রাখেন : "(3) His majesty's Government intend to decide the communal question, if a voluntary agreement is not arrived at by communities by an early date."

ভারতে মুসলিম রাজনীতির ধারা

সুতরাং, এটি ঘটনাক্রমেই এসেছে। ভারতে মুসলিম রাজনীতির আর একটি সরকারী নাম সংখ্যালঘুর রাজনীতি। তা এক পৃথক ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ; কিন্তু বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। তারই গর্ভে একটি বৈরী পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়া সত্বেও বর্তমান (অমুসলমান) ভারতেও মুসলিম-সংখ্যালঘু সমস্যার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে, history repeating itself; সেদিক থেকে এই ধারাগুলো লক্ষ্যণীয়।

১৯৩১-এর ১৮ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে এক সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী সম্মেলন হয়; অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন মৌলানা কুতবুদ্দিন আবুহুল ওয়ালি। এই সম্মেলন আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধী ছিল। প্রত্যাহারের পর মুসলিম দাবী সম্পর্কে গান্ধীজীর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় খুসী হয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, পৃথক নির্বাচন 'ভারতীয় জাতির' বিকাশের পরিপন্থী। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্যার আলি ইমাম; তাঁরও ঐকথা : "Separate Electoate a negation of nationalism."

মে মাসের ২৯/৩০এ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল ও

সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের এক সমঝোতা চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সিমলায় ডাঃ আন্সারী ও টি. এ. কে. শেরওয়ানী এবং মৌলানা সফি দাউদি তুটি পৃথক বিবৃতি দেন।

৩০এ মে বোম্বাই সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন পরিষ্কার জানান যে, তাঁরা এমন কোন সংবিধানই গ্রহণ করবেন না যাতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার রক্ষাকবচ নেই এবং একথাও মানেন না যে, পৃথক নির্বাচন জাতীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

অল ইণ্ডিয়া মুসলিম ভলান্টিয়ার্স কনফারেন্সে বাংলার এইচ. এস. সুরাবর্দী আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন : "separate electorate could create a nation while joint electorate could only mean disintegration and Hindu domination."

অর্থাৎ পৃথক নির্বাচন এক অভিন্ন মুসলিম জাতির সৃষ্টি করতে পারে, নতুবা হিন্দুপ্রাধান্যে মারামারি, বিশৃঙ্খলা। সুরাবর্দী ভবিষ্যদ্বক্তা। দিল্লীতে এমনি এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অল ইণ্ডিয়া মুসলিম ইয়ুথ কনফারেন্স (আমেদাবাদ, ৩রা জুন), সৌকৎ আলির সভাপতিত্বে অল বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্স (১৬ই মে) ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করল। অল বেঙ্গল ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম কনফারেন্স (ফরিদপুর ২৭এ জুন) অবশ্য বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর সপক্ষে দাঁড়ায়।

এওয়ার্ড ঘোষণার পর এই বহুস্বর বিচিত্রতর হয়ে একটা পরিণতির দিকে ছুটে চলল, গান্ধীজীর সামনে তখন হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন নেই, এই তুই সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের ভয়াবহ পরিণামের জন্য উদ্বেগ নেই, তাঁর বিস্ময়কর উদ্বেগ দেখা দিল Depressed class বা অনুন্নত সম্প্রদায় নিয়ে—তারা না হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট না হয়েও ঐ এওয়ার্ডকেই সবলে আঁকড়ে ধরলেন। গান্ধীজী বা কংগ্রেসের দিক থেকে কোন বাধা বা প্রতিরোধ না থাকায় মুসলমানদের পক্ষে ঐটিই শক্ত হাতিয়ার হয়ে উঠল।

১৯৩১ এর জুলাই-আগষ্ট-অক্টোবর-ডিসেম্বরেও অনেক মুসলিম সম্মেলন হয়েছিল: ৯ই জুলাই, এলাহাবাদে, নবাব মহম্মদ ইসমাইলের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স, ১১ই/১২ই জুলাই ঢাকায় সফৎ আমেদ খাঁনের সভাপতিত্বে অল বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্স, ১৮ই জুলাই ডঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে মীরাটে ইউ. পি. ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম কনফারেন্স, ৮ই আগষ্ট এলাহাবাদে জমিয়ৎ উল-উলেমা সম্মেলন, ঐদিনই এলাহাবাদে ইউ.পি. মুসলিম কনফারেন্স, ২৪এ অক্টোবর পাঞ্জাব ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম কনফারেন্স, ২৬এ ডিসেম্বর অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের ২২তম অধিবেশন নয়াদিল্লীতে।

মুসলিম লীগ তখনও জিন্নাজীর করায়ত্ত হয়নি; তখনও খান সাহেব শেখ মহম্মদ আবদুল্যার মুখে শোনা যাচ্ছে। "We claim as much Indians as any other community," আবার চৌধুরী জফরুল্লা খাঁনের মুখে শোনা যাচ্ছে—কারও শুভেচ্ছা বা সদুদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর না করে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়েছে আইনগত ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। তাই প্রস্তাব হল: যে সংবিধানে এই সব প্রতিশ্রুতি নেই তা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য হবেনা। সর্বভারতীয় মোসলেম কনফারেন্সে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ পেল। জোর দেওয়া হল পৃথক নির্বাচনের এবং সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও সংখ্যাল্পতা-ক্ষেত্রে চলতি ওয়েটেজের সুবিধে অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর। নিখিলবঙ্গ মোসলেম সম্মেলনেও বলা হল: "separate electorate a settled fact. তাছাড়া, জাতীয়তা আবার কি? What, after all, is nationalism? Where is Nationalism in India at present day?...It is a fiction of the coarsest texture and the gentlemen who pride themselves on the possession of this quality are hunting the shadow in the water." এঁদের প্রস্তাবও ছিল পৃথক নির্বাচন। এলাহাবাদে মৌলানা সৌকৎ আলিও কংগ্রেসের সমস্যা সমাধানে সংশয় প্রকাশ করলেন।

সুতরাং, মুসলিম মহলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের এওয়ার্ড যতটা না ভায়োলেণ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার চাইতে বেশী হয়েছিল গান্ধীজীর ও তাঁর মহলে। মুসলমানেরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোন বৈঠকই বর্জন করেন নি বরং সহযোগিতা করেছেন ; কিন্তু গান্ধীজী প্রথমটি বর্জন করেছেন, দ্বিতীয়টিতে উপস্থিত থেকেও অসমাপ্ত অবস্থায় চলে এসেছেন, তৃতীয়টির কথা তখনও ওঠে নি। অতএব বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তাঁরই সব চাইতে বেশী নির্বিকার থাকার কথা।

গান্ধীজীর মৃত্যুপণ অনশনের নোটীশ

তিনি স্যার স্যামুয়েল হোড়কে ১৯৩২এর ১১ই মার্চ যারবেদা জেল থেকে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি মৃত্যুপণ অনশন করবেন, (পৃথক নির্বাচনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক তিক্ততর হবে এই অশাঙ্কায় নয়) অনুন্নত শ্রেণীকে পৃথক নির্বাচন দেওয়া প্রস্তাব যদি প্রত্যাহৃত না হয়।

> "I hold that seperate electorate is harmful for them, and for Hinduism....So far as Hinduism is concerned, separate electorate would simply vivisect and disrupt it".

লক্ষ্য করার বিষয়, সমগ্র হিন্দুসমাজ বা সম্প্রদায় যেখানে গোটা কম্যুনাল এওয়ার্ডকেই জাতীয়স্বার্থ পরিপন্থী বলে নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন, সেখানে গান্ধীজী অনুন্নতশ্রেণীর মুখপাত্র থাকতেও, একান্তভাবে হিন্দু সমাজের একটি অংশের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের জন্য মরণপণ অনশনের কথা জানালেন :

> "I, therefore, respectfully inform His Majesty's Government that in the event of their decision creating separate electorate for the Depressed classes, I must fast unto death."

স্বভাবতঃই তামাম হিন্দুস্থানে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

মিঃ হোড় বলেছিলেন, তারিখটা হচ্ছে ১৩ই এপ্রিল, আপনি লর্ড লোথিয়ান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

গান্ধীজী মানলেন না ; তিনি ১৮ই আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকেও তাঁর মরণপণ অনশনের সিদ্ধান্ত জানালেন : "I have to resist your decision with my life. The only way I can do is by declaring a perpetual fast unto death from food of any kind save water with or without salt and soda."

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন : "আপনি অনশনে মৃত্যুবরণের চরম পথ নিচ্ছেন এজন্য নয় যে, অনুন্নত শ্রেণী অন্যান্য হিন্দুর সঙ্গে যৌথ নির্বাচনে সামিল থাক, কেননা, সে ব্যবস্থা তো রয়েছেই ; আপনি হিন্দুদের ঐক্যও চাইছেন না, কেননা, তাও রয়েছে। আপনি চেইছেন অনুন্নত শ্রেণী যেন নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে আইনসভায় নিজেদের কথা বলতে না পারে ; অথচ এই অনুন্নত শ্রেণী যে আজকে তাদের সীমাবদ্ধ আসন ক'টি পেতেও নিদারুণ অসুবিধে ভোগ করে তা আপনার কথায়ই স্বীকৃত। আমাদের দিক থেকে সঙ্গত ও সযত্ন প্রস্তাব সত্ত্বেও আপনি কেন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি নে।"

গান্ধীজী আবার লিখলেন ম্যাকডোনাল্ডকে ; ঐ একই কথা। সুতরাং ২০এ সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর অনশন শুরু হল। সরকার চাইলেন তাঁকে জেলের বাইরে আর কোথাও রাখতে। কিন্তু গান্ধীজী সর্তাধীনে বাইরে মুক্ত হতে রাজী নন। সুতরাং, জেলেই থাকলেন। গান্ধী-সহচরেরা অনেকেই অনশনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাতে রাজী হলেন না, কেননা, তাঁরটা ছিল ভগবানের নির্দেশে।

> "Because this is a fast I have taken, as I firmly believe at God's call."

কবিগুরুর উদ্বেগ

রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ৩য় খণ্ডের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ১৯এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে এই

সম্পর্কে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি গান্ধীজীর "সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন নাই—

> "It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity....

"গান্ধীজী যেদিন অনশন আরম্ভ করিলেন সেইদিন প্রাতে কবি মন্দিরে উপাসনা করিলেন। কবি বলেন, 'যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে, গভীরভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।"

ইতিমধ্যে, ১৯এ সেপ্টেম্বর থেকে এক নেতৃ-সম্মেলন হল এই সঙ্কট উত্তরণের উপায় নির্ধারণের জন্য। উপস্থিত হলেন সপ্রু, জয়াকর, মালব্য, রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম. সি. রাজা, বি. এস, মুঞ্জে, চিমনলাল শীতলবাদ, এম. আর. বালু, টি প্রকাশম, ডঃ আম্বেদকর, সোলোনকি, জি. কে. নটরাজন, এম এস আনে, জি. কে. দেবধর, এ ভিঠক্কর, স্যার গোবিন্দ, ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানী, স্বামী সত্যানন্দ, ডি পি খৈতান, শ্রীযুক্তা হংস মেহতা, শ্রীমতী অনুসূয়া বাঈ গোখলে, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, রাজা রাও, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং আরও কেউ কেউ।

স্বভাবতঃই চাপটা পড়েছিল বিলাতের প্রধানমন্ত্রী বা ভারত-সচিবের ওপর নয়, বড়লাটের ওপরও নয়. চাপ পড়েছিল অনুন্নত শ্রেণীর মুখ্য প্রবক্তা ডঃ আম্বেদকরের ওপর। তিনি বললেন, সাথীদের সঙ্গে আলোচনা না করে সহসা কোন কথা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর তিনি যে প্রস্তাব দিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে : বাংলাদেশে ২৫০টি আসনের মধ্যে ৫০টি অনুন্নত শ্রেণী পাবে ; আসন সংরক্ষিত রেখে যৌথ নির্বাচন হবে ; দশ বছর পর আসন সংরক্ষণ রেখে সরাসরি যৌথ নির্বাচন হবে ; আরও পনের বছর পর গণ-ভোট।

২১এ সেপ্টেম্বর জি. ডি. বিরলা প্রমুখ এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন।

ঐতিহাসিক চুক্তি নিষ্পন্ন

২৪এ সেপ্টেম্বর, অনশনের পঞ্চম দিন বেলা ৩টায় "ঐতিহাসিক চুক্তি" নিষ্পন্ন হল ; চুক্তিপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করলেন পণ্ডিত মালব্য, তারপর ডঃ আম্বেদকর।

এরপর নেতারা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক কেবলে জানালেন, আপনি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে অনুন্নত শ্রেণীকে দিয়েছিলেন ৭১, আমরা রাজী হলাম ১৪৮ টিতে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ১৮ শতাংশ তাঁদের হবে।

কিন্তু বিলেত থেকে অনুমোদন আসতে দেরী হচ্ছিল। রবীন্দ্র-জীবনীকার ঐ খণ্ডেরই ৪৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "কবি গান্ধীজি সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন ; পুনায় যাওয়া স্থির করিলেন।"···

কবির নিজের কথা উদ্ধৃত করেছেন জীবনীকার :

"আশা নৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ ষ্টেশনে পৌঁছলেম।···মোটর গাড়িতে চড়ে পুনা-পথে চললেম।···বিঠলভাই থাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল।··· মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসেনি। প্রধানমন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম। দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্র জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে।···

অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ গবর্নমেন্টের ছাপমারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন।····পড়া শেষ করে জানালেন, কাগজটা ডক্টর আম্বেদকরকে দেখানো দরকার।

"লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। মহাদেব দেশাই বললেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলাম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল।"

২৬এ সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল এসেম্বলিতে স্বরাষ্ট্র সচিব হেগ এবং

কাউন্সিল অব স্টেট-এ স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস ঘোষণা করলেন পুণা চুক্তি বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেছেন। বিপুল হর্ষধ্বনি হল।

এই অনশন থেকেই উদ্ভূত হল আরও দুটি জিনিস : একটি জি. ডি. বিরলার সভাপতিত্বে 'এন্টিআনটাচেবিলিটি লীগ', আর একটি সাম্প্রদায়িক সমাধান চেষ্টায় 'ঐক্য সম্মেলন'। এবং দ্বিতীয়টিই বেশ কিছুকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়া বর্ষণহীন গর্জানো মেঘের মত ভারাক্রান্ত করে রাখল!

সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচেষ্টা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ডঃ সৈয়দ মামুদের অনুরোধে মৌলানা সৌকৎ আলি একটা স্থায়ী মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য বড়লাটকে বললেন, গান্ধীজীকে ছেড়ে দিন। বড়লাট প্রথমে জানতে চাইলেন, আপনার পেছনে কি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন আছে? পরে বললেন, গান্ধীজী যতক্ষণ না আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেকে বিমুক্ত করছেন ততক্ষণ তাঁর মুক্তির কথা ওঠে না।

না উঠুক, সৌকৎ আলি আরও কাল চেষ্টা করলেন, তাঁকে সমর্থন করলেন বোম্বে কাউন্সিল মুসলিম পার্টি, খিলাফৎ কমিটি, আক্রাম খাঁ, লেবার ফেডারেসন, খালিকুজ্জুমানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জমিয়ৎ-উল-উলেমা, আসাম মুসলিম এসোসিয়েশন, চট্টগ্রামের মুসলমানগণ, সর্বদল মুসলিম সম্মেলন। কিন্তু বিরোধিতা করলেন এ. এইচ. গজনভীর নেতৃত্বে কলকাতার মুসলমানগণ, মাদ্রাজ মুসলিম সম্মেলন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী মুসলিম সম্মেলন এবং স্যার মহম্মদ ইকবাল, মৌঃ সফি আমেদ খান, স্যার জুলফিকার আলি খাঁন, ডঃ জিয়াউদ্দীন, স্যার মহম্মদ ইয়াকুব, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, এস. এম. পাদশা ও মহম্মদ মোয়াজ্জাম। বিবৃতিতে তারা বললেন : আমরা মনে করি, পৃথক ও যৌথ নির্বাচনের প্রশ্নটি পুনরুত্থাপণ করা অত্যন্ত অসঙ্গত হচ্ছে ; আমরা বর্তমানে এই রক্ষাকবচ ছাড়তে নারাজ।

পক্ষান্তরে হিন্দুদের সঙ্গে মীমাংসার জন্য সর্বদল মুসলিম সম্মেলন

১৬ই অক্টোবর যে কমিটি করলেন তাতে থাকলেন : মৌলানা সৌকৎ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, নবাবমহম্মদ ইসমাইল, রাজা নবাব আলি খাঁন, সালেমপুরের রাজা,শেখ আবদুল মজিদ সোহ্কি, সর্দার সুলেমান কাশিম মিঠা, মিঞা জাফর শা, মৌঃ জাফর আলি খান, চৌধুরী খালিকুজ্জুমান, হাফিজ হিদায়েৎ হোসেন, মৌঃ আক্রাম খাঁ, শেঠ ইয়াকুব হাসান, নবাব জাদা য়ুসুফ আলি।

মুসলিম লীগ বলল, ফলাফল দেখে সে মতামত দেবে। সেটা হল ২৩এ অক্টোবর।

এলাহাবাদে সম্মেলন ১৯৩২ এর ৩রা থেকে ১৭ই নবেম্বর অবধি চলল। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু মহাসভা, পাঞ্জাব রাষ্ট্রীয় হিন্দুসভা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, উদার নীতিক ও জাতীয়তা-বাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূস্বামী সংস্থা, অল-ইণ্ডিয়া খিলাফৎ কমিটি, অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম কনফারেন্স, অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম ন্যাশানালিষ্ট পার্টি, অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ, মোসলেম ইয়ুথ লীগ, জমিয়ৎ-উল-উলেমা হিন্দ, পাঞ্জাব অহ্‌র পার্টি. অল-ইণ্ডিয়া সিয়া কনফারেন্স এবং ভারতীয় খৃষ্টানদের মোট ১২১জন প্রতিনিধি; সম্প্রদায় হিসেবে ৬৩জন হিন্দু, ৩৯জন মুসলমান, ১১জন শিখ, ৮জন ভারতীয় খৃষ্টান।

একসময় মনে হয়েছিল, ঐক্যের সূর্যোদয় হল বুঝি। অনেক অনুকূল মত পাওয়া গেল; ঐক্য সম্মেলনে একটা চুক্তিও গৃহীত হল; চুক্তি মতো যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিনিধিত্বের হার হবে: মুসলমান ৩২ শতাংশ; শিখদের ৪$\frac{১}{২}$ শতাংশ; ভারতীয় খৃষ্টান ২ শতাংশ; য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ১টি আসন; অবশিষ্ট সাধারণ আসন। মুসলমানেরা এ যাবৎ যে ওয়েটেজ পেয়ে এসেছেন তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই হারে বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানেরা পাবেন ৫১ শতাংশ; বাংলায় আর সবাই মিলে ৪৪.৭ শতাংশ; পাঞ্জাবে শিখেরা ২০ শতাংশ, ভারতীয় খৃষ্টানেরা ৩টি আসন; য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান/ইউরোপীয়েরা ১টি আসন।

তারপর সবার অলক্ষ্যে মেঘের সঞ্চার হল এবং ভারত জন-

সমুদ্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কম্যুনাল এওয়ার্ডের ভীষণাকৃতি তরঙ্গ-চূড়াই সত্য হয়ে রইল। দিশেহারা জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ঐ তরঙ্গক্ষেত্রে অভিভূত হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি অকুল সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল, তারপর কোথাও একটা আশ্রয় মিলল—কিন্তু জাতীয়তাবাদের জাহাজটা তখন কোন্ দরিয়ায়?

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হল

বাংলার বিপ্লববাদ মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হতে চলেছে, সত্য, ১৯৩৪ নাগাদ এর এপিটাফ লিখব। তখনই ঘটেছিল পূর্ণগ্রাস। কিন্তু আজ এখনও ১৯৩২এর পাছদুয়ার আর ১৯৩৩এর সিংহদ্বার।

১৯৩২এর ২৭এ জুন মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেন নিহত হন। তিনি তখন ঢাকা-ওয়ারীতে সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. চ্যাটার্জির বাড়ি ঘুমোচ্ছিলেন। মশারী টাঙানো ছিল। মশারী তুলে কে মেরে গেছে। পরদিন একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে মনোরঞ্জন দত্ত নামে একটি ছেলে টেলিগ্রাফ অফিসে যায়ঃ "কামাখ্যার দেহে অস্ত্রোপচার ভালই হয়েছে। কোন উদ্বেগের কারণ নেই।" এই ছিল টেলিগ্রামের বয়ান আর এই পুলিশের সন্ধান-সূত্র। কালীপদ মুখার্জী বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২২এ আগষ্ট ইদিলপুরের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয় চরমুগরিয়া ডাকাতি সম্পর্কে।

সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৫৫—১৮ ভোটে বঙ্গীয় সংশোধনী ফৌজদারী আইনে হত্যা-প্রচেষ্টায়ও প্রাণদণ্ডের ধারা সংযোজিত হয়। কিন্তু বিপ্লবীদের এ ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। ২৫এ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ইউরোপীয়ান ক্লাবে সাহেবী আনন্দোল্লাসের মধ্যে বোমা ফেটে পড়ে। বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন গ্রাজুয়েট মেয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। নির্বীর্য কেরানী বৃত্তির আকাঙ্খা এঁর রক্তে সঞ্চারিত হতে পারেনি। বোমা নিক্ষেপের পর আর সব বিপ্লবী সরে পড়েন। প্রীতিলতা ধরা পড়ার অমর্যাদাকর

আশঙ্কায় বিষপান করেন। কিছুদূরে তাঁর দেহ পাওয়া যায়। সংশোধিত ফৌজদারির নববিধান এঁদের করবে কি?

বিপ্লবীরা আরও একবার ২৮ এ সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনের প্রাননাশের চেষ্টা করেছিল। সখের প্রান গড়ের মাঠে ওয়াটসন তাঁর সেক্রেটারী মিসেস আর. গ্রসকে নিয়ে মোটরে করে সান্ধ্য ভ্রমণ করেছিলেন; আরও একটি গাড়ী ছুটে এসে এই ভ্রাম্যমান গাড়ীর সমান্তরাল হল; দশ দশটা গুলীর আওয়াজ সান্ধ্য বাতাসকে ছিন্ন ভিন্ন করল। কিন্তু a cat has nine lives, গাড়ীর আরোহীরা আহত হলেন মাত্র। কিন্তু বিপ্লবীদের দু'জন প্রান দিলেন; "জনতা" পিছু তাড়া করেছিল; ওঁরা বিষপান করেছিলেন; তৃতীয় জন অপসৃত হতে পেরেছিলেন।

ওয়াটসনকে আক্রমণ করার মামলায় সুনীল চ্যাটার্জি, প্রমোদরঞ্জন বসু, অমর ঘোষের হল যথাক্রমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ১০ বছর ও ২০ বছর কারাদণ্ড। প্রাণকুমার দাস, অবণীভূষণ দত্ত, মনসাচরণ বক্সী খালাস হলেন। তবে সে কালে আদালতে খালাস পেলেই যে রাহুমুক্তি ঘটত তা একেবারেই নয়, গরম চাটু থেকে আগুনে পড়তে হত। মামলার জাল ভেদ করলেও বি-সি-এল-এর জালে বন্দী হতে হত এবং এর ব্যাতিক্রম নেই বললেই চলে।

এমনি এক জেলখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চার্লস লিউক স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে মোটরে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে পথে এসে পড়ল এক সাইকেল। পড়ল বাধা। তারপরই লিউকের মুখে লাগল এক গুলী। সত্য, এই সাহেবকে আমি দেখেছিলাম ঐ রাজসাহী জেলেই এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদেই। আমি সেখানে কারাদণ্ডিত বন্দী। নিরাময় হয়ে নির্ভয়ে এসেছেন স্বপদে, গালের নীচে গলার কাছাকাছি ক্ষতচিহ্ন। রুদ্ধ লোহার গরাজের ফাঁক দিয়ে মুখখানা দেখেছিলাম—মনটা দেখতে পাই নি। বাহাদুর বটে। ওঁর মনোবলকে প্রণাম করি।

১৯৩৩এর ১৬ই জানুয়ারী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার গিলোটিন

নেমে এল। দায়রা জজ ইয়র্ক মাত্র তিনজনকে অব্যাহতি দিয়ে দণ্ড দিলেন: মুজঃফর আমেদকে—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; ডাঙ্গে, স্প্র্যাট, ঘাটে, যোগলেকর, নিম্বকরকে—১২ বছর করে কারাদণ্ড; ব্রাডলে, মিরাজকর, উসমানিকে—১০ বছর করে; সোহন সিং যোশ, মজিদ, গোস্বামীকে—৭ বছর করে; অযোধ্যা প্রসাদ, অধিকারী, পি-সি. যোশী ও দেশাইকে-৫ বছর করে; চক্রবর্তী, বসাক, হাচিনসন, মিত্র, ঝাবওয়ালা, সায়গলকে—৪ বছর করে; সামস্থল হুদা, আলভে, কাসলে, গৌরীশঙ্কর, কদমকে—৩ বছর করে। খালাস পেলেন কিশোরীলাল ঘোষ, শিবনাথ ব্যানার্জি, বি. এন. মুখার্জি। ১৯২৮ এর মার্চে ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রায় লিখতে লেগেছে পাঁচ মাস। অভিযোগ ছিল—সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের। বিচারকাল—তিনবছর দশমাস। ছাপানো নথিপত্রের আয়তন ১০,০০০ পৃষ্ঠা; সাক্ষীর সংখ্যা ৬৩৭, নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছিল ৩,৩৬৪টি, এবং এক গবর্নমেণ্টেরই খরচ হয়েছিল ১৬ লক্ষ টাকা।

কি বলেছিলাম আমি, মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে? হ্যাঁ, সত্য, ১৯৩৩ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী সূর্য সেন ধরা পড়লেন, মাথার দাম ধরা হয়েছিল ১০,০০০ টাকা। কিন্তু অমূল্য-প্রাণ সূর্য সেন বিনা লড়াইয়ে ধরা দেননি, সংক্ষিপ্ত তীব্র লড়াইয়ের পর কারান্তরিত হয়ে গেলেন। তারপর ঠিক ছ'মাস পর—থাক্, ছ'মাস পরেই বলব সে কথা।

সুভাষচন্দ্র কোথায়?

আমি বোধ হয় তোমাকে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের একমাত্র প্রতিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী সুভাষচন্দ্রের কথা একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছি, না, সত্য? ইচ্ছে করে নয়, ঘটনাক্রমে। এখনও তোমায় বলতাম না যদি এমন একটা সময়ে এসে না পড়তাম যখন সুভাষচন্দ্রকে গভীর কৌশলে এদেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হল। তোমাকে বলেছি, ১৯৩০ এর আন্দোলনের আগেই সুভাষচন্দ্র কারান্তরিত হয়েছিলেন। এর

পর তাঁর জীবনে সাতদিন বা ছ'মাস কারাদণ্ড তুচ্ছ ঘটনা। যে-গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের মূলে গভীর ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করার অবকাশ আছে তা হচ্ছে, ১৯৩২ এর ১লা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে যোগ দিয়েছিলেন। অধিবেশনের পর বাংলায় ফেরবার উদ্যোগ করলেন। রওনাও হলেন। কিন্তু কল্যাণ স্টেশনে তাঁর জন্য প্রস্তুত ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন ৩। প্রথমে মধ্যপ্রদেশের শিউনি জেল; তারপর জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেল। স্বাস্থ্য ভাঙতে লাগল। নিয়ে যাওয়া হল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে। কিছুতেই কিছু নয়। লক্ষ্ণৌর বলরামপুর হাসপাতাল। ডাক্তার লেঃ কর্নেল বাকলের পরামর্শে সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাবার অনুমতি দিতে সরকার রাজী হলেন, মুক্তিপত্র দিলেন লয়েড ট্রিস্টাইন কোম্পানির ইটালিয়ান জাহাজ গ্যাঙ্গী যখন বোম্বাই বন্দর ছেড়ে সাগরে প্রবেশ করল। আপাতঃ লক্ষ্য ভিয়েনা। Adieu, adieu, my native land !···

৯ই মার্চ ফরাসী চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মঃ কুঁইর চোখের সামনে তিনজন বিপ্লবীর অগ্নিনালিকা গর্জে উঠল। গোঁদলপাড়ায় একদিন এসেছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট, সংগ্রামে আহত বিপ্লবীদের ধরে নিয়ে গেছল, সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে আঁতাত, আজ দ্বিতীয় চক্ষুর সামনেও আততায়ী। মঃ কুঁই হাসপাতালে গেলেন; সেখান থেকে মৃত্যুর কোলে। কুঁই গল্প শুনেছিলেন কোন্ একটা বাড়িতে তিনজন সশস্ত্র বাঙালী বিপ্লবী আশ্রয় নিয়ে আছেন; গেলেন খোঁজ নিতে; ওঁরাও খবর পেয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করলেন; কুঁই পেছন ছাড়েন না; একজন দাঁড়িয়ে গেলেন, গুলী করলেন, ধরা পড়লেন, আর দু'জন সঙ্গী ইত্যবসরে অদৃশ্য।

গান্ধীজীর আবার অনশন

এসব নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন, ভারতের একাংশেও কোন তোলপাড় হয়নি। তামাম হিন্দুস্থানে তোলপাড় হল গান্ধীজী যখন

যারবেদা জেল থেকে ১লা মে তারিখে ঘোষণা করলেন, তিনি ৮ই মে থেকে অনশন করবেন :

> "unless God or Devil, whoever possesses me, comes to the rescue and says you must not fast" ...

কিন্তু ভগবান বা শয়তান কেউই তাঁকে নিবৃত্ত করতে এলেন না। ৮ই মে ১২টা বেলা থেকে তিনি অনশন শুরু করলেন। হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য চাই মুক্তি।

৮ই মে-রই সন্ধ্যেবেলায় পেলেন মুক্তি। যারবেদা পাহাড়ের চূড়ায় ছিল লেডী থ্যাকারসের মারবেল প্যালেস, বিনয় করে নাম দেওয়া হয়েছিল 'পর্ণকুটির'; সমাদরে গান্ধীজীর স্থান হল সেখানেই, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর হাতে নিঙরানো জাফা-কমলার রস পান করে অনশন ভঙ্গ করলেন হরিজন বন্ধু গান্ধীজী।

আর আন্দামান বন্দীদের অনশন

কিন্তু আন্দামানের সেলুলার জেলে কোন শ্রীমতীর হস্ত বা জাফা-লেবুর এক ফোঁটা রসও প্রসারিত হয়নি; সেখানে সত্যি সত্যি মৃত্যু-প্রস্তুত: fast unto death, সরকারী ইস্তাহারমতো ২০ জন বন্দী ১২ই মে থেকে অনশন শুরু করেন পরে আরও অনেকে যোগ দেন; ১৭ই তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার মহাবীর সিং, প্রহরীদের জবরদস্তি আহার-চেষ্টার-আপ্রাণ প্রতিরোধে মৃত্যু বরণ করেন। তারপর আরও দু'জন, বাংলাদেশের মানকৃষ্ণ দাস আর মোহিত মোহন মৈত্র। ইংরেজ প্রচারকেরা মিথ্যারসনায় ঘোষণা করেছিল নিউমোনিয়া। সেদিন এঁদের জন্য অশ্রুপাতের বিশেষ কেউ ছিল না; অশ্রুজলহীন বাংলাদেশের সংবাদপত্রও গান্ধীজীর আমরণ অনশনে অত্যধিক কাতর।

গান্ধীজী ৮ই মে তারিখেই এক মাসের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও ভি. জে. প্যাটেল ইউরোপ থেকে রয়টার মারফৎ এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন : The latest action of Mahatma Gandhi

in suspending Civil Disobedience is a confession of failure. We are clearly of opinion that Mahatma Gandhi as a political leader has failed.

মানলাম। কিন্তু সেদিন ঘরে-বাইরে কোথাও তো একটা বিকল্প নেতৃত্বের দেখা পাইনি যা এই হতমান দেশকে সাফল্য গৌরবে নিয়ে যাবার আশা দিতে পারে? মৃতকে মৃত বলে স্বীকারে লজ্জা নেই, লজ্জা মৃতকে অ-মৃত বলে ঘোষণা করায় অথবা মৃতদেহ থেকে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে দাবী করায়, গুরুবাদী আশ্রমবাসীদের এ জাতীয় ঝোঁক আছে। এক্ষেত্রে, আইন অমান্য আন্দোলনের আয়ু যেখানে ফুরিয়ে গেছে, সেখানে ওকে স্থগিত রাখার নামে জীইয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে নেতৃত্বকেই সঞ্জীবিত রাখার কৌশল। লজ্জা এখানেও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' নাটকের 'বুড়ো মরেছে কি মরেনি'র বিতর্কের মতো আন্দোলন 'চলছে ও চলবে' কিনা স্থির করার জন্য পুণায় কংগ্রেসসেবীদের এক সভা বা বৈঠক হল ১৯৩৩ এর ১২ই জুলাই। এম. এস. আনে ছিলেন সভাপতি। গান্ধীজী সবাইকে 'খলুমখোল্লা' বলতে বললেন তাঁদের অভিমত। তাঁরা কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আন্দোলনের নিঃসর্ত প্রত্যাহারের পক্ষপাতী? অথবা স্থগিত রাখার? অথবা সীমাবদ্ধ আন্দোলন?

তিনদিন ধরে চলল বৈঠক: ১২ই, ১৩ই, ১৪ই। যাঁরা আন্দোলনের নিঃসর্ত প্রত্যাহারের পক্ষপাতী ছিলেন (পুরুষোত্তম ত্রিকমদাস, হরিসর্বথামা রাও, আলি বাহাদুর খাঁ, যমুনাদাস দ্বারকাদাস, সত্যমূর্তি প্রমুখ) তাঁরা বললেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, গান্ধীজীর আদর্শ জনসাধারণের পক্ষে অবাস্তব বা অপ্রযোজ্য, গান্ধীজীর নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে, কংগ্রেস পুঁজিপতিদের হাতে খেলেছে, তারা কংগ্রেসকে সমর্থনের নামে নিজেদের পকেট-পূর্তি করেছে।

শার্দুল সিং কবিশের, আচার্য কৃপালনী প্রমুখেরা ছিলেন প্রত্যাহারের বিপক্ষে, আসফ আলি সীমাবদ্ধ বা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহেরও বিরুদ্ধে।

গান্ধীজী বললেন, পুণা-চুক্তি তিনি জীবন দিয়েও রক্ষা করবেন। কারাগারে হরিজন উন্নয়ন এই প্রতিজ্ঞারই জের। লোকে তাঁকে এখনও ভালবাসে, সুতরাং, তাদের একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা ঠিক হবে না। তিনি নিঃসর্ত প্রত্যাহারের বিপক্ষে, কেননা, তা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। স্থির হল সীমাবদ্ধ বা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ।

আর, গান্ধীজী বড়লাটকে চিঠি দেবেন। কি চিঠি? সে অধিকার তাঁকেই দেওয়া হল।

বড়লাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী গান্ধীজী

গান্ধীজী ১৭ই জুন আরও ছ'সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য স্থগিত রেখেছিলেন, ঐ অবস্থায়ই তিনি একমাস পর ১৭ই জুলাই 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন :

> Will His Excxllency grant me an interview with a view to exploring the possibilities of peace? Kindly wire."

একদা ১৯৩০এর যে-আন্দোলন ছিল ভয়াল উত্তাল, ১৯৩২এ তারই স্তিমিত তলানির দিকে চেয়ে বড়লাট বললেন—'না'।*
গান্ধীজী তাঁর অপমান গায়ে-না-মাখার রীত্যনুসারে আবার টেলিগ্রাম করলেন, দুঃখ করে বললেন, একটা ঘরোয়া বৈঠকের অননুমোদিত কার্যবিবরণীর প্রচার যে আপনাদের সরকারী স্বীকৃতি পাবে এবং তারই ভিত্তিতে আমার সাক্ষাৎ-প্রার্থনা নামঞ্জুর হবে, তা কিন্তু আশা করিনি। সাক্ষাৎ-প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হত, আমি দেখাতে পারতাম, বৈঠকের মোদ্দা কথা ছিল সম্মানজনক শান্তিচেষ্টা।

এর পর কিছু একটা করা গান্ধীজীর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল : প্রশ্নও উঠেছিল, হরিজন ছেড়ে আবার তিনি রাজনীতিতে লাগলেন কেন? জবাবে বলেছিলেন, অনেকে মনে

---

* দণ্ডিতের সংখ্যা হ্রাস : জানুয়ারী ১৪,৮০৩; ফেব্রুয়ারী ১৭,৮১৮; মার্চ ৬,৯০০; এপ্রিল ৫,২৫৪; মে ৩,৮১৮; জুন ৩,৫৩১; জুলাই ৩,৫৯৫; আগষ্ট ৩,৩৪৭; সেপ্টেম্বর ২,৭৯১; অক্টোবর ১,১৩৭; নবেম্বর ১,৮৯৮; ডিসেম্বর ১,৫৪৫।

করেছিলেন যে, আমি সর্বক্ষণের জন্য হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করব। তাঁরা আমাকে বোঝেন না। প্রথমত আমার কর্মজীবন এমন কাঠিন্যে ভাগ ভাগ করা নয়, এ এক অখণ্ড সত্তা, আমি আমার সারাজীবনের কাজ পরিহার করতে পারি নে। সে কাজ হরিজনের কাজের চাইতে কিছু কম প্রিয় নয়। আর ২৪ ঘণ্টাই তো হরিজনের কাজ করা যায় না। তা অসম্ভব।

আশ্রম ভেঙে দেব

২৬এ জুলাই আমেদাবাদ থেকে গান্ধীজী পুণায় বোম্বাই গবর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীকে এক পত্রযোগে আশ্রম ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত জানান। আর. এম. ম্যাক্সওয়েল প্রাপ্তি স্বীকার করলেন। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, গ্রামে গ্রামে পাদপরিক্রমা করে নির্ভীকতার বাণী প্রচার করবেন। আইন অমান্যেরই রকমফের।

কথা রটেছিল যে, তিনি অর্থাভাবে অথবা হতাশায় আশ্রম ভেঙে দিচ্ছেন। গান্ধীজী বলেছিলেন, এ বিদ্বেষপ্রসূত ও ভিত্তিহীন কথা। তিনি গুজরাটবাসীদের উদ্দেশে আবেদন জানালেন, ৩০এ জুলাই ৩৩জন সাথী নিয়ে রাস যাবেন ঐ (নির্ভীকতার) বাণী প্রচার করতে।

১লা আগষ্ট গান্ধীজী এমার্জেন্সী পাওয়ার্স য়্যাক্টের তিন ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে সবরমতী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা আগষ্ট এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হল। গান্ধীজী সর্ত অমান্য করলেন। তাই নিষিদ্ধ এলাকায়ই আবার তাঁকে গল্‌ফ মাঠে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলাকালে তাঁকে প্রশ্ন করা হল :

বয়স কত ? চৌষট্টি।

পেশা ?—কাটুনী, তাঁতি, চাষী।

বাড়ি ?—এখন যারবেদা জেল।

নচেৎ ?—আমেদাবাদ জেলায় সবরমতী।

আবারও গান্ধীজীর অনশন

জেলে দিন বারো কাটতে না কাটতেই গান্ধীজী আবার হরিজন-সেবার নামে অনশন শুরু করলেন : "my life ceases to interest me, if I cannot do Harijan's work."

বিব্রত সরকার এক ইস্তাহারে জানালেন, হরিজনের কাজে তিনি কোন সুযোগটা পাচ্ছেন না ? দরকার মতো সংবাদপত্র-সাময়িকী সবই পাচ্ছেন, দৈনিক অন্ততঃ দু'জনের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন, 'হরিজন' সম্পাদনার কাজে সপ্তাহে তিনদিন নির্দেশ ও লেখা দিতে পারছেন। কয়েকখানি চিঠিও লিখতে পারেন। তাঁকে একজন কয়েদী-টাইপিস্ট, বই ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এতেও যদি না হয় তবে তিনি আইন অমান্য প্রত্যাহার করে মুক্ত হলেই পারেন।

> "But if Mr Gandhi now feels that life ceases to interest him if he may not do Harijan service without let or hindrance, the Government are prepered, provided Mr. Gandhi is willing to abandon all civil disobedience activities and incitements, to set him at liberty atonce so that he can devote himself wholly and without restriction to the cause of social reform."

ভারত-সরকার খুব বাহাদুরির সঙ্গে আমাদের দেশের অন্যতম "tallest man" কে একথা বললেন বটে, কিন্তু অপঘাত মৃত্যুর দায় এড়াতে ছেড়ে দিলেন গান্ধীজীকে। প্রথমে য়্যাম্বুলেন্সযোগে স্যাস্যুন হাসপাতালে, পরে উন্মুক্ত আকাশ তলে।

২৩এ সেপ্টেম্বর কারামুক্তির পর আবারও গান্ধীজী লেডী থ্যাকারসের পর্ণকুটিরে গেছিলেন য়্যাম্বুলেন্সযোগে। তারপর সবরমতী আশ্রমকে সম্প্রদান করলেন জি. ডি. বিরলার হাতে ৩০এ সেপ্টেম্বর।

আগ্রাসী আইন অমান্য আর নয়

সরকারী উদারতায় গান্ধীজীর নিঃসন্দেহে কিছু হৃদয়ের পরিবর্তন হল। তিনি নিঃসর্ত মুক্তিলাভের দিন কুড়ি পর ১৫ই সেপ্টেম্বর

ঘোষণা করলেন, কঠিন প্রার্থনা ও ভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঐ কারা মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগ্রাসী আইন অমান্য করে আর কারাবরণ করব না।

বাংলার বিপ্লবীদের "আগ্রাসী সত্যাগ্রহ" ও মৃত্যুবরণেরও অবশ্য মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু সমাপ্তি ঘোষণা হয়নি।

সূর্যসেনের গ্রেপ্তারের তিনমাস পর ১৯এ মে আর একটি খণ্ড যুদ্ধে বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাস ও পূর্ণ তালুকদার নিহত হলেন; বন্দী হলেন কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, সুধীন্দ্র দাস ও প্রসন্ন তালুকদার।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে চিত্রা সিনেমার বিপরীত দিকে এক বাড়িতেও এক যুদ্ধ হল। ড্যালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় ২০ বছর কারাদণ্ডিত দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে-ছিলেন; চন্দননগর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট নলিনী দাসও ছিলেন আত্ম-গোপন করে। আর মুক্ত রাজবন্দী জগদানন্দ মুখার্জী। "আগ্রাসী" পুলিশের সঙ্গে হল সশস্ত্র সজ্ঘর্ষ; পুলিশ ইন্সপেক্টর মুকুন্দ ভট্টাচার্যের গায়ে লাগে গুলি। তারপর বিপ্লবীর অনিবার্য পরিণতি; ধরা পড়লেন। ২২এ মে।

৭ই আগষ্ট শুরু হল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা; বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ব্রহ্মের ৩৮ জন যুবক। আলিপুরে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল।

৩১এ আগষ্ট পুলিশ আদালতের অদূরে এক বাড়িতে পাওয়া গেল বড় এক ট্রাঙ্ক ভরতি ডিনামাইট ষ্টিক আর এক কানাস্তারা বিষবাষ্পের বোমা।

চারদিকে এই ব্যর্থতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও ম্রিয়মান বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই আবার উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন যখন শুনলেন, মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বি. ই. জি. বার্জ বিপ্লবীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের কথাই সত্য হল। ১৯৩৩এ ১২ই জানুয়ারী

প্রদ্যোতের ফাঁসীমঞ্চে আরোহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ প্রশ্ন করেছিলেন : "Are you ready Prodyot ?"

> "One minute, please, Mr. Burge. We are determined, Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapore. Yours is the next turn, get yourself ready. I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all housees of Bengal. Do your work, please."

অকস্মাৎ কণ্ঠ কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে তুলে অপ্রতিরোধ্য আবেগে বলে উঠলেন, সত্য, স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত এই সব প্রাণ ক্রিমিনাল ?

আরক্ত মুখমণ্ডল হঠাৎ মুমূর্ষুর মতো মনে হল ; কণ্ঠ একেবারে খাদে নামিয়ে ধরা গলায় বললেন, বিদেশী সরকারের গলায় গলা মিলিয়ে আমরাও তাই তো বলেছি।

সামলে নিয়ে বললেন, যাক্, গল্পটা শেষ করি ; আজ এসব গল্প ছাড়া আর কি ?

কিম্বদন্তী আছে, বার্জ ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ পৌরুষে বাঙালী বিপ্লবীদের নগণ্য জ্ঞান করে বিচরণ করতেন। বিপ্লবীরাও দিনের বেলায়ই দেখা দিলেন। সরকারী রক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই পাকা ছিল। বার্জ এসেছিলেন মাঠে টাউন ক্লাব বনাম মহামেডান টিমের ফুটবল খেলা দেখতে ; সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সাহেব জোন্স, সিভিল সার্জেন লিণ্টন। মাঠের খেলা সবে শুরু হবে, এমন সময় শুরু হল প্রাণ দেয়া-নেয়ার আর এক খেলা। মঞ্চের ফোকাসে পড়েছে একদিকে বার্জ-জোন্স-লিণ্টন, আর এক দিকে তিনটি বাঙালী যুবক ; বার্জের গায়ে ছ'টা গুলিই লাগল, বেঁচে ওঠবার কোন অবকাশই আর রাখেননি ওঁরা, বার্জের আর্দালির গুলিতে বিপ্লবীদের একজন নিষ্প্রাণ দেহে ধরাশায়ী বার্জের ওপরই পড়লেন, আর একজন আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, তৃতীয়জন ধরা পড়লেন।

চট্টগ্রামে চলেছে চিরুনি আচড়ানো "পলাতক" বিপ্লবীদের খোঁজ, হিন্দুমাত্রেই চাই পরিচয়-পত্র। তল্লাসী এখানে ওখানে সারা বাংলা দেশেই। পাওয়া গেল। কলকাতা ডায়োসেসান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রী জ্যোতিকণা দত্তের কারাদণ্ড হল চার বছরের; তাঁর কাছে পাওয়া গেল দুটো রিভলভার, দুটো পিস্তল, ৫৩টি কার্তুজ।

আবারও একটা ব্যর্থ রক্তাক্ত চেষ্টা হল উত্তর বাংলার হিলি স্টেশনে। দার্জিলিং মেল হিলি-বালুরঘাটের ডাক দিয়ে যেতেই তা লুট হয়ে গেল; ডাকপিয়ন কালীচরণ মাহালীকে প্রাণ দিতে হল, আহত হল কিছু যাত্রী ও কুলী। গ্রামবাসীরা ওঁদের পেছন ছাড়ল না। ঘেরাও হয়ে ধরা পড়ে গেলেন অনেকেই; তাঁদের সঙ্গে পাওয়া গেল একটি দু'নলা, একটি একনলা বন্দুক, ছ'ঘরা ওয়েবলি রিভলভার, অটোমেটিক পিস্তল, ৬৮টি কার্তুজ, তিনটি ছোরা, একটি টর্চ, ১,১০০ টাকার নোট, ২২,০০০ টাকার ইন্সিওর পার্শেল ইত্যাদি।

তোমায় যে ডিনামাইট স্টিক পাবার কথা বলেছিলাম তার জন্য যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ২১এ নবেম্বর হল সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড; তাঁর কাছে পাওয়া গেছল ১৭৭টি ডিনামাইট, ৩২টি জেলাটিন, ১৮৮টি ডিটোনেটর, তিন কয়েল সেফটি ফিউজ ও বহু কার্তুজ। ২৪এ নবেম্বর বারাণসীর এক বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ বিহারের সীতানাথ দে, কেশপ্রসাদ শর্মা, বাংলার কেশব চক্রবর্তী, বারাণসীর প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, অমৃতসরের স্বামী কর্মদেবজীকে গ্রেপ্তার করল। ২রা ডিসেম্বর কলকাতায় আরও তল্লাসী হল, আর ১৩ই ডিসেম্বর, তিন বছর ধরে, যে পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল তার অবসান হল; অমুক সিং পেলেন প্রাণদণ্ড।

বহ্নি ক্ষীয়মাণ

অহিংস আইন অমান্যের বিরতি চলছে; তারই নিঃশেষ মুখে "সহিংস" আইন অমান্যের বিস্ফোরণে ১৯৩৪-এর দ্বারোদ্ঘাটন হল।

সেই অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামেই। ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন ইউরোপীয়ানেরা, এমন সময় চারটি হিন্দু যুবক বোমা নিক্ষেপ করলেন; পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এম. এফ. ক্লিয়ারি সামান্য আহত হলেন; ক্ষতি হল বিপ্লবীদলেরই; একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন, দু'জন মারাত্মক রকমে আহত হলেন, একজন ধরা পড়লেন। নিক্ষিপ্ত তিনটি বোমার দুটিই ফাটেনি। অথচ তাদের কাছে পাওয়া গেল সাতটি তাজা বোমা ও একটি রিভলভার। একজন ছিলেন অস্ত্রাগার দখলের সন্দেহভাজন।

সারা চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের খোঁজে চিরুনি আঁচড়ানোর কথা তোমায় বলেছি, তিন-ম্যাজিস্ট্রেট-মারা মেদিনীপুরে মিলিটারী রুট-মার্চের কথাটাও বলি, শোনো। না, বিস্তারিত কিছু নয়, এই আতিশয্য এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কলকাতার অবিপ্লবী নাগরিকেরা এলবার্ট হলে ১৯৩৪এর ১৭ই জানুয়ারী এক প্রতিবাদ সভা করতে বাধ্য হলেন; সভাপতিত্ব করলেন এ. কে. ফজলুল হক। বৃটিশ অনুগত সেনারা গ্রামবাসীদের ইউনিয়ান জ্যাক সেলামে বাধ্য করেছে, গ্রামবাসীদের বেত মেরেছে, সম্পত্তি নাশ করেছে।

টেরারিজম্! টেরারিজম্ আর কাকে বল, সত্য? সে কথার জবাব দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু পরদিনই ১৮ই জানুয়ারী।

> "Action of a few terrorists in Bengal had given the Government an excuse to crush every single activity in the province."

তিনি কলকাতার ছাত্রদের উদ্দেশে এক বক্তৃতার মধ্যে এত বড় একটা কথা বললেন। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের এই এক রীতি। অনর্গল বক্তৃতা দেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে। পাঞ্জাব নয়, যুক্ত-প্রদেশ নয়, আসাম নয়, মাদ্রাজ নয়, মারাঠাও নয়, বাংলাদেশের হাঁ, বাংলাদেশেরই গুটি কয়েক সন্ত্রাসবাদীর ক্রিয়াকলাপ প্রদেশের প্রত্যেকটি কাজ ধ্বংস করার অছিলা তুলে দিচ্ছে গবর্নমেণ্টের হাতে। এখানে, এই প্রদেশেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গবর্নমেণ্ট চটেন নি, তা কোন অছিলায় ধ্বংসও করতে চান নি।

১৯৩০এ আইন অমান্য আন্দোলনে গবর্নমেন্ট চটেন নি, কাঁথির লবণ সত্যাগ্রহ কোন অছিলায় ধ্বংসও করতে চান নি, সবই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হত এবং স্বরাজও আসত হাতের মোয়ার মত। শুধু বাদ সেধেছে ঐ গুটিকয়েক সন্ত্রাসবাদী ; ওরা ১৯০৫-৮এর সন্ত্রাসবাদী বাংলার উত্তরাধিকারী, আর ওরাই গবর্নমেন্টের হাতে অছিলা জুগিয়ে জুগিয়ে জহওরলাল প্রমুখের বৈধ, নির্বিঘ্ন, শান্ত-আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

কিন্তু তাঁরা যে বারবার বাংলার বিপ্লববাদ ধ্বংসের জন্য গবর্নমেন্টের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক বিচার করবে কে?

৩১এ জানুয়ারী New Anti-Terrorist Bill আনা হল বাংলাদেশের জন্য। বাংলা তথা ভারত তথা বৃটিশ সরকার বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে—চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুরে—পুলিশ মিলিটারী লেলিয়ে দিয়ে ত্রিশের বঙ্গ যুবসমাজকে বিনাবিচারে বন্দীশালায় আটক রেখে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে, হিন্দু যুবকদের পরিচয়পত্র রাখতে বাধ্য করে, দার্জিলিংকে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ করে, স্কুল কলেজ পথে ঘাটে অঢেল টাকার গুপ্তচর এজেন্ট প্রভোকেটর ছড়িয়ে দিয়ে, মেরে, কারাদণ্ড দিয়ে ফাঁসীতে ঝুলিয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। হত্যা প্রচেষ্টার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানসহ অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স, আইনের পর আইন, হুকুমের পর হুকুম বলবৎ ও জারী করেও তৃপ্ত হয়নি—

একটু গলা নামিয়ে বললেন, আমরাও, অহিংসবাদীরাও হইনি, তাই বাংলা সরকার আরও একটা পালক গুঁজে নিলেন তাঁদের টুপিতে—Anti-Terrorist Bill. তুমি কি জান, সত্য, যে-হাণ্টকে মহাসমারোহে কলকাতার কংগ্রেসী পৌরসভা তেনজিং-হিলারীর এভারেষ্ট চূড়ায় আরোহণ পরিচালনার জন্য সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, সেই হাণ্ট নোয়াখালী চাঁটগায় বিপ্লবীদের শিকার করে বেড়িয়েছে? কে খোঁজ রেখেছে, একটি নয়, দুটি নয়, এমন আরও হাণ্টের?

বিস্মিত হয়ো না যদি শোনো তারাও কোন-না-কোন উপলক্ষে সম্বর্ধিত হয়েছেন। কেননা, এদের হান্টিংয়ের ফলেই বাংলার বিপ্লববাদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সম্বর্ধনাকালে কারও মনে এতটুকু প্রশ্নও জাগেনি। Public memory is proverbially short—তাই বলে এত সর্ট?

১০ই ফেব্রুয়ারী বার্জ হত্যা-মামলার রায় বেরোলো। একজন নয়, তিনজনের ফাঁসীর হুকুম হল; একের বদলে তিন—নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল কামাখ্যা ঘোষ, নন্দলাল সিং, সনাতন রায়, সুকুমার সেনের; মনীন্দ্র চৌধুরী, পুর্ণানন্দ সান্যাল, বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, সরোজদাস কানুনগো ছাড়া পেলেন।

২৭এ ফেব্রুয়ারী হিলি ডাকাতি মামলার রায় বেরোলো: প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী; সরোজ কুমার বসু, হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের হল মৃত্যুদণ্ড। আপীলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। এখানেও দেখ, একজনের জন্য চারজন—এমনি প্রতিহিংসাত্মক বিচার চলেছে তখন। ঐ মামলায় আর যাঁদের দণ্ড হল তাঁরা হলেন: আবদুল কাদের, প্রফুল্ল সান্যাল, কিরণ দে—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; কালীপদ সরকার, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, হরিপদ বসু ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড। তিনজন রাজসাক্ষী হয়েছিল, তাদেরও দণ্ড হয়েছিল পাঁচ বছর, সাত বছর করে।

একটু থামলেন, বাঁ দিককার ছোট জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন, দুটো কাক ঝুটোপুটি করতে করতে মাটিতে পড়েছিল, সেখানেও ওদের পাখার ঝাপ্‌টায় উঠেছিল ধুলো, মুহূর্তেই ছাড়াছাড়ি হল, দুটো উড়ে গেল।

একটা অল ফলস ডে

দৃষ্টি ফেরালেন, বললেন, কাক নাকি কাকের মাংস খায় না। বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। তারপর মাথা নামিয়ে হাতের কাগজটা খেয়াল হতেই একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতেই বললেন, তোমরা All Fools' Day কাকে বল?

আমি বললাম, ১লা এপ্রিল।

বললেন, হ্যাঁ, ১৯৩৪এর ঐদিনে কংগ্রেস নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল; কেউ এপ্রিল ফুল হন নি। সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে কি কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল তুমি অনুমান কর, সত্য?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, অনুমান করা শক্ত। সেদিন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, অল ইণ্ডিয়া স্বরাজ্য পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

পরদিন, ২রা এপ্রিল, গান্ধীজী ঘোষণা করলেন: "introspection prompted by the conversations with the Ashram inmates···আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আলোচনাকালে আমার অন্তর্দর্শনে এই বাণী পেয়েছি যে, বিশেষ বিশেষ অভিযোগের ক্ষেত্র থেকে আলাদা স্বরাজের জন্য সকল কংগ্রেসসেবীকে আইন অমান্যে বিরতি দেবার পরামর্শ দিতে হবে। ওটি আমার ওপরই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার জীবদ্দশায় কেবল আমার নির্দেশেই অপরে তা আরম্ভ করতে পারবে; তবে যদি এমন কেউ আর্বিভূত হন যিনি আমার চাইতে এই বিজ্ঞানটি আরও ভাল জানেন বলে দাবী করতে পারেন, তবে সে-কথা আলাদা। বহু লোকের আইন অমান্য ফলতঃ চমৎকার হলেও সন্ত্রাসবাদী অথবা শাসকশ্রেণীর হৃদয় স্পর্শ করে নি।

গান্ধীজী এখানে disobedience না বলে resistance বলেছেন এবং সচরাচর গান্ধীজী যে বিনম্র মিষ্টি ভাষায় লিখে থাকেন তা থেকে এর বয়ান ও সুর আলাদা; খানিকটা যেন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিজ্ঞানটি এক তাঁরই জানা আছে এবং আর কেউ এই জ্ঞান নিয়ে এখনও জন্মায়নি, সুতরাং, তাঁর জীবদ্দশায় ওটা তাঁরই পেটেন্ট, কেউ করতে চায় তো তাঁর নির্দেশে করতে হবে। আর এর যে উদ্দেশ্য ছিল তার দুটো ব্যর্থ হয়েছে এবং দুটি একই বন্ধনীগত—সন্ত্রাসবাদী আর শাসকশ্রেণী, ওরাই স্বরাজের

প্রতিবন্ধক, আইন অমান্য বিশাল হয়েছে, কিন্তু ওদের হৃদয় স্পর্শ করেনি ; প্রতিবন্ধক দূর হয় নি।

কিন্তু যাঁরা সন্ত্রাসবাদী নন, শাসক শ্রেণীভুক্ত নন, এমন কি আইন অমান্য করার নির্দেশ প্রার্থীও নন, তাঁরা দুজন ডাক্তারের নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্রিয়াকলাপের বিকল্প হিসেবে স্বরাজ্য পার্টির পুনরুজ্জীবনে মিলিত হয়েছিলেন। সে সম্মেলনে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ আলম, আর. কে. সিদ্ধ, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, সত্যমূর্তি, কে. এম. মুন্সী, কে. এফ. নারীমান, জি. ভি. সুব্বা রাও, মোহনলাল সকসেনা, দীক্ষিত এবং আরও ২৯ জন।

কেবল তো স্বরাজ্য পার্টির পুনরুজ্জীবন নয়, মুমূর্ষু কংগ্রেসের মধ্যে প্রাণক্রিয়া সঞ্চারের এই বিধান গান্ধীজীর কাছে দুই ডাক্তার ও ভুলাভাই দেশাই নিবেদন করলেন, গান্ধীজী আশীর্বাদ করলেন।

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে শাসক শ্রেণীর হৃদয় পরিবর্তন না হলেও তাঁরা ১৬ই এপ্রিল জানালেন, গান্ধীজীর আইন অমান্য প্রত্যাহারের নতুন নীতি সমর্থনের জন্য যদি এ. আই. সি. সি.র অধিবেশন বসে তাঁরা আপত্তি করবেন না।

কিন্তু তার আগে স্বরাজীদেরই এক সম্মেলন হল—রাঁচীতে। উদ্দেশ্য—দিল্লীতে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা এই ১০০ কংগ্রেসসেবীর সম্মেলনে পাকাপাকি করে নেওয়া। চৌধুরী খালিকুজ্জমান প্রস্তাবটি তুললেন স্বরাজ্য পার্টি পুনরুজ্জীবনের, এসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার।

মূল স্বরাজ্য পার্টির to mend or end the Constitution-এরই রকমফের, বড়লাটের প্রেরোগেটিভ ও সার্টিফাই করে বাতিল আইনকে সচল করার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা যথেষ্ট থাকা সত্বেও। সুজনেরও ছলের অভাব হয় না। এ ছাড়া কাজই বা কি ছিল ? তাই আমরাও সেই পুরোনো নো-চেঞ্জারদের মতই চরকা খদ্দরের, গুড় আর ঢেঁকির চালে, গ্রামের কাদামাটীতে চলে গেলাম, ওঁরা দিল্লীর হল প্রকম্পিত করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

পাটনায় ১৮ই ও ১৯এ মে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি.র অধিবেশন দিল্লীর পথ প্রশস্ততর করে দিল। ডাঃ আন্সরী প্রস্তাব করলেন গান্ধীজী আইন অমান্য প্রত্যাহারের যে সুপারিশ করেছেন তা গৃহীত হোক ; ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সমর্থন করলেন।

৬ই জুন কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। ১৭ই জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল ; তাতে এই প্রকাশ পেল যে, কংগ্রেস এটি গ্রহণও করছে না, বর্জনও করছে না।

> "The Congress claims to represent equally all the communities composing the Indian nation and, therefore, in view of the divirsion of opinion, can neither accept nor reject the Communal Aword as long as the division lasts."

এই বিশ্বজগতে আর কোথাও এই ত্রিশঙ্কু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই এবং এর বিষময় ফল ফলতেও দেরী হয়নি।

সমাজবাদের কথা নয়

কিন্তু ১৮ই জুন ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পার্টি-প্রকৃতিটি ১৯৩০এর হোমোজিনিয়াস ক্যাবিনেটের চাইতেও স্ফুটতর হল। কংগ্রেসে অপোজিসান থাকে থাকুক, ক্যাবিনেটে থাকবে না এই ছিল এ যাবৎ কথা ; কিন্তু এবার তার চাইতেও বড়, কংগ্রেসে শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত ও বিনা ক্ষতি-পূরণে সম্পত্তি দখল জাতীয় কথার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। এর ডায়েলেকটিকাল পরিণত আমাদের পেছনে-ফেলে-আসা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নয় অথবা বোম্বাইয়ের রেড ফ্ল্যাগের বিক্ষোভও নয়, এগুলো হয়তো দূরবর্তী বা পরোক্ষ কারণ, নিকটতম ও প্রত্যক্ষ কারণ কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই সোস্যালিষ্ট ভাবধারার বিস্তার, কংগ্রেসে সোস্যালিষ্ট গোষ্টির আবির্ভাব। কংগ্রেসের মূল প্রবলতর

প্রকৃতিকে না বুঝে ঐ গোষ্ঠির প্রত্যয় ছিল একদিন কংগ্রেসে সমাজবাদী ভাবধারা সঞ্চারিত হবে এবং তারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে। অতিমাত্রায় সচেতন অ-সোস্যালিষ্ট নেতৃত্ব উঠতি ভাব-বাদীদের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেই প্রস্তাব নিলেন:

> "Whilst the Working Committee welcomes the formation of groups representing different schools of thought, it is necessary, in view of *loose talk about oonfiscation of private property and necessity of class war*, to remind Congressmen that the Karachi resolution, as finally settled, by A. I. C. C. at Bombay in August 1931, which lays down certain principles, neither contemplates confiscation of private property without just cause or compensation, nor advocaey of class war.

"কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির আরও অভিমত এই যে বাজেয়াপ্তি ও শ্রেণীসংগ্রাম তা অহিংসনীতির বিরোধী।

মাসখানেক আগে ১৫ই মে কাশী বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপ্যাল আচার্য নরেন্দ্রদেবের সভাপতিত্বে প্রথম সমাজবাদী সম্মেলন হয়েছিল। আর, ৮ই জানুয়ারী একবার এবং ২৩এ মে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘটীদের ওপর পুলিশের গুলী চলেছিল।

অথবা, বলা যায়, কংগ্রেস এতদিন সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে যে মনোভাব অবলম্বন করে বিদেশী বৃটিশ সরকারের সান্নিধ্যে এসেছিল, সমাজবাদ সম্পর্কেও অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করে বৃটিশ বুর্জোয়াদের নিকটতর হয়েছিল। পার্টি হিসেবে কংগ্রেসের সংহতির দিক থেকে এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিল না। তেমনি, ভারত সরকার যখন ২৩এ জুলাই কম্যুনিষ্ট এসোসিয়েশনগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন তার মধ্যেও কোন অসামঞ্জস্য খুঁজতে যাওয়া ভুল।

সোস্যালিষ্টদের আবির্ভাব

অর্থাৎ, ভারতীয় রাজনীতিতে স্পষ্টতঃই মতদ্বৈধ, ভাব-সংঘর্ষ চলছিল একটি সমন্বয়ের দিকে যাবার তাগিদে। তাই, ২৯এ জুন যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন অভিযানের উদ্বোধন করলেন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, তখন ৩০এ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা বললেন, তাঁরা নির্বাচনে অংশ নেবেন না।

তার আগে ৩০এ সেপ্টেম্বর স্বামী সম্পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে বারাণসীতে হয়েছিল অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সভা। উপস্থিত ছিলেন ডঃ ডি. সিলভা (সি. পি.), বি. পি. সিংহ (বিহার), মাসানী (বোম্বে), নরেন্দ্র দেব, শ্রীপ্রকাশ (ইউ. পি.), শঙ্করলাল (দিল্লী), এস. এম. এ. যোশী (মহারাষ্ট্র), চার্লস ম্যাসার্নহাস (Charles Mascernhas) (বাংলা), আসওয়া (আজমীঢ়) নবকৃষ্ণ চৌধুরী (উৎকল)। প্রস্তাব হল :

"প্রাদেশিক কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট প্রতিনিধিদের, এই সভার অভিমত যে, কংগ্রেসের লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের বর্তমান সংসদীয় ক্রিয়াকলাপ এমন ধরণের নয় যাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্রতর বা ত্বরান্বিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, এই সভা মনে করে যে, এই ধরণের তৎপরতা নিষ্ফল নিয়মতান্ত্রিকতায় নিয়ে যায় ; ইতিমধ্যেই যারা পূর্ণ স্বাধীনতায় অথবা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাসহীন তাদের মিশ্রণে অবনতি ঘটেছে ; এর সুনিশ্চিত ফল হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ বিরতি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ। এই সভা তাই কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলোর সদস্যদের উদ্দেশে আবেদন জানাচ্ছে যে তাঁরা যেন (১) এসেম্বলি নির্বাচনে কংগ্রেস অথবা নির্দলীয় প্রার্থীরূপে মনোনয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, মনোনীত হয়ে থাকলে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন ; (২) কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক সংসদীয় পরিষদ অথবা নির্বাচন-সংক্রান্ত কমিটিগুলোতে যোগদানে গররাজী হন।"

১লা অক্টোবরও বোম্বাইয়ে এক সর্বভারতীয় সমাজবাদী সম্মেলন হয় ; সেখানে ডঃ লোহিয়া, এক. এ. আন্সারী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোহনলাল গৌতম. ডাঃ কার্নিক, এলাহাবাদের জে. মুখার্জী, মাদ্রাজের পি. কে. পিল্লাই, অচ্যুত পটবর্দ্ধন, এস. এ. ব্রেলভি

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডেও ছিলেন। এখানেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হল :

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের আর একটি প্রকাশ হল কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে ; এই দ্বন্দ্বের পরিণতি স্বরূপ পণ্ডিত মালব্যের নেতৃত্বে এক "কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টির উদ্ভব হওয়ায়ও সমাজবাদী সম্মেলনে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়, ৩০-এ সেপ্টম্বর বারাণসী সম্মেলনে।

কম্যুনাল এওয়ার্ডের নিন্দা, না তার বিরোধিতা করা সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবিরোধী কেন বা কি করে হচ্ছে তার কোন যুক্তি নেই। নিজেদের একদিকে দক্ষিণপন্থামুক্ত সমাজবাদী বলে আর এক দিকে অসাম্প্রদায়িক বলে জাহির করার বাহাদুরি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই। কম্যুনাল এওয়ার্ড বৃটিশ কূট-নীতির দান, সে কূটনীতির জালে যাঁরা পড়লেন, প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, কার্যতঃ গ্রহণই করলেন। তাঁরা হলেন অসাম্প্রদায়িক, অনিন্দ্য, আর যাঁরা ঐ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা করার ঝুঁকি নিলেন তাঁরা হলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও জাতীয়তা বিরোধী।

কম্যুনাল এওয়ার্ডে একটা নিষ্ফল বিতর্কও ছিল না, জন-সাধারণের পক্ষে উপেক্ষারও বস্তু ছিল না। কম্যুনাল এওয়ার্ডের মূল কথাটা সংখ্যা, সংখ্যানুপাত প্রতিনিধিত্ব এবং মুসলমান জন-সাধারণ মুসলমান প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবে না। নির্বাচকমণ্ডলীটাই আলাদা করে দেওয়া। তবু বলতে হবে of no importance to masses ? এই mass-এর মধ্যে গিয়ে সোস্যালিষ্টরা কতখানি সিকিউলারিজম আনতে পেরেছিলেন ? শুধু তাই-নয়, সত্য, দেশ বিভাগের পর, ঐ পার্টির একজন লালটুপি পরা নেতাকে জিগগেস করেছিলাম, শেষটায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগ হল ? তিনি অনায়াসে বললেন, না তো, ভাগ হল রিজিওনাল বেসিসে। কালের পরিণামে ইনি দল-ছাড়া বাণী-বাহক হয়েছেন এবং অনর্গল সবাইকে উপদেশ দিয়ে চলেছেন।

অথচ সেদিন ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট পার্টির মতো কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টির উদ্ভব হয়েছিল। হত না গান্ধাজী পরিচালিত কংগ্রেস যদি সমাজবাদকে অপাঙ্‌ক্তের মনে না করতেন এবং কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্পর্কে ক্লীবনীতি অনুসরণ না করতেন। ১৯৩৩-৩৪ এর হতমান কংগ্রেসের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতার পরিচয় ছিল না, ছিল বিস্ফোরক মুক্ত কার্তুজের খোলের মত। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য তখনকার কংগ্রেসের একজন স্তম্ভ ছিলেন, লণ্ডনে গান্ধীজীর সহচর ছিলেন, কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্পর্কে কংগ্রেসের অনিশ্চয়তাই তাঁর মত ব্যক্তিকে কংগ্রেসের বাইরে ঠেলে দিয়েছে।

বাইরে মানে?

বললেন, কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্পর্কে কংগ্রেসের অনিশ্চিত মনোভাব মনঃপূত না হওয়ায় পণ্ডিত মালব্য ও আনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরই কলকাতায় ১৮ই আগষ্ট এক সম্মেলন হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সাদর অভ্যর্থনার ভাষণ দেন। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন পণ্ডিত মালব্য। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অখিল চন্দ্র দত্ত। উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করেন যমুনাদাস মেহতা, এন. সি. কেলকার, এম. এস. আনে। প্রস্তাবে "সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে গবর্নমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অসঙ্গতভাবে যার নাম দেওয়া হয়েছে "কম্যুনাল এওয়ার্ড" তার তীব্র নিন্দা করা হয়; কেন না এতে পৃথক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত নির্বাচন প্রথা শুধু অক্ষুণ্ণ নয়, সম্প্রসারিতও হয়েছে এবং পৃথক নির্বাচনে বিধিবদ্ধভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিধান রাখা হয়েছে।

মুসলিম রাজনীতির গতিক্রম

কিন্তু ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক কোঠায় বিভক্ত করার বৃটিশ কূটনীতি ব্যর্থ হয় নি, কংগ্রেসের বাইরে মুসলমানেরা ক্রমশঃই এওয়ার্ডের নিকটতর হয়েছেন। সিমলায় একই সময়ে ১৩ই

আগষ্ট নাগাদ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ও অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তার সুর এক।

অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় ওটি গ্রহণ করেছে, কংগ্রেস না-গ্রহণ না-বর্জনে ওটি গ্রহণ করেছে (নইলে নির্বাচনে নামতে পারত না), সোস্যালিষ্টরা কম্যুনাল এওয়াডের বিরুদ্ধে আক্রমণ সাম্প্রদায়িকতা বলে মনে করছেন (নইলে গণ-আন্দোলন করতেন)। কম্যুনাল এওয়ার্ড অন্ততঃ শতায়ু হয়ে রইল।

বিপ্লববাদের এপিটাফ

আয়ু ফুরিয়েছিল বাংলাদেশে বিপ্লববাদের। আমি বলেছিলাম ১৯৩৪ নাগাদ এর এপিটাফ লিখব। এপিটাফের রুক্ষ সৌধ উঠবে দার্জিলিংয়ের লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

"এইখানে বাংলাদেশের অফুরন্ত বৈপ্লবিক শক্তির নিরুদ্ধ সমাধি।"

একি হত্যা, না আত্মহত্যা? সন্দেহ নেই, সমগ্র সরকারী যন্ত্র, বেসরকারী অহিংস সংগঠন, উদারনীতিক থেকে শুরু করে খেতাবধারী রাজানুরক্তের ভদ্রমহল এবং সর্বোপরি উদাসীন জনগণের বেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে গেছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। কিন্তু, সত্য, এই রূঢ় তথ্যই বা ভুলি কি করে যে, তাঁরা সঙ্কল্পসাধনে এক হাতে রিভলভার আর ও এক হাতে বিষ নিয়ে বেরোতেন? ব্যর্থতার জন্যই শুধু নয়, তাঁদের ধরে দেবার লোক আশেপাশেই থাকত সেই আশঙ্কায়, হাত-বাড়ানো জনসাধারণের সঙ্গে এঁদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল না।

দাদারা এঁদের সরণ ও মারণ মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু যে-দেশ বা দেশের মানুষের কল্যাণে এই আত্মোৎসর্গ তার মধ্যে প্রত্যেক বিপ্লবীকে সম্প্রসারিত করার কোন মন্ত্র শেখাননি। এককালে রোগীর শুশ্রূষা, মড়া পোড়ানো, মুষ্টিভিক্ষার কারুণ্য ছিল বটে কিন্তু অবস্থাবিপাকে আর সবই ছিল একান্ত গোপন, ব্যায়ামাগার থেকে রিভলভার চালনা শিক্ষণ অবধি। অস্ত্রও খুব বেশী ছিল না, ফিসফিসানিটাই ছিল সব চাইতে বড় হাতিয়ার। আর সংগঠন

ইত্যাদি ছিল আত্মনির্ভর ; অনেক সময় দাদারা খবরও রাখতেন না, ঘর ছাড়া ছেলেটি কোথায় এবং কেমন করে জীবন ধারণ করে, অথচ তার জীবনের ওপর দাবী ছিল ষোলো আনা। বাংলার নির্বোধ ছেলেরা তাও মেনে নিয়েছিল, কিন্তু একমাত্র 'গীতা' কতকাল তার জীবন ধারণ করে রাখতে পারে ? মৃত্যুকে তুচ্ছ করার দর্শন হিসেবে গীতা অনবদ্য হয়েছিল, কিন্তু বাস্তব জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করার দর্শন ছিল না ; ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, ফরাসী বিপ্লব, রুশ জাপান যুদ্ধ, আয়র্ল্যাণ্ড, হ্যাঁ, সবই তার সঙ্কল্পে ধূপের কাজ করতে পারে, কিন্তু ভারতের মাটিতে, দেশের মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে কি দর্শন দিতে পেরেছিলেন দাদারা ? বরং সাধারণ থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে হয়েছে, বাস্তব জীবনের ভারতীয় দর্শন তাঁরা কিছু দিতে পারেন নি—সব কিছু ভাসা-ভাসা, অস্পষ্ট ; শেষ পর্যায়ে যদি-বা বলশেভিক বিপ্লবের কথা বলতেন, কিন্তু তাতেও ছিল বেশীর ভাগ রোমান্সের খাদ। যাঁরা ওর তত্ত্বের মধ্যে ডুবলেন, তাঁরা রুশদেশের দিকে তাকিয়ে স্বদেশের মাটী থেকে নিলেন পা তুলে, বায়ুভূত অবস্থায় স্বদেশের বিস্মৃতিতে পরদেশ হয়ে উঠল দিগ্‌দর্শন।

কিন্তু তারও আগের কথা, ৩৪-৩৫এর কথা। সেখানে আরও একটা বাহ্যিক ঘটনা ঘটেছিল। বাইরেও ছিল, সোস্যালিজম কম্যুনিজমের বুলি, বিক্ষিপ্ত ছাড়া ছাড়া নিতান্ত সীমাবদ্ধ ; কিন্তু বন্দীনিবাসগুলোয় যেন নামল প্রবল বন্যা। সত্য, সেকালের একটা বই থেকে তোমায় খানিকটা পড়ে শোনাই, এক রাজবন্দীর কথা :

রাজবন্দীর জবানবন্দী

"রাজশক্তি এখানে একটু চালে ভুল করেছিল। 'ভাল ছেলে হব আমি পাঠে দেব মন,' বিপ্লবীদের ভাবগতি হয়তো এই সঙ্কল্পে পাল্টাবে এই মনে করে অতিবুদ্ধি গোয়েন্দা বিভাগের পরামর্শে সরকার কারাভ্যন্তরে সাম্যবাদী সাহিত্য আমদানীর পথ প্রথমদিকে

উন্মুক্তপ্রায় রেখেছিলেন। বৈপ্লবিক গণ্ডীতে ঘটনাক্রমে আগত কয়েক হাজার ছেলের মধ্যে সকলেই বিপ্লবের ভাবে উদ্বুদ্ধ নয়; এমন একদল সুবোধ ছেলে সত্যিই পাওয়া গেল যারা অনুমতি পেয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রাচীরগুলো উত্তীর্ণ হবার আয়োজনে আত্ম-নিয়োগ করল। কিন্তু এরই মধ্যে একদল যুবক সাম্যবাদী সাহিত্য গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে এজন্য তাদের সংঘাত নিতান্ত নগণ্য হয়নি। ভাবগত ও দলগত পার্থক্যের বিচারে এই বিপ্লবীরা প্রথমাবধিই পৃথক হাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। ইংরাজীতে যাকে বলে 'কিচেন'।......কোন্ কিচেনে কে উঠবে এই দিয়েই তার প্রাথমিক পরিচয় হত। এদের মধ্যে শিক্ষক ছিল, ছাত্র ছিল, খেলোয়াড় ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, নিতান্ত বেকারও ছিল। বাইরে ভোগসম্ভোগের অতৃপ্তিও অনেককে ভেতরে প্রসাধনের সুযোগে সৌখীন করে তুলেছে, কেউ কেউ গীতা ষড়দর্শন নিয়ে সাত্ত্বিক হয়েছে, কেউ বডি-থ্রো করে ভাল গোলকিপার হবার চেষ্টা করেছে, কেউ কালো পোষাকে 'অটো-বায়োগ্রাফি অব বেনিটো মুসোলিনী' বগলে গুটিকয়েক ছেলের কুচকাওয়াজে মেতে মুসোলিনী অথবা হিটলার হবার চেষ্টা করেছে, কেউ কেউ সাম্যবাদী সাহিত্য নিজে পড়েছে এবং অপরকে নিস্পৃহভাবে পড়িয়েছে, কেউ বন্দীশিবিরেই দল গড়তে শুরু করেছে।......অনুশীলনের মস্ত হাড়িতে ভাঙ্গন ধরেছিল মোটামুটি মেছুয়াবাজার বোমার মামলা থেকেই, বহু উপদল পরিপুষ্ট যুগান্তরের হাড়িতেও রকমারি কাঠি পড়তে শুরু হয়েছিল, এই থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল না-অনুশীলন না-যুগান্তর 'গোত্রহীন' 'থার্ড কিচেন', অর্থাৎ তিন নম্বর হাড়ি। এই তিন নম্বর হাড়ির ওপর এক নম্বর, আর দুই নম্বর হাড়ির বিরাগের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই আত্মতুষ্ট শ্রদ্ধেয়েরা তৃতীয় রসুইয়ের অনাস্বাদিত গন্ধ বাতাস ঠেলেও রোধ করতে পারলেন না, দুদিককার শাসনের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তা সমানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দাদারা প্রথম চেষ্টা করলেন বই বাছাই করে বাক্সবন্দী করতে, পরে চেষ্টা

করলেন একটা মাঝামাঝি দর্শন দাঁড় করাতে। ফ্যাসিজম, সোস্থালিজম কম্যুনিজম যেন মোকাবিলা শুরু করল।……

"তখন সবে প্রাচীন স্থবির ভাবহীনতার উর্বর ক্ষেত্রে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন মার্ক্স, এঙ্গেলস, প্লিকানভ, লেনিন, ট্রটস্কি,স্ট্যালিন, বুখারিন, ল্যাপিডাস, এমনকি কাউটস্কি, ক্রপটকিন। আনুষঙ্গিক মূল সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ক্ষুধার্ত বিপ্লবীদের মুখে এসে পড়তে লাগল। বন্দীশিবির হল বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত।"

ভারতবর্ষের পটভূমিকা গেছে বিলুপ্ত হয়ে ফলে একদিকে নারদনিকি ওরফে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি উন্নাসিকতা ও আর এক দিকে নবদর্শনের ক্ষেত্রভূমির মুখাপেক্ষিতা তাঁদের কখনো আত্ম-দর্শনে স্বাবলম্বী করতে পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে…।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে দার্জিলিংয়ের ঘোড়দৌড় মাঠে বাংলার গবর্নর স্যার জন এণ্ডার্সনের ওপর বিপ্লবীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়। সাহেবী পোষাকে ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লাটসাহেবের তু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন; গুলীও চালিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ লক্ষ্য। কোন আঘাত লাগেনি লাট সাহেবের সুরক্ষিত দেহে। বিপ্লবীরা বন্দী হন।

গান্ধীজী নিদারুণ নিন্দা করলেন এই প্রচেষ্টার এবং তৎকালীন কলকাতা করপোরেশনের ভদ্র কাউন্সিলাররাও।

অনাদরে অনশনে কারাগারে ফাঁসীমঞ্চে কত বিপ্লবীর বলিদান হয়েছে, কত জন পঙ্গু অশক্ত ভিখিরী হয়েছেন, কোন একদিন হয়তো এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কেউ হিসেব করবেন।

আমি তাঁদের এপিটাফে শুধু এইটুকু লিখে রাখতে চাই: একদা বাংলাদেশে প্রকৃতির অন্ধ তাণ্ডবের মতো অপরিমেয় হৃদয়াবেগের অপ্রতিরোধ্য ঝড় উঠেছিল, বিগত এক শতাব্দী ধরে তা সঞ্চারিত হয়েছে, শেষ তরঙ্গের উত্থান শুরু হয়েছে ২৭-২৮এ, তীব্রতার চূড়ায় উঠেছে ১৯৩০-৩১এ, স্তিমিত প্রশমিত হয়ে এসেছে ১৯৩৩-৩৪এ। কিন্তু নিন্দা-দমন অতিক্রম করে এই প্রাকৃতিক শক্তিকে কব্জা করার

মতো কোনো শক্তিধরের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি বাস্তব প্রাণ-প্রাচুর্যের দর্শন-সৌকর্যে একে সুন্দরতর করে তুলতে পারতেন; প্রাণোচ্ছল যৌবনের ডান হাতের রিভলভারকে অসত্য করে বাঁ হাতের বিষটাই সত্য হয়ে উঠল; এই, এইখানে আত্মবিনাশী সেই ক্ষণায়ুর দেহ সমাধিস্থ—"

বলতে বলতে তিনিও যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নিষ্ঠুর অহিংসবাদী নন, অপরিসীম স্নেহ শ্রদ্ধা ওঁর বিশুষ্ক ল্যাক্রিমাল গ্ল্যাণ্ডে আলোড়ন তুলেছে, বার্ধক্যম্লান চোখ দুটিতে ছোট্ট দুটি সরোবর।

গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট

আজকের মানুষটি গতকাল সন্ধ্যের মানুষটি নন। খুব স্বাভাবিক স্পষ্ট গলায় বললেনঃ ১৯৩৫ এর সব চাইতে বড় কথা ইণ্ডিয়া বিল—গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট।

১লা ফেব্রুয়ারী তার একটি ভারতীয় সংস্করণ বেরোলো; কমন্স সভায় দ্বিতীয় দফা আলোচনাকালে স্যার স্যামুয়েল হোড় ৬ই ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করলেন, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই লক্ষ্য; পুণা চুক্তি মেনে নেওয়া হল; ৫ই জুন কমন্সে তৃতীয় দফার আলোচনাও সমাপ্ত হল। ২০এ জুন লর্ড সভা পাশ করে দিলেন ইণ্ডিয়া বিল।

এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবার কিছু নেই, এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, স্যার স্যামুয়েল হোড়ের সে কথাই সত্য যে, সারমেযদের চেল্লা-চেল্লি সত্বেও ক্যারাভান চলে গেল; হোয়াইট পেপার, কম্যুনাল এওয়ার্ড, পৃথক নির্বাচন এবং গান্ধীর অনশন-সৃষ্টি বিস্ফোটক পুণা চুক্তি নিয়ে ইণ্ডিয়া বিল হল ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম'।

এর চাইতে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও লীগ প্রেসিডেণ্টের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা, পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগ ও মুসলিম কনফারেন্সের সফল মিলন-আলোচনা।

কম্যুনাল এওয়ার্ড-বিরোধীরা ও হিন্দু মহাসভা বৃথাই হাত

কামড়ে মরলেন। দিল্লীতে ২৩এ ফেব্রুয়ারী সি. ওয়াই চিন্তামনির সভাপতিত্বে এক কম্যুনাল এওয়ার্ড বিরোধী সম্মেলন হল, নিন্দাত্মক প্রস্তাব হল, কমিটি হল। কানপুরে ২০-২২ এপ্রিলে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ষোড়শ অধিবেশনেও কম্যুনাল এওয়ার্ডের নিন্দা হল। বাংলাদেশের ঝিনাইদহে সারা-বঙ্গ অনুন্নত শ্রেণী সম্মেলনেও তার নিন্দা হল। পক্ষান্তরে, দিল্লীতে ২৪এ মার্চ ঢাকার নবাবের সভাপতিত্বে কম্যুনাল এওয়ার্ড কনফারেন্সে কিছু হৈ হট্টগোল হলেও কম্যুনাল এওয়ার্ডকে "Corner-stone of a gigantic constitutional machinery" বলে আদর করা হয়েছিল। ইয়ামিন খাঁ এখানে একটি বড় বেয়াড়া প্রশ্ন তুলেছিলেন :

> "When Mr Gandhi fasted for the settlement of the Depressed class question why should he not do so for achievement of the Hindu-Muslim unity which was a more vital question ?"

এ প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ ছিল না ; কংগ্রেস তখন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে এবং গান্ধীজী কংগ্রেস ছেড়ে যাবার কথা ভাবছেন।

য়্যা !—আমি চমকে উঠলাম।

তিনি বললেন, ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং।

কংগ্রেসের ইতিহাস লেখন

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই থেকে ১লা আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়েছিল এবং দেশের কল্যাণে ডঃ পট্টভি সীতারামায়াকে ধন্যবাদ জানানো হল। তিনি "হিষ্ট্রি অব কংগ্রেস" নামে একখানি বই লিখেছেন ; তার পাণ্ডুলিপি প্রেসিডেণ্টকে পড়তে দেওয়া হল, কংগ্রেসের ৫০ বছর পূর্তির স্মরণী হিসেবে এটি প্রকাশ করা যায় কিনা তা স্থির করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, গান্ধী প্রশস্তির এই বইথানি মুদ্রন ও প্রকাশনের জন্য ৬০০০ টাকা মঞ্জুর হল।

কংগ্রেস যে সাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং দেরী যে আর সইছিল না, ১৯৩৫ এর ১৭।১৮ই অক্টোবর, এ. আই. সি. সি-র মাদ্রাজ অধিবেশনে তা প্রকট হল :

"নতুন সংবিধান অনুসারে সাধারণ প্রাদেশিক নির্বাচন হতে কিছু সময় কেটে যেতে বাধ্য, এই অন্তর্বর্তীকালে রাজনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়াবে তাও অনিশ্চিত ; এসব কথা বিবেচনা করে কমিটির অভিমত যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হবে কি হবে না বর্তমানে তৎসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা।

> "not only premature, but also inadvisable and impolitic to come to any decision on the question."

আসলে কিন্তু ওঁরা মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। শুধু জনমানসকে চমকে না দেওয়ার জন্য এইটুকু বলা, তাই জনমনকে প্রস্তুত করার জন্য এ নিয়ে আলোচনার অবাধ অবকাশ করে দিলেন :

> "it seems no objection to the question being discussed in the country."

গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ (?)!

নিস্তরঙ্গ এই ১৯৩৫এ একটা অভিমানক্ষুব্ধ হতাশার ঢেউ তুলেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী—যে কথা শুনে তুমি এইমাত্র চমকে উঠলে। গুজব একটা রটেছিল বা রটছিল। তার নিরসন করে গান্ধীজী ১৭ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধাগঞ্জ থেকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন ; এই বিবৃতির সবটাই তুমি পট্টভির ডায়েরীতে পাবে, আমি শুধু ওঁর অন্যতম একটি কারণ এখানে চয়ন করছি :

> "I have welcomed the formation of the Socialist group. Many of them are respected and self-sacrificing co-workers. With all this, I have fundamental differences with them on the programme published in their authorized pamphlet. But I would not, by reason of the moral pressure I may be able to exert, suppress the spread of ideas propounded in their literature. I may

not interfere with free expression of those ideas, however distasteful some of them be to me. If they gain ascendancy in the Congress, as they well may, I cannot remain in the Congress For, to be in active opposition should be unthinkable"

মোটামুটি কথা হল, তিনি তাঁর ভাবধারা থেকে পৃথক সমাজবাদী ভাবধারা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না; তাঁর চোখের সামনে সমাজবাদীরা প্রাধান্য বিস্তার করছেন, এমনও আশঙ্কা যে, তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তেমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে কংগ্রেসে থাকা সম্ভব নয়; কেননা, বিরোধিতা তিনি কোন কালে সহ্য করেন নি, এখনও করবেন না। সুতরাং, তিনি সমাজবাদীদের "সম্মানিত ও আত্মত্যাগী" বলে তুলে ধরে কর্মপন্থার নামে আছড়ে মারলেন। হয় ওঁরা থাকবেন, নইলে 'আমি'। কংগ্রেসের ইতিহাসে গান্ধীজীর এই অভিমান একবার নয় বারকয়েক ঘটেছে এবং প্রতিবারই তিনি তাঁর মূল্য বাড়িয়ে নিয়েছেন। আর হতবাক্ জনসাধারণের কাছে সহচরেরা তাঁর অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। কংগ্রেস কখনও তাঁকে বাদ দিয়ে চলেনি, তিনি ক্রমশঃই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে থেকে কংগ্রেসকে তাঁর পথে চালিয়েছেন।

অথবা, সত্য, কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতিতে যে মন্থন ও রোমন্থন চলছিল এ তারই এক অভিব্যক্তি। কম্যুনাল এওয়ার্ডকে ভিত্তি করে মুসলিম রাজনীতি আলোড়িত হয়েছে; হিন্দু রাজনীতি দ্বিধাগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্নগতি নিয়েছে; কংগ্রেসে নির্বাচন ও মন্ত্রিত্বপন্থীরা জোটবদ্ধ হয়ে চলেছেন এবং সমাজবাদী-সাম্যবাদী-আপোষবিরোধী সংগ্রামী অংশগুলোর ক্রমাপসারণে চাপ দিয়ে চলেছেন।

১৯৩৬-এ ভারতের আকাশে সমাজবাদের একটা ধোঁয়াকুণ্ডলী উঠছিল। মার্চ মাসের ১৯-এ তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসকর্মীদেরই নবসংবিধান-বিরোধী সম্মেলনে এক প্রস্তাবক্রমে খুব জোর দিয়ে বলা হল: নববিধানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে তা জাতীয় স্বাধীনতা-

লক্ষ্যের এবং শাসনসংস্কার প্রত্যাখ্যানের ঘোষিতনীতির পরিপন্থী হবে। ২২ তারিখে করাচীতেও এর প্রতিধ্বনি হয়।

কিন্তু যাঁরা জোটবদ্ধ হয়ে মন্ত্রিত্বের দিকে এগোচ্ছিলেন তাঁরা সতর্ক থাকলেও এদিকে খুব বেশী কর্ণপাত করেন নি; কর্ণপাত করেছিলেন খোদ জওহরলালের সমাজবাদী ধাঁচের কথাবার্তায়। এতে কিছুকাল চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠলেও প্রবক্তারই পরবর্তী আচরণে তা প্রশমিত হয়ে যায়।

১৫ই মে বোম্বের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে জওহরলাল বলেছিলেন, তাঁর যদিও এই দৃঢ় নিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের দুর্গতি নিরাকরণের একমাত্র নিদান সমাজবাদ, তবু তিনি এই অভিমত কংগ্রেসের ওপর কেউ চাপিয়ে দেয় তা চান না।

কিন্তু জওহরলাল সমাজবাদ সম্পর্কে যতটুকু বলেছিলেন তা-ই চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। বোম্বের ২১ জন নেতৃস্থানীয় বণিক এক যুক্ত ইস্তাহার মারফৎ জওহরলালের 'ভারতে সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার সানুকূল প্রচার' সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ১৮ই মে; ২০শে মে আরও একজন মুখ্য ব্যবসায়ী ভারতে 'সমাজবাদের বিকাশে' আফসোস করলেন। ৩০শে মে জওহরলাল তাঁর সমাজবাদী প্রত্যয়ের পুনরাবৃত্তি করলে স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর অভিযোগ করলেন, নেহরুর সমাজবাদী কথা আসলে সাম্যবাদ প্রচারেরই আড়াল মাত্র (using Socialism as a smoke-screen for Communist propaganda)।

"৩১এ মে দৈত্যাকার ধোঁয়াকুণ্ডলী দেখে নেহরু একটু ঘাবড়ালেন। পাঞ্জাবের কৃষকেরা তাঁকে কাস্তে ও হাতুড়ী উপহার দিলে তিনি বললেন, তিনি চান না তাঁরা সব-কিছুই রুশিয়ার অনুকরণ করুন। পাঞ্জাবের বণিকেরা তাঁকে জানালেন যে, তাঁর মতবাদ নিরক্ষর গ্রাম বাসীদের পক্ষে বিপজ্জনক। লাহোরের ব্যবসায়ীরাও আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ৩রা জুন, আর এ যে নেহরুর সহকর্মীদেরও মনঃপূত নয় তার অভিব্যক্তি হল ৬ই জুন। চূড়ান্ত হল যখন গান্ধীজীরই

গোপন পরামর্শক্রমে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারি, জয়রামদাস দৌলতরাম, যমুনালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল, জে. বি. কৃপালনী, এস. বি. দেব পদত্যাগের হুমকি দিয়ে এক চরম পত্র দিলেন। তাতে তাঁরা লিখলেন: "কংগ্রেস আজও সোস্যালিজম্-এর নীতি নেয়নি। এই অবস্থায় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটি, আর সমাজতন্ত্রী সদস্যরা যদি সোস্যালিজম্-এর নীতি ব্যাখ্যায় ও প্রচারে মুখর হয়ে ওঠেন, তবে দেশের অমঙ্গল ঘটবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে একাজ অনর্থ সৃষ্টি করবে।"

পত্রের এই অংশটুকু তোমায় আমি নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীর 'নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' থেকে পড়ে শোনালাম, তিনি অনুবাদ করেছেন "বাঞ্চ অব লেটার্স" থেকে।

গান্ধীজীর চেষ্টায় এই যে ঘরোয়া-ঝগড়া, গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে তা মিটেছিল এবং জওহরলাল সতর্ক হয়ে গেছিলেন। সত্য-মূর্তি স্পষ্টতঃই, ১লা জুন জানালেন, তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকার উৎসাদনের বিরোধী এবং ২২এ নবেম্বর বললেন, যাঁরা এখনই সমাজবাদের কথা বলেন তাঁরা কংগ্রেসের শত্রু।

নির্বাচনে মুক্তি পথ

কিন্তু কংগ্রেসের কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই, কোন কোন বিষয়ে বিরোধিতা আছে মাত্র। কংগ্রেস তাই ১৯৩৬এ ১২-১৪ই এপ্রিলে উনপঞ্চাশতম বাৎসরিক অধিবেশনে একই সঙ্গে গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের বিরোধিতা ও য়্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনে সহযোগিতার এক বিমিশ্র প্রস্তাব গ্রহণ করল। অথবা প্রস্তাবের প্রথমাংশটুকু সংগ্রামী জনসাধারণকে এবং দ্বিতীয় অংশটি মন্ত্রিত্ব-পিয়াসীদের তুষ্ট করার জন্য নথিভুক্ত করা হল।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ-উত্থাপিত এই প্রস্তাব সোস্যালিষ্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরের সংশোধনী বাতিল করে দিয়ে গৃহীত হয়।

বোম্বাইয়ে ১১৷১২এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের চতুর্বিংশ অধিবেশনেও ঠিক একই ছাঁচে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাস চারেক পর বোম্বাইয়ে ২২৷২৩ আগষ্টে এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে গৃহীত এক সুদীর্ঘ নির্বাচনী ইস্তাহারের সার কথা হল আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থনের আবেদন। কেন?

> "National welfare demands it. The fight for independence calls for it."

হাস্যকর মনে হয় না, সত্য? কিন্তু সেদিন তা হয়নি। ১৯৩৬এর ২৭৷২৮ডিসেম্বরে কংগ্রেসের ৫০তম অধিবেশন হয়েছিল ফৈজপুরে; জওহরলাল প্রেসিডেন্ট। ৩০এ ডিসেম্বর নাগাদ নির্বাচনী হৈ হুল্লোড়ে ভারতের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত—সেই হোয়াইট পেপার—জয়েন্ট পার্লামেন্টারী রিপোর্ট-ভিত্তিক কম্যুনাল এওয়ার্ড কলঙ্কিত নববিধানে আসন নিয়ে কাড়াকাড়ি—ক্ষমতা চাই, ক্ষমতা।

কংগ্রেসের নির্বাচন সাফল্য

কংগ্রেস পেল সে ক্ষমতা। প্রথমে ছ'টা, পরে সাতটা প্রদেশে কংগ্রেস রাজত্ব কায়েম হল, কিন্তু "সংগ্রামী জনতার" দিকে তাকিয়ে সহসা ঘোমটা ফেলে নাচতে রাজী হয় নি। কংগ্রেসের নির্বাচনে ও মন্ত্রিত্বগ্রহণে এই দ্বিধাগ্রস্ততা কাটাতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর "ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডমে" কৃতিত্ব দাবী করেছেন:

"The victory of the Congress has to be judged against the Congress early reluctance to contest the elections at all. ১৯৩৫-এর ভারত আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বিধান ছিল। কিন্তু পরমায়ে পড়েছিল মাছি। জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার ছিল গবর্নরের হাতে। তা করলে গবর্নমেন্ট সংবিধানও প্রত্যাহার করে সব ক্ষমতা নিজে নিতে পারবেন। সুতরাং প্রদেশে প্রদেশে গণতন্ত্র তদ্দিনই চলতে পারে যদ্দিন গবর্নর সে অনুমতি দেবেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা ছিল আরও খারাপ।......"

"সুতরাং, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, কংগ্রেস যেখানে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে সেখানে সে এই ব্যবস্থার প্রতি বিরূপভাব অবলম্বন করবে।.......আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করতাম।......শেষ পর্যন্ত আমার মতই গৃহীত হয় এবং কংগ্রেস নির্বাচনে যোগ দেয়।"

"নতুন আর এক মত পার্থক্য দেখা দেয় কংগ্রেস নেতৃত্বে। নির্বাচনে যোগ দিলেও একাংশ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী হলেন।"

এ সম্পর্কে পট্টভি বলছেন :

> "In six out of eleven provinces, the party that came in a majarity would not touch office with a pair of tongs."

এত ঘৃণা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ব্যাপারে! কিন্তু আজাদ বলছেন: "এ ব্যাপারে আমিও বিপরীত অভিমত পোষণ করেছি এবং বলেছি ......গবর্নরের সঙ্গে সংঘর্ষ যদি বাঁধেই তবে তার মোকাবিলা করতে হবে।...আর যদি কংগ্রেসকে চলে আসতেই হয় তো জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসকে তা বলিষ্ঠতরই করে তুলবে।"

"কিন্তু গবর্নরেরা এ তর্কাবদানের জন্য অপেক্ষা করেন নি। কংগ্রেসের দ্বিধাচিত্ত লক্ষ্য করে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলকেই মন্ত্রিত্বগঠনে আমন্ত্রণ জানালেন। ফলে, অকংগ্রেসী কোথাও কোথাও কংগ্রেসবিরোধীরা অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কংগ্রেসের এই অনিশ্চয়তা সাধারণ কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল।......বড়লাটের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাকালে এই কথাটি বের করে আনার চেষ্টা হল যে, গবর্নরেরা মন্ত্রিদের কাজে বাধার সৃষ্টি করবেন না। বড়লাট অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার পর ওয়ার্কিং কমিটির কোন কোন সদস্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে মত-পরিবর্তন হল।"

কেন, বড়লাট কথা দিয়েছিলেন বুঝি?

মোটেও না। আসলে বাধাটা ছিল নিজেদের মধ্যেই। আমি তোমায় বলেছি, সত্য, নেতৃবৃন্দ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন

সব চরম কথা ব'লে ফেলতে অভ্যস্ত যে, পরে তার তাল সামলানো দায় হয়। মৌলানা আজাদ সে-কথাই বলছেন:

"কংগ্রেস গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট বা ভারত আইন সম্পর্কে বারংবার এমন সব কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেছে যে, নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও কেউ তা মুখ ফুটে বলতে সাহস করেছিলেন না। জওহরলাল ছিলেন তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে এমন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার কথা বলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ওয়ার্ধায় যখন ওয়ার্কিং কমিটি বসল তখন দেখলাম বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে সকলেরই কেমন অনিচ্ছা। তাই আমি স্পষ্ট ভাষায় বললাম, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছুক্ষণ আলোচনার পর গান্ধীজী আমাকে সমর্থন করলেন এবং কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল।"

নিলাম রাজ্যভার

১৯৩৭এ গৃহীত প্রস্তাবটা ছিল এই রকম:

"সুতরাং, কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসছেন এবং স্থির করছেন যে, যেখানেই আমন্ত্রিত হবেন সেখানেই কংগ্রেসকর্মীদের তা গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হবে।" সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঐ সংগ্রামী কথাটাও জুড়ে দেওয়া হল যে, এ গ্রহণ ঐ আইনটিকে বাতিল করার জন্যই।

সত্য, গল্প হলে বলতাম, অতঃপর তাঁরা সুখে শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। কিন্তু ইতিহাস গল্প নয়, এ ফুরোয় না, নটে গাছটিও মুড়োয় না, ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন, এর শেষ নেই।

নির্বাচনের ফলাফল দেখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি খুবই খুসী হয়েছিল কিন্তু জেদটুকু ছাড়ে নি। প্রথম প্রস্তাবটি হয়েছিল বিস্ময়কর সাড়া দেবার জন্য জাতির উদ্দেশে অভিনন্দন জানাতে।

"The Working Committe congratulates the nation on its wonderful response to the call of the Congress

during the recent elections...এর দ্বারা জনসাধারণের কংগ্রেস নীতির প্রতি আনুরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ ও বিনাশের জন্য তাদের সঙ্কল্প এবং সংবিধান পরিষদের মাধ্যমে এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও তার সাহায্যে সকলের দুর্গতিভার দূর করার আকাঙ্ক্ষা।"

বোম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন বি. জি. খের, মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারি, যুক্তপ্রদেশে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, বিহারে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, সি. পিতে এন. বি. খারে, উড়িষ্যায় বিশ্বনাথ দাস। আর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খান সাহেব।

কোয়ালিশনের ব্যতিক্রমও?

শেষেরটা আলাদা করে বললেন যে?

এর জবাবটা দিন জিন্নাজী। তিনি ১৯৩৭-এর ১৫-১৮ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের পঞ্চবিংশ অধিবেশনে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগঠন-নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন:

"The demand was insistent, abjure your party and forswear your policy and liquidate Muslim League; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো যেখানে দেখল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নেই সেখানে সমষ্টিগত দায়িত্বের পবিত্রনীতি গেল উবে, অচিরাৎ যে-কোন গ্রুপের সঙ্গে জোট-বাঁধার অনুমতি দেওয়া হল।"

অবশ্য, জিন্নাজীর এ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়; বাংলাদেশের বেলায় ওঁদের ঐ কঠোর নীতির কোন ব্যতিক্রম হয়নি; তাহলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা-কোয়ালিশন হত এবং ফজলুল হক লীগে যোগ না দিলে পাকিস্থান হাসিল হত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কংগ্রেসের মতি ছিল ইতিহাসের এই গতির একান্ত বিরোধী।

১৯৩৭-এর ১৫ই অক্টোবর এতাবৎ লীগ-বহির্ভূত এবং পৃথক

during the recent elections···এর দ্বারা জনসাধারণের কংগ্রেস নীতির প্রতি আনুরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ ও বিনাশের জন্য তাদের সঙ্কল্প এবং সংবিধান পরিষদের মাধ্যমে এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও তার সাহায্যে সকলের দুর্গতিভার দূর করার আকাঙ্ক্ষা।"

বোম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন বি. জি. খের, মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারি, যুক্তপ্রদেশে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, বিহারে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, সি. পিতে এন. বি. খারে, উড়িষ্যায় বিশ্বনাথ দাস। আর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খান সাহেব।

কোয়ালিশনের ব্যতিক্রমও?

শেষেরটা আলাদা করে বললেন যে?

এর জবাবটা দিন জিন্নাজী। তিনি ১৯৩৭-এর ১৫-১৮ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের পঞ্চবিংশ অধিবেশনে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগঠন-নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন:

"The demand was insistent, abjure your party and forswear your policy and liquidate Muslim League; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো যেখানে দেখল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নেই সেখানে সমষ্টিগত দায়িত্বের পবিত্রনীতি গেল উবে, অচিরাৎ যে-কোন গ্রুপের সঙ্গে জোট-বাঁধার অনুমতি দেওয়া হল।"

অবশ্য, জিন্নাজীর এ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়; বাংলাদেশের বেলায় ওঁদের ঐ কঠোর নীতির কোন ব্যতিক্রম হয়নি; তাহলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা-কোয়ালিশন হত এবং ফজলুল হক লীগে যোগ না দিলে পাকিস্থান হাসিল হত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কংগ্রেসের মতি ছিল ইতিহাসের এই গতির একান্ত বিরোধী।

১৯৩৭-এর ১৫ই অক্টোবর এতাবৎ লীগ-বহির্ভূত এবং পৃথক

পরিচয়ে নির্বাচিত পাঞ্জাব ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী দু'জন জিন্না-পরিচালিত মুসলিম লীগে যোগ দেন। এই সভায়ই সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয় এবং জিন্নাজী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান।

২৩শে অক্টোবর বহরমপুরে সারা বাংলা মুসলিম সম্মেলন হয়; উপস্থিত থাকেন ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, কাজেমালি মীর্জা। এখানে জিন্নাজী ঘোষণা করলেন:

> "Political power is a power that will safeguard our religion, culture or language. That is what we are fighting for."

"আর, লোকে বলে আমাদের দলে নাকি সব নবাব, নাইট, জমিদার, তালুকদার। ওটা আপনাদের ধোঁকা দেবার জন্য। নইলে কংগ্রেস কি? বিরলাদের কথা, বড়-বড় মিল মালিক আর কোটীপতিদের কথা কে বলবে—যাঁরা কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন?"

"বন্দেমাতরম্"

আগে লক্ষ্ণৌয়ে, পরে বহরমপুরেও মুসলমানেরা "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে আপত্তি তুললেন। পক্ষান্তরে পুনায় 'বন্দেমাতরম্' রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৪-১৭ই আগষ্টে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি ওর প্রথম দুটি স্ট্যাঞ্জামাত্র গাইতে অনুমতি দিলেন। ২৯-৩১ অক্টোবরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি'তে জওহরলাল ঐ দুটি স্ট্যাঞ্জার কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, একথাও ঘোষণা করলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে শেষ দুটি স্ট্যাঞ্জার বিরোধী, এজন্য তিনি ও দুটি উচ্ছেদের দাবী করেছিলেন।

কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের সাফল্য শুধু দুই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী-ট্রফিলাভেই সীমাবদ্ধ নয় বা বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদেই নয়। এম. এ. জিন্নার মুসলীম লীগে সকল মুসলিম দলের অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা সফল হল পাটনায়, অহ্রর পার্টিগুলোও যোগ দিল লীগে।

সভা, হোয়াইট পেপার, জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী রিপোর্ট, কম্যুনাল এওয়ার্ড, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াই, দলগত "পবিত্রতা" রক্ষা করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল; আর কংগ্রেস একই সঙ্গে মুখে সংবিধানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের কথা বলে কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে সংবিধানের জাতককে স্নেহযত্নে লালন করে চলল। পরিশেষে সংগ্রামের কথাটি যতই সুদূরপরাহত হতে লাগল, ততই মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসবার জন্য একটা উৎকণ্ঠার সঞ্চার হতে লাগল। মৌলানা আজাদ বলেছেন: "সাম্প্রদায়িকতা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি ঘটনাই আমার কাছে এসেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং পূর্ণ দায়িত্ব বোধ নিয়ে বলতে পারি, মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর প্রতি যে সব অবিচারের অভিযোগ করেছেন সেসব একান্ত অসত্য। এসব অভিযোগের একটিতেও যদি লেশমাত্র সত্য থাকত, আমি তার প্রতিকারের চেষ্টা করতাম, এজন্য আমি, দরকার হলে পদত্যাগের জন্যও প্রস্তুত ছিলাম।"

জিজ্ঞাসা করলাম: ভারতবর্ষে এই যে এত সব ক্রিয়াকাণ্ড হয়ে চলেছে এর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের তো উপস্থিতি দেখছি নে।

না, তিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং ভারতীয় রাজনীতির এই এক অন্যতম ট্রাজেডি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ অবধি ভারতীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র অনুপস্থিত—ইউরোপে নির্বাসিত। তিনি অবশ্য নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। কিন্তু স্বদেশের কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা না-থাকার রাজনৈতিক পরিণাম যে কি তা ট্রটস্কি-স্ট্যালিনের বেলায় যা হয়েছিল, সুভাষ-গান্ধীজীর বেলায়ও তাই হয়েছে। পাঁচ বছরের অনুপস্থিতি সুভাষচন্দ্রের পায়ের নীচে দেশের মাটীকে যতখানি শিথিল করেছে, গান্ধীজীর পায়ের মাটী তত মজবুত করেছে; তবু যে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহে অনেকের পায়ের মাটী কেঁপে উঠেছিল সে কেবল সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ সংগঠন শক্তিতে। স্বদেশে পাঁচ বছর

অনুপস্থিতির খেসারত দিতে দিতেই সুভাষচন্দ্রের শক্তি শেষ হয়ে গেছল। তারপর ১৯৪০এর পর একেবারেই বিলীন হয়ে গেলেন।

১৯৩৪এর শেষ ভাগে ইউরোপে থাকতে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন 'ভারতের সংগ্রাম' বইখানি। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার ঐ বইখানির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। তারপরও দুটো বছর গড়িয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৬এর মার্চ মাসে ভারত গবর্নমেন্টকে স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা জানালেন। গবর্নমেন্ট বললেন, সাবধান, এদেশের মাটীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার। সুভাষচন্দ্র বেপরোয়া। গবর্নমেন্টও বেপরোয়া। ১৯৩৬এর ৮ই এপ্রিল স্বদেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। ১৯৩৭এর ১৭ই মার্চ কারামুক্তি পান। কিন্তু তদ্দিনে ভারতের সাংবিধানিক ভাগ্য স্থির হয়ে গেছে, সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন-সিংহাসনে আসীন। সুভাষচন্দ্র আবার চিকিৎসার জন্য ১৯৩৮এ ইউরোপ রওনা হয়ে যান।

সুভাষচন্দ্রের পুনরাগমন

ভারতীয় রাজনীতিতে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল। ১৯৩৮এর ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন, সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তখন লণ্ডনে। এ কি করে সম্ভব হল? কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন, উত্থান-পতন সবই গান্ধীজীর ইচ্ছাধীন ছিল একথা সেকালে কে না জানত?—his word was law এবং সুভাষের প্রতি তাঁর মনোভাবও অনুচ্চারিত, অস্পষ্ট ও অবিদিত ছিল না। তবু এ কি করে সম্ভব হল? আমি মনে করি, সত্য, এ নিয়ে গবেষণা বৃথা। হয়তো এও তাঁর একটা experiment with truth. ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার নির্মম অক্ষালনীয় চিহ্ন আছে, যে আমার-তোমার গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অথবা একটা বছরের অপেক্ষা মাত্র। যে সময় অর্জুনের মতো অনুল্লেখ্য এক ব্যক্তিকে সম্মুখে

রেখে সুভাষের উদ্দেশে তূণীর শূন্য করেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের মতো ভীষ্মদেবকে পরাজয়-মৃত্যুতে শেষ করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে, যবনিকার আড়াল তুলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সে স্বীকারোক্তিও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। প্রণম্য গান্ধী-জীবনের সে কলঙ্ক আজও আমায় অনুশোচনায় ভরিয়ে দেয়।

সুভাষচন্দ্রের অপরাধের রেকর্ড

১৯৩৮-এ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে সুভাষচন্দ্র আনলেন এক নতুন সুর। গান্ধীজী বা গান্ধীপন্থীদের দৃষ্টিতে সব চাইতে বড় অপরাধ হয়েছিল চরকা-খদ্দর-গুড়-লকড়ির বদলে তিনি করেছিলেন এক প্ল্যানিং কমিশন। কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসে যদি কোন জাতীয় সংগঠনাত্মক কাজ হয়ে থাকে তো সে এই। ভারতবর্ষের যাবতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজবুত ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্র সমবেত করেছিলেন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা-বিরহিত বিজ্ঞানীদের। গান্ধী-পরিচালিত নেতৃবৃন্দ যখন কম্যুনাল এওয়ার্ড-বিষাক্ত রাজ্য শাসনের খাদে পড়ে মিথ্যা সংগ্রামের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন তখন এমন একটি প্রকৃত দায়িত্বের কাজ তাঁদের বিরক্ত না করে পারেনি।

"মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র" বইয়ের লেখক শিশির দাস লিখেছেন: "সতীশ দাশগুপ্ত ও কুমারাপ্পা ছিলেন এই (পরিকল্পনা) কমিটির গান্ধীবাদী সদস্য। কিছুদিন বাদেই সতীশ দাশগুপ্ত ও কুমারাপ্পা পরিকল্পনা কমিটি কুটিরশিল্পেও বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে চায়, তাতে হিংসা আসবে—এই অজুহাতে কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন—কারণ গান্ধীজীর অহিংসাবাদী সেবকরূপে তাঁরা যে কাজে হিংসার গন্ধ পাওয়া যাবে, তাতে সম্মতি দিতে পারেন না।"

শিশির দাশ তাঁর বইয়ে বিরোধের কারণ লিখতে গিয়ে সুভাষ-চন্দ্রেরই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমি তোমায় সেটি পড়ে শোনাই:

"বৃটেনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে আপোষ-বিরোধী করে তুলতে কংগ্রেস সভাপতিরূপে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। গান্ধী-শিষ্যেরা

তখন বৃটেনের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করছিলেন এবং তাঁরা এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৮-এর শেষ ভাগে জাতীয় উন্নয়ন ও শিল্পোন্নতির প্ল্যান রচনার জন্য জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করি। মহাত্মা গান্ধী শিল্পোন্নতির বিরোধী ছিলেন বলে এতে আরও অসন্তুষ্ট হলেন। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে মিউনিক চুক্তির পর ভারতীয় জনসাধারণকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে ভারতব্যাপী প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে বলি, এ জনসাধারণের মনঃপূত হয়েছিল কিন্তু গান্ধীবাদীরা অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন। কারণ, তাঁদের মন্ত্রিত্ব এবং পার্লামেণ্টারী কাজে বাধা সৃষ্টি হয়, এ তাঁরা চাননি এবং এসময় কোনরূপ জাতীয় সংগ্রামে তাঁদের আপত্তি ছিল।"

এবার ফিরাও তারে

সুতরাং, তাঁরা স্থির করে ফেলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের হাল ধরতে দেওয়া হবে না। নেপথ্য আয়োজন চলতে লাগল সুভাষচন্দ্রকে প্রতিহত করার।

এ ব্যাপারে স্বয়ং পট্টভি কি লিখেছেন?

বলি, শোনো: "হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ঝড় উঠল ত্রিপুরী অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট পদকে কেন্দ্র করে। ১৯৩৮-এর শেষ নাগাদ জানা গেল যে, সুভাষচন্দ্র এবারও প্রেসিডেণ্ট হবার অভিলাষ পোষণ করছেন।

> "The desire, however, to continne to be President of the Congress in succession over two years need not be motivated by any particular reason. If Jawaharlal had presided thrice, that was because his father, Motilalji desired it at all costs in 1929, the nation desired it at Lucknow in 1936, on his bereavement Gandhiji desired it at Faizpur eight months later."

"লেখককে গান্ধীজী বলেছিলেন, মৌলানা গররাজী হলে তাঁকে (লেখককে) ঐ কাঁটার মুকুট মাথায় তুলতে হতে পারে। ঘোষণায় দেখা গেল তিনজনের নাম, শেষেরটি লেখকের এবং তাঁর

আসছে সভাপতির নাম। সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ আর পট্টভির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। সভার কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরতে না-ফিরতে নেতা জানতে পারলেন এক বিস্ময়জনক ঘটনা। আবুল কালাম আজাদ নিজের নাম প্রত্যাহার করে সমর্থন করেছেন ডাঃ পট্টভিকে। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন···কংগ্রেস-প্রতিনিধেদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডঃ পট্টভিকে সমর্থন করেন।

"······এই মৌলানার সঙ্গে পাশাপাশি বসে কেটেছে দুটো দিন। অথচ ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি তাঁর মনের গোপন কামনা।"

১৯৩৯-এর ১৭ই জানুয়ারী ডঃ পট্টভি সীতারামায়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিলেন: "It is news to me that I have been nominated as a candidate for the Presidentship···আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করতে চাই।

কিন্তু এ বিবৃতিটি পরক্ষণেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কারণটা জানা গেল ২০এ তারিখ প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের এক বিবৃতিতে:

"আমি আমার নাম প্রত্যাহার করব না ধারণা করে ডঃ সীতারামায়া তাঁর নাম প্রত্যাহারে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম।"

আজাদ কিন্তু তাঁর বইয়ে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সমগ্র ব্যাপারটাই চেপে গেছেন।

মৌলানা আজাদের নাম প্রত্যাহারে ও তাঁর বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র একটা জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। "এ বিষয়ে আলোচনাকালে অযথা বিনয়-নম্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই, কেন না বিষয়টি ব্যক্তিগত নয়। ...আমি এখন পর্যন্ত একজন ডেলিগেটের কাছ থেকেও আমার নাম প্রত্যাহারের প্রস্তাব বা পরামর্শ পাইনি; পক্ষান্তরে, আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমাকে

অজ্ঞাতসারে। তিনি তাই প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু মৌলানার অনুরোধে তাঁর মত পরিবর্তন করতে হয়। মৌলানা কেন মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন, তা মৌলানাই জানেন এবং হয়তো জানেন গান্ধীজী।"

এদিকে পরিকল্পনা কমিশন-প্রসাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদের আলো এসে পড়েছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর। নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর "নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ" বইয়ে "বাঞ্চ অব লেটার্স" থেকে দেখিয়েছেন "১৯৩৯-এর কংগ্রেস সভাপতির পদে পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে মনোনীত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅনিল চন্দকে দিয়ে জহরলালের নিকট অনুরোধ পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। বলেও ছিলেন—এবং বলেছিলেন খুব জোর দিয়ে—যে পরিকল্পনা পরিষদের মত একটা নতুন ও গুরুতর বিষয় সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে সুভাষের তো দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।"

উৎকণ্ঠায় গান্ধীজীকেও চিঠি দিয়েছিলেন কবিগুরু। তিনি গান্ধীজীরও গুরুদেব বটেন কিন্তু রাজনীতিতে শিষ্য গুরুর এই 'হস্তক্ষেপ' পছন্দ করছিলেন না। তিনি জওহরলালকে যে চিঠি দেন সেটি তোমায় "নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ" থেকেই পড়ে শোনাই: "গুরুদেব যে চিঠি পাঠিয়েছেন লোক-মারফত, তা তোমাকে পাঠালেম। আমি উত্তর দিয়েছি। বাংলায় বড্ড বেশি দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। এর হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হলে ওঁর মুক্ত থাকা প্রয়োজন। সভাপতির কাজের বাইরে না থাকলে এ কাজ হবে না।....তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে লিখবেন, অথবা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তখন তোমার মতও তুমি জানিয়ো।" নরেন্দ্র নারায়ণ টীকা করেছেন, "ওঁর অর্থ সুভাষ।"

তোমাকে আরও খানিকটা পড়ে শোনাব নরেন্দ্র নারায়ণের বই থেকে:

"১৯৩৮-এর শেষ। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে ওয়ার্ধায়। নতুন বছরের সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। নানা প্রদেশ থেকে

আসছে সভাপতির নাম। সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ আর পট্টভির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। সভার কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরতে না-ফিরতে নেতা জানতে পারলেন এক বিস্ময়জনক ঘটনা। আবুল কালাম আজাদ নিজের নাম প্রত্যাহার করে সমর্থন করেছেন ডাঃ পট্টভিকে। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন···কংগ্রেস-প্রতিনিধেদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডঃ পট্টভিকে সমর্থন করেন।

"······এই মৌলানার সঙ্গে পাশাপাশি বসে কেটেছে দুটো দিন। অথচ ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি তাঁর মনের গোপন কামনা।"

১৯৩৯-এর ১৭ই জানুয়ারী ডঃ পট্টভি সীতারামায়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিলেন: "It is news to me that I have been nominated as a candidate for the Presidentship···আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করতে চাই।

কিন্তু এ বিবৃতিটি পরক্ষণেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কারণটা জানা গেল ২০এ তারিখ প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের এক বিবৃতিতে:

"আমি আমার নাম প্রত্যাহার করব না ধারণা করে ডঃ সীতারামায়া তাঁর নাম প্রত্যাহারে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম।"

আজাদ কিন্তু তাঁর বইয়ে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সমগ্র ব্যাপারটাই চেপে গেছেন।

মৌলানা আজাদের নাম প্রত্যাহারে ও তাঁর বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র একটা জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। "এ বিষয়ে আলোচনাকালে অযথা বিনয়-নম্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই, কেন না বিষয়টি ব্যক্তিগত নয়। ...আমি এখন পর্যন্ত একজন ডেলিগেটের কাছ থেকেও আমার নাম প্রত্যাহারের প্রস্তাব বা পরামর্শ পাইনি; পক্ষান্তরে, আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমাকে

মনোনীত করা হয়েছে; সমাজবাদী অসমাজবাদী সকলের কাছ থেকেই অনুরোধ আসছে আমি যেন সরে না দাঁড়াই। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও ফেডারেশন প্রশ্নে সংগ্রাম সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টরূপে আমার সেবাভার নেবার দাবী যদি ওঠে আমি কি যুক্তিতে নিজেকে প্রত্যাহার করব?"

যবনিকা উত্তোলন

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পরিচয়ে প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, দৌলতরাম ও কৃপালনী এবার পর্দা সরিয়ে দেখা দিলেন এবং বললেন, "সুভাষবাবু দেখছি নতুন নজীর সৃষ্টি করছেন; তা অবশ্য তিনি করতে পারেন; কেবল অভিজ্ঞতায়ই এর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে আমাদের এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

"যখন মৌলানা আজাদ তাঁর নাম প্রত্যাহার করা স্থির করেন, তখন তিনি আমাদেরই পরামর্শক্রমে ডঃ পট্টভির সানুকূলে বিবৃতি দেন। আমরা মনে করি, বিশেষ অবস্থার উদ্ভব না হলে একই প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হবেন না এই নিয়ম মেনে চলা খুবই সমীচীন। ডঃ পট্টভি প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য পাত্র।"

ঐ তারিখেই সুভাষচন্দ্র এক পাল্টা বিবৃতিতে বলেন, এই প্রথম শুনলাম যে, ডঃ পট্টভিকে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত অনেক আলাপ আলোচনার পর করা হয়। আমার তো নয়ই, আমার অন্য সহ-কর্মীদেরও এই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার খবর জানা নেই। স্বাক্ষর-কারীরা নিজেদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বলে পরিচয় না দিলেই ভাল করতেন।

২৫এ জানুয়ারী সর্দার প্যাটেল সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিকে "amazing" বিশেষণ-ভূষিত করলে ২৬এ সুভাষচন্দ্র প্যাটেলের বিবৃতিকে "damaging confession" বলেন। তাঁদের পরামর্শ বৈঠকে ছিলেন, গান্ধীজী, জওহর ও তিনি নিজে। উল্লেখ করে বলেন, "Is it not surprising that neither the President

nor the other members of the Committee knew anything about this ?"

ইতিমধ্যে ডঃ পট্টভি ২৫এ জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন না। ২৬এ জওহরলাল এক বিবৃতিতে বলেন, ফেডারেশন নির্বাচনের কোন ইস্যুই নয়। সুভাষচন্দ্র বললেন: ফেডারেল ক্যাবিনেটের সম্ভাব্য তালিকা পর্যন্ত প্রস্তুত! ২৭এ সুভাষচন্দ্র আরও একটি বিবৃতি দেন; ২৯এ বেরোয় নির্বাচন ফলাফল। আমার এখন আর অঙ্কটা মনে নেই। শ্রীশিশির দাসের বইয়ে দেখছি ১৬৯০-১৩৭৭ ভোটে সুভাষচন্দ্র জিতেছেন; আমি নৃপেন মিত্রের য়্যানুয়াল রেজিষ্টার-এ পাচ্ছি ১৫৭৫-১৩৭৬। শিশির দাস বলেছেন, বাংলা দেশের ৮০জন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, মিত্রের হিসেবে দেখছি ৭৯জন। মিত্র এক জায়গায় বলেছেন মহাকোশল বাদে ২১টি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ ভোট দিয়েছে, বিস্তারিত হিসেবে দিচ্ছেন ২০টি প্রদেশ।

দাঁড়াইনু বিশ্বসভা মাঝে

ফলাফল প্রকাশের দু-দিন পর ৩১এ জানুয়ারী গান্ধীজী এক চমকপ্রদ বিবৃতি দিলেন:

"Mr. Subhas Bose has achieved a decisive victory over his opponent Dr. Pattabhi Sitaramayya. আমাকে স্বীকার করতে হবে আমি নিঃসন্দেহে তাঁর (সুভাষের) পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। এর কারণ বলা আমি দরকার বোধ করছি নে। তাঁর সব ইস্তাহারে তিনি যে সব তথ্য বা যুক্তি দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। তথাপি আমি তাঁর জয়লাভে আনন্দিত এবং যেহেতু ডঃ সীতারামায়ার নাম প্রত্যাহার না করার মধ্যে আমার হাত আছে একজন্য এ পরাজয় তার চাইতেও বেশী আমার—The defeat is more mine than his. এ পরাজয়ে আমি উল্লসিত। .... After all, Subhas Babu is not an enemy

of his country. যাই হোক, সুভাষবাবু তাঁর দেশের শত্রু নন।

ঐ বিবৃতিকে পট্টভি "ঐতিহাসিক" আখ্যা দিয়ে বললেন : দেশে এ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল :

> "There was searching of hearts, a revolution in positions. Those who had voted for Subhas Babu came out with a fresh voting of confidence in Gandhiji and Gandhiji's leadership...... The original voting took place on the 29th January, 1939. Within a week it looked as though tables were turned...........created a situation altogether unenviable for the newly elected President...."

তোমায় বলব কি, সত্য, গান্ধীজীর মন্তব্য শুনে সেদিন আমার অহিংস সত্তায় দাবদাহ ঘটেছিল। গান্ধীজী যখন ভারত-শত্রু ইংরাজের প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধের ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের গৌরবে ভূষিত তারও অনেক আগে বাংলাদেশ অনেক রক্ত ঢেলেছে দেশমাতৃকার চরণে; দেশপ্রেমের বেদীমূলে গান্ধীজী একান্তই নবাগত; তাঁর কাছে প্রমাণপত্র নিয়ে বাংলাদেশের সুভাষচন্দ্রকে দেশপ্রেমিক না দেশের শত্রু তা স্থির করে নিতে হবে? সেদিন আমার কাছে সেই প্রণম্য মহাত্মা বড্ড ক্ষুদ্র, বড্ড সাধারণ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর অহিংসায় নাকি হিংসার স্থান নেই; পরাজয় মেনে যদি তিনি দেশ-নির্বাচিত নেতাকে মেনে নিতেন, একথা স্বীকার করতাম। তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণতা সেদিন বড্ড বেশী প্রকট হয়েছিল। তিনি অদম্য ক্রোধবশে কংগ্রেস নির্বাচকমণ্ডলীকে পর্যন্ত বোগাস বলেছিলেন।* একথা স্মরণ করতেও আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। কিন্তু তোমায় বলেছি, বেদনা নইলে ইতিহাসের স্বাদ থাকে না, গতিও থাকে না।

নির্বাচনের পর ২রা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জওহরলালের দেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে; আলোচনাও হয়েছিল। ফয়সালা

* মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ১১৩

কিছু হয়নি। যাঁরা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা কলকাতায় এসে ফেডারেশন সম্পর্কে দৃঢ়তর মনোভাব অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

অসুরের উৎপীড়ন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য—মৌলানা আজাদ, শ্রীমতী নাইডু, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, যমুনালাল বাজাজ, জয়রাম দাস দৌলতরাম, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সীতারামায়া, আবদুল গফফর খান, হরেকৃষ্ণ মহতাব, জে. বি. কৃপালিনী কমিটির সদস্যপদ থেকে এক মাসের মধ্যে অব্যাহতি চাইলেন ১০ই ফেব্রুয়ারী। কিন্তু এক মাসের ত্বরাও সইল না, ২২এ ফেব্রুয়ারীই পদত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে জওহরলাল ২০এ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেই সম্ভবত এটি ত্বরান্বিত করেছেন। ২৬এ সুভাষচন্দ্র এঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন।

যদিও সুভাষচন্দ্র এঁদের সমবেত শক্তির সমকক্ষ, কেননা, এঁদের প্রকৃত শক্তি ছিল বাইরে, তবু অতিরিক্ত কার্যভারে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন ৪ঠা মার্চ; জ্বর উঠল ১০৪ ডিগ্রীতে। স্বভাবতঃই ডাক্তার নিষেধ করলেন ত্রিপুরী গিয়ে ৫২তম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে। নিষেধ শুনলেন না। কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ এ. আই. সি. সি. বা বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যোগ দিতে পারলেন না এবং এদিকে মহাত্মার অহিংস ও সত্যের উপকরণে অভিমন্যুর বক্ষ লক্ষ্য করে তাঁরা যে মৃত্যু-শেল তৈরী করেছিলেন "নিষ্ক্রম্প্র" হাতে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তাই নিক্ষেপ করলেন :

> "The Congress declares its firm adherence to the fundamental policies of the Congress which have governed its programme in the past twenty years under the guidance of Mahatma Gandhi and is definitely of the opinion that there should be no break in these policies, and

চেয়ারটা ওঁদের পক্ষে দখল করলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং এই সুযোগ তাঁরা নিয়ে এলেন পন্থ-প্রস্তাব, সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব কংগ্রেস-বহির্ভূত গান্ধীজীর ইচ্ছা-রজ্জুর সাতপাকে বাঁধতে। এবং এক্ষেত্রে আর একবার প্রমাণিত হল কি চোরা-বালির ওপর তথাকথিত বামপন্থী কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল।

মর্মান্তিক পন্থ-প্রস্তাবের মর্মার্থ কি ছিল? বলা হল, গান্ধীজীর প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করতে হবে।

বাঃ! ১৯৩০এ না এঁরাই—

ধীরে, রজনী, ধীরে। হ্যাঁ, এঁরাই, এই সুভাষচন্দ্রকে বাদ দেবার জন্যই বলেছিলেন ক্যাবিনেট সিসটেমের কথা এবং বলেছিলেন, সভাপতির অনিচ্ছায় কাউকে সভাপতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এবার লোক-নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পঙ্গু করার জন্য একেবারে বিপরীত প্রস্তাব গৃহীত হল কার স্বার্থ ও ইসারায় অনুমান করা শক্ত নয়। গান্ধীজী জওহরলালকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে বলেছিলেন; তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করে-ছিলেন।

বড়লাট-গান্ধীজী সাক্ষাৎ

ত্রিপুরীতে সুভাষ-নিধন পালার প্রথম অঙ্কে যবনিকাপাত হতেই গান্ধীজী ১৫ই মার্চ নয়াদিল্লীতে গেলেন বড়লাটের সঙ্গে কথা কইতে; ছু'ঘণ্টা আলাপ হল। রাজকোট নামক একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য নিয়ে যথেষ্ট বাষ্পের সৃষ্টি করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই।

তবে ১৯এ মার্চ গান্ধীজীর সঙ্গে নেহরু, প্যাটেল, পন্থ ও ভুলাভাই দেশাইর যে বৈঠক হল, তা যে ত্রিপুরী-বিজয়-কাহিনীমুক্ত ছিল না, পন্থজীর নামটিই তার নিঃসংশয় প্রমাণ। এবং স্থির হ'ল এবার ডাকতে বা ডাকাতে হবে এ. আই. সি. সি.। অহিংস মতেও আহত পশু অপেক্ষা নিহত পশু নিরাপদ।

নির্বাচনের ধরণ দেখে আমি এই কথাই মনে করি যে, দূর থেকেই আমি দেশের সেবায় আরও বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো।...আশা করি এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। অধিবেশনে যোগ দিতে তুমি কিন্তু আমায় বাধ্য করো না।"

Experiment with untruth চলেছে, সত্য, আঁচ করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র মোক্ষম কথা বলতে পারেন এবং বললেনও, ঐ স্ট্রেচারে শায়িত অবস্থায়ই :

> "The time has come for us to raise the issue of Swaraj and submit our national demand to the British Government in the form of ultimatum."

এ-কথাই প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হল। কিন্তু এ-যাবৎ যাঁরা দক্ষিণপন্থীদের নিন্দায় নিজেদের সমাজবাদী বা প্রগতিশীল বলছিলেন অথবা যাঁরা ভোট দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করেছেন তাঁদের মধ্যে এই প্রথম সন্ত্রস্ত ভাব দেখা দিল, তাঁরা এ প্রস্তাব দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে মিলে নাকচ ক'রে দিলেন।

সুভাষচন্দ্রের পীড়া নিয়ে দক্ষিণীমহলে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের ঢেউ খেলেছে, কেউ কিছু গোপনও করেন নি। বলেছেন, ও পলিটিকাল ফিভার। অভ্যর্থনা সমিতির ডাক্তার পর্যন্ত— স্বীকার করতে চান নি।

"পরে করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হল তাঁরই পরামর্শে। বোর্ডের সভ্য হলেন সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরারের সিভিল হাসপাতালের ইনস্পেক্টার জেনারেল, ডাইরেক্টার অব পাবলিক হেলথ; আর জব্বলপুরের সিভিল সার্জেন। এঁরা যুক্ত বিবৃতি দিলেন রোগী সম্পর্কে। রোগ সত্যি এবং সাংঘাতিকও।"*

বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন বিরুদ্ধাচারী নেতৃবৃন্দ। এক পঙ্‌ক্তিতে বসবেন না বলে যে মঞ্চ থেকে তাঁরা জোটবদ্ধ হয়ে নেমে এসেছিলেন তারই কন্ডেটেবল

* নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

চেয়ারটা ওঁদের পক্ষে দখল করলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং এই সুযোগ তাঁরা নিয়ে এলেন পন্থ-প্রস্তাব, সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব কংগ্রেস-বহির্ভূত গান্ধীজীর ইচ্ছা-রজ্জুর সাতপাকে বাঁধতে। এবং এক্ষেত্রে আর একবার প্রমাণিত হল কি চোরা-বালির ওপর তথাকথিত বামপন্থী কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল।

মর্মান্তিক পন্থ-প্রস্তাবের মর্মার্থ কি ছিল? বলা হল, গান্ধীজীর প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করতে হবে।

বাঃ! ১৯৩০এ না এঁরাই—

ধীরে, রজনী, ধীরে। হ্যাঁ, এঁরাই, এই সুভাষচন্দ্রকে বাদ দেবার জন্যই বলেছিলেন ক্যাবিনেট সিসটেমের কথা এবং বলেছিলেন, সভাপতির অনিচ্ছায় কাউকে সভাপতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এবার লোক-নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পঙ্গু করার জন্য একেবারে বিপরীত প্রস্তাব গৃহীত হল কার স্বার্থ ও ইসারায় অনুমান করা শক্ত নয়। গান্ধীজী জওহরলালকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে বলেছিলেন; তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করে-ছিলেন।

বড়লাট-গান্ধীজী সাক্ষাৎ

ত্রিপুরীতে সুভাষ-নিধন পালার প্রথম অঙ্কে যবনিকাপাত হতেই গান্ধীজী ১৫ই মার্চ নয়াদিল্লীতে গেলেন বড়লাটের সঙ্গে কথা কইতে; দু'ঘণ্টা আলাপ হল। রাজকোট নামক একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য নিয়ে যথেষ্ট বাষ্পের সৃষ্টি করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই।

তবে ১৯এ মার্চ গান্ধীজীর সঙ্গে নেহরু, প্যাটেল, পন্থ ও ভুলাভাই দেশাইর যে বৈঠক হল, তা যে ত্রিপুরী-বিজয়-কাহিনীমুক্ত ছিল না, পন্থজীর নামটিই তার নিঃসংশয় প্রমাণ। এবং স্থির হ'ল এবার ডাকতে বা ডাকাতে হবে এ. আই. সি. সি.। অহিংস মতেও আহত পশু অপেক্ষা নিহত পশু নিরাপদ।

সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠন বা এ. আই. সি. সি'র অধিবেশন আহ্বানের বিলম্বের একটা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললেন, বুঝতে পারছি নে, পন্থ প্রস্তাবটি আমার পদত্যাগের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে কিনা। গান্ধীজীকে এজন্য চিঠি লিখে চলেছেন।

তারপরের দিন, ১৮ই এপ্রিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য-প্রফুল্লচন্দ্র একটা নিষ্পত্তির জন্য গান্ধীজী ও সুভাষের কাছে তার পাঠালেন।

ইতিমধ্যে বড় দুঃখে সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে এক চিঠি লিখে-ছিলেন: "সমগ্রভাবে নির্বাচনী দ্বন্দ্বটাকে যদি ধরা যায়, তাহলে লোকে কি একথা ভাবতে পারে না যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হবার পর সমস্ত তিক্ততার অবসান ঘটবে এবং মুষ্টিযোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধশেষে সকলেই হেসে করমর্দন করবে? কিন্তু তোমাদের সত্য এবং অহিংসা সত্বেও ইহা ঘটে নি। খেলোয়াড়ী মন নিয়ে তোমরা নির্বাচনের ফল গ্রহণ কর নাই, তোমরা আমার বিরুদ্ধে অন্তরে অভিযোগ পোষণ করে প্রতিহিংসা নিতে আরম্ভ করেছ। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে তুমি আমার বিরুদ্ধে লগুড় ধারণ করেছ, সে অধিকার অবশ্য তোমার আছে।····ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা আমার (সভাপতির) অনুপস্থিতিতে বৈঠক করে আমাকে না জানিয়ে পট্টভিকে সভাপতি পদে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত কি অন্যায় হয় নাই? আমার নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর সর্দার প্যাটেলের এই উক্তি কি অন্যায় হয় নাই? ভোট ক্যানভাসের জন্য বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীমণ্ডলীকে ব্যবহার করা কি অন্যায় হয় নাই?"*

জওহরের জবাবে মোদ্দা কথাটা দাঁড়িয়েছিল: "আমার মনে হয়, প্রকৃতিগতভাবে আমরা কতকটা বিপরীতমুখী এবং জীবন ও সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এক নয়।"

* "মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র"

জওহর গান্ধীজীকে চিঠি লিখলেন : বর্তমান সমস্যা আলোচনার জন্যে সুভাষ আমাকে ডেকেছেন।……আমার 'না' বলবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে কী বলবো তাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম স্থির করবার সম্পূর্ণ ভার আপনার ওপর ছেড়ে দেবার পরামর্শ ছাড়া আমি তো আর কোন পরামর্শ তাঁকে দিতে পারছিনে। তিনিও দু-একজনের নাম না-বলতে পারেন তা নয়, কিন্তু একথা তাঁকে স্পষ্ট করে বলতেই হবে যে, সে-নাম আপনি ইচ্ছে করলে রাখতে পারেন আবার অগ্রাহ্যও করতে পারেন। ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থার কথাও আছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব এ ব্যাপারে স্থির নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। অতীতের পারম্পর্য আর কর্মসূচী মানতে হবে, তার বাইরে যাওয়া চলবে না। সুভাষ যদি এতে রাজী হন, তাহলে দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে।"**

শিশির দাস তাঁর বইয়ে এই প্রসঙ্গে 'হিউ টয়'-এর যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আমি তাই তোমার পুনরুদ্ধার করে শোনাই :

> "It was indeed his second turning point. The first, he would have claimed, had been the result of a British injustice, now it was the injustice of his own people, his own comrades. For he had been democratically elected in preference to Gandhi's nominee; he was President, inspite of the will of Gandhi ....His popular in mandate had been denied by, intrigue, intrigue not only against himself, but against the democracy which had elected him."

গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অনেক পত্রালাপ হয়েছে এই নিয়ে। গান্ধীজী অনায়াসে যে স্তরে নেমে বলতে পেরেছেন after all he is not an enemy of the country, সুভাষচন্দ্র সে স্তরে নামতে

** "নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ"

পারেন নি, তাঁর মার্জিত বাঙালীর রুচিবোধ ও বিনয়-নম্রতা সুভাষ-চন্দ্রের চিঠিগুলোকে করে তুলেছিল স্নিগ্ধ। সে পত্রাবলী পাঠের সুযোগ করে নিও তুমি, সত্য আমার কাছে কিন্তু অনেক পত্রে সুভাষের বিনয়াতিশয্য ও আত্মসমর্পণের প্রবণতা বিরক্তিকর লেগেছে, সে সব তুমি পড়ে নিও।* এর শেষ কথা হচ্ছে, গান্ধীজীর কঠিন অনমনীয়তায় কোন মীমাংসায় পৌঁছানো যায়নি। গান্ধীজী জানতেন, আবেগপ্রবণ লোকেদের কোন কোন নার্ভ অত্যন্ত দুর্বলও থাকে, তার ওপর অবিরাম চাপ দিতে থাকলে একবার আর্তনাদ উঠবেই, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

আসলে দুটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত চলেছিল, ত্রিপুরী তার শীর্ষারোহণ এবং ৩০শে এপ্রিল-১লা মে তারিখে কলকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তার অবতরণ। সুভাষচন্দ্র নিরুপায়বোধে পদত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্রের সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে গান্ধীজী ছিলেন সোদপুরে; সুভাষচন্দ্র সেখানে গিয়েও তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করেছেন ২৭এ এপ্রিল; পরদিন আরও ৭জন প্রাক্তন ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যের সঙ্গেও, কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌঁছোনো যায়নি। প্রত্যেক আলাপের মর্মকথা ছিল নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ।

ওয়েলিংটনে অন্ত্যেষ্টি

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এ. আই. সি.সি.-মঞ্চে ২৯এ এপ্রিল বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণার পর এত দীর্ঘদিনের দীর্ঘায়ত আলোচনার সারাংশ উদ্ঘাটিত হল। সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদ ত্যাগ করতে গিয়ে গান্ধীজীর এই জীবন-বাণী পড়লেন:

> "Knowing your own views and knowing how you and most of the members (of the old Working Committee)

*. "সর্বসাকুল্যে ৪৯ খানা পত্র এবং টেলিগ্রাম নেতা গান্ধীজীকে লিখেছিলেন। নেতার প্রতিখানা পত্রের ছত্রে ছত্রে আছে সৌজন্য, ধৈর্য ও গান্ধীজীর ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধার পরিচয়।" —নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ।

differ in fundamental, it seems to me that if I gave you names it would be on imposition on you. Such being the case you are free to chose your own committee."

কিন্তু পন্থ-প্রস্তাব তো সেই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্যই। সুভাষচন্দ্র বললেন: তিনি যদি নিজের পছন্দমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন তবে তিনি এ. আই. সি. সি. কে একথা বলতে পারবেন না যে,

"such a Committee commanded the implicit confidence of Mahatma Gandhi."

অতএব তিনি পদত্যাগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী নাইডুকে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীমতী নাইডু আসন গ্রহণ করার পর পণ্ডিত জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করে বলেন, পুরোনো ওয়ার্কিং কমিটিই থাক, তার সঙ্গে "নতুন রক্ত" নেবার আপনি দুটো অবকাশ পাচ্ছেন; যমুনালাল বাজাজ জেলে এবং জয়রামদাস দৌলতরাম অসুস্থ।

এখানেই সেই সুভাষচন্দ্রের হোমোজিনিয়াস ও কম্পোজিট প্রশ্নটি ওঠে। তিনি বলেন, লোকের আশঙ্কা এক কমিটিতে বিভিন্ন মতাবলম্বী থাকলে কাজের অসুবিধে। তাঁর জবাব হচ্ছে, সমগ্র কংগ্রেসে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক নেই? এ. আই. সি. সিতে নেই? তবু তো একটা মিলনক্ষেত্র আছে; শক্তিশালী একটা ক্যাবিনেট গড়তে গেলেও তাতে কংগ্রেসের বিভিন্ন মত প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

"If we want a strong cabinet with a dynamic urge, it is necessary for us to put representatives of different shades of opinion in the Congress, giving the majority to those who will ensure continuity of policy."

এরপর নাটকের এই অঙ্কের আর বিশেষ বাকী নেই। চৈতরাম গিদোয়ানীর প্রস্তাবক্রমে ও মোহনলাল সকসেনার সমর্থনক্রমে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

চিরতরে ?

হ্যাঁ, এরপর সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, ওয়ার্কিং কমিটির নতুন কার্যবিধির বেড়াজাল, তারপর সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়নের গিলোটিন। এটা কি মাস সত্য ?

আমি হকচকিয়ে বললাম, এপ্রিলের শেষ, মে মাস পড় পড়।

বললেন, হ্যাঁ, এই অসহ্য দাবদাহের মধ্যে যদি হঠাৎ বর্ষার আশীর্বাদ নামে ? সুভাষচন্দ্রের অসহ্য তাপ-পীড়িত জীবনেও এক আশীর্বাদের বর্ষা নেমে এসেছিল :

রবীন্দ্রনাথের নেতাবরণ

"বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।" বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, "গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি।......দুর্ভাগা যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি ; কাছের তারা দূরে ফেলে, আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন......"

ছত্রে ছত্রে অন্তরোদ্গত স্নিগ্ধ স্নেহাশীষের ঝরণা। নিষ্ঠুর ইতিহাস-বর্ণনায় আমার সময় সীমাবদ্ধ, তুমি পড়ে নিও।

কিন্তু, আমার মতে, সত্য, সুভাষচন্দ্র ওয়েলিংটনে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। তিনি যে-শক্তি নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গড়তে লাগলেন, সেই শক্তি নিয়েই তো তাঁর মনোমত সাথীদের নিয়ে ক্যাবিনেট বা ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে পারতেন। নাই-বা থাকত তাতে গান্ধীজীর আশীর্বাদ বা আস্থা, কংগ্রেসের সংগঠন তো তাঁর হাতে থাকত ?

ওঁদেরই বরং কংগ্রেস ছেড়ে যেতে হত। সুভাষচন্দ্রের এই আশঙ্কাও অমূলক যে এ. আই. সি. সিতে পন্থ-প্রস্তাবের লগুড় নিয়ে তাঁরা ঐ ক্যাবিনেট বানচাল করে দিতেন। আমি মনে করি, ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ালেও দক্ষিণপন্থীরা জিততে পারতেন না, কেননা, গান্ধীজীর যে-চিঠিখানি পড়ার পর তিনি পদত্যাগ করলেন, সে-চিঠিই তাঁর সপক্ষে হত। সুভাষচন্দ্র কম্পোজিট ক্যাবিনেটের ওপর জোর না দিয়ে পছন্দমতো হোমোজিনিয়াস ক্যাবিনেট করার সাহস দেখালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-চরিত্রই যেত বদলে। উত্তরকালে বিদেশে স্বনির্বাসিত অবস্থায় সুভাষচন্দ্র যে অসাধারণ বীর্যবত্তা, প্রতিভা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তার কল্যাণ ভারতবর্ষেই উৎসারিত হতে পারত। ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যনির্ণয়ে সুভাষচন্দ্রের দৈহিক অনুপস্থিতি ঘটেছিল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭; আসলে এই অনুপস্থিতির কাল ১৯৩৩ থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপের সুযোগ নিয়েছে অপরে।

"সকল কাঁটা ধন্য করে"

সেদিন গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর আদরের বেড়াল ছানাটার সঙ্গে খেলছেন; উনি ওকে মারবার ভান করছেন, ছানাটা ওর ছোট্ট থাবা দিয়ে ওঁকে আঁচড়াতে চাইছে, মাঝে মাঝে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচও করছে। মনে হল, খুব উপভোগ করছিলেন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত হতেই বললেন:

সংগ্রাম চলেছে, সত্য, সংগ্রাম। আহত পশুকে ছেড়ে দেব না কিছুতেই, বোম্বাইয়ে আমরা প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রস্তাব করেছি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না নিয়ে কোন কংগ্রেস কর্মীর আইন অমান্য আন্দোলন করা চলবে না।

সুভাষচন্দ্র অবিরাম সংগ্রামের কথা বলে চলেছেন। এখন তিনি সভাপতিপদ-মুক্ত কিন্তু এখনও কংগ্রেসে; সুতরাং, সংগ্রামীকে নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধতে হবে। বোম্বে এ. আই. সি. সিতে ঐ প্রস্তাব গৃহীত

হবার পরও সুভাষচন্দ্র বললেন : "The time is now ripe for India to embark upon an active struggle for independence. A splendid opportunity for demanding indepedence from Britain will be lost if not availed of now."

কেন? কি এমন সুবর্ণ মুহূর্ত? ইউরোপের আকাশ তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মেঘে ছেয়ে ফেলেছে। লেবেনস্রাউম! নাৎসী-বাহিনীর গুজ স্টেপ, ব্লিৎসক্রিগ, ফিফ্‌থ কলাম প্রস্তুত।

আমার স্বদেশেও চলছে সংগ্রাম; কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে হিন্দুদের ব্যর্থ সংগ্রাম; মুসলিম-তোষণে কংগ্রেসের নিষ্ফল প্রচেষ্টা; সত্যাগ্রহের অধিকার নিয়ে বামপন্থীদের বন্ধ্যা প্রতিবাদ ও সুভাষ-চন্দ্রের বলিদান; বাংলার কারাগারে রাজবন্দীদের বাঁচার লড়াই; বামপন্থী সংহতির মিথ্যা আশা; দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের ক্ষমতা রক্ষার অহিংস আহব।

কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে হিন্দুদের সংগ্রাম এক কথায়ই সমাপ্ত করে দেওয়া যায় যে, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস বা বিপ্লবী সংস্থার বাইরে একান্তভাবে হিন্দুদের সংগঠন কখনই সংগ্রামের শক্তি অর্জন করতে পারেনি; বিপ্লবীরা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে গবর্নমেণ্টও হিন্দুমহাসভাকে কখনও প্রবল মনে করেননি; খুব বড় বড় সভা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য রায় প্রমুখ ব্যক্তিরাও কম্যুনাল এওয়ার্ডের প্রতিবাদে কণ্ঠ মিলিয়েছেন; কিন্তু কম্যুনাল-এওয়ার্ড ফ্রণ্ট সংগ্রামী ফ্রণ্ট নয় বলে কখনও সত্যিকারের সরকারী স্বীকৃতিলাভ করেনি।

কম্যুনাল এওয়ার্ডে সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছে সব চাইতে বেশী। পৃথক নির্বাচনে তাঁদের পরিচয় হয়েছে মুসলমানই; এজন্য যাঁরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মুসলমান জন-সাধারণের কাছে গেছেন—যেমন মুসলিম লীগ—তাঁরাই ক্রমশঃ

আসর জমিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসও বাস্তব রাজনীতিবশে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের গৌণ করে রেখে লীগের তোষণে উৎকণ্ঠা দেখিয়ে লীগকে মুখ্য করে তুলেছে। কনসেসন দিয়েছেন, তুষ্ট করতে পারেনি।

সত্যাগ্রহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যেই গান্ধীজীর উদ্যোগে বিতাড়িত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে লেফট কনসলি-ডেশনের কাঁচা তক্তাগুলো মড়মড় করে ভেঙে গেল। দক্ষিণপন্থীরা অনায়াসেই তারপর কংগ্রেসকে বামপন্থী-কণ্টক-মুক্ত করলেন। রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে তখন একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ—আরও টেবলেট করে বলা যায়—জিন্না। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস এত সংহত যে আর কাউকে পরোয়া করে না। এবং একমাত্র লীগকে পরোয়া করতে করতে একদিকে হিন্দু সম্প্রদায় অন্য দিকে জাতীয়বাদী মুসলমানদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়ে রাজ্যলাভ করেছে।

"অনশনের পেটেণ্ট রাইট"

তুমি জান, সত্য, গান্ধীজী রাজনৈতিক অনশন সম্পর্কে নিদারুণ স্পর্শকাতর ছিলেন। তিনি ওটি বরাবরই তাঁরই স্বাধিকারে রাখতে চেয়েছেন এবং তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যখনই কেউ রাজনৈতিক অনশন করেছেন তিনি নির্বিচারে নিন্দা করেছেন। একে তো সুভাষচন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ তাঁকে সর্বদাই টেণ্টারহুকে রেখেছে তার ওপর "দুর্নীতি-গ্রস্ত" (—গান্ধীজী) বাংলা দেশেরই কিছু রাজনৈতিক বন্দী কারাগারে অনশন করে বসলেন। শুনে গান্ধীজী দুবার এমন বিরূপ মন্তব্য করলেন যে বন্দীদের অসামান্য ক্ষতি হল এবং বাংলাদেশের লীগ সরকার আরও শক্তি পেলেন। পণ্ডিত নেহরুকে অনুরোধ করা হল, এটাকে ইস্যু করে কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে পারেন না? তিনি ততখানি জোর দিয়ে বললেন, না, why should they resign? গান্ধীজী প্রথমবার বললেন: Inadvisable and bad in any case." দ্বিতীয়বার বললেন, এ অনশন অযৌক্তিক। সুতরাং

এই জীবন-মরণের প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ালো একান্তভাবে বাংলার ; কেননা, বাংলা তো উদাসীন থাকতে পারে না ? ১৭ই জুলাই কলকাতায় হরতাল হল। ৩১এ জুলাই জনসভা হল। গান্ধীজীর মন্তব্যে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন : It will strengthen the hands of the Government.

অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত, বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃসর্ত অনশন ভঙ্গ করতে হল।

বামপন্থীর অন্তিম যাত্রা

বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করে দক্ষিণপন্থী এ. আই. সি. সি. যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বামপন্থী কংগ্রেসসেবীদের একাংশ তার প্রতিবাদে ৯ই জুলাই একটি সারাভারত দিবস পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তোমায় বলেছি, চোরাবালির ওপর একটা লেফট কনসলিডেশন কমিটি (L.C.C.) দাঁড় করানো হয়েছিল, সেই স্বল্পায়ু সংস্থাটিই এর উদ্যোগভার নিল। সুভাষচন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত ও জোটবদ্ধ দক্ষিণপন্থী-মনোনীত প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৬ই জুলাই রাঁচী থেকে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। "এইভাবে যদি এ. আই. সি. সি'র অধস্তন কমিটিগুলো ও তাদের কর্মকর্তারা এসব প্রস্তাব অমান্য করেন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন তবে কংগ্রেসে শৃঙ্খলার অবসান ঘটবে এবং সংগঠন ভেঙে পড়বে।" লেফট কনসলিডেশন কমিটি (লেঃ কঃ কঃ) বা বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (বাঃ সঃ কঃ) ৮ই জুলাই এই বিবৃতির একটি প্রতিবাদ জানালো বটে কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা ইতিমধ্যে বামপন্থীর চোরাবালি সম্যক জানতে পেরেছিলেন এবং এজন্য দ্রুতগতি ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। ভেতরের খবর ও অন্যান্য বামপন্থী নেতার প্রকাশ্য বিবৃতি থেকে তাঁরা নিঃসংশয় হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে আগষ্টের শেষ সপ্তাহে। ঠিক তার দু'মাস আগে ঐ কমিটির অন্যতম শরিক এম. এন. রায় বলেছিলেন :

"খুবই খুশীর কথা যে বামপন্থী শক্তিকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।" এ বছরকার সভাপতি-নির্বাচনকে "One of the momentous incidents in the contemporary history of our country" অভিহিত করে তিনি বললেন: 'কম্পোজিট' নেতৃত্ব একটা অবাস্তব প্রস্তাব।...এটা হোমোজিনিয়াসই হওয়া দরকার। বিপ্লব-বিরোধী লোক নিয়ে আপনি বিপ্লব করতে পারেন না। অসুবিধেগুলোর দিকে চোখ বুঁজে থেকে লাভ নেই। একটা প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে মতৈক্য না হওয়া পর্যন্ত বাম-পন্থী শক্তিসমূহের ঐক্য হতে পারে না।

পরে, (৯ই জুলাই) আরও স্পষ্টতর করে বললেন: "আজকে আমরা দক্ষিণপন্থীদের উৎপীড়নের অভিযোগ করে থাকি। কিন্তু কে তাঁদের এই একচেটিয়া অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ দিয়েছে? স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণের যে সুযোগ এসেছিল বামপন্থীরা তা নিতে পারেননি বলেই তা হয়েছে। যখন ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করল তখন প্রেসিডেন্টের পক্ষে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাঁর কর্তব্য ছিল এগিয়ে যাওয়া, নিজের পছন্দ মতো কমিটি গঠন করা এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। আমি কোন গোপন কথা ফাঁস করছি নে যখন আমি বলছি, আমি তাঁকে বরাবর এই পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু তিনি অন্য পন্থা স্থির করেছিলেন এবং পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।"

সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বললেন: বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের বিবাদের বিষয়টা নতুন সংগ্রাম-সূচনার সময় নিয়ে।" অর্থাৎ মৌলিক কোন কারণ নয়। ওঁরই সহচর অশোক মেহতা বললেন: "A contest between the two will, therefore—apart from enabling Dame History, in Rammonohar Lohia's striking phrase, to play coquette with the two—only end in weakening the Congress and receding the dawn of our freedom."

বুঝতে পারছ, সত্য, বামপন্থী সমন্বয় ইতিমধ্যেই কতখানি রিসিড করে গেছে; পেছু হটে গেছে ? লীগ অব দি র‍্যাডিকাল কংগ্রেসমেন ২৫এ জুলাই পরিষ্কার বলে দিলেন,

> "Now we are free to speak and dissociate ourselves from efforts for establishing unity of divergent elements having conflicting views about the function of the Left Wing.........
> "আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, লেঃ কঃ কঃ যে পন্থা নিয়েছেন তার দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হবে না। We are also of the opinion that it is not permissible for responsible Congressmen to organise public demonstrations in which anti-Congress elements are bound to participate...."

সুতরাং, সন্দেহের অবকাশ নেই, সুভাষচন্দ্র একা পড়ে গেলেন, isolated. দক্ষিণপন্থীরা আর সবাইকে ছেড়ে সুভাষচন্দ্রকেই আক্রমণ-লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল তো সোজা বলে দিলেন, "সুভাষবাবু শত্রুদলে ভিড়েছেন (has chosen to join the ranks of the enemies.")

সত্য, ক্ষেত্র প্রস্তুত।

সুভাষচন্দ্র বৃথাই এর প্রতিবাদ করেছিলেন ; চরম গিলোটিন নেমে আসছিল তাঁর গ্রীবাদেশে। ১২ই আগষ্ট অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার হেড লাইন হল : Disciplinary Action Against Subhas Bose ; তার নীচে তিনটি সংবাদ সাজানো : War Preparations : Three Years Ban : Calcutta Reaction. সংবাদ হচ্ছে এই :

> "The Congress Working Committee at its afternoon sitting to-day resolved that 'for his grave act of indiscipline' 'Sri Subhas Chandra Bose is declared disqualified as President of the Bengal Provincial Congress Committee and to be member of any elective Congress Committee for three years as from August, 1939."

নাটকের পঞ্চমাঙ্কের আর একটু বাকী। সূত্রধরের ভূমিকা।

যবনিকার সামনে পাদপ্রদীপের আলোকে বেরিয়ে এসে গান্ধীজী বললেন :

"I owe it to the public to make my position clear about both these resolutions.

"আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সুভাষবাবু সংক্রান্ত প্রস্তাব-টির খসড়া আমারই! I can say that the members of the Working Committee would have shirked the duty of taking action, if they could have. তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের এ কাজের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় উঠবে। যে প্রস্তাব কোন ব্যক্তির তোয়াক্কা রাখে না এমন প্রস্তাবের চাইতে একটা মামুলী প্রস্তাব করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল। কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করার অর্থ হত কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিহার। আমার মতে ওয়ার্কিং কমিটি যে দণ্ড দিলেন ত ন্যূনতম।"

ঐ প্রস্তাব ও এই স্বীকারোক্তিতে নিঃসন্দেহে বীর্যবত্তা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে যখন স্মরণ করি যে, তিনি কংগ্রেসের কেউ নন, অথচ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা তাঁর হাতে টিনের পুতুলে প্রতিপন্ন হল। তিনি আরও বললেন :

"আমি প্রস্তাবের সঙ্গে নিজের পরিচয় রাখতে অথবা ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য কমিটির সভায় যোগ দিই নি। I attended in the pursuit of my mission of non-violence. We pursue the same gool—আমি অহিংসার বাণী বাহকরূপেই ঐ সভায় যোগ দিয়ে ছিলাম।"

অর্থাৎ, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ওপর আস্থা ছিল না। এর পরও কমিটি সদস্যরা কেউ লজ্জা পেয়েছেন বা পদত্যাগ করেছেন বলে শুনিনি ; এবং এ হল অহিংসার মিশন।

নাও, সত্য, এবার ডেক পরিষ্কার, এবার আমরা ছুটে যাব স্বরাজের নিষ্কণ্টক পথে, শত্রু নির্মূল, এবার বন্ধু মুসলিম লীগ ও বৃটিশ-প্রতিভূদের সঙ্গে মিলন-বৈঠকের পালা।

২রা সেপ্টেম্বর ছুটি খবর বেরোলো; একটি কমন্স সভায় "ভারত সরকার (সংশোধনী) বিল পাশ; আর একটি বড়লাটের জরুরী আহ্বানে গান্ধীজীর সিমলা যাত্রা। একটিতে প্রাদেশিক সরকারগুলোর ক্ষমতা হরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যস্ত হল; আর একটিতে বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে ফেডারেশন নিয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন; কেননা, যে-ফেডারেশনের কথা তুলে, এমন কি মন্ত্রীদের তালিকা তৈরীর কথা ফাঁস করে দক্ষিণপন্থীদের বেশী বিব্রত করে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী তারই সম্পর্কে ২রা সেপ্টেম্বরের 'হরিজন' সংখ্যায় লিখেছিলেন: চাপিয়ে দেওয়া ফেডারেশন ভারতবর্ষকে এখনকার চাইতে বেশী বিভক্ত করে দেবে। বৃটিশ সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, তাঁরা ভারতের ওপর ফেডারেশন চাপাবেন না, তবে অনেকটা এগোনো যায়। মুখে না বললেও মনে হচ্ছে, বড়লাট সেভাবেই এগোচ্ছেন। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে আমার প্রস্তাব, তিনি একটি ঘোষণায় বিষয়টি স্পষ্টতর করে তুলুন; তাহলে প্রকৃত ফেডারেশনের পথ মসৃণ হবে, ঐক্যও হবে।

সুতরাং, প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের ক্ষমতা হরণ করা হলেও আলোচনার ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত। কিন্তু এই মহা আহবের আবহাওয়ায় সুভাষ-বিরোধীদের কাছ থেকে আহ্বান আসবে সুভাষচন্দ্র বোধ হয় অতটা প্রস্তুত ছিলেন না। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালবেলা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছ থেকে এই মর্মে এক তার পেলেন যে, তিনি যেন রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

ওয়ার্ধাতে নেতৃসভা হবে। সবই অপ্রত্যাশিত, তবু সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ স্থগিত রেখে প্রস্তুত রইলেন।

ব্যাপারটা কার পরামর্শে হয়েছিল, কে জানে, গান্ধীজীর পরামর্শ ক্রমে এ আমন্ত্রণ বা বৈঠকের ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হল। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে গান্ধীজী এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি সিমলা যাচ্ছেন, বড়লাটের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ফিরে এসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসার স্থান কাল স্থির করবেন।

বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর যে কথাবার্তা হল তা গোপন রাখা হল। বড়লাট কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হবার পরই জিন্নাজীর সঙ্গেও আলাপ করলেন। জানা গেল, বড়লাট এম. এস. আনে প্রমুখ আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আলোচনা অসমাপ্ত থাকে।

ইতিমধ্যে জে. বি. কৃপালনী জানান যে, ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা হবে; হয়তো সুভাষচন্দ্র ও আনেও আমন্ত্রিত হতে পারেন। হঠাৎ, গোপাল রেড্ডী নামে এক ব্যক্তি বলে বসলেন, দেশবাসী যেন গান্ধীজীর ওপর আস্থা রাখেন। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ গোপন রাখার জন্যই সম্ভবতঃ কথাটা উঠল। ৫ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী এক বিবৃতি দিলেন: "এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির কোন পরামর্শ নিয়ে যাই নি। টেলিগ্রাফে আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথম যে ট্রেন পেলাম তাতেই সিমলা রওনা হয়ে গেলাম। তা ছাড়া, আমার অদম্য অহিংসার দরুণ আমি জানতাম, জাতীয় মন প্রতিফলিত করতে পারবো না, করতে গেলে ব্যর্থ হব; বড়লাটকে তাই বলেছি। সুতরাং, আমার সঙ্গে কোন সমঝোতা বা আপোস আলোচনা হয়নি। তিনি আমাকে সে জন্য ডেকেছিলেন বলেও মনে হল না।

"I have returned from the Viceregal Lodge empty-handed and without any understanding open or secret."

"যদি কিছু হয় তো সে কংগ্রেস ও গবর্নমেন্টের সঙ্গে হবে। আমি

অবশ্য বড়লাটকে বলেছি যে, আমার সব সহানুভূতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি—

> "My own sympathies were with England and France from the purely humanitarian standpoint. I told him that I could not contemplate, without being stirred to the very depth, the destruction of London which had hitherto been regarded as impregnable. As I was picturing before him the Houses of Parliament and the Westminster Abbey and their possible destruction, I broke down. I have become disconsolate."

হিটলার এবং দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বললেন, আমার কতই না আশা যে, হিটলার যুক্তিতে কর্ণপাত করবেন। আমি এখন ভারতের মুক্তির কথা মোটে ভাবছি নে। ইংলণ্ড যদি ব্যর্থকাম হয় অথবা ধংসের মধ্যে বিজয়ী হয় তবে ভারতের সে স্বাধীনতার কি মূল্য ?

> "I am not, therefore, just now thinking of India's deliverance. It will come but will it be worth, if England and France fail or if they come out victorious over Germany ruined and humbled ?"

৬ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিবৃতিতে হতাশা প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে, পণ্ডিত জওহরলাল চীন থেকে ফিরে এসে গান্ধীজীর কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন : "আমরা বার বার বলেছি, আমরা দর কষাকষি করতে চাইনে। বৃটেনের অসুবিধের সুযোগ নিয়ে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি নে।"

ওয়ার্কিং কমিটির সভা ৮তারিখেও হতে পারল না ; রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জওহরলাল এসে পৌঁছোন নি। যাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমন্ত্রিত সুভাষচন্দ্র, আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, য়ুসুফ মেহেরালি, অচ্যুত পটবর্ধন।

এদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অথবা তাঁদের সঙ্গে অ-কংগ্রেসী নেতাদের যখন নিষ্ফল আলোচনা চলছে তখন ১১ই সেপ্টেম্বর বড়লাট কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর যুগ্ম অধিবেশনে বললেন, জরুরী অবস্থা সৃষ্টির ফলে ফেডারেশনকে লক্ষ্য রেখেও তৎসংক্রান্ত কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখা হল। এ সম্পর্কে অমৃত-বাজার পত্রিকা লিখলেন: "The abandonment of the Federation...is more a victory for the Moslem League than for the Congress. For the Congress would have accepted the Federation had it been more democratic, but the Moslem League would not have accepted it." (A. B. P., Sept 12, 1939.)

ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা নিষ্ফল হলেও এটি স্থির হল যে, গান্ধীজীকে নিরঙ্কুশ অধিকার দেওয়া হবে বড়লাটের সঙ্গে আলাপ বা যথাবিহিত ব্যবস্থা করবার। ওয়ার্ধাগঞ্জের ১৪ই সেপ্টেম্বর সংবাদে বলা হল, কমিটি এখনও মনঃস্থির করতে পারেন নি।

সুভাষচন্দ্রের আর মিলিত হবার কোন কথাই ওঠে না। দক্ষিণ-পন্থী বামপন্থীদের কোন আপোস হবার লক্ষণও প্রকাশ পেলনা। যুদ্ধ সম্পর্কে পরে ওয়ার্ধাগঞ্জ থেকে যে দীর্ঘ বিবৃতি বেরোয় তার বর্ণনায় পত্রিকা বললেন যে, ওটা একটা থিসিসের মতো। গান্ধীজীর এক বিবৃতি এই থিসিসকে আরও রহস্যাবৃত করে ফেলল। চারদিন লেগেছে ঐ খসড়া করতে; খসড়া করেছেন জওহরলাল, এই সংবাদ দিয়ে গান্ধীজী বললেন:

> "....... the author of the statement is an artist who cannot be surpassed in his implacable hostility to imperialism in every shape or form. He is a friend of the English people. Indeed he is more English than Indian in his

methods. He is more at home with English than with his own men."

সুতরাং, খসড়া, খসড়ার বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই ভারতের স্বার্থোপযোগী হয়েছে, কি বল, সত্য? অভিভাবক হিসেবে ইংরাজেরা চিরকালই আমাদের ভালোটা দেখে এসেছেন। এর ওপর শিল্পীর স্পর্শ। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবে ইঙ্গ-ফরাসী সমর্থন ও হিটলারের দ্ব্যর্থহীন নিন্দা ছিল।

আবার বড়লাট-গান্ধীজী সাক্ষাৎ

বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আবার দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হ'ল; তিনি রওনা দেবার আগে প্যাটেল, প্রসাদ, রাজাগোপালাচারি এবং ঘনশ্যামদাস বিরলার সঙ্গে একান্তে আলাপ করলেন। ২৬এ সেপ্টেম্বর সাড়ে তিনঘণ্টা আলোচনা হ'ল। গান্ধীজী কংগ্রেসের যে অভিমত পেশ করলেন, তা লণ্ডন হোয়াইট-হলে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। কথা রটল সাত জন হিন্দু, চার জন মুসলমান, তিন জন ইউরোপীয়ান নিয়ে বড়লাট পর্যদ সম্প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জওহরলাল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। কমন্স সভায় স্যার ও'নীল মিঃ সোরেনসেনকে জানালেন, তাঁরা কংগ্রেস প্রস্তাব পড়ে দেখছেন।

একটু গোলমাল বাঁধিয়েছিলেন লর্ড জেটল্যাণ্ড। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গবর্ণরদের সহযোগিতায় যে দিব্যি প্রশাসন চলছিল তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলে বসলেন, 'তাই আমি মনে করি, এসময়ে কংগ্রেসের দাবী পুনরুত্থাপনটা সমীচীন হয় নি!

কিছু অস্বস্তিকর হলেও গান্ধীজী বললেন, কংগ্রেস উদ্ভট কিছুই করে নি বা একটা ঘোষণার দাবী অসম্মানজনকও নয়। যাতে জনসাধারণের কাছে গিয়ে বলতে পারা যায় যে, যুদ্ধ শেষে 'স্বাধীন ভারতের গ্রেট বৃটেনের মতই স্বাধীন মর্যাদা হবে'—একথা জেনে নেবার অধিকার কংগ্রেসের নিশ্চয়ই আছে।

দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার পর সংগ্রামী বামপন্থীদের সঙ্গে কোন সমঝোতার কথা ওঠে না, ওঠেও নি। কংগ্রেস বামপন্থীদের থেকে যতখানি দূরে গেল, গ্রেট বৃটেনের ততখানি কাছে এল।

কিন্তু উদারনীতিক ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল আশায় ছাই দিয়ে বড়লাট অক্টোবর মাসে এক ঘোষণা করলেন; নরমপন্থীরা পর্যন্ত চমকে উঠলেন।

বড়লাটের ঘোষণাটি কি ছিল?

মামুলী। যুদ্ধাবসানে তাঁরা সকল দল সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ ও স্বার্থের মুখপাত্রদের নিয়ে কি রকম বাঞ্ছনীয় সংবিধান হতে পারে তা পরামর্শ করবেন।

এর মধ্যে মুসলিম লীগও স্নায়ুযুদ্ধে অবতীর্ণ হল। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মুসলিম নিপীড়ণের এক বিরাট অভিযোগ তালিকা পেশ করল। গবর্ণরেরা উচ্চবাচ্য করলেন না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে এলেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। তিনি বললেন, বেশ তো, ভারতের প্রধান বিচারপতি তদন্ত করুন। জিন্নাজী বললেন, না, বড়লাট। বড়লাটের পথ অবশ্যই খোলা ছিল; তিনি গবর্ণরদের জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। তিনিও তা করলেন না। অস্বস্তিকর অবস্থা; কিন্তু অভিযোগ তালিকা ঠিকই থাকল প্রলম্বিত।

এমনি করে আশার আলো যখন চারিদিক থেকেই নিভে আসছে তখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়াই স্থির করল, ছাড়তেও লাগল। এমন সময় বড়লাট সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ পাঠাতে লাগলেন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের উদ্দেশে। উদ্দেশ্য—ওঁদের কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখা, সংগ্রামের কথা থেকে নিরস্ত রাখা।

কংগ্রেস লীগ সমঝোতা

কংগ্রেস স্বভাবতঃই ষ্ট্র্যাটেজি পাল্টালো। বিরলা বাড়িতে কংগ্রেসের যুদ্ধ কমিটির বৈঠক বসল। গান্ধীজী উপস্থিত থাকলেন। বড়লাটের

সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে আবার আশা-তরু মঞ্জুরিল। প্রসাদ, নেহরু বললেন, লর্ড জেটল্যাণ্ডের কথাই শেষ কথা নয়। কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগ সম্বন্ধেও মনোভাব বদলে ফেলল; কংগ্রেস লীগ আপোস অপরিহার্য অনুভূত হ'ল। জওহর একদা জিন্নাজীর সঙ্গে ডিনার খেলেন। "নেহরু জিন্না আলাপ" এই শিরোনামায় অমৃতবাজার পত্রিকা লিখলেন: "Mr. Jinnah and Pandit Jawaharlal Nehru have dined together and discussed politics. দুর্ভাগ্যবশতঃ, মোসলেম লীগ নেতৃবৃন্দের মতামত ও মনোভাব দেশে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে এই ঘটনাটি বহু লোকের কাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো ঠেকবে তা অস্বাভাবিক নয়; এ থেকে নানারকম জল্পনারও উদ্ভব হয়েছে। খবর এই যে, লীগ ও কংগ্রেসের মীমাংসা হয়ে গেছে:

"জিন্নাজী বড়লাটের দরবারে আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন না; তার বদলে কংগ্রেসের কাছ থেকেই প্রতিশ্রুতি নেবেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি বৃটেনের কি মনোভাব কংগ্রেস তা জানতে চাইলে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন। সকল প্রদেশে জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথাও হয়েছে। যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোতে লীগ প্রতিনিধি থাকবেন, তাঁদের কংগ্রেস শপথপত্রে স্বাক্ষর দিতে হবে না এবং এই লীগ প্রতিনিধিরাই পিরপুর রিপোর্টভুক্ত অভিযোগগুলো নিরাকরণ করবেন। বাংলা ও পাঞ্জাব সরকারে লীগ প্রাধান্য বর্তমান; সেখানেও কংগ্রেস প্রতিনিধি নেওয়া হবে।"

অথচ তোমায় বলেছি কি না মনে পড়ছে না, সত্য, যে, ১৯৩৮-এর ১৫ই ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি একাধারে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক সংস্থা বলে ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত বামপন্থী সংগঠন ও হিন্দু মহাসভাকে এড়িয়ে গেছে, কিন্তু মুসলিম লীগকে সমমর্যাদা দিয়েছে। কার্যতঃ হিন্দু মহাসভার ভূমিকা অবলম্বন করেছে, লীগের যুক্তিকেই শেষ পর্যন্ত মানতে হয়েছে, হিন্দু মহাসভার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করলে অথবা হিন্দু মহাসভা ও লীগকে সমান জ্ঞান

করলে এই ফাঁদে পড়তে হত না। হিন্দু মহাসভাকে এড়াতে গিয়ে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ফাঁদে পড়ে গেছে। কংগ্রেসকে বামপন্থা-মুক্ত করতে গিয়ে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা নিজেদের শক্তিহীনতা পূরণে লীগের পেছনে বৃটিশ মদত লক্ষ্য করে লীগের সাহচর্য কামনা করতে বাধ্য হ'ল। ১৯৩৯-এ তার নিঃসংশয় সূচনা। লীগের ব্ল্যাকমেল সার্থক হয়ে উঠতে লাগল।

অমৃতবাজার পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে বললেন ঃ

> "If the Congress leaders have decided to parley with the League once again, there is no earthly reason why the Hindu Mahasabha authorities should be ignored by them."

অথবা কংগ্রেস উভয়কেই উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংস্থার সাযুজ্য রক্ষা করে চললে প্রকৃত এক সিকিউলার শক্তির উদ্ভব হতে পারত। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের ধারা কংগ্রেস-লীগের যৌথ ধাক্কায় পথান্তরে গিয়ে পড়েছে।

ওয়ার্কিং কমিটির কাছে জওহরলাল তাঁর জিন্নাজীর সঙ্গে আলোচনা-ফল এবং সর্দার প্যাটেল বড়লাটের সঙ্গে তাঁর আলোচনাফল রিপোর্ট করলেন। জিন্নাজী গেলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজী তৃতীয়বার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন।

বড়লাট এর মধ্যে এক কৌতুক করলেন; হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেণ্ট বি. ডি. সভারকরকে আমন্ত্রণ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। আর সুভাষচন্দ্রকেও আমন্ত্রণ জানালেন।

এ. আই. সি. সি'তে যুদ্ধ-প্রস্তাব

কিন্তু মহাকালের স্রোত রুদ্ধ হয় না। হাতে কিছু না পেয়ে এ. আই. সি. সি. যুদ্ধ সঙ্কটের প্রস্তাবটি গ্রহণ করল এবং ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য, কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের এক সম্মেলন হ'ল। এইখানেই একরকম বাধ্য হয়েই স্থির হ'ল যে, ঐ যুদ্ধপ্রস্তাব প্রাদেশিক বিধান সভাগুলোতেও পাশ করতে হবে।

গান্ধীজীর মতে যাঁরা কোন-একটা-কিছু করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছেন তাঁদের উদ্দেশে বললেন, এই প্রস্তাবটি "মধ্যপন্থানুবর্তী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ;" আরও ভালো যে, দ্ব্যর্থ ঘোষণার দাবীতে কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এই কারণে অনন্তকাল তিনি অপেক্ষা করতে রাজী যে,

> "Our fight has not been one of nonviolent resistance of the strong, it has been one of passive resistance of the weak."

এই একটা কৌতুকের বিষয় লক্ষ্য করে আসছি, সত্য, যে, গান্ধীজী নিজেই প্রস্তাবের খসড়া করছেন, ওটা পাশ করানোর নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অবধারিত পাশ হবার পর নিজেই তার প্রশংসা করছেন। এবিষয়ে তাঁর কখনো কুণ্ঠা লক্ষ্য করি নি।

পুনরাগমনায় চ বিদায়

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের এই যে প্রস্তাব তা প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলীগুলোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। বিহার এবিষয়ে সবার আগে। তখনকার দিনে আজকের মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হত প্রধান-মন্ত্রী; বিহারের প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন তা-ই সব প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী তুলেছিলেন, বলাবাহুল্য, গৃহীতও হয়েছিল।

"এই বিধানসভা ভারত সরকারের এবং ভারত সরকার মারফৎ বৃটিশ সরকারের গোচরে একথা আনতে চাইছে যে, বর্তমান যুদ্ধের সঙ্কল্পিত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে এটি অপরিহার্য যে, ভারতীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা লাভের জন্য গণতন্ত্রের নীতি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত এবং ভারতের কার্যক্রম ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সমীচীন; সুতরাং, এই বিধানসভা ভারত সরকারকে একটি ঘোষণাবলে একথা পরিষ্কার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যে, তাঁরা স্বাধীন জাতি হিসেবে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা ভারতীয়দেরই অধিকার বলে মেনে নিচ্ছেন এবং বর্তমানেই যতটা সম্ভব ভারত-শাসনে সে নীতি

ততটা প্রয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন।” (১৬ই অক্টোবর ১৯৩৯)

এর জবাবে বড়লাট যা বললেন তাকে গান্ধীজী বললেন: “Profoundly disappointing.” এর চাইতে আদৌ কোন ঘোষণা না করলেই ভালো হত। (১৮ই অক্টোবর)

২২শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হাজার শব্দ সম্বলিত এক প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন এবং এই গভীর সঙ্কটে সকল দেশবাসীর উদ্দেশে সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য আহ্বান জানালেন।

স্থির হল যে, মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেও বিধানসভার স্পীকার, ডেপুটী স্পীকার ও সদস্যগণ এবং পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণ স্ব স্ব পদ ও আসনে বহাল থাকবেন। কিন্তু মীমাংসার দরজা খোলা রাখা হ'ল।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণ

গান্ধীজী কংগ্রেসের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করে “এসোসিয়েটেড প্রেসের” কাছে বললেন:

> “The moderation of the Working Committee's resolution leaves the door open for satisfying the national demand and averting the crisis.” (২৩শে অক্টোবর ১৯৩৯)

কিন্তু একটির পর আর একটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবার পর শূন্য কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্ন অনিবার্য উপলব্ধি করে গান্ধীজী তাঁর নেতৃত্বের সর্ত উপস্থিত করলেন।

“আমাকে যদি সংগ্রামের সর্বময় কর্তৃত্ব রক্ষা করতে হয় তো আমি কঠিনতম নিয়মানুবর্তিতা দাবী করব। আমি যতটা বুঝতে পারছি, কংগ্রেসসেবীরা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার এবং এযাবৎ যে অহিংস ও সত্যোপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার চাইতেও বেশী না দেন তবে বড় আকারে আইন প্রতিরোধের (Civil Resistance) কোন সম্ভাবনা নেই। কর্তৃপক্ষ আমাদের নেহাৎ সেদিকে ঠেলে না দিলে

তার দরকারও নেই। আমি এই আশা পোষণ করে আসছিলাম যে, বৃটেন ও ভারতের মধ্যে এক সম্মানজনক শান্তি ও শরিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে……” (২৮শে অক্টোবর)।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে এক কঠিনতর আঘাত এল। মাদ্রাজে সংবিধানই একেবারে বাতিল করে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু পটপরিবর্তন হতেও দেরী হ'ল না। বোম্বের ৩০এ তারিখের এক খবরে প্রকাশ পেল, গান্ধীজী আর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৩১এ অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছেন। বড়লাট নাকি আবারও কয়েকজন কংগ্রেস ও লীগ নেতাকে ডেকেছেন।

জিন্নাজী ও গান্ধীজী

এর একটা তিক্ত ও রক্তাক্ত পটভূমিকা ছিল। সুরুরে বেধেছিল নিদারুণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদেই জিন্নাজী অত্যন্ত কড়া ভাষায় গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছিলেন ঃ

"পরিতাপের বিষয় যে, মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র ভাষ্যকার ও ডিক্টেটর হিসেবে তাঁর বিবৃতিতে এমন ভাষার মোড়ক দিয়েছেন যে, তাতে আবারও এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে, কংগ্রেস প্রথমতঃ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে অসমর্থ এবং সে এই ধারণার বশবর্তী যে, কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র প্রবক্তা ; দ্বিতীয়ত, সে একদিকে ভারতে গণতন্ত্রের পক্ষে বলে যাচ্ছে ও গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করতে চাইছে, অন্যদিকে বিগত আড়াই বছর ধরে নিজেকে কেবল যে ফ্যাসিষ্ট ও একনায়কতন্ত্রী সংস্থা বলে ঘোষণা করেছে তাই নয়, কাজেও এই নীতির প্রয়োগ করে চলেছে। তৃতীয়তঃ, কংগ্রেস সারাভারতে হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবন ও হিন্দুত্বের প্রাধান্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।"

জিন্নাজী তথা লীগকে খুশী করার জন্য গান্ধীজী লিখলেন ঃ

"মুসলিম লীগ এক মহৎ প্রতিষ্ঠান। এর প্রেসিডেণ্ট একদা

নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের আশা-তরু স্বরূপ ছিলেন। লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব অবিস্মরণীয়। কংগ্রেসের জন্য তাঁর শ্রমদান ও কংগ্রেস কর্মীদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার সৌধ চিহ্নস্বরূপ বোম্বাই কংগ্রেসে রয়েছে 'জিন্না হল।' লীগের এমন বহু সদস্য আছেন যাঁরা সেই স্মরণীয় খিলাফৎ দিনে সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। আমি ভাবতেও সঙ্কোচ বোধ করি যে, সেই এক-দিনকার সাথীরা আজ তাঁদের লেখা ও বক্তৃতায় যে তিক্ততার পরিচয় দেন তাঁদের হৃদয়েও সেই তিক্ততা বিরাজমান। সুতরাং, আমি বলব, কংগ্রেস বা কংগ্রেসসেবীদের হৃদয়ে যদি লীগ বা কোন লীগ সদস্যের প্রতি তিক্ততা থাকে তবে তা অত্যন্ত অন্যায়।"

গান্ধীজীর এই প্রশস্তি যখন বেরোয় তখন সুকুরের হাঙ্গামা মীরাটে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং, এখানে দরকার হ'ল তৃতীয় পক্ষ, যে তৃতীয় পক্ষের মোহ থেকে কুড়ি বৎসর স্বাধীন ভারতে বাদশাহী করা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুক্ত হতে পারেন নি; আজও উইলসন কিম্বা কোসিগিন। সেদিন ছিলেন বৃটিশ বড়লাট। বড়লাট, জিন্নাজী ও গান্ধীজী এক বৈঠকে বসলেন এর একটা মীমাংসার জন্য। "ত্রয়ী" এই শিরোনামায় লিখলেন পত্রিকা:

> "For over on hour the three leaders (Gandhiji, Dr. Rajendra Prasad and Jinnahji) were closeted with Viceroy. What transpired there is still a sealed book to us." (November, 2, 1939)

পত্রিকা পরদিনই স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আপোস-মীমাংসার আলাপটা কিন্তু গান্ধীজী "মুসলিম সম্প্রদায়ের" সঙ্গে করেন নি, করেছেন "মুসলিম লীগে"র সঙ্গে।

সুতরাং, ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল, ব্যর্থ হ'ল। পত্রিকা বললেন, ও "বুনো হাঁসের পেছন ছোটা।" আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ কিছু প্রকাশ পায়নি, কিন্তু জিন্নাজীর লাভ হ'ল প্রচুর। আর এইসব বৈঠক, খানাপিনা ও ব্যর্থতাশেষে গান্ধীজী আর একবার জোর দিয়ে বললেন,

দেশকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত না দেখলে আমি সেরকম চেষ্টার প্রতিরোধ করব।

দেখ, সত্য, তোমায় এর আগেও বলেছি, আমাদের দেশের স্মরণীয় ও বরণীয় নেতৃবৃন্দের এই একটি বিরল গুণ যে, তাঁরা অনর্গল বক্তৃতা বা বিবৃতি দিতে পারেন; তাঁদের মনে সর্বদাই এই আশঙ্কা যে, তাঁরা যেন লোক-স্মৃতির অগোচরে না যান; সর্বদাই যেন তাঁদের অস্তিত্ব সাধারণের মনে জাগরূক থাকে। এই অনর্গল বক্তৃতা ও বিবৃতির ফল এই যে, তাতে জট পাকিয়ে যায়; সেটা যে ওঁরা না চান তা নয়; কেননা, তাতে মানুষটা বিজ্ঞাপিত থাকে। এমনি একটা কাণ্ড ঘটল নবেম্বরে।

তোমাকে সম্ভবতঃ বলেছি, সত্য, যে, কম্যুনাল এওয়ার্ড দেবার আগে লণ্ডনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ—মায় মালব্য ও গান্ধীজী—র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে একটা এওয়ার্ড দেবার জন্য লিখিত অনুরোধ করেছিলেন। গান্ধীজী সেই কথাটিই এখন আবার তুলতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। গান্ধীজী এও বললেন যে,—

> "The Congress, at his instance, 'loyally accepted' the Award."

গান্ধীজী সত্যি কথাই বলেছিলেন, কিন্তু বিব্রত কংগ্রেস একথা স্বীকার করতে রাজী নয়। হট্টগোল এমন হ'ল যে, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এগিয়ে এসে বলতে হ'ল: আমরা তো শাসন সংস্কারটাই অগ্রাহ্য করেছি; এওয়ার্ড তার একটা অংশ; সুতরাং, সেটিও অগ্রাহ্য করেছি।

এই ছেলে ভুলানো ছড়ায় অনেকেই পরিতুষ্ট হ'ল না বটে, কিন্তু বিদ্রোহও হ'ল না; কেননা, তখন বিদ্রোহ করবার মতো কেউ ছিলও না।

শূন্যস্থান পূরণে······

এদিকে কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করায় প্রশাসন ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণের জন্য কোথাও কোথাও

একটা ঝোঁক দেখা দিল। আসাম হ'ল তার সূচনা। প্রদেশ-গবর্ণর বিরোধীপক্ষীয় স্যার মহম্মদ সাদুল্যাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। স্বভাবতঃই কর্মাভাবশূন্য সাধারণ কংগ্রেসসেবীদের এই সব পরিণতি চঞ্চল করে তুলল; পক্ষান্তরে, কম্যুনাল এওয়ার্ডের মহিমায় বিরোধীপক্ষ মানেই ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। আসামে তা-ই ইউরোপীয়ান চা-করদের প্রসাদে বিজাতীয় প্রকৃতিতে ফেঁপে উঠতে লাগল। বৃটিশ সরকারের দিকেও অচলাবস্থা অবসানের জন্য কোন তাগিদ নেই। সাধারণ কংগ্রেসসেবীদের "হচ্ছে হবে" করে কতদিন নিরস্ত রাখা যাবে?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও কিন্তু মীমাংসার দরজা খোলা রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে গান্ধীজীর এই অভিমতই সমর্থন করলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার সময় এখনও হয়নি। তাঁদের প্রস্তাবে বলা হ'ল: "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও ওয়ার্কিং কমিটি সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হবার সর্বপ্রকার উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করে যাবেন।" সুভাষচন্দ্র বসু এর একটু কড়া সমালোচনা করে বললেন: "অর্থাৎ, আমাদের লাথি মারলেও আমরা বৃটিশ সরকারের পদলেহন করে যাব।" (অঃ বাঃ পঃ, ২৫ নবেম্বর, ১৯৩৯)

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করার মতো লোক খুব বেশী ছিল না; গান্ধীজী ও নেহরুজী বরং জিন্নাজী ও তাঁর সহচরদের কথায় কর্ণপাত করেছিলেন। জিন্নাজী অবশ্য গান্ধীজী-নেহরুজীর কথায়ও কান পাতছিলেন না।

মুসলিম মুক্তি-দিবস

জিন্নাজী এই নীরব নিষ্ক্রিয়তার ওপর এক বোমা ছুঁড়ে মারলেন; কর্ণবিদারী ঐ শব্দতরঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল জিন্নাজীর এই বিবৃতি যে, ২২-এ ডিসেম্বর শুক্রবার মুসলমানদের মুক্তিদিবসরূপে পালিত হবে।

"The day of deliverance and thanks giving as a mark of relief that the Congress Governments have atlast ceased to function."

তখনও কিছু 'জাতীয়তাবাদী' মুসলমান ছিলেন যাঁরা অপ্রতিরোধ্য সাম্প্রদায়িক ধ্বস নামতে দেখেও এই "স্বস্তিতে শুক্রিয়া" জানাতে চাইলেন না। কিন্তু জিন্নাজীর অসাধারণ দুঃসাহস তাঁর রাজনৈতিক প্রতিমূর্তিকে আরও দীর্ঘায়ত করে দিল। তখন কে অস্বীকার করবে জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগ গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসের সমকক্ষ নয়—অগণিত উদাসীন নির্বোধ অসাম্প্রদায়িক জনসাধারণ সত্ত্বেও? পত্রিকা নালিশ করেছিলেন, লীগ-বহির্ভূত অসংখ্য মুসলমান থাকতেও বৃটিশ সরকার লীগকেই স্বীকৃতি দিয়ে অন্যায় করছেন। কিন্তু এ যদি বৃটিশ সরকারের দোষ হয়ে থাকে, তবে গান্ধীজী ও কংগ্রেসও একই কারণে সমভাবে দোষী; তাঁরাও কার্যতঃ একমাত্র লীগকেই উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমানহারে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১২ই ডিসেম্বর বোম্বের এক সংবাদে জানা গেল, জিন্নাজী জওহরলালের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছেন। তার জবাবে জিন্নাজী কিছুমাত্র অস্পষ্টতা না রেখে যা বলেছিলেন তা আরও জোর দিয়ে বললেন।

মুক্তি-দিবস উদ্‌যাপিত

সাধারণ মানুষের এই নিঃসহায় অবস্থায় মুসলিম মুক্তিদিবস পালিত হল! লীগ-বহির্ভূত মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে যে প্রতিরোধ ও বিরক্তি ছিল কংগ্রেস তার কোন সুযোগ নিল না, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগঠিতও করল না। কারণ, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দে জিন্নাজী ও লীগের সঙ্গেই একটা আপোসের জন্য বেশী করে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বৃটিশ শক্তির পর লীগকেই তাঁরা দ্বিতীয় শক্তিরূপে গণ্য করছিলেন।

অথচ একজন খাটী মুসলমান, করাচীর খান আবদুল কোয়াম স্কুর হাঙ্গামার নারকীয় পরিণতির দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছিলেন: "মুসলিম

লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনার ভাবনা ত্যাগ করা উচিত।" (২রা জানুয়ারী, ১৯৪০)

কিন্তু গান্ধীজীর ভাবনা ছিল অন্যত্র, মীমাংসার দরজা ছিল খোলা; তাই তাঁর নির্দেশে "স্বাধীনতার সঙ্কল্প" বাক্যেরও রদবদল হ'ল এবং চরকার ওপর জোর দেওয়া হ'ল।

আবার আনাগোনা

আমরাও হয়তো চরকাই ঘুরোতাম; কিন্তু ঐ ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে দিল্লীর এক খবর এল কানে, নেতৃবৃন্দের ডাক পড়েছে আবার বড়লাটের সঙ্গে বৈঠকে বসবার। ১৩ই জানুয়ারী শুরু হ'ল বৈঠক।

যবনিকা উঠলে দেখা গেল, সুসজ্জিত বৈঠকে অপেক্ষামান বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে এলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ভুলাভাই দেশাই। তারপর এলেন জিন্নাজী।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আমি তো বুঝতে পারছিনে, বড়লাটের ভাষণে এমন কি আছে যাতে আবার ছুটে যেতে হবে বড়লাঠের সঙ্গে কথা কইতে। তিনি পাটনার এক জনসভায় বলেছিলেন: "আমি প্রথমে স্বাধীনতা চাই; সেজন্য আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি।" (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪০)

গান্ধীজী বললেন, আমি কিন্তু সংগ্রামের জন্য একেবারেই হাত কামড়াচ্ছি নে। আমি ওটা পরিহারের জন্যই চেষ্টা করছি।

> "I am not spoiling for a fight. I am trying to avoid it. Whatever may be true of the members of the Working Committee, I wholly endorse Subhas Babu's charge that I am eager to have a Compromise with Britain, if it can be had with honour......I have not lost faith in Britain. I like the latest pronouncement of Lord Linlithgow. I believe in his sincerity." (২০এ জানুয়ারী ১৯৪০)

সুতরাং, ওয়ার্কিং কমিটিও সূত্রচালিত পুত্তলীবৎ প্রস্তাব নিলেন যে, গান্ধীজী বর্তমান অবস্থা দূরীকরণ যায় কি না তা জানবার জন্য বড়লাটের বক্তৃতার কিছু ভাষ্য চাইবেন। (২০এ জানুয়ারী, ১৯৩৯)

গান্ধীজী আবার বললেন, লর্ড লিনলিথগোর আন্তরিকতায় তাঁর খুব বিশ্বাস।

সুভাষচন্দ্রের আরও একটি বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন ঃ

"But I must live in the hope that we shall gain our common end without another fight."

গান্ধীজীর প্রত্যাশামতো আবার বৈঠক ও আনাগোনা শুরু হ'ল ; যুদ্ধকালটা যদি এইভাবে ভারতবর্ষকে নিষ্ক্রিয় রেখে অতিবাহিত করা যায় মন্দ কি ?

গান্ধীজী সদলে নয়াদিল্লী পৌঁছোলেন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এবং বিরলা-ভবনে গেলেন। অন্যান্য নেতারাও এলেন।

বলা বাহুল্য, এবারও কোন মীমাংসাসূত্র পাওয়া গেলনা। কিন্তু গান্ধীজী কিছুতেই একে 'ব্রেকডাউন' বলতে রাজী হলেন না। আমি মনে করি ও আশা রাখি, এ শুধু মুলতুবী হ'ল।

"I believe the more so because I entertain the firm belief that we are reaching the goal soon ; none can stop us attaining independence."

লালেবাই, সত্য, ঘুম-পাড়ানীয়া গান। আলোচনা হচ্ছে কি নিয়ে তার হদিস নেই, কিন্তু টেবিলেই পাওয়া যাবে স্বাধীনতা-উপঢৌকন। কেউ রুখতে পারে না।

কিন্তু, সত্য, মাঝে মাঝে এমন দুরন্ত ছেলেরও দেখা পাওয়া যায়, যাকে কিছুতেই ঘুম পাড়ানো যায় না। সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই গান্ধীজী-চালিত কংগ্রেসের মাথাব্যথার কারণ ছিলেন, কিন্তু সে প্রধানতঃ সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে। কিন্তু কে জানত, পাঞ্জাবেরই এক দামাল ছেলে সকলের অলক্ষ্যে বিলেতে গিয়ে সিংহনাদ করে উঠবেঃ ভুলিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ ! স্যার মাইকেল ওডায়ারের কথা আমরা হয়তো বছরে এপ্রিলের একদিন মনে করতাম ; কিন্তু কে জানত, এই পাঞ্জাবী যুবক ২১ বছর ধরে একাদিক্রমে ওডায়ারের পেছন পেছন ছায়ার মত

ঘুরেছে? মহম্মদ সিং আজাদ ওরফে উধম সিংয়ের রিভলভার ছুটল নিশ্চিন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের নায়ককে লক্ষ্য করে; কাছেই ছিলেন লর্ড জেটল্যাণ্ড, লর্ড লেমিংটন ও স্যার লুই ডেন। কেউ রক্ষা করতে পারেননি স্যার মাইকেল ওডায়ারকে। লণ্ডনের ১২ই মার্চের রাত্রি। উধম সিংয়ের প্রথম বিচার করলেন গান্ধীজী প্রমুখ মহাত্মারা অপযশের ফাঁসীমঞ্চে তুলে, তারপর ২১এ মার্চ লণ্ডন আদালতে, তারপর মে মাসের শেষে মৃত্যুদণ্ড! মাইকেল ওডায়ারের বিচারক বিস্মৃতির অতলগর্ভে; জালিয়ানওয়ালাবাগের ৫০ বছর পূর্তিতেও কেউ তাঁর নাম করেনি।

একই সময়ে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র-চালিত আপোস-বিরোধী সম্মেলনের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন: আমি বড়লাটের কাছে, দরকার হলে, পঞ্চাশ বার যাব। নিজে যেচে দেখা করব। লর্ড রিডিংয়ের কাছে যেতেও আমার লজ্জা ছিল না, জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে আপোসে পৌঁছাতেও আমার লজ্জা ছিল না। (১৮ই মার্চ, ১৯৪০)

আমরা বাংলায় যেমন বলি: বেশ করেছি, একশ'বার করব। কিন্তু গান্ধীজীর এ সুর কিন্তু সর্বত্রগামী নয়—জিন্নাজীর বেলায় নয়, বৃটিশ সরকারের বেলায় নয়। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটিরও নয়। কথা উঠেছিল এবং কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবও এসেছিল, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের দণ্ড প্রত্যাহার করা যায় না? মৌলানা আজাদ গান্ধীজীর মতই উত্তপ্ত জবাব দিয়ে বললেন: "শৃঙ্খলাভঙ্গে" দণ্ড বাতিল করার জন্য প্রস্তাব আনা সহজ কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে পরিহার করা তত সহজ নয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক ভেবেচিন্তে কংগ্রেস সংগঠনের স্বার্থেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল; কংগ্রেস একটি সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান, সুতরাং সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দরকার। ওয়ার্কিং কমিটি সঙ্কটকালে যদি বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা প্রকাশ করে তবে গোটা সংগঠনই ভেঙে পড়বে। (১৯ এ মার্চ)

আহা, ওয়ার্কিং কমিটির যদি সর্বত্র এবং বরাবর এই রকম দুর্বলতা-মুক্ত সৎসাহসে অবিচল থাকতে পারতেন! মৌলানা আজাদই তাঁর বইয়ে এর বিপরীত প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করেছেন।

জিন্নাজীর পারমানবিক বোমা

ইতিমধ্যে জিন্নাজী যে দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষেপ করলেন, তা সমগ্র ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে ভারতীয় চরিত্রকে নিশ্চিহ্ন অথবা বিকৃত করে দিয়ে গেছে। বোমাটির লেবেল ছিল 'পাকিস্থান'। লাহোরে—যে-লাহোরে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে অবধি শতবার বৈঠকে বসবার আস্ফালন করে চলেছে সেই লাহোরেই—নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে আপাততঃ গান্ধীজীর সমশক্তিসম্পন্ন, পরবর্তীকালে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ডিক্টেটর জিন্নাজী বজ্রনাদে ঘোষণা করলেন:

> "The only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national States." (২২এ মার্চ্চ ১৯৩৯)

এইখানেই জিন্নাজী অন্যান্য ভারতীয় নেতা থেকে পৃথক: দুঃসাহসে অটুট এবং ভাষণে স্পষ্ট; কোন ধোঁয়া নেই, দুর্জ্ঞেয় অন্তরাত্মার অনুচ্চারিত বাণী বা তার ভাষ্য নয়, তীক্ষ্ণ ঋজু স্বচ্ছ। জিন্নাজী এতদিন ধরে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলে আসছিলেন এ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কংগ্রেস-মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগপত্র, কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগে স্বস্তি দিবস পালন, বড়লাট-গান্ধীজীর মন বুঝে নেবার বৈঠক—পাকিস্থান-লক্ষ্যে এক একটি পদক্ষেপ। বৃটিশ ষ্ট্রাটেজি ও কংগ্রেসের দুর্বলতা জিন্নাজীর নখদর্পণে এবং সময় বুঝেই তিনি এই বোমাটি নিক্ষেপ করলেন। এর পর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি বাঁকাচোরা পথে হাতড়াতে হাতড়াতে পাকিস্থানের অন্ধ গলিতে এসে থেমেছে এবং আমার আশঙ্কা, সত্য, সম্ভবতঃ চিরকালের জন্যই গতিরুদ্ধ হয়েছে।

জিন্নাজী ও লীগের সিদ্ধান্ত শুনে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন: baffling। আর আশা করলেন, যখন এটি কার্যকর সিদ্ধান্তের রূপ নেবে মুসলমানেরা

দেশবিভাগ চাইবে না। এ যেমন ৬ই এপ্রিলের কথা, ১৩ই এপ্রিল তেমনি বললেন যে,

"as a man of non-violence he cannot forcibly resist the proposed partition, if the Muslims of India really insist upon it."

কিন্তু তিনি কখনো স্বেচ্ছায় এই অঙ্গচ্ছেদে রাজী হবেন না ; তিনি এটি নিবারণের জন্য সকল অহিংস উপায়ই নিয়োগ করবেন। (এপ্রিল ১৩ই ১৯৪০)।

আবার মান-অভিমানের পালা

এর মধ্যে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গান্ধীজীকে নিয়ে আর একবার মান-অভিমানের পালা শুরু হ'ল। যুদ্ধ, ভারতের যোগদান, হিংসা-অহিংসা নিয়ে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির যে মতান্তর তা প্রতিফলিত হ'ল এক প্রস্তাবে। "বহু উৎকণ্ঠিত ও সুদীর্ঘ বিতর্কের পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, কমিটির পক্ষে আর মহাত্মা গান্ধীর কার্যসূচী ও ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করা সম্ভব নয়।" অথচ এই সেদিনই একান্ত-ভাবে তাঁর ওপর সকল দায়িত্বভার এবং কংগ্রেস নীতি ও পদ্ধতি নির্দেশের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল।

অনুমান করা যেতে পারে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর যে আলাপই হয়ে থাক তা কমিটির মতে সন্তোষজনক হয়নি, সুতরাং, গ্রহণযোগ্য হয়নি। একথার সমর্থন পাওয়া যায় কমিটির প্রস্তাবেঃ "ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রত্যয় পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়তর হয়েছে যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতিই কেবল ভারত ও বৃটেনের সমস্যা সমাধান করতে পারে ; সুতরাং, সেরকম দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা প্রয়োজন।" (জুলাই ৭, ১৯৪০)

খান আবদুল গফফার খাঁ গান্ধীজীর সমর্থনে পদত্যাগ করলেন।

এ. আই. সি. সি. ৯১-৬৩ ভোটে কমিটির প্রস্তাব মেনে নিলেন ২৭এ জুলাই।

এ সম্পর্কে মৌলানা আজাদ তাঁর India Wins Freedomএ

লিখেছেন ঃ "অবস্থা চরমে উঠল জুলাই মাসে পুণায় ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি'র সভায়।" প্রস্তাব যথারীতি গ্রহণের পর "ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যুদ্ধ সম্পর্কে দোদুল্যমান হলেন। কেউ ভুলতে পারছিলেন না যে, গান্ধীজী নীতিগতভাবে যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী। তাঁরা একথাও ভুলতে পারছিলেন না যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ যে আয়তন লাভ করেছে তা তাঁর নেতৃত্বেই। এই প্রথম একটা মৌলিক প্রশ্নে তাঁদের মতান্তর ঘটছে এবং গান্ধীজী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। পুণা সভায় এক মাসের মধ্যে প্যাটেল তাঁর মত বদলালেন এবং গান্ধীজীর মত মেনে নিলেন। অন্যান্য সদস্যও দুলতে লাগলেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আর কয়েকজন সদস্য আমাকে লিখলেন, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁরা গান্ধীজীর অভিমতই পোষণ করেন এবং কংগ্রেসেরও তা করা উচিত। কিন্তু আমি যেহেতু ভিন্ন মত পোষণ করি তখন তাঁদের পক্ষে কমিটির সদস্য থাকা সমীচীন কিনা এই সন্দেহ জেগেছে।······আমি তাঁদের লিখে জানালাম, বৃটীশ সরকারের এখন যা মতিগতি তাতে তাঁরা যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবেন এমন মনে হয় না। সুতরাং যতক্ষণ বৃটীশ সরকারের মতি পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ ভারতের যুদ্ধে যোগদান একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকছে মাত্র। আপনাদের অনুরোধ করি, আপনারা কমিটির সদস্য থেকে যান।

আবার আমন্ত্রণ

এর মধ্যে আগস্ট মাসে বৃটিশ সরকার বড়লাটের কেন্দ্রীয় পর্ষদে (Executive Council) আরও প্রতিনিধি নিতে চাইলেন; মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমন্ত্রিত হলেন।

"সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আমি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। অনেক কংগ্রেসকর্মী আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হননি। গান্ধীজী কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমাকে একখানি চিঠি দিলেন।"

কিন্তু গান্ধীজী নিজে এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি ইংরাজদের

উদ্দেশে আবার এক আবেদনে অস্ত্র সংবরণ করে আত্মিক শক্তিযোগে হিটলারকে বাধাদানের প্রস্তাব করলেন। চিঠি লিখে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি লর্ড লিনলিথগোর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ঐ একই আবেদনের পুনরাবৃত্তি করলেন। এই প্রস্তাবে লর্ড লিনলিথগো এতই হকচকিয়ে গেলেন যে, অভ্যস্ত সৌজন্যবোধও ভুলে গেলেন। মৌলানা লিখেছেন ঃ

> "It was normally his practice to ring the bell for an A. D. C. to come and take Gandhiji to his car. On this occasion he neither rang the bell nor sent for the A. D. C. The result was that Gandhiji walked away from a silent and bewildered Viceroy and had to find his way out to his car all by himself."

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, কংগ্রেস বৃটিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, (২৩শে আগস্ট) মুসলিম লীগ ঐ প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য মনে করল (৩১এ আগস্ট)। ভারত সচিব এমেরিও কমন্সসভায় একথা ঘোষণা করলেন।

আবার দোঁহে মিলন হল

সেপ্টেম্বরকে ধন্যবাদ, বোম্বাইয়ের এক সভায় ছত্রভঙ্গপ্রায় কংগ্রেস জনতা ফিরে দাঁড়াল; গান্ধীজীর সঙ্গে মতপার্থক্য চুকে গেল এবং গান্ধীজী আবার রামগড় প্রস্তাবমতো কংগ্রেস পরিচালনার নেতৃত্ব পেলেন। (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০)

এবং গান্ধীজী আবারও বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবেন। আইন অমান্যের প্রস্তাব রইল স্থগিত। জিন্নাজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন ২৫-এ এবং গান্ধীজী ২৮-এ সেপ্টেম্বর।

কিন্তু যথারীতি এবারও আপোস বৈঠকের নৌকো ব্যর্থতার চরে ভেঙে গেল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ যে স্বেচ্ছায় যুদ্ধের শরিক হয়েছে অন্তত তা বাহ্যিক দেখাবার জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিন। বড়লাট বললেন—'না'।

ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহ

স্বভাবতঃই গান্ধীজী, অতএব কংগ্রেস, যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সেই অবস্থায়, সমষ্টিগত বিরাট ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সত্যাগ্রহ নয়, কংগ্রেসের সংগ্রামশীলতা রক্ষার জন্য, ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহ মঞ্জুর করলেন। তার প্রথম গান্ধী-মনোনীত সত্যাগ্রহী বিনোবা ভাবে, স্বয়ং গান্ধীজীর নিজ ছাঁচে ঢালা আশ্রমবাসী। এ হল ১৬ই অক্টোবরের কথা।

এই প্রসঙ্গে, কারও কারও মতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, তোমায় বলে রাখি, গান্ধীজীর মতই নিরুপায় অথচ সংগ্রামের জন্য অস্থির সুভাষচন্দ্রও সত্যাগ্রহ বা আন্দোলনের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে পারছিলেন না বা নিচ্ছিলেন না। তিনি একটি ছোট আন্দোলনের পরিকল্পনা করছিলেন। ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বিপরীত দিকে একটি মনুমেণ্ট ছিল, তার নাম হলওয়েল মনুমেণ্ট। পলাশী-খ্যাত-নবাব সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি একটা অবিশ্বাস্য রকমের ছোট্ট ঘরে বন্দী ইংরাজদের আটকে রেখেছিলেন ; তাতে সব মারা গেছিল ; এবং তার নাম হয়েছিল অন্ধকূপ হত্যা। সিরাজ হেরে গেলে এবং বণিক ইংরাজ রাজদণ্ড পেলে তারা ঐ হত্যাকে চিরঞ্জীব রাখতে হলওয়েলের নামে একটি সৌধ করেছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদেরা এই 'মিথ্'কে স্বীকার করেন নি ; কিন্তু তবু এটি খাড়া ছিল। মুসলিম লীগ যখন রাজ্য হাতে পেল তখনও। এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মুসলমানেরও অসন্তোষ ছিল— যেহেতু সিরাজ মুসলিম নবাব। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি যে, কারণ যাই হোক, প্রাচীন স্মৃতি-সৌধ আইন অনুসারে হলওয়েল মনুমেণ্টকে সংরক্ষিত বলে ১৯২৩এর ১০ই জুলাই যে নোটীশ করা হয়েছিল ১৯৪০এর ১৬ই আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার তা প্রত্যাহার করে নেন। লীগশাসিত বাংলার বিধানসভায় ও ২৩এ আগস্ট এক

প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, পাঠ্য পুস্তকে এই মিথ্যাকাহিনীকে সন্নিবেশ করা চলবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি প্রদেশ সরকার তক্ষুনি ওটি অপসারণে উদ্যোগী হলেন না। তবু আন্দোলনের ভিত্তিভূমি বহুলাংশ শিথিল হয়ে গেলেও সুভাষচন্দ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন না। তিনি এর শেষ করে যেতে পারলেন না; তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল পৃথক। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে এই মিথ্যা কলঙ্কচিহ্ন অপসারণের উদ্যোগ করছিলেন। ইংরাজেরা থাকতে লীগ সরকারকে দিয়েও এর অপসারণ সহজ হবে না জেনে সুভাষচন্দ্র একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার উদ্যোগ করতে করতেই ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ১২৯ ধারামতে বন্দী হয়ে গেলেন। কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ইতিপূর্বে অপসারিত সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও অপসারিত হলেন। ঐদিনই হলওয়েল স্মৃতি অপসারণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার কথা, চারজন সত্যাগ্রহী এজন্য গ্রেপ্তারও হলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন সিমলায় আনাগোনা করছেন; বাংলা দেশে আর একটি মাত্র বাধা ছিল; সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা, শরৎচন্দ্র বসু; তাঁকে প্রথমে এ. আই. সি. সি. থেকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস পার্লমেণ্টারী বোর্ড থেকেও বহিষ্কার করা হ'ল। ১৯৪০-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি।

এই সময়ই গান্ধীজী ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহ মঞ্জুর করলেন। বিনোবাজীর ২১-এ অক্টোবর তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। আজাদ তাঁর বইয়ে বললেন, "এর পর জওহরলাল সত্যাগ্রহী হতে চাইলেন, গান্ধীজী হলেন রাজী।" এলাহাবাদ থেকে পনের মাইল দূরে ছেওকিতে তিনি গ্রেপ্তার হলেন ৩১-এ অক্টোবর; গোরক্ষপুরে এক বক্তৃতা দেবার অপরাধে। ৪ঠা নবেম্বর তাঁর চার বছর কারাদণ্ড হয়েছিল তিনদফা অভিযোগে। আজাদ বলছেন: "এর পর আরও অনেকে অনুসরণ করলেন এবং শিগগিরই দেশব্যাপী ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল।"

সুভাষচন্দ্র যে-কানুনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সর্দার প্যাটেলকেও সে-কানুনে আটক রাখা হ'ল। সত্যাগ্রহ ক্রমশ বোম্বে ছেড়ে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ছড়িয়ে পড়ায় এইটেই প্রতিপন্ন হ'ল যে, শুধু

সুভাষচন্দ্র নয়, দেশের বহু মানুষই সংগ্রামের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিন নানা জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের খবর আসতে লাগল। বাংলা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

বড়লাট তাঁর পরিষদ সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব করেছিলেন তা প্রত্যাহার করলেন ২০-এ নবেম্বর।

মৌলানা আজাদকেও গ্রেপ্তার করা হ'ল ১৯৪১ এর ৩রা জানুয়ারী ১৯৪০ এর ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে এক বক্তৃতার অপরাধে। আজাদ তাঁর বইয়ে বলেছেন, "আমাকে দু'বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল ও নৈনী জেলে আটক রাখা হ'ল।" অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখছি ৮ই জানুয়ারী (১৯৪১) তাঁর ১৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

কিন্তু গান্ধীজী বার বার সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

> "the present struggle launched by the Congress wil never develop into a mass movement (whatever may be the expansion) and so far as I can see, it will remain as an individual civil disobedience and confined only to those who believe in and fufil my conditions." (অঃ বাঃ পঃ ১১ জানুষারী, ১৯৪১)

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান

এর মধ্যে বাংলা দেশে তথা ভারত উপমহাদেশে এক আলেয়ার আলোক ঝলক ঘেলে গেল। সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তোমায় বলেছি ঃ জনসভায় এক বক্তৃতা দেবার জন্য আর "ফরোয়ার্ড ব্লক" সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লেখার জন্য। ১৪ই জানুয়ারী যখন মামলা ওঠে তখন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করে মুলতুবী প্রার্থনা করা হয়। এর পরও ঐ একই কারণে মুলতুবীর প্রার্থনা জানানো হয় ২০শে জানুয়ারী। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করেছেন।

তারপর, সে এক পৃথক রোমাঞ্চ কাহিনী। আমার ইতিহাসের গতিপথে সে কাহিনী পাশে রেখে নাই।

এদিকে গান্ধীজীর আন্দোলন যেমনই হোক না ব্যাপারটা কংগ্রেস

বনাম গবর্ণমেন্টই হোক, জিন্নাজী আপত্তি তুললেন। লীগ এক প্রস্তাবক্রমে জানালেন, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে বৃটিশ সরকার যা স্থির করেছেন তা নড়চড় করে দেওয়া। তেমন অবস্থা হলে লীগ হস্তক্ষেপ করতে পরাঙ্মুখ হবে না। (২৪-এ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১)।

সবই নার্ভের খেলা, বুঝলে, সত্য, জিন্নাজী বললেন, কংগ্রেস চাপ সৃষ্টি করছে ইংরাজদের ওপর, আর উনি চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন কংগ্রেসের ওপর কংগ্রেসকে দিয়ে একথা স্বীকার করাতে যে, লীগ হচ্ছে মুসলমানদের সংগঠন, কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দুদের সংগঠন। নার্ভের এই খেলায় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের "হিম্মৎ গির গিয়া" বটে, কিন্তু ১৯৪১-এ তেমন অবস্থা আসে নি; কেবল এইটুকু হয়েছে যে, ১৯৩৮-এ যাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে নিন্দা করা হয়েছিল তাকে আর বর্জন করা হয় না, এক টেবিলে বসে কথাবার্তা হয়, সুতরাং সে নিন্দাও কার্যত বাতিল হয়ে গেছে। তবু ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯-এ এপ্রিল জিন্না বা লীগের এই প্রচেষ্টায় প্রতিবাদ জানালেন;

> "It is obvious that the Congress would not commit suicide with one stroke of the pen dubbing itself as a communal organisation of the Hindus alone……and dealing a death blow to the ideals for which it laboured, suffered and sacrificed."

গান্ধীজীও বললেন, "আমি দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করতে চাই যে, এই আন্দোলনের ভাবনা ও প্রয়োগে কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িক—কি মুসলিম-বিরোধী কি ইংরাজ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আছে। লক্ষ্য করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, এটিকে সীমায়িত ও অনিষ্টমুক্ত রাখার জন্য সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।"

কিন্তু অবস্থাটা বেপরোয়া হয়ে আসছিল। কমন্স সভায় ভারত-সচিব আমেরীর এক বক্তৃতায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গান্ধীজী বললেন ঃ "আমি স্বীকার করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে···কিন্তু বৃটিশ শক্তি এখান থেকে চলে

যাক, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—কংগ্রেস, লীগ এবং সকল দল তাদের স্বার্থেই একত্র হবে এবং ভারত সরকার প্রতিষ্ঠায় তারা নিজেরাই এক ঘরোয়া সমাধানে পৌঁছোবে। হতে পারে, সে সুদিন আসবার আগে আমাদের নিজেদের লড়াই করতে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বিদেশীকে আমন্ত্রণ না করা বিষয়ে একমত হই তো হাঙ্গামা বড় জোর পক্ষকাল চলবে এবং আজ ইউরোপে একদিনে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার চাইতেও কম লোকক্ষয় হবে; তার সহজ কারণ, বৃটিশ শাসনে আমরা একেবারেই নিরস্ত্র।" (অঃ বাঃ পঃ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪১)

গান্ধীজীর একথাটি তুমি মনে রেখো, সত্য, আমার পরে লাগবে; আর, আগের একটা কথা স্মরণ করো, যখন তিনি বলেছিলেন, অহিংসায় দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি যুগ যুগ অপেক্ষা করতে রাজী আছেন। এখানে কিন্তু কম হলেও রক্তপাতে আপত্তি নেই—বড় জোর পক্ষকাল।

অথচ মে মাসেই তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের দিকে তাকিয়ে এক রকম স্বীকারই করলেন যে, তাঁর ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহও নিষ্ফল হতে পারে। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের 'সর্বোদয়' কাগজে লিখেছিলেন:

> "The movement for the conduct of which I am responsible, may prove a vain effort."

সত্য, আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি যে, আজ প্রায় তিন বছর যাবৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলছে, কেননা, ভারতের স্বাধীনতা লাভে অহিংস সংগ্রামের দিক্ নির্ণয় হচ্ছে না। কিন্তু বৃটিশ কর্তারা এজন্য বসে থাকেন নি। বৃটিশ ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল লালা রামশরণ দাস, স্যার কাউয়াসজী জাহাঙ্গীর, যমুনাদাস মেহতা প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয়কে নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমিটি করলেন।

এ ছাড়া, বড়লাট পরিষদের সম্প্রসারণ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ গঠনের কথাও ঘোষণা করা হ'ল এক সরকারী ইস্তাহারে; এতে অনেকের মধ্যে হোরমাসজি মোদি, আকবর হায়দরি, মালিক ফিরোজ

খাঁ নুন, সুলতান আমেদ, ফজলুল হক, এম এস আনে, বীরেন মুখার্জি, সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ প্রমুখও ছিলেন।

এখানে তোমাকে আর একটা অনিবার্য বেদনার কথা বলি। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের মাস সাতেক পর ১৯৪১-এর ৭ই আগস্ট দ্বিপ্রহর ১২টা ১৩ মিনিটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বোটানিকেল গার্ডেনের সেই দীর্ঘায়ু বটগাছটা দেখেছ তুমি? রবীন্দ্রনাথ গোটা বাংলা দেশকে তেমনি স্নেহচ্ছায়ায় রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ওপর যখন অসুর-উৎপীড়ন চলছিল তখন তাঁর করুণাময় হৃদয়টি দেখেছ। কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ দেখেছ তাঁর? মে মাসের শেষে বিলাতের পার্লামেণ্ট সদস্যা মিস র‍্যাথবোন ভারতের উদ্দেশে যে কটূক্তি করেছিল জুন মাসের প্রথমেই তার জবাব দিতে সেরূপ জ্বলে উঠেছিল। ইতিহাস বর্ণনায় সবটা চিঠি তোমায় বলতে পারব না, একটুকু বলি ঃ

> "The British hate the Nazis for merely challenging their world-mastery and Miss Rathbone expects us to kiss the hand of her people in servility for having riveted chains on ours."

জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই দীপ্ত জ্যোতি। বাংলা দেশ মহীরুহশূন্য হ'ল।

অনশন-নীতি অপরিবর্তনীয় নয়

তোমার মনে আছে, সত্য, বাংলার ছেলেরা জেলে থাকতে অনশন করেছিল বলে গান্ধীজী তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন? কিন্তু দেউলীতে জয়প্রকাশ প্রমুখ কেউ কেউ অনশন করলে গান্ধীজী নিন্দা করতে পারলেন না, সমর্থনই করলেন;

> "I cannot help recognising that at times they have no other honourable recourse for redress of grievances. It is cruel for the Government to say that they will not consider grievances unless the strike is given up. It is tantamount to saying that sufferers should not suffer for the redress of wrongs done to them. "(Oct. 30, 1941)."

২৮এ নবেম্বর তিনি আবার বললেন :

"For a prisoner under stress, hunger strike is the best non-violent remedy....I think that hunger-strikes should not be regarded as a crime." (Nov. 28, 1941)

আজাদ-জওহরের আকস্মিক মুক্তি

কারামেয়াদ শেষ হবার আগেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কারামুক্তি হ'ল। বিলাতের সংসদীয় মহলে এজন্য আশার সঞ্চার হলে গান্ধীজী এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে মন্তব্য করলেন, তাঁরা শিগগিরিই হতাশ হবেন। পণ্ডিত নেহেরু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন না। (৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১) এর মধ্যে ৭ই তারিখে গান্ধীজীর এই নির্দেশটি তাৎপর্যময় হয়ে উঠল যে, ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি'র সদস্যেরা সত্যাগ্রহে নামবেন না। পরিষ্কার ইঙ্গিত—কিছু একটা আসন্ন।

আজাদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন : "এই সিদ্ধান্তের অভিপ্রায় যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কি প্রতিক্রিয়া তা দেখা।

"অন্যান্যবার কারামুক্তির পর আংশিক সাফল্যের একটা আনন্দ পেয়েছি ; এবার মনে হ'ল যুদ্ধ চলেছে আজ দু'বছরেরও বেশী কাল কিন্তু আমরা ভারতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ করতে পারিনি। আমরা যেন অবস্থার স্রোতে ভেসে চলেছি, স্রোত কেটে লক্ষ্য স্থানে যেতে পারিনি।"

এই সময় ৮ই ডিসেম্বর জাপান বিশ্ব মহা আহবে নেমে পড়ল এবং পার্ল হারবার থেকে শুরু করে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ঐ অতটুকু দেশ তোলপাড় ক'রে তুলল।

গান্ধীজী ছিলেন বরদোলিতে। মৌলানা মুক্তির অব্যবহিত পরই বরদোলিতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন। কিছু দূর এগিয়েই বোঝা গেল, যুদ্ধ, যুদ্ধে যোগদান, হিংসা-অহিংসা অথবা হিংসা-অহিংসা-নিরপেক্ষ দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট

অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। দু'দিন ধরে বিতর্ক হ'ল, কোন মীমাংসায় আসা গেল না। গান্ধীজী কিছুতেই অহিংসা ছাড়তে রাজী নন; মৌলানা বললেন, ভারতের স্বাধীনতার ওপরই জোর দিতে হবে, অহিংস নীতির ওপর নয়। গান্ধীজী এই বিপরীত অভিমতের মাঝামাঝি একটা খসড়া তৈরি করলেন।

আবার ছাড়াছাড়ি

শেষ পর্যন্ত ১৯৪১-এর শেষ দিন ৩১-এ ডিসেম্বর পত্রিকার সাতের পৃষ্ঠায় সাত কলম ব্যাপী এক সংবাদ বেরোলো ঃ "গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্বভার-মুক্ত।" ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধের প্রতি মনোভাব প্রকাশ করে জানালো, জাতীয় প্রতিরক্ষায় যোগদানের প্রথম সর্ত স্বাধীনতা। অর্থাৎ যুদ্ধ হিংস অহিংস গৌণ কথা, মুখ্য কথা দেশের স্বাধীনতা। ১৯৪২-এর ১৩ই জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটি 'স্বাধীনতার সঙ্কল্প' বাক্যে যেখানে ব্যষ্টিগত সত্যাগ্রহের কথা আছে সেই অংশটুকু তুলে দিলেন। এ. আই. সি. সি. নেহেরুর প্রস্তাব গ্রহণ করল।

ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ শ্রীমতীকে সঙ্গে নিয়ে জেনারিলিসিমো চিয়াং কাই সেক ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং বড়লাট থেকে শুরু করে সকল ভারতীয় নেতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। তিনি একটা বাণীও দিয়ে গেছিলেন এবং একদিন সারা ভারতে চীন দিবসও পালিত হয়েছিল।

১৯৪২-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপবাহিনীর হাতে সিঙ্গাপুর পতনের পর কলকাতায় দু'টি সভায় জেনারেল চিয়াং ও মাদাম চিয়াং সম্পর্কে জওহরলাল যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার খানিকটা পড়ে শোনাই। পরবর্তী নয়া-চীন অভ্যুত্থানকে এবং আমাদের পররাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাকে বুঝে নেবার জন্য ;—

> "His was one of the few names that stood out in the map of world to-day. If one went to China to-day, one would find that no group or individual in China—who would not agree in one thing that Marshal Chiang Kai-

Shek was not only a very great leader but possibly the greatest leader China had...."

ক্রিপ্‌স মিশন

রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে মার্চ মাসটা বড়ই তাৎপর্যময়। ধুরন্ধর কূটনীতিক উইনস্টন চার্চিল তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধমন্ত্রী। ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য জাপানী আক্রমণের পর কি রকম দাঁড়িয়েছে ও লোকগুলোর মনের গতিই বা কি বুঝে আসবার জন্য পাঠালেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে।

কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা দল হিসেবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আর সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হ'ল।

পৃথক সত্তা সত্বেও ভারতীয় কম্যুনিস্টরা তখনও কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন। সম্ভবতঃ সেজন্যই তাঁদের পৃথকভাবে ডাকা হয় নি; অথবা তাঁরা যুদ্ধোদ্যমে সামিল ছিলেন বলে বোধ হয় অপ্রয়োজন মনে করেছিলেন। তবু, কম্যুনিস্টদের মধ্যে যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদের মুক্তি দাবী করে বঙ্কিম মুখার্জি বলেছিলেন।

> "In this hour of grave peril to Bengal, we Communists declare, we will fight the Fascists to death. We will recruit thousands for the air force ;......We will lead a campaign for mass enthusiasm among workers to intensify production ; give us back our leaders. (A.B.P. March 2, 1942)

ফরোয়ার্ড ব্লকের কোন প্রতিনিধি কেন আমন্ত্রিত হন নি, প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রেসিডেণ্ট আর. এস. রুইকারকে স্ট্যাফোর্ড লেখেন, "Owing to the fact that the President of your organisation has been actively co-operating with enemy powers." (A.B,P, April 11, 1942)

সুভাষের সৈন্যাপত্যে যদি কোন সেনাবাহিনী আসে তখন জওহরলাল কি করবেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "The way Subhas

Bose has chosen is utterly wrong.......I cannot accept but must oppose." (A.B.P. April 13)

ব্রহ্মে বৃটিশবাহিনীর পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'ল। স্প্রাই ও ওয়েনকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিপ্‌স পৌঁছোলেন করাচীতে ২২-এ মার্চ। ক্রিপ্‌স ভূমিকায় বললেন, সময় অপচয় নয়, দীর্ঘ আলোচনাও নয়।

সর্বপ্রথম দেখা করলেন মৌলানা আজাদ, দোভাষী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন আসফ আলি। আজাদ চলে আসবার তিন মিনিট পর এলেন জিন্নাজী।

কিন্তু কি কথা নিয়ে এসেছেন ক্রিপ্‌স ?

গান্ধীজীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা আলাপ হল ২৭-এ মার্চ। দ্বিতীয়বার মৌলানা ও জিন্নাজীর সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দ ও সেকেন্দর হায়াৎ খাঁনের সঙ্গেও। তৃতীয়বার প্রেসকে বললেন, বেশ আলাপ হচ্ছে। ২৯-এ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ডের খসড়া ঘোষণা ছাড়া হ'ল, "হয় সবটা নিন, নইলে ছেড়ে দিন।" ক্রিপসের সাফ কথা।

কেউই সর্বাংশে মানতে পারল না, কংগ্রেস নয়, লীগ নয়, হিন্দু মহাসভাও নয়। সঙ্কটটা নাকি প্রতিরক্ষার কর্তৃত্ব নিয়ে। এখানে তেজ বাহাদুর সপ্রু শান্তিদূতের কাজ করেছেন; কিন্তু কংগ্রেস বলল, না।

তবে মৌলানা ও নেহেরু ক্রিপ্‌স ও ভারতের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করলেন; আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছ থেকে এক দূত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

তারপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে দীর্ঘ প্রস্তাব নিল তা প্রেসে ছাড়া হ'ল ১১ই এপ্রিল। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর স্বাভাবিক নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন:

> "Our price is going to be blood and tears, not of a few only but of vast numbers of people."

ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর মৌলানা আজাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললেন। ক্রিপ্‌স এসে প্রথমে একটা

রঙিন চিত্র আঁকেন ; যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে ; যুদ্ধকালে বড়লাট বৃটিশ প্রতিভূ হিসাবে শীর্ষস্থানীয় থাকলেও বড়লাটের ভারতীয় পরিষদই হবে সব-কিছু। পরে, বিস্তারিত আলোচনাকালে নানারকম আইনের ফ্যাকরা বের করতে থাকেন ; তাতে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তাই কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ

> "Any proposal concerning the future of India must demand attention and scrutiny, but in to-day's grave crisis, it is the present that counts, and even proposals for the future are important in so far as they affect the present...For the present the British War Cabinet's proposals are vague and altogether incomplate and it would appear that no vital chages in the present structure are contemplated."

গান্ধীজী মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> "It is a thousand pities that British Government should have sent a proposal for dissolving the political deadlock, which on the face of it, was too ridiculous to find acceptance anywhere."

কমন্স সভায় গিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড রিপোট দিলেন যে, তাঁর মিশন প্রতিরক্ষা প্রশ্নে ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে যুদ্ধাবসানতক কি ধরণের অবস্থায় সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকবে সে কথা নিয়ে।

পাকিস্থানের সমর্থনে মাদ্রাজ

কিন্তু ভারতবর্ষে গোলমাল বাঁধালেন রাজাজী। ক্রিপ্‌স প্রকারান্তরে যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ইঙ্গিত করেছিলেন মাদ্রাজ বিধানমণ্ডলী পার্টি মুসলিম লীগের পাকিস্থান মেনে নিয়ে তা প্রজ্জ্বলিত করে দিল। তোমাকে আমি একেবারে শুরুতে মাদ্রাজ বা দক্ষিণ ভারতের মানসিকতা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম। বাংলা বা পাঞ্জাব যদি পাকিস্থানে যায়, অথবা কেটে ভাগ করে, কিম্বা উত্তর ভারতের খানিকটা যদি ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ই মাদ্রাজের অঙ্গকে তা স্পর্শ করে না, ওপরে কাটলে সেখানকার একটা তৃণেরও বেদনা হওয়ার কথা নয়। পাকিস্থান মেনে

নিলে অক্ষুণ্ণ দক্ষিণ বা মাদ্রাজ সহ অবশিষ্ট ভারত যদি স্বাধীন হয় তা তাদের অকাম্য হবে কেন ? ভারতে অখণ্ডতা বা সংহতি তো একটা কল্পলোকের কথা, ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ কেটে ফেলেও তো খণ্ড ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতির কথা চলছে। সুতরাং, এ কোন বিস্ময়ের কথা নয় যে, মাদ্রাজ থেকেই প্রথম পাকিস্থানের সমর্থন এল।

জিগগেস করলাম : কি হয়েছিল সেখানে ?

বললেন : মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধান মণ্ডলী পার্টির সভা হচ্ছিল, রাজাজী ছিলেন সভাপতি। তিনিই পাকিস্থান মেনে নেবার প্রস্তাব তুললেন। কংগ্রেস-এর বিপরীত প্রস্তাব আছে জেনেও।

প্রস্তাবটিতে কি ছিল ?—আমি জানতে চাইলাম।

বললেন, আসল অংশটুকু শুধু পড়ছি :

> "and, therefore, as much as the Muslim League has insisted on the recognition of the right of separation of certain areas from United India upon the ascertainment of the wishes of the people of such areas as a condition Precedent for a united national action at this moment of grave national danger, this party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a national Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and that it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation ;......"

এ নিয়ে হুলুস্থুল বেঁধে গেল : কিন্তু কারও সাহস হ'ল না রাজাজী বা মাদ্রাজ বিধান মণ্ডলী সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আনে। গান্ধীজী এবিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগী হলেন না, তবে মন্তব্য করেছিলেন : I consider vivisection of India to be a sin.” মৌলানা আজাদ অসন্তুষ্ট হলেন মাত্র।

রাজাজী অবিচল। দেশব্যাপী নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষ পর্যন্ত

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তা সখেদে গ্রহণ করলেন। কি বিপরীত ব্যবহার! (১লা মে, ১৯৪২)

এলাহাবাদে যে এ. আই. সি. সি'র অধিবেশন হ'ল তাতে রাজাজীর প্রস্তাব ১২০—১৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয় বটে, কিন্তু কৌতুক এই যে, তার পাল্টা প্রস্তাব মাত্র ৯২—১৭ ভোটে গৃহীত হয়; বিরোধীদের সংখ্যাও দু'জন বৃদ্ধি!

এই থেকে তুমি খানিকটা আভাষ পেতে পারো যে, রাজাজীর প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হ'ল বটে, মুসলিম লীগ সম্পর্কে সকলের মনোভাব এক ছিল না। কংগ্রেস মহলে লীগ এখন আর হিন্দু মহাসভার সমপর্যায়ভুক্ত নয়, তার আলাদা মর্যাদা। পণ্ডিত নেহেরু লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও এর ইঙ্গিত দিলেন; "The crisis that faces our country to-day is likely to import a new tinge to the communal problem and give rise to a new approach for its solution. (A.B.P. May 24, 1942)

ক্ষুরধারবুদ্ধি রাজাজী গান্ধীজীর পথানুসরণ করলেন; কংগ্রেসের সদস্যপদ, সুতরাং মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্যপদও ত্যাগ করলেন। (১২ই জুলাই)

একটা মস্ত আমুদে ব্যাপার ঘটেছিল, সত্য। হঠাৎ বিস্ফোরণের মত তা প্রকাশ পেল। ওয়ার্কিং কমিটি "রেঙ্গুনের ঘটনাবলী ও ভারতে তার সম্ভাব্য পরিণতি" এবং "সৈন্যদের হাতে মেয়েদের লাঞ্ছনা" সংক্রান্ত যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, ভারত সরকার তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এ. আই. সি. সি. অফিস তল্লাস করে যুদ্ধসংক্রান্ত বিতর্কের এক বিবরণী হস্তগত করেছিলেন, তাই প্রকাশ করে বিশ্বকে চমকে দিতে চাইলেন! গান্ধীজী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না, তবে একটা খসড়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে চলে যেতে; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্যই ভারত যুদ্ধাঞ্চলে পড়েছে; এ দেশের স্বাধীনতার জন্য কোন বিদেশী সাহায্যের দরকার নেই; জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তবে সে অহিংস প্রতিরোধের

নিলে অক্ষুণ্ণ দক্ষিণ বা মাদ্রাজ সহ অবশিষ্ট ভারত যদি স্বাধীন হয় তা তাদের অকাম্য হবে কেন? ভারতে অখণ্ডতা বা সংহতি তো একটা কল্পলোকের কথা, ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ কেটে ফেলেও তো খণ্ড ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতির কথা চলছে। সুতরাং, এ কোন বিস্ময়ের কথা নয় যে, মাদ্রাজ থেকেই প্রথম পাকিস্থানের সমর্থন এল।

জিগগেস করলাম: কি হয়েছিল সেখানে?

বললেন: মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধান মণ্ডলী পার্টির সভা হচ্ছিল, রাজাজী ছিলেন সভাপতি। তিনিই পাকিস্থান মেনে নেবার প্রস্তাব তুললেন। কংগ্রেস-এর বিপরীত প্রস্তাব আছে জেনেও।

প্রস্তাবটিতে কি ছিল?—আমি জানতে চাইলাম।

বললেন, আসল অংশটুকু শুধু পড়ছি:

> "and, therefore, as much as the Muslim League has insisted on the recognition of the right of separation of certain areas from United India upon the ascertainment of the wishes of the people of such areas as a condition Precedent for a united national action at this moment of grave national danger, this party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a national Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and that it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation ;......"

এ নিয়ে হুলুস্থূল বেঁধে গেল: কিন্তু কারও সাহস হ'ল না রাজাজী বা মাদ্রাজ বিধান মণ্ডলী সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনে। গান্ধীজী এবিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগী হলেন না, তবে মন্তব্য করেছিলেন: I consider vivisection of India to be a sin.' মৌলানা আজাদ অসন্তুষ্ট হলেন মাত্র।

রাজাজী অবিচল। দেশব্যাপী নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষ পর্যন্ত

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তা সখেদে গ্রহণ করলেন। কি বিপরীত ব্যবহার! (১লা মে, ১৯৪২)

এলাহাবাদে যে এ. আই. সি. সি'র অধিবেশন হ'ল তাতে রাজাজীর প্রস্তাব ১২০—১৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয় বটে, কিন্তু কৌতুক এই যে, তার পাল্টা প্রস্তাব মাত্র ৯২—১৭ ভোটে গৃহীত হয়; বিরোধীদের সংখ্যাও দু'জন বৃদ্ধি!

এই থেকে তুমি খানিকটা আভাষ পেতে পারো যে, রাজাজীর প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হ'ল বটে, মুসলিম লীগ সম্পর্কে সকলের মনোভাব এক ছিল না। কংগ্রেস মহলে লীগ এখন আর হিন্দু মহাসভার সমপর্যায়ভুক্ত নয়, তার আলাদা মর্যাদা। পণ্ডিত নেহেরু লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও এর ইঙ্গিত দিলেন; "The crisis that faces our country to-day is likely to import a new tinge to the communal problem and give rise to a new approach for its solution. (A.B.P. May 24, 1942)

ক্ষুরধারবুদ্ধি রাজাজী গান্ধীজীর পথানুসরণ করলেন; কংগ্রেসের সদস্যপদ, সুতরাং মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্যপদও ত্যাগ করলেন। (১২ই জুলাই)

একটা মস্ত আমুদে ব্যাপার ঘটেছিল, সত্য। হঠাৎ বিস্ফোরণের মত তা প্রকাশ পেল। ওয়ার্কিং কমিটি "রেঙ্গুনের ঘটনাবলী ও ভারতে তার সম্ভাব্য পরিণতি" এবং "সৈন্যদের হাতে মেয়েদের লাঞ্ছনা" সংক্রান্ত যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, ভারত সরকার তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এ. আই. সি. সি. অফিস তল্লাস করে যুদ্ধসংক্রান্ত বিতর্কের এক বিবরণী হস্তগত করেছিলেন, তাই প্রকাশ করে বিশ্বকে চমকে দিতে চাইলেন! গান্ধীজী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না, তবে একটা খসড়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে চলে যেতে; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্যই ভারত যুদ্ধাঞ্চলে পড়েছে; এ দেশের স্বাধীনতার জন্য কোন বিদেশী সাহায্যের দরকার নেই; জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তবে সে অহিংস প্রতিরোধের

সম্মুখীন হবে ; কি রকম অসহযোগিতা হবে তা বলা হ'ল ; বলা হ'ল, বিদেশী সৈন্য ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আপদস্বরূপ।

এই খসড়া নিয়ে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাই প্রকাশ করে ভারত সরকার মনে করলেন কিছু একটা করা গেল। গান্ধীজী বললেন, আমার খসড়া নিয়ে আমার কিছুমাত্র লজ্জিত হবার নেই।

ভারত সরকারের এই তৎপরতার মূলে হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটির বহু শব্দসম্বলিত এক প্রস্তাব—যার পরে নাম হয়েছিল "ভারত ছাড়" প্রস্তাব। অর্থাৎ বৃটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল ; অবশ্য তাতে একথাও বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস অচিরাৎ রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে বিব্রতকর কোন পদক্ষেপ করতে চায় না। প্রস্তাবটির সার কথা হচ্ছে ঃ

> "Events happening from day to day, and the experience that the people of India are passing through, confirm the opinion of Congressmen that British rule in India must end immediately, not merely because foreign domination, even at its best, is an evil in itself and a continuing injury to the subject people, but because India in bondage can play no effective part in defending herself and in affecting the fortunes of the war that is desolating humanity. The freedom of India is thus necessary not only in the interest of India but also for the safety of the world and for the ending of nazism, fascism, militarism and other forms of imperialism, and the aggression of one nation over another."

কিভাবে এই প্রস্তাবের—অথবা প্রস্তাবের পেছনে যে মানসিকতা তার সূত্রপাত হ'ল সেই প্রসঙ্গে আজাদ লিখেছেন ঃ ক্রিপ্‌স চলে যাবার পর আমি গান্ধীজীর মধ্যে একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখলাম।...গান্ধীজীর মন সর্বাত্মক চরম নিষ্ক্রিয়তা থেকে এখন সঙ্ঘবদ্ধ গণ-তৎপরতার দিকে ঝুঁকেছে !...দেখে বিস্মিত হলাম (জাপান ও জাপানীদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে), গান্ধীজী আমার সঙ্গে একমত নন।...দেখলাম সর্দার প্যাটেলেরও সেই মত।...ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমি ৫ই জুলাই ওয়ার্ধায় পৌঁছোলে এই প্রথম আমি গান্ধীজীর মুখে

'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের কথা শুনলাম। আমি সহসা এই নতুন ভাবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।······যখন আমি তাঁকে চেপে ধরলাম, কর্মসূচীটা কি হবে, দেখলাম তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।······গান্ধীজীর ধারণা ছিল যে, বৃটেন তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের প্রস্তাবকে একটা সতর্কবাণী হিসেবে নেবে এবং চরম কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবে না। আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত সংগঠনে তিনি সময় পাবেন।···আমি আমার বিপরীত অভিমত পেশ করলাম। একমাত্র জওহরলাল আমাকে সমর্থন করলেন, তাও খানিকটা। নিজেদের প্রত্যয় না থাকলেও অন্যান্য সদস্য গান্ধীজীর বিরোধিতা করতে রাজী নন। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা নয়। সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আচার্য কৃপালনীর যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তাঁরা প্রায়শঃই নিজেরা কিছু ভাবেন না, তাঁরা গান্ধীজীর চিন্তাভাবনার ওপরই নির্ভর করতে অভ্যস্ত।···তাঁরা শুধু একথাই বলতে পারলেন যে, আমাদের গান্ধীজীর ওপর বিশ্বাস থাকা উচিত।···

"···অবস্থা চরমে উঠল যখন গান্ধীজী আমাকে লিখলেন যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমনই ব্যবধান বর্তমান যে একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। কংগ্রেস যদি চায় যে, গান্ধীজী আন্দোলন পরিচালনা করবেন তবে আমাকে প্রেসিডেণ্ট পদ এবং ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য পদ ত্যাগ করতে হবে। জওহরলালকেও তাই করতে হবে। আমি তক্ষুনি জওহরলালকে ডেকে পাঠালাম এবং তাঁকে গান্ধীজীর চিঠিটি দেখালাম। সর্দার প্যাটেলও এসে গেছলেন, তিনি চিঠিটি পড়ে মর্মাহত হলেন। তিনি তক্ষুনি গান্ধীজীর কাছে গেলেন এবং প্রতিবাদ জানালেন।···

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী ত্রুটি স্বীকার করলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এ.আই.সি.সি'র সভায়ও গৃহীত হ'ল—বিরোধ সংখ্যা মাত্র ১৩ জন। ৮ই আগস্টের প্রস্তাব। জওহরের ভাষায় "অহিংস বিদ্রোহ" গান্ধীজীর ভাষায় অহিংস বিপ্লব!

আগস্ট বিপ্লব

বিপ্লব শুরু হ'ল ৯ই আগস্ট থেকে। প্রস্তুত ভারত সরকার ৯ই আগস্টের ভোর বেলায়ই গান্ধীজী, জওহরলালজী ও অন্যান্য নেতাকে সাপ্‌টে গ্রেপ্তার করেছেন এবং আরও করে চলেছেন। বোম্বাইয়ে নিদারুণ বিশৃঙ্খলায় পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত হ'ল, ২০ জন বুলেটের আঘাতে আহত হ'ল। স্বাধীনতার বেদী মুলে আবারও জনগণের রক্ততর্পণ। অন্তত বারোবার গুলী চলেছে। পুণা আমেদাবাদেও। সারা ভারতে জনবিক্ষোভের তরঙ্গ আকাশ ছোঁয়া হ'ল। দিনের পর দিন—দিনরাত।

তবে বাদ ছিল ; দুটি বড় রাজনৈতিক পার্টি, মুস্‌লিম লীগ ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, রাজাজী, ষ্টীলফ্রেম আর চির রাজভক্তেরা।

মুস্‌লিম লীগের অভিপ্রায় ছিল ইংরাজেরা এদেশে থাকতেই তাদের সহায়তায় একটা পৃথক রাষ্ট্র ছিনিয়ে নেওয়া ; লীগের পক্ষে বৃটিশ বিরোধী হওয়ার ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই ছিলনা। লীগ বুঝেছিল বা জিন্নাজী বুঝেছিলেন, ইংরাজকে যেতে হবে; যেতে যদি হয় তো ভারতের বুকে একটা কাঁটা রেখে যাক ; সে কাঁটা ভারতেরই বুকে একটি বৈরী-রাষ্ট্র। ইংরাজ পরম আনন্দে তা করে যাবে। সুতরাং, এই সুবর্ণ সুযোগে পাকিস্থানের দাবীটা হলধরের মতো ভারতের বুকে চেপে রাখা। কর্ষণ হবেই, ফল ফলবেই। তাই, কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে লীগের যোগদান দেওয়ার কথা ওঠে না।

ভারতীয় কম্যুনিস্টরা ১৯৪১ এর ২০-এ জুন অবধি বৃটিশ সাম্রাজবাদ বিরোধী ছিলেন। ১৯৪১ এর ২৯-এ জুন নাৎসী জার্মানী যেই সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করল অমনি তত্ত্বের দিক থেকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক হয়ে গেল, সাম্রাজ্যবাদীরা হ'ল গণতন্ত্রী এবং জনসাধারণের সংগ্রামী রাষ্ট্র। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ জনসাধারণ একাকার হয়ে গেল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট

রুশিয়া একাকার হয়ে গেল। মৌলিক প্রকৃতিতে পৃথক হয়েও সর্বত্র যুদ্ধ জনযুদ্ধে দাঁড়াল। বৃটিশ বা সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষেত্রে যদিবা তা সত্যি, সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনে নিপীড়িত, শোষিত নির্বীর্য ভারতের জনসাধারণের পক্ষে এযুদ্ধ জনযুদ্ধ হতে যাবে কিসের জোরে? কিন্তু সেদিন এঁরা দলবদ্ধ হয়ে তাই বলেছেন, ১৯৪২-এর সংগ্রামের বিরোধিতা করছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছেন, কোথাও জনবিক্ষোভ এই যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিঘ্নিত করলে তা বরদাস্ত করেন নি। অথচ এই ভারতেই কোটী কোটী জনসাধারণের মধ্যে যে সাম্রাজ-বাদ বিরোধী শক্তির উদ্বোধন সঞ্চার ও পরিপোষণে জনগণেরও কোন অভিসন্ধি থাকলে তা স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়ে যেত সে বিরল সুযোগ তাঁরা নিলেন না; নিজেরা পরবুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হলেন, একশ্রেণীর শ্রমিক-শক্তিকেও বিভ্রান্ত করলেন এবং ঐ করেই তাঁরা অবাঞ্ছিতদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ মসৃণ করে দিলেন। অথচ সখ্যতাবশে এঁরা রাজাজী এবং রাজাজীর ফরমূলা প্রসাদাৎ পাকিস্থান দাবীও সমর্থন করেছেন।

তবু, ১৯৪২ এর 'বিদ্রোহ' 'বিপ্লব,' অভ্যুত্থান—যে নামেই তাকে অভিহিত করো—এত 'স্বদেশী' বিরোধিতা সত্ত্বেও এক অবিস্মরণীয় স্মরণীয় হয়ে আছে; সেই স্মর্তব্য তোমায় শোনাতে পারি, পর্বের পর পর্বে, দীর্ঘকাল ধরেঃ কিন্তু আমার ইতিহাসের গতিক্রমে সময় বড় সংক্ষিপ্ত; কোনদিন অবকাশ পেলে তোমায় শোনাব। কি অসামান্য গণশক্তি, কি অকাতর বলিদান।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর

বাংলা দেশে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর আর এক করুণ মহাভারত। সুতীব্র আকাঙ্খা সত্ত্বেও আমি তোমায় এ কাহিনীও বিস্তারিত বলতে পারছি নে। শুধু এই বলি, এ এক এমন দুর্ভিক্ষ—যা মানুষের ইচ্ছে করে সৃষ্টি—নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের আসনে বসা মানুষ, অমানুষ।

ব্রহ্মদেশে বৃটিশবাহিনী যখন প্রতিপক্ষের চাপে পশ্চাদপসরণ করতে

করতে বাংলা দেশ ছেড়ে যাওয়া স্থির করল তখন এখানকার নৌকো বা সাইকেলগুলোই শুধু ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করে ক্ষান্ত হ'ল না। বৃটিশ ও লীগ কর্তৃপক্ষের আঁতাতে এখান থেকে খাদ্যসম্ভারও সব বাংলা দেশের বাইরে চালান দিতে লাগল—যাতে এক কণা চালও প্রতিপক্ষের হাতে না পড়ে। প্রতিপক্ষ মরে নি, মরতে মরেছে এদেশেরই বাঙালী দরিদ্র চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্তেরা—পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট লাখ।

আজাদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন: গবর্ণমেণ্টের ধারণা, জাপানীরা যদি সারা ভারত আক্রমণ নাও করে তো বাংলাদেশ দখলের চেষ্টা করতে পারে। তাঁরা মনে করেছিলেন, জাপানীরা সমুদ্রপথে আক্রমণ করবে এবং ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতার দিকে অগ্রসর হবে। আমি জানতে পেরেছিলাম, এমন বিপন্ন অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কলকাতা পরিত্যাগ করবেন। কোন্ কোন্ পর্যায়ে কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণা ছেড়ে যেতে হবে সেই পরামর্শ দিয়ে একটা গোপন সার্কুলারও জারী হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় প্রতিরোধের পরিকল্পনাও রইল এবং প্রয়োজন হলে কিভাবে কোন্ পথে পিছিয়ে আসতে হবে তারও নক্সা রইল। প্রথম প্রতিরোধের কথা ছিল পদ্মা বরাবর, দ্বিতীয় আসানসোল রাঁচী বরাবর আর শেষ এলাহাবাদে। জাপ-আক্রান্ত হলে গবর্ণমেণ্ট এখানে পোড়া মাটীর রীতি অবলম্বনও স্থির করে রেখেছিলেন—বড় বড় সেতু উড়িয়ে দিয়ে, কারখানা ধ্বংস করে—যাতে সেগুলো জাপানীদের হাতে না পড়ে; জামসেদপুরের আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ফ্যাক্টরী ধ্বংসের পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে গেলে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।"

গান্ধীজীর অনশন

ভারতের ১৯৪৩ শুধু বাংলার মন্বন্তরের জন্যই চিহ্নিত নয়, রাজনৈতিক মানচিত্রে গান্ধীজীর অনশনও একটি চিহ্ন। তিনি তখন কারাগারে। কিন্তু কারামুক্তির জন্য ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ দিনের জন্য অনশন শুরু করেন। কারাগারে অনশন সম্পর্কে গান্ধীজীর মত-বিবর্তন তোমাকে আর একবার মনে করিয়ে দি। বাংলার বন্দীরা অনশন করলে তিনি

তার নিন্দা করলেন, দেউলীতে জয়প্রকাশ প্রমুখের অনশন সমর্থন করলেন, এবার নিজের কারামুক্তির জন্য অনশনের পথ নিলেন।

গবর্ণমেণ্ট "অনশনকালীন" কারামুক্তি দিতে চাইলেন। তাতে গান্ধীজী রাজী নন; গবর্ণমেণ্টও নিঃসর্ত মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন। সরকারী ইস্তাহারে বলা হ'লঃ "It is now clear that only his unconditional release could prevent him from fasting. This the Government of India are not prepared to concede."

মৌলানা আজাদ তাঁর বইয়ে যদিও গান্ধীজীর এই অনশন সমর্থন করেন নি, সরকারী এই ইস্তাহারও উল্লেখ করেন নি; তাঁর ধারণা গান্ধীজী হতাশায় "আত্মশুদ্ধির" জন্য এই অনশন করেছেন।

কিন্তু সরকারী ইস্তাহারে যেটি উল্লেখযোগ্য কথা তা হচ্ছে যে গান্ধীজী।

> "in his correspondence with the Viceroy, has repudiated all responsibility for the cosequences which have flowed from the 'Quit India' demand which he and Congress Party have put forward."

কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের পর দেশে যা কিছু ঘটেছে তার দায়িত্ব গান্ধীজী অস্বীকার করলেন বটে কিন্তু ভারত সরকার একখানা বইয়ে ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেসকেই দায়ী প্রতিপন্ন করলেন এবং এজন্য "হরিজন" থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিলেন!

গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন, ১৯৪৩-এর ৩রা মার্চ সকাল ৯॥ টায়।

গান্ধীজীর কারামুক্তি

১৯৪৪ এর ৬ই মে গান্ধীজী নিঃসর্ত মুক্তি পেলেন। তাঁর সঙ্গে ছাড়া পেলেন ডাঃ সুশীলা নায়ার, ডাঃ গিলডার, পিয়ারীলাল ও মনি বেন। মুক্তির পর তাঁকে যথারীতি থ্যাকারসের "পর্ণকুটিরে" নিয়ে যাওয়া হ'ল।

আসলে, ঐ অনশনের পর থেকে গান্ধীজীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না,

ডাক্তাররেরাও তাঁকে আটক রাখা সম্ভবতঃ নিরাপদ মনে করছিলেন না। লণ্ডন মহলে কথা হ'ল, বড়লাট তাঁর নিজের দায়িত্বে গান্ধীজীকে ছেড়েছেন। আমেরিকার ডিমক্রাট রিপ্রেজেণ্টেটিভ ইম্যানুয়েল সেলার অবশ্য নিউ ইয়র্ক থেকে এর ওপর রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করে বললেন, আশা করা যায়, পরিবর্তিত নীতির সূচনা হ'ল। (৮ই মে, ১৯৪৪)

গান্ধীজী নীরবতা ভঙ্গ করে ঘোষণা করলেন, "গত বছর কায়েদ-ই-আজমের প্রতি আমি যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম তা বজায় আছে এবং আমি একটু ভাল হলেই হিন্দু মুসলিম সমঝৌতা বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হব।" (১৬ই মে)

গান্ধীজীর চিঠির তারিখ—যারবেদা, ৪ঠা মে, ১৯৪৩। লিখেছিলেনঃ

"Dear Quaid-E-Azam"

"প্রিয় কায়েদ-ই-আজম, আমি কারারুদ্ধ হবার পর গবর্ণমেণ্ট যখন আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি কি কি সংবাদপত্র চাই, আমি আমার তালিকায় 'ডন' পত্রিকাটিও ধরেছিলাম। মোটামুটি নিয়মিতই পাচ্ছি ; যখনই পাই, তখনই যত্নের সঙ্গে পড়ি।

"আপনার আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করছি। পত্রালাপের পরিবর্তে আমার প্রস্তাব 'আসুন' আমরা মুখোমুখি আলাপ করি। কিন্তু সে আপনার উপর নির্ভর।

> "Why should not both you and I approach the great question of communal unity as men determined on finding a communal solutiou acceptable to all who are concerned with it or interested it. ?"

সত্য, মৌলানা আজাদ গান্ধীজী এই যে জিন্নাজীকে কায়েদ-ই-আজম বিশেষণে ভূষিত করলেন তা আপত্তিকর মনে করেছেন এবং জিন্নাজীর পেছনে এভাবে ছোটাছুটিও তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেন ঃ

"আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, গান্ধীজীই সর্বপ্রথম মিঃ জিন্নার ক্ষেত্রে "কায়েদ-ই-আজম" বা মহান্ নেতা উপাধিটি চালু করেন।……এই বিশেষণের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুমাত্র বিবেচনা না করে গান্ধীজী মিঃ জিন্নাকে কায়েদ-ই-আজম বলে সম্বোধন করেন।…ভারতীয়

মুসলমানেরা বুঝলেন যে গান্ধীজী যখন মিঃ জিন্নাকে কায়েদ-ই-আজম বলে সম্বোধন করছেন তখন তিনি প্রকৃতই বুঝি তাই।”

কারামুক্তির পর এই যে গান্ধীজী জিন্নাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হলেন, এই সম্পর্কেও আজাদ বলেছেন ঃ

“আমি মনে করি, এবার জিন্নাজীর সঙ্গে গান্ধীজীর সংলাপ-প্রচেষ্টা মস্ত এক রাজনৈতিক ভ্রান্তি। এ এক নতুনতর মর্যাদা দিল মিঃ জিন্নাকে; মিঃ জিন্না এটিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। বস্তুতঃ, গান্ধীজী গোড়া থেকেই মিঃ জিন্না সম্পর্কে এক উদ্ভট মনোভাব অবলম্বন করে-ছিলেন। গান্ধীজীরই কাজে ও অকাজে মিঃ জিন্না ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে গান্ধীজীর এই মনোভাব ছাড়া মিঃ জিন্না আদৌ প্রাধান্য লাভ করতে পারতেন কি না। ভারতীয় মুসলমানদের এক বিরাট অংশ মিঃ জিন্না ও তাঁর নীতি সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন গান্ধীজী অনবরত তাঁর পেছনে ছুটছেন এবং তাঁকে খুশী করতে চাইছেন, তখন মিঃ জিন্নার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। তাঁরা এও মনে করলেন যে, সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় সুবিধা আদায় করতে তিনিই সব চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি।”

পরবর্তীকালীন নিষ্ঠুর সত্যের প্রবক্তা!

“ডন”–এ গান্ধীজীর পত্র

কিন্তু তখন লণ্ডনে জিন্না-গান্ধীর সাক্ষাৎ সম্ভাবনায় কৌতূহলের উদ্রেক হ'ল। জিন্নাজীর উদ্দেশে লেখা যে-চিঠি লর্ড লিনলিথগো আটক করেছিলেন, গান্ধীজী সে চিঠি ছাপতে দিলেন “ডন” পত্রিকাকে।

এমনি করে গান্ধীজীকে উপলক্ষ্য করে বোম্বাই রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ল। ডঃ জয়াকরের কাছে গান্ধীজীর চিঠি প্রকাশ পেল। তাতে লেখা ছিল ঃ “আপনি আমার মুক্তিকে কি চক্ষে দেখছেন জানিনে। আমি সুখী নই। কিছু লজ্জাও বোধ করছি। আমার অসুস্থ হয়ে

পড়া উচিত হয়নি। চেষ্টা করেছিলাম, ব্যর্থকাম হয়েছি। মনে হয়, আমাকে একটু সুস্থ দেখলেই ওঁরা আমায় বন্দী করবেন। যদি না করেন, আমি কি করতে পারি? আমি আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারিনে। আপনিও বলেছেন, ওটি নির্দোষ।"

গান্ধীজীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল এ চিঠির ভাষ্য করে জানালেন, একমাত্র এ. আই. সিঃ সি'ই অবস্থান্তর ঘটাতে বা প্রত্যাহার করতে পারে।

সাক্ষাৎপ্রার্থীর স্রোত বইতে লাগল পর্ণকুটিরে। জয়াকর, সপ্রু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মালব্য, জি. ডি. বিরলা, ভুলাভাই দেশাই, কে. এম. মুন্সী, হোমি মোদি, জে. আর. ডি. টাটা, পণ্ডিত কুঞ্জরু, এস. আর. মাসানি, পি. সি. যোশী।

শুধু তাই নয়, আরও জানা গেল, লর্ড ওয়াভেল বড়লাট পদে অভিষিক্ত হবার পর থেকেই গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে ভারতের রাজনীতি নিয়ে পত্রালাপ করছিলেন; তিনি অন্যান্য সরকারী পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও চিঠি লেখালেখি করছিলেন। সব মিলিয়ে টাইপ-করা ফুলস্কেপ সাইজের ২৫০ পৃষ্ঠা; তার মধ্যে ভারত সরকার প্রকাশিত "১৯৪২-৪৩-এর হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকাটিরও জবাব ছিল। এসব পত্রালাপ হয়েছিল ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিলে। গান্ধীজী তাঁর জবাবে বলেছিলেন, "তিনি এবং কংগ্রেস যে নির্দোষ তা নিরপেক্ষ টাইবিউনালেই প্রতিপন্ন হতে পারে।"

তিনি তাঁর জবাবে একথাও লিখেছিলেন যে, ভারত সরকারের দেশব্যাপী গ্রেপ্তার এমনই প্রবল বেগে করা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জনসাধারণ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে। কারও সংযম হারানোর সঙ্গে কংগ্রেসকে জড়ানো যায় না, বরং এর দ্বারা এই বোঝায় যে, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।"

আমেদনগর ফোর্টে ওয়ার্কিং কমিটির যেসব সদস্য আটক ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে গান্ধীজী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে এক চিঠি দিয়েছিলেন পুণা থাকতে। তাঁর অনুরোধ ছিল, হয় তাঁকে

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হোক অথবা ৗর অভিপ্রায় সম্পর্কে বড়লাট ও ভারত সরকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য বড়লাটের সঙ্গে সমগ্র ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে দেওয়া হোক।

বড়লাট বললেন, না। (অঃ বাঃ পঃ, ৩০ জুন)

জুলাই মাসের মাঝামাঝি গান্ধীজী আবার এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। তিনি "নিউজ-ক্রনিকলের স্পেশ্যাল করেসপণ্ডেণ্ট মিঃ গেল্ডারকে তিন ঘণ্টা ধরে এক ইণ্টারভিউ দিলেন ; তিনি গেল্ডারকে বললেন, অসামরিক প্রশাসনের পূর্ণ কর্তৃত্বে যদি কোন জাতীয় সরকার (National Government) করা হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং কংগ্রেসকে তা গ্রহণে পরামর্শ দেবেন। এই 'সাক্ষাৎকার' স্বভাবতই বেরোলো লণ্ডনে।

গান্ধীজীর রাজাজী-ফরমূলা সমর্থন

এখানেই শেষ নয়। এদেশের খোরাক হিসেবেও তিনি ফ্রী প্রেস জার্নালের ম্যানেজিং এডিটার এস. সদানন্দের কাছে যা বললেন তাতে এই প্রথম প্রকাশ পেল যে, তিনি রাজাজী ফরমূলা অনুমোদন করেন। (জুলাই, ১৩)

কোথাও কোথাও কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ায় তিনি বললেন, আগস্ট প্রস্তাবের প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের যা বলেছেন তার কোথাও অমিল নেই।

চারদিকে উল্টোপাল্টা খবর বেরোতে লাগল। বলা হ'ল, অদূর-ভবিষ্যতে গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ হবে ; কিন্তু গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বিতীয়বার যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তা নামঞ্জুর হয়েছে। গান্ধীজী বললেন, তাতে কি হয়েছে, রাজাজী ফরমূলার তাতে কোন ব্যত্যয় ঘটছে না। পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগ কাউন্সিল গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভার সর্বতোভাবে জিন্নাজীর ওপর ন্যস্ত করলেন।

সত্য, পাকিস্থান যাত্রা শুরু হ'ল আমাদের। রাজাজী কংগ্রেস সংসর্গ ছেড়ে গেলেও গান্ধীজীর মতো চিন্ময় দেহে রয়ে গেছেন এবং রয়ে গেছেন কংগ্রেসের সর্বময় নেতৃত্বের মধ্যেই। তাই কায়েদ-ই-আজম নিয়ে এত বোলবোলা। সাভারকরকে মহান নেতা বলাতেই যত সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসটাকে তুমি পাকিস্থানের ছায়ায় ভারতের গ্রাস বলে চিহ্নিত করতে পার।

ব্যাপারটা এতদূর গড়ালো যে, বড়লাট দেখা করতে না চাইলেও দেবতাকে আর রুষ্ট না করার জন্য গান্ধীজী নিজে উদ্যোগী হয়ে কংগ্রেসসেবীদের পুলিশী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে "৯ই আগস্ট" দিবস পালন থেকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দিলেন। গান্ধীজী আরও একবার ঐ আন্দোলনে তাঁর দায় দায়িত্ব অস্বীকার করে বললেন, "আমার বা কংগ্রেসের নামে যত সব অনাসৃষ্টি হয়েছে।

জিন্না-গান্ধী মোলাকাৎ

জিন্না প্রস্তুত; গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন; পত্র পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বললেনঃ "সন্ধি! বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার আবহাওয়া সৃষ্টিতে যত্নবান হোনঃ মন্তব্য সংলাপ-অবসানে।"

সত্য, জিন্নাজী হাতের মুঠোয় পাকিস্থান অনুভব করছেন; একবার স্বীকৃতি যখন পাওয়া গেছে আর নিস্তার নেই। বললেন, গান্ধীজী-প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের ফরমূলা তাঁর হাতে আছে। দেশের বিবেক-বিক্রীত সংবাদ-পত্র জনমত সংগঠনে অবিরাম বলতে লাগল, উপায় কি? এই তো ভালো, এই তো ভালো। ১৯৪২ এর আন্দোলনে পণ্যভারবাহী এই সংবাদ পত্রই ভয়ে ও পয়সার লোভে কংগ্রেস-বিরোধী বিজ্ঞাপনে ছেপেছেঃ স্টেটসম্যান পথ না দেখালে ১৯৪৩ এ মন্বন্তরের মৃত্যু দৃশ্যও চেপে যেত; ১৯৪৪এ-ও কংগ্রেসের সর্বময় নেতার, অর্থাৎ, কংগ্রেসের পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণের সর্বনেশে দিকটা উদ্ঘাটিত করে নির্বোধ জনসাধারণকে সতর্ক বা সচেতন করল না; যেমন করেনি ১৯৩৫ এ কম্যুনাল এওয়ার্ডের 'না গ্রহণ না

বর্জনের বিষময় পরিণতি সম্পর্কে, করলে ইতিহাসের গতি নির্ঘাত অন্য রকম হ'ত।

কংগ্রেস-সংবাদপত্র সহযোগিতায় ও জনসাধারণের নির্বোধ ঔদাসীন্যের রসাসিঞ্চনে পাকিস্থানের বিষবৃক্ষ রোপণ হ'ল। জিন্নাজীর অসুস্থতার জন্য সাক্ষাতের তারিখ ১৫ই আগস্ট থেকে বদলে বদলে ৯ই সেপ্টেম্বরে এল। জিন্নাজী জানতেন, মাছ টোপ যখন গিলেছে, তখন তাকে একটু খেলিয়েও ডাঙ্গায় তোলা যায়।

৯ই থেকে ২৭এ সেপ্টেম্বর অবধি গান্ধী-জিন্না বৈঠক চলল ঃ বোম্বাইয়ের মালাবার হিলে জিন্নাভবনে। অনেক ছবি, চলচ্চিত্রও উঠল, তবে বৈঠকে প্রেসকে থাকতে দেওয়া হ'ল না। ২৭-এ সেপ্টেম্বরই আলোচনা ভেঙ্গে গেল।

জিন্নাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভূতপূর্ব প্রবলতার সঙ্গে ঘোষণা করলেন ঃ হিন্দু মুস্‌লিম বিরোধ নিষ্পত্তির একটাই মাত্র কার্যকর বাস্তব পথ আছে ; তা হচ্ছে, ভারতবর্ষকে দুটো সার্বভৌম অংশে ভাগ করা—পাকিস্থান এবং হিন্দুস্থান ; সমগ্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্থান।" (৭ই অক্টোবর, ১৯৪৪)

সারা ভারতবর্ষে মর্মান্তিক শোনালেও মৃত্যুর মতই অনিবার্য মনে হ'ল।

সৈয়দ মামুদের মুক্তি

এই সংশয়, অবিশ্বাস ও অপ্রতিরোধ্য বিষময় পরিণতির দিকে যখন ভারতের ভাগ্য গড়িয়ে চলেছে তখন অকস্মাৎ ডঃ সৈয়দ মামুদের মুক্তি গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করল। স্বাস্থ্যের জন্য নয়, ভারতসচিবের এই ঘোষণা বিষয়টাকে আরও রহস্যময় করে তুলল। তিনি আমেদনগর ফোর্টে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন, কিন্তু তিনি যে বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপ চালাচ্ছিলেন তা জওহরলাল বা তাঁর অন্য কোন সহকর্মীও জানতেন না। মুক্তির পর তিনি এক বিবৃতি দেন। তাতে তিনি স্বীকার করেন যে, ঐভাবে সহকর্মীদের অগোচরে পত্রালাপ করে তিনি অসঙ্গত কাজ করেছেন। তাঁর বিবৃতিতে জানা যায় যে,

তিনি ৮ই আগস্ট অপরাহ্ণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন ; এর পর এ. আই. সি. সি. হয় এবং মধ্য রাত্রি অবধি চলে ঃ ৯ই আগস্টের ভোর বেলা গ্রেপ্তার হন।

২৬ মাস পার হয়ে গেল ; এদ্দিন তিনি কাউকে একথা বলেন নি ; অতি সম্প্রতি বড়লাটকে বলতে পারলেন যে, তিনি আগস্ট প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন।

১৯৪৫ এর সূচনায় ভুলভাই দেশাই ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সাক্ষাৎ ঘটল। ১৯৪২-এর আগস্টের পর ভুলাভাইর মতো একজন প্রথম সারির নেতা আমেদনগরে বন্দী সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন। দেশাই গেলেন ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু কিছু জানা গেল না। কোন কোন মহলে অস্বস্তি প্রকাশ পেল যখন ভুলাভাই কেন্দ্রীয় এসেম্বলির মুসলিম লীগ পার্টির ডেপুটি লীডারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। কংগ্রেস লীগ মীমাংসা কিছু হয়নি ঃ কিন্তু এতেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

কৌতূহলী জনসাধারণ এইসব ঘটনার সঙ্গে দেশাই—বড়লাট সাক্ষাতের একটা সম্বন্ধ সূত্র অনুমান করল। একঘণ্টা আলাপ হয়েছিল ওঁদের মধ্যে ঃ তখন নাকি ভুলাভাই একটা কম্পোজিট সকলদল-ইন্টারিম গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এতে এইটিই প্রকট হ'ল যে, একশ্রেণীর কংগ্রেসসেবী কোন না কোন ছলে মন্ত্রিত্বে ফিরে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ভুলাভাই প্রেসের উদ্দেশে আবেদন জানালেন যে তাঁরা যেন এ নিয়ে জল্পনা না করেন। এবং নিজেও প্রকাশ করলেন না নবাব লিয়াকৎ আলি খাঁর সঙ্গে আদৌ কোনো চুক্তি হয়েছে কিনা। অথবা এ ব্যাপারে গান্ধীজী ও জিন্নাজীর সমর্থন ছিল কিনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই হয়নি। নিষ্ফল।

চল ফিরে মন্ত্রিত্বে

ফল ফলল উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ফিরে নিল। ডঃ খাঁন সাহেবের কাছে গান্ধীজী একটি সীল করা খাম পাঠালেন। তাতে কি ছিল আর কেউ জানেনি ; কিন্তু বলা হ'ল খাঁন সাহেব চিঠির নির্দেশনামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। অবশ্য কারান্তরিত ভাই আবদুল গফফর খানের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই। সীমান্ত সরকার আবদুল গফফর খান ও আরও আশী জন বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

এমনি সময় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন। আমেরি যেন কথাটা খোলসা করার জন্যই বললেন, তাঁর সঙ্গে ভারতের সাংবিধানিক ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা হবে।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর পটভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে ; ইতালীতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানীতে নাৎসীবাদের পতন হয়েছে। জনতা মুসোলিনীকে হত্যা করেছে, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। জাপান দ্রুত ভেঙে পড়ছে। দুর্বল কিন্তু মহিমান্বিত হয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ ; আকাশে সঞ্চারিত বিজয়োৎসব—শান্তি কথকতা ; স্যান ফ্রান্সিস্কোতে বাজছে বৃহৎ শক্তি সম্মেলনের আবহসঙ্গীত।

ভারতীয় প্রশ্ন যে তিমিরে সেই তিমিরে।

জিন্না আমেরির লুকোচুরি খেলা

আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল বৃটিশ কূটনৈতিক ও স্নায়ুদ্বন্দ্বে বিজয়ী লীগ মহলে। তার একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৫-এর ১২ই মে। 'বম্‌শেল' এই শিরোনামায় লিখলেন ; "১৯৪৪-এর ২৪-এ জুলাই মিঃ জিন্না ভারতসচিব মিঃ আমেরির কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, আর একটী কলামে আমরা তা প্রকাশ করলাম। চিঠিটি বেরিয়েছে আমাদেরই সহযোগী 'ন্যাশানালিস্ট' পত্রিকায়।···জিন্নার মতো একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির পক্ষে এ কি সম্ভব যে, তিনি একই সঙ্গে

গান্ধীজীর সঙ্গে আপোস-আলোচনা চালাচ্ছেন আবার মিঃ আমেরির সঙ্গে ঐ ধরনের পত্রালাপ করছেন ?—বিশেষ করে, যে-আমেরি যত ভারতসচিব হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে শত্রু-ভাবাপন্ন ? পাছে মিঃ আমেরি মিঃ জিন্নার আচরণকে ভুল বোঝেন এজন্য তিনি (মিঃ জিন্না) তাঁকে (মিঃ আমেরিকে) এই আশ্বাস দিতে ব্যস্ত যে, গান্ধীজীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত আলোচনায় কিছু হবে বলে তিনি মনে করেন না। তা হলে তিনি দেখা করতে রাজী হলেন কেন ?···তিনি মিঃ আমেরিকে লিখেছেন ঃ 'আপনি এটি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, আমি যদি আলোচনায় গররাজি হতাম তবে তার সুযোগ নিত কংগ্রেসী হিন্দু সংবাদপত্র ; বিকৃত যুক্তি দিয়ে কেবল যে আমাকে কলঙ্কিত করত তাই নয়, মুসলিম স্বার্থেরও ক্ষতি করত।' অর্থাৎ যখন সারা দেশে আনন্দ হিল্লোল বইছে এই দেখে যে, দুই নেতা মিলিত হয়েছেন এবং বৃটিশ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার উপায়স্বরূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান কামনা করছে, তখন মিঃ জিন্না গোপনে মিঃ আমেরিকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন, আসলে ওটা ফক্কিকারি, মুসলিম স্বার্থসাধনে বৃটীশ সরকারের ওপরই তাঁর সকল বিশ্বাস ন্যস্ত। শুধু মাত্র কংগ্রেসী হিন্দু সংবাদপত্র অথবা সারা দেশকে—ফাঁকি দেবার জন্যই তিনি ঐ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।" পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> "In the long history of betrayals it is difficult to find a parallel."

কিন্তু এর দ্বারা কংগ্রেস বা কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা যে কোন শিক্ষা লাভ করেছিলেন পরবর্তী ঘটনাবলীতে তার লেশমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। কেননা আমেরিকা থেকে একটা খবর রটল যে, লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন থেকে একটা শাঁসালো প্রস্তাব নিয়ে ভারতে ফিরছেন।

দাদুরী ডাকিছে মিলন-পিয়াসে

কংগ্রেস আবার মিলন পিয়াসে উচ্চকিত হয়ে উঠল। বিলাতে একটু পরিবর্তনও ঘটল। মিঃ চার্চিলের পদত্যাগে রক্ষণশীল

মন্ত্রিসভা গেল ভেঙে। হ'ল সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। কূটবুদ্ধি ইংরাজেরা লোকের মনে ধোঁকা দেবার জন্য ডাঃ মামুদের পর আসফ আলিকে কারামুক্তি দিলেন।

আর রাজাজী লর্ড ওয়াভেল কিছু নিয়ে আসছেন শুনতেই তা গলাধঃকরণ করে বসলেন। তিনি মাদ্রাজের গোখেল হলে ৩১এ মে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে আবেগের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মপন্থা পরিবর্তনের আবেদন জানালেন। প্রশাসন কাঠামো কেমন হবে এটা তাঁর কাছে প্রশ্ন নয়, তাঁর প্রশ্ন আমাদের শাসন করাটা শিখতে হবে তো!

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ পেল, ১৩ই জুন ওয়াভেলের প্রস্তাবটি উদ্ঘাটিত হবে; সেদিন সিলেকসান কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই সিলেকসান কমিটিতে ছিলেন ৮ জন কংগ্রেসের, ৬ জন মুসলিম লীগের, ৫জন হিন্দু, অন্যান্য ৫, আর চেয়ারম্যান হচ্ছেন বড়লাট।

বড়লাট এক বেতার বক্তৃতায় তা উদ্ঘাটন করলেন, আমেরি করলেন বিলাতে। বড়লাট আমন্ত্রণ জানালেন "কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতির ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশে: "to take counsel with me with a view to the formation of a new Executive Council." নতুন বড়লাট পর্যদ গঠনের জন্য; এই নতুন পর্ষদে থাকবেন সমানুপাতিক বর্ণহিন্দু ও মুসলমান।

মৌলানা আজাদ মুক্তি পেলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হ'ল; শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া সব নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল; সিমলা নেতৃসম্মেলনে গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতারাও আমন্ত্রণ পেলেন।

গান্ধীজী বড়লাটের ভাষণে "বর্ণহিন্দুর" উল্লেখে আপত্তি করলেন এবং সর্দার প্যাটেল সোজাসুজি বললেন, যদি বর্ণহিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাসাম্য বজায় থাকে তবে সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের স্থান নেই। (১৭ই জুন)

বললে কি হবে, গান্ধী-ওয়াভেল সাক্ষাৎ তখন সুনিশ্চিত। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টও আমন্ত্রিত; তিনি ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের মিলিত হবার

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (১৮ই জুন)। সিমলা সম্মেলনের সুফল সম্পর্কে গান্ধীজী ও নেহরুর খুবই আশাবাদী। বোম্বাইয়ে মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যেরা প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য সদস্যকে সম্মেলনে যোগদানে অনুমতি দিলেন ; গান্ধীজী উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। (২৪এ জুন)

সম্মেলন শুরু হলে জিন্নাজী দাবী করলেন, বড়লাট পরিষদের মুসলিম সদস্যদের লীগ মনোনীত করবে। অর্থাৎ কংগ্রেস বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মুসলমানকে মনোনয়নের অধিকার থাকবে না।

আলোচনা ব্যর্থতার মুখে এসে পড়ল। কিন্তু নেহেরু বললেন, আমাদের সফল হতে হবেই। বড়লাট বললেন ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে তাঁর কাছে নামের তালিকা পাঠিয়ে দিতে। জিন্নাজী বললেন, গান্ধী যদি পাকিস্থানের ভিত্তিটা মেনে নেন তবে এ সম্মেলন নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই, আমরা নিজেরা একটা সম্মেলন করব। (২রা জুলাই)

৪ঠা জুলাই নেহেরু বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। কংগ্রেস নামের তালিকা স্থির করে ফেলল, প্রধান সেনাপতি ও বড়লাট বাদে পনেরটি নাম প্রস্তাব করল। অন্যান্য দলও নাম দিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সর্বসম্মতিক্রমে নামের তালিকা দিতে গররাজী হ'ল, কেননা জিন্নাজী যে প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন, তা পাননি, অর্থাৎ বড়লাট পরিষদের মুসলিম সদস্যের নাম একমাত্র লীগই প্রস্তাব করবে। ৬ তারিখ পার হয়ে ৯ই তারিখে পড়েছে।

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ

নির্দিষ্ট তারিখের পাঁচদিন পর জিন্নাজী ও গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে দেখা করলেন। ১৪ই জুলাই পত্রিকার সংবাদ শিরোনামা হ'ল ঃ সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ।

আজাদ বলেছেন, এই প্রথম আপোস আলোচনা ব্যর্থ হ'ল। ভারতে ও বৃটেনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে নয়, সাম্প্রাদায়িক প্রশ্নে।

"বড়লাট পরিষদে কে কে থাকবেন এই পার্থক্যটা দেখা দিল। অথচ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়ে গেছল।

"জিন্নার বিরোধিতার জন্য সম্মেলন যদি ভেঙে না যেত তাহ'লে মুসলমানদের জনসংখ্যা যেখানে মাত্র ২৫ শতাংশ সেখানে ১৪ জনের পরিষদে তাঁদের প্রতিনিধি সংখ্যা থাকত ৭।......লীগ নাকি ছিল মুসলিম স্বার্থের ধারক কিন্তু লীগের বিরোধিতায় ভারতের মুসলমানেরা অখণ্ড ভারতের প্রশাসনে একটা উল্লেখযোগ্য শরিকানা থেকে বঞ্চিত হ'ল।

"আমি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছি, আমরা মুসলিম লীগের এ দাবী মেনে নিতে পারিনে যে, লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র কর্তৃত্বময় সংস্থা। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী। বাংলায় গবর্ণরের শাসন। পাঞ্জাবে ইউনিয়ানিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী। সিন্ধু ও আসামে লীগ-সরকার কংগ্রেস সহযোগিতার ওপর নির্ভর।"

কিন্তু সত্য, এ হচ্ছে যুক্তি বা তথ্য। লীগের তখন তার চাইতেও বড় জিনিস করায়ত্ত হয়েছে, তার অবিসম্বাদী অখণ্ড স্বীকৃতি ও সংহতশক্তি। এই শক্তিকে সামান্য করে দেখে ৪৬ খৃস্টাব্দে নেহেরু মীমাংসা বানচাল করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন লিওনার্ড মসলে।

কে ইনি?

"দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ" বইয়ের লেখক। এই বইখানি নিয়ে বড্ড বেশী হৈ-চৈ হচ্ছে, জনসন ক্যাম্বেল, পিয়ারীলাল প্রমুখের বিশদ গ্রন্থাবলী সত্বেও, মসলে আজাদের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জায়গা মতো আমিও মসলেকে উল্লেখ করব। মসলে বলেছেন, সব গোপন দলিল সরকারী সূত্রে প্রকাশ পাবে ১৯৯৯ খৃস্টাব্দে। আরও ত্রিশ বছর পর।

আবার নির্বাচনে মাতোয়ারা

এই ব্যর্থতা ও হতাশার পর কংগ্রেসের আর কিছুই করবার ছিলনা। পটভূমিটাও কিছু বদলে গেছল। চার্চিল সরকারের পদত্যাগের পর

বিলেতে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল তাতে শ্রমিকদল ক্ষমতায় এল। ভারতের বড়লাটও ভারতবর্ষে শীতকালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা করলেন। নিষ্ক্রিয় কর্মহীন কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে তা লুফে নিল এবং শুনে তুমি কি আশ্চর্য হবে, সত্য, যে, কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা যে-আগস্ট বিপ্লবের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব অস্বীকার করে ওর সাবোতাজ ও ধ্বংসলীলার নিন্দা করেছিলেন, তাই—এবং আরও অধিকতর বিস্ময়কর—সশস্ত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্রিয়াকলাপই তাঁদের নির্বাচন বৈতরণী পার হবার পাথেয় ও বাহন হ'ল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ?

হ্যাঁ, সত্য, এবারও আমাকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে। আমি আমার সীমাবদ্ধ ইতিহাস বর্ণনায়, মহাভারতের অনেক পর্ব পাশে ফেলে চলেছি—১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লব, ১৯৪৩ এর নিদারুণ অমার্জনীয় মন্বন্তর ১৯৪২-৪৩-৪৪-৪৫ এর আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট পর্ব তোমায় বলতে পারব না, পারব না বলতে কলকাতা তথা নোয়াখালীতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নরহত্যা-লীলা বীভৎস তাণ্ডব। অথচ এগুলো প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অথবা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতের নেতৃবৃন্দ খবর পেয়েছিলেন কি পান নি বলতে পারব না, তাঁরা বৃটিশের সুরে সুর মিলিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রহ্ম ও ইম্ফল অভিযানকে জাপানী অভিযান বলেই প্রচার করেছিলেন, মাঝে মাঝে স্পষ্টতায় বলেছিলেন যে, সুভাষের এমন দুর্বুদ্ধিই যদি হয় তো তাঁরা তাঁর প্রতিরোধ করবেন। কম্যুনিস্টরা যে সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং বিশেষণ দিয়েছিলেন তা থেকে এই সব উক্তির প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য ছিল না।

বিজয়ী ইংরাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সেনানীদের দিল্লীর লাল কেল্লায় প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করে। ভারতবর্ষে আবার এক সর্বজনীন বিদ্রোহ, সর্বাত্মক বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়ে। তোমায় আমি সিপাহী বিদ্রোহের চাইতেও অনেক বড় ও তাৎপর্যে মহত্তর নৌ-বিদ্রোহের কথাও

বলতে পারব না; সেও মহাভারতের আর এক বিরাট পর্ব। তাও ব্যর্থ হয়েছে নেতৃত্বের অভাবে; কেননা, একমাত্র সক্রিয় নেতৃত্ব ভারতীয় কংগ্রেস তখন সুনিশ্চিত সাংবিধানিক পথে পা দিয়েছে, আন্দোলন নয়, বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব তো নয়ই, তাকে প্রতিহত করে সমগ্র শক্তিকে কংগ্রেসীরা নির্বাচন, গবর্ণমেণ্ট গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকে প্রধাবিত করলেন। পক্ষান্তরে, ১৯৪৬ এ মুস্‌লিম লীগ মারের পথে দেশ বিভাগ অনিবার্য করে তুলল। রাজশাসন হস্তগত করতে সাগ্রহী কংগ্রেস পাকিস্থানও মেনে নিল।

এখানে তোমাকে শুধু দুটি খবর বলে যাই; কেননা, এ দুটি ভবিষ্যৎ কোন কোন ঘটনার পক্ষে তাৎপর্যবহ। একটি নয়াদিল্লির ১লা সেপ্টেম্বরের খবর। তাতে বলা হ'ল, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকারের পর ভারত সরকার স্থির করেছেন, এটিকে আর কয়েদখানা করে রাখা হবে না। প্রথমত, এতে তিক্ততার সৃষ্টি হয়; রাজনীতিক বন্দীদের পাঠানোতে তাই হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, কারাগার প্রদেশ-প্রশাসন ভুক্ত বলে, কেন্দ্রের কোন পেনাল সেটেলমেণ্টের দরকার নেই। তৃতীয়ত, যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধে। জাপ অধিকারের সময় ৫।৬ হাজার বর্মী বন্দী ছাড়া ভারতীয় রাজনীতিক বন্দী কেউ ছিলনা। দ্বিতীয় সিঙ্গাপুরের ৮ই সেপ্টেম্বরের খবর। আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মরণে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন, পুনরধিকারের পর ইংরাজেরা সেটিকে ভারতীয় স্থাপারদের দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। জাপ আত্মসমর্পণের পরে ওটির আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল। ইংরাজেরা ওটি ভাঙতে গিয়ে দেখে ওখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ তিনদিন আগেও ওখানে আজাদ হিন্দ প্রহরী মোতায়েন ছিল।

এ সম্পর্কে নেহরু কি আচরণ করেছেন ১৯৪৬ এর জানুয়ারিতে, তা মাউণ্টব্যাটেন বিশদ বলেছেন।

আপাততঃ ১৯৪৫ এর আগস্ট মাস থেকে কংগ্রেস ও অন্যান্য দল সাধারণ নির্বাচনে মেতে উঠল। গান্ধীজী সমর্থন করলেন। পুণা

অধিবেশনে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হ'ল। ১৯-এ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রথম সভা হ'ল ; ঐদিনই বড়লাট বেতারে ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ সরকারের আহ্বান করার ইচ্ছা

> "as soon as possible a constitution-making body and as a preliminary step they have authorised me to undertake, immediately after the elections, discussions with representatives of the Legislative Assemblies in the Provinces, to ascertain whether the proposals contained in the 1942 dclaration are acceptable or whether some alternative or modified scheme is preferable."

ইত্যাদি ইত্যাদি। তিন বছর পর বোম্বাইয়ে ২১ এ সেপ্টেম্বর এ. আই. সি. সি'র প্রথম অধিবেশনে ওয়াভেল-ক্রিপস প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল ; দ্বিতীয় দিন "১৯৪২ সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে সাধুবাদ" জানিয়ে জওহরলালের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর নিয়োগ করা হ'ল—এইটেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সৈন্যদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কমিটি।

একটা খবর তোমায় বলি, সত্য। ঠিক এই সময়েই, ২৫ এ সেপ্টেম্বর, আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সেনানীদের এক শিবিরে গুলী চালিয়ে পাঁচজনকে মেরে ফেলে এবং অনেককে আহত করে। শিবিরটা ছিল কলকাতার কাছে নীলগঞ্জে এবং এখানে অন্ততঃ একহাজার বন্দী আজাদ সেনানী ছিল। খবরটা স্বয়ং জওহরলাল দিয়েছিলেন এলাহাবাদে ১০ই অক্টোবর। (অঃ বাঃ পঃ, ১১ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

ওয়াভেল প্রস্তাবকে ওয়ার্কিং কমিটি বলেছিল, "অস্পস্ট, অপূর্ণ ও অসন্তোষজনক" ; বলা বাহুল্য, এ. আই. সি. সি'ও তাই সমর্থন করল।

সুতরাং, সংগ্রাম। মানে, নির্বাচন সংগ্রাম। কৃষকদের উদ্দেশে বলা হ'ল, মেহনতি জনতার হাতে ক্ষমতা এনে দেওয়ার জন্যই তো এ সংগ্রাম ; মূল শিল্পগুলো হবে রাষ্ট্রায়ত্ত, অন্যান্য শিল্পও ; ভূমি ব্যবস্থারও সংস্কার আর সমবায়ভিত্তিক খামার।

পি. সি. যোশীর ফতোয়া

লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া শুরু করল বোম্বাইয়ে। কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশী কংগ্রেসের সকল কম্যুনিস্ট সদস্যকে কংগ্রেস থেকে অবিলম্বে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। যোশী মহাশয় যে বিবৃতি দিলেন তাতে রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করা হ'ল। আগে ইংরাজীটুকু বলি, পরে বাংলা ঃ

> "The Congress stands for freedom of India, the League demands freedom for Muslim homelands. To demand the right of self-determination from British but to deny it to a section of our own countrymen is a plain injustice. In the name of Indian freedom the Congress leadership is denying freedom to Muslim Homelands. In the name of unity of India it is keeping divided India's two main political organisations...We do not consider it good sense to fight out brother Muslims in the name of Indian unity...."

"কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চায়; লীগ চায় মুসলিম স্বদেশের স্বাধীনতা। বৃটেনের কাছে স্বায়ত্তশাসন দাবী করা, আর, আমাদেরই স্বদেশবাসীদের তা থেকে বঞ্চিত রাখা পরিষ্কার অবিচার। ভারতের স্বাধীনতার নামে কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলিম স্বদেশের স্বাধীনতা দিতে চাইছে না। ভারতের ঐক্যের অছিলায় কংগ্রেস দুটি রাজনৈতিক সংস্থাকে পৃথক করে রাখছে।...... ভারতীয় ঐক্যের নামে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে লড়াই করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।..."

সত্য, কিছু মন্তব্য করে এই কদর্য অনিষ্টকারিতার মর্যাদা দিতেও আমি কুণ্ঠিত; আজ একটি প্রতিবেশী বৈরী রাষ্ট্রের পটভূমিকায় এই বিবৃতির বিজাতীয়তা আপনা-আপনিই পরিস্ফুট হবে। তবে হ্যাঁ, যেখানে বিবৃতিতে অকস্মাৎ আগস্ট সংগ্রামের প্রশস্তির নিন্দা করা হয়েছে তার নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা থাকত যদি ওঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা

দিয়ে এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে হনন না করতেন। তবু বলব, একথা বলার মধ্যে যুক্তি আছে যে, "কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদ্দিন জেলের ভেতর ছিলেন তদ্দিন বৃটিশ বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপে আগষ্টোত্তর সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তাঁদের প্রথম কাজ হ'ল, আমাদের কোন কথা না শুনে, আগস্ট সংগ্রামে যোগ না দেওয়ার জন্য আমাদের নিন্দা করা। আমরা যদি তাঁদের মনোভাবকে নীতিহীন সুবিধাবাদ বলি, কে আমাদের দুষবে?"

নীতিহীন সুবিধাবাদেরই আর এক নাম রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি, তাই না, সত্য? হিটলার-স্ট্যালিন ট্রেড প্যাক্ট ও নন-য়্যাগ্রেসন প্যাক্টে আবদ্ধ হবার আগে পর্যন্ত "সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চীৎকারই ছিল রাজনীতি এবং তারপরও এই প্যাক্টে বাহবা দেওয়া রাজনীতি; তারপর পোল্যাণ্ডের ভাগাভাগি এক রাষ্ট্রনীতি; তারপর ফ্রান্স-ইংলণ্ড অবধি ফ্যাসিবাদ নাৎসীবাদের অগ্রগতিকালে নীরবতা এক রাজনীতি; তারপরও ঐ একই ঢল যখন উল্টোস্রোতে বইল, সোভিয়েট রুশিয়ায় পড়ল নাৎসী গুজস্টেপ তখনকার হাহাকারও রাজনীতি এবং একেবারে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ—জল থেকে বাষ্প— "সাম্রাজ্যবাদী" যুদ্ধ থেকে "জনযুদ্ধ"; ফ্যাসিবাদ নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সেদিন সমাদরের সখা। এও রাজনীতি। কিন্তু যোশীদের মতে unprincipled oppotunism নয়। হিরোসিমা নাগাশাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপে নীরব থাকা অথবা উপভোগ করা আদৌ নীতিহীন সুবিধাবাদ নয়। নীতিবিগর্হিত সুবিধাবাদ নয় আরও কি কি কথা, আর বাড়িয়ে বললাম না, সত্য; কিন্তু এদ্দিন পর কি চৈতন্য হ'ল কংগ্রেসে নীতিবিগর্হিত সুবিধাবাদ আছে? অকস্মাৎ লীগের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কংগ্রেসের নিন্দা করে বেরিয়ে আসার মধ্যেই বা কি নীতি-পরিশুদ্ধ সত্যবাদ আছে তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

কংগ্রেসের আরও কি দোষ? "তাঁরা ভুলে গেছেন ফ্যাসিস্ট জাপানের আগ্রাসী হুমকি, তাঁরা সাবোতাজ ক্রিয়াকলাপের সংগঠকদের ভুলে গেছেন,"—জাপানকে তো যোশীরাই শূন্যমার্গে বদ্ধমুষ্টি তুলে

ঠেকিয়েছেন এবং সক্রিয় সহযোগিতায় সাবোটারদের নিস্তব্ধ করেছেন ; এজন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ইনাম পুরস্কারও কি তাঁরা পাননি ? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষে নিশ্চয়ই অন্যায় আগস্টোত্তর দিনগুলোকে মূলতঃ ঘৃণিত বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা প্রেমিক জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান বলা কিন্তু যোশীরা যে ভারতস্বার্থবৈরীদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন তার নিন্দা কি অন্যায় ?

একথা তাঁরা একশবার বলতে পারেন যে, "আমরা ভারতীয় কম্যুনিস্টরা হাইকম্যাণ্ডের বর্তমান লীগ-বিরোধী ও কম্যুনিস্ট বিরোধী নীতিকে মনে করি গৃহযুদ্ধের শক্তিকে সরাসরি উৎসাহ দেওয়া—যার পরিণাম দেশের সর্বনাশ, স্বাধীনতা নয়। "(অঃ বাঃ পঃ, অক্টোবর ৬, ১৯৪৫)

সত্যি ভাল কথা। কিন্তু তার দাওয়াই কি স্বায়ত্তশাসনের নামে বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্থানের সমর্থন ? আমি তো জানিনে, সত্য, unprincipled opportunism, নীতিবিগর্হিত সুবিধাবাদ কাকে বলে। সেদিন কিন্তু ওঁরা ছাড়া কেউ সন্দেহ করেন নি যে, দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা Great Calcutta Killing-এরই মহড়া মাত্র ; ফ্যাসিবাদ নাৎসীবাদের মহড়া যেমন হয়েছিল স্পেনে। কারা সেদিন স্পেনের প্রগতিশীল শক্তিকে সহায়তা না করে নির্বীর্য করেছিল তা আজ কারও অবিদিত নয়। নাৎসীবাদকে ত্বরান্বিত করেছে যেমন ইউরোপীয় ভ্রান্তপথিক কম্যুনিস্টরা, ভারতে পাকিস্থানকেও ত্বরান্বিত করেছে তেমনি কংগ্রেসের ভ্রান্তি ও কম্যুনিস্টদের মদদ।

পুষ্পস্তবক নয়—ইট

সেদিন এসব মহলে নিন্দা করতে শোনা যায়নি যখন মৌলানা আজাদকে ইটপাটকেলে লাঞ্ছিত করায় "ডন" খুশী হয়ে লিখেছিলেন ঃ

We can only say that brickbats, rather than bouquets are always, in all places, in store for puppets and showboys.

কে বা কারা গৃহযুদ্ধের জন্য তরপাচ্ছিল ? যোশীরা যাকে

Muslim homelands বলে অভিহিত করছিলেন, একশ্রেণীর মুসলমানের সংস্থা সারাভারত মজলিস-ই-অর্হর তার নিন্দা করলেন : "Pakistan is nothing short of a fraud which is being placed upon credulous Muslims...." (৯ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

যোশীমহোদয়দের দুর্ভাগ্য, একদিকে কংগ্রেস যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপ নির্বাচন অভিযানে ব্যবহার করেছে অন্যদিকে কংগ্রেস-কম্যুনিস্টদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সারা ভারতব্যাপী আজাদ হিন্দ ফৌজের চেতনা ও প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছিল—ছাত্রদের মধ্যে, কেরাণীদের মধ্যে, ডাক ও তার বিভাগে, পুলিশের মধ্যে, অনুগত বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের মধ্যে ; বিমানবহরের মধ্যে, নৌবাহিনীর মধ্যে। আমার হাতে এত তথ্য আছে, সত্য, নৌ-বিদ্রোহের কালে কালেই, উদ্বেলিত অসন্তোষের—আর. আই. এ. এফ-এ, জব্বলপুর পুলিশে, গোর্খা বিদ্রোহে, উপকূল গোলন্দাজ বাহিনীতে, মালাবার স্পেশ্যাল পুলিশে, হাজারীবাগ পুলিশ ধর্মঘটে, ঢাকা পুলিশ ধর্মঘটে এবং আরও কোন কোন ঘটনা সম্পর্কে যে তোমায় অভিভূত করে ফেলতে পারি। প্রত্যেকটি ঘটনাই এক একটি ছোট কাব্য। কৈ এর একটারও তো ফয়দা ওঠাতে পারেননি মহোদয় বিপ্লবীরা ?

পক্ষান্তরে, মৌলানা আজাদের চোখেও পড়েছিল এই সর্বজনীন বিদ্রোহ :

> "A most remarkable change had in the meantime come about in all the public services...All the three branches of the Armed Forces—the Navy, the Army and the Air Force—were inspired by a new spirit of patriotism.... These sentiments were widespread, not only among officers but also among the ranks......."

সেদিনকার সে মানসিকতা আজ বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। নিন্দা করতে হয়, তাঁদের যাঁরা এই চেতনা ও প্রেরণাকে সজ্ঞান উপেক্ষায় অপযশে বা বলপ্রয়োগে দমন করেছেন। তাঁরাই সেদিন প্রতিবিপ্লবীর ভূমিকায় সারা ভারতে বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। বিকল্প নেতৃত্ব থাকলে ভারতবর্ষে কেরেনস্কি সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

লণ্ডন অবজার্ভারের দিল্লী প্রতিনিধি লিখেছিলেন ঃ—

"India to-day is a vast powder magazine with exclusive potentialities exceeding those at any period of Indo-British history since Mutiny......." (১২ই নভেম্বর,১৯৪৫)

কংগ্রেসের নির্বাচন সাফল্য

কংগ্রেস সেণ্ট্রাল এসেম্বলিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অর্ধেক আসন পেয়ে গেল। বৃটিশ রাজ হতাশায় এবং চারদিককার উত্তপ্ত প্ররোচনায় একটা উপলক্ষ্যের অপেক্ষায় ছিল ; সে উপলক্ষ্য পাওয়া গেল কলকাতায় ছাত্রদের আই-এন-এ (মানে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ) দিবস পালনে। ধর্মতলা স্ট্রীটে পুলিশ গুলী চালিয়ে রক্তরেখা আঁকল। (২১এ নবেম্বর) পর পর ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলল ঐ রক্তের লিখন। মাদুরার রক্ত লক্ষৌয়ে, লক্ষৌয়ের লাহোরে, লাহোরের রাওয়ালপিণ্ডিতে, রাওয়ালপিণ্ডির রক্ত গড়িয়ে এল কলকাতায়—সেই এক উপলক্ষ্য—আই-এন-এ বিক্ষোভ।

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দও ভয় পেলেন, এ শক্তি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার ভয়। তাঁরা বললেন, তাঁরা চান না "strength of the people mis-directed and mis-spent" হয় কেননা, তখন তাঁরা চাইছিলেন সকল শক্তি নির্বাচন-উত্তরণে ও মন্ত্রিত্ব করতলগত করার কাজে নিয়োগ করা হয় (২৮এ নবেম্বর)। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেরণা ও মানসিকতা তো নিঃসন্দেহে কংগ্রেস-ক্রীডের নয়। উৎকণ্ঠিত গান্ধীজী কলকাতায় এলেন ১লা ডিসেম্বর। বাংলায় নির্বাচন আসন্ন। প্রচার করা হ'ল, তিনি সেজন্য আসেন নি, এসেছেন ১৯৪৩-এর ভুক্তভোগীদের সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু ভিড় বাড়তে লাগল ; কৃপালনী, আসফ আলি, রফি আমেদ কিদোয়াইও এলেন গান্ধীজীর কাছে। সোদপুরের সভা রাজ-নীতি-বর্জিত ছিল না। মৌলানা আজাদ এলেন ; কংগ্রেস পার্লা-মেণ্টারী বোর্ডের সভা হ'ল। নিছক ১৯৪৩ এর ব্যাপার নয়। গান্ধীজী প্রদেশের গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করলেন, শোনা গেল, এটি বড়লাটের সঙ্গে

সাক্ষাতের ভূমিকা স্বরূপ। কেসী তখন বাংলার গবর্ণর, তাঁর সঙ্গে চারদিন আলাপ হ'ল গান্ধীজীর এবং দীর্ঘকাল ধরে। সরকারী ইস্তাহারে বলা হ'ল, "বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা।"

পণ্ডিত নেহেরুর নির্বাচনী বক্তৃতা স্পষ্টতর:

> "On coming to Bengal after three and half years my first feeling is to offer my salute and homage to Bengal's dead—dead by famine and starvation, by man's incompetence and inhumanity and done to death by police and military; also my salute and greetings to living Bengal, specially the youth, vibrant and full of passion for India's freedom."

মৃত ও জীবিত বাংলার যুবশক্তিকে প্রণাম! দেশপ্রিয় পার্কে আই-এন-এ সপ্তাহের উদ্বোধনে প্যাটেল ও নেহেরু বক্তৃতা দিলেন এমন এক বিশাল সমাবেশে যে অমন সমাবেশ নেহেরু দেখেন নি। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কংগ্রেস-বিতাড়িত সুভাষচন্দ্রের অকুণ্ঠ প্রশস্তি হ'ল, কেননা, তখন সুভাষচন্দ্র প্রতিরোধের অতীত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাত্রদের সমর্থন করলেন, স্টক এক্সচেঞ্জওয়ালারা লক্ষাধিক টাকার এক তোড়া দিলেন নেহেরুকে। গান্ধীজী শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জনের কন্যা অপর্ণা দেবী ও বাসন্তী দেবীর ভবনে পদার্পণ করলেন (১৭ই ডিসেম্বর)। ১৯৪৩ এর ভুক্তভোগী এঁরা কেউ নন। পণ্ডিত নেহেরু কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিলেন। ১৯৪৩ এর ভুক্তভোগীরা তখন কেউ বেঁচে নেই।

এবং নির্বাচন কিসের ভিত্তিতে? বলা বাহুল্য, কম্যুনাল এওয়ার্ডের ভিত্তিতে: মুসলমান মুসলমানকে ভোট দেবে, জাতীয়তাবাদী হলেও নিস্তার নেই এবং হিন্দু হিন্দুকে ভোট দেবে, জাতীয়তা-বিরোধী হলেও নিস্তার নেই।

গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে গিয়ে গুরুদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এলেন—যে গুরুদেব বড় দুঃখে সুভাষচন্দ্রকে "দেশনায়কের পদে" বরণ করেছিলেন।

এইভাবে নির্বাচনের মজবুত মঞ্চ হ'ল প্রস্তুত।

দুর্ভাবনার বছর ৪৬

ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ১৯৪৬-এ ১লা জানুয়ারী এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন :

"1946 will be a crucial year in India's history."

১৯৪৬ সত্যি তাই হয়েছিল। তার মধ্যে সম-প্রধান ঘটনা হচ্ছে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন, ক্যাবিনেট মিশন, ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট, ব্যাপক ডাক ও তার ধর্মঘট, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, কলকাতার নরহত্যা লীলা, নোয়াখালী-বিহারের বীভৎসতা, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বিজাতি-তত্ত্বের যুপকাঠে আত্মনিবেদন। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, সত্য, তবু বলে যেতে হবে ১৯৪৭-এর ভঙ্গবঙ্গ তীরে সাঁতরে ওঠবার জন্য।

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন ভারতবর্ষে পদার্পণ করলে তার নেতা রবার্ট রিচার্ডস বললেন, আমাদের মিশন সরকারী নয়, সরকারী রিপোর্টও আমরা করব না। আমরা শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ মতিগতি লক্ষ্য করতে এসেছি।

আর একটি হচ্ছে পার্লামেণ্টারী রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীজীর অত্যাশ্চর্য বিবর্তন। তিনি ৫ই জানুয়ারী বললেন : "I am convinced that if real representatives of the will of the people are returned to the legislature, it can render valuable services towards constructive work in adverse circumstances"

গান্ধীজী আসাম নির্বাচনকালে আসাম সফরে গেলেন।

বৃটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা হ'ল আসফ আলির, ডঃ সৌকৎ উল্লা আন্সারী ও যুগল কিশোর খান্নার ৯ই জানুয়ারী; ১০ই তারিখে দু'ঘণ্টা ধরে পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে ; ১৭ই তারিখে মৌলানা আজাদের সঙ্গে ৯০ মিনিটকাল ; গান্ধীজীর সঙ্গে সর্বপ্রথম ২৩-এ জানুয়ারী।

সত্য, এই যে এত মিনিট এত ঘণ্টা ধরে সাক্ষাৎ এ সম্পর্কে লিওনার্ড মসলের কয়েকটি চমকপ্রদ মন্তব্য তোমায় শুনিয়ে রাখি :

"In a land filled with politicians, who often did not know when to keep their mouths shut, (ওয়াভেলের কথা বলছেন), he found it almost impossible to open his."

নেহেরুজী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সারা রাত কথা বলতেন ; যত সমস্যা বাড়ত তত বেশী।

গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে হবে বলে আগের দিন রাতে লর্ড ওয়াভেলের ঘুম হয় নি ঃ

"He spoke to me for half an hour, and I am still not sure what he meant to tell me."

"Gandhi was once asked to describe his policy. 'I will write it down for you in five sentences,' he replied. The reporter took the message away with him and discovered that each sentences contradicted the one before it."

সুতরাং, ঘণ্টা-ক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামিও না, সত্য, জনসভায় তো ওঁরা আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার কমে বক্তৃতাই দিতে পারতেন না, এখনও পারেন না। আমাদের শ্লোগান হচ্ছে, কাজ নয়, কথা। কথকতা নয় কতকথা। এবং এই কথা বলে বলেই একদা কোন এক সময় ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেল।

নতুন বড়লাট-পরিষদ

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশনের সঙ্গেও যখন এমনি 'কথা আর কথা' হচ্ছিল তখন তাঁদের অতিক্রম করে এল এক নতুন ঘোষণা ঃ বৃটিশ সরকার যথাশীঘ্র রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এক নতুন বড়লাট পরিষদ গঠন করবেন এবং সংবিধান সংস্থাও করবেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ভারী খুশী হয়েছিলেন, মৌলানা আজাদ বললেন ঃ "স্বাধীনতা একেবারে কাছেই, যে-কোনদিন কোলে এসে পড়তে পারে।" জওহরলালও বললেন ঃ "স্বাধীনতা এখন আর সুদূরপরাহত নয়।"

কেননা, সংসদীয় পন্থায় ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে কংগ্রেসের এক

বৈপ্লবিক মত পরিবর্তন ঘটেছিল। এবার নির্বাচনে জয়লাভের পর যেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানে তো বটেই যেখানে নেই সেখানেও—অলীগ মুসলিম সংস্থার সঙ্গে নতুবা, এইটাই চমকপ্রদ—মুস্‌লিম লীগের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েও ক্ষমতা দখলে কংগ্রেস নেতারা আগ্রহী হলেন। সিন্ধু থেকে তার সূচনা। এখানে প্রগ্রেসিভ মুস্‌লিম লীগ পার্টির জি. এম. সৈয়দের নেতৃত্বে কংগ্রেস-প্রগ্রেসিভ মুস্‌লিম লীগ পার্টি-খানবাহাদুর মৌলাবক্সের ন্যাশানালিস্ট মুস্‌লিম পার্টির কোয়ালিশন ঘোষণা করা হ'ল ২রা ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৬ যে ১৯৩৭ নয় এ তার প্রমাণ; বাংলাদেশে ফজলুল হকের দলের সঙ্গে কংগ্রেসকে কোয়ালিশন করতে দিলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরকম হত, স্বাধীনতা হয়তো অন্যরকমেও আসত। তা আসতে দেয়নি কংগ্রেসের এই একই নেতৃত্ব, যে-নেতৃত্ব ৪৬এ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিষিদ্ধ কোয়ালিশনের পেছনে ছুটল। ইতিহাসের কণ্ঠে ধিক্কার নেই, সত্য, নইলে এখানে অসহ্য ধিক্কার উঠত।

সিন্ধুতে ঐ ঘোষণার পর সিন্ধু প্রাদেশিক মুস্‌লিম লীগের প্রেসিডেন্ট এম. এইচ. গজদার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের সঙ্গে একঘণ্টাকাল কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করলেন। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি এই অবস্থায় আজাদ প্রস্তাব করলেন যে-কোয়ালিশন ইতিমধ্যেই হয়েছে তাদের অর্ধেক আর মুস্‌লিম লীগের অর্ধেক নিয়ে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী। তাহলে দাঁড়ালো সকল-দল-মন্ত্রিমণ্ডলী। গবর্ণর সব দল-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করলেন, মায় ইউরোপীয়ান ও শ্রমিক। কিন্তু সব বানচাল হয়ে গেল যখন গবর্ণর মুস্‌লিম লীগ স্যার হিদায়েতুল্লাকেই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

আসামেও লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আহা, কি পরিণতি, সত্য, কংগ্রেসেরই নিন্দিত এক সাম্প্রদায়িক সংগঠনের গলায় গলা মিলোতে সিকিউলার কংগ্রেসের কি ব্যর্থ আকুতি!

একই বন্ধনীতে কংগ্রেস লীগ

কাণ্ড কারখানা দেখে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন করাচী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন। কংগ্রেস ও লীগকে তাঁরা এক বন্ধনীতে ফেলে বললেন, এদেরই আধিপত্য। কিছু মুসলমান হয়তো লীগের বাইরে আছেন; কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে কিছু হিন্দু আছেন কিনা তা উল্লেখ করলেন না। লণ্ডন থেকে জানা গেল, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতসচিব পেথিক লরেন্স "have been tremendously impressed by the assessment of the Indian situation made for them by the members of the Parliamentary Delegation who have returned from India.

কিন্তু সব চাইতে যে মারাত্মক কথা ওঁদের চমকে দিয়েছিল তা হচ্ছে গণ্য করবার মতো প্রত্যেকটি মহলে আজাদ হিন্দ ফৌজের অনুপ্রেরণা; যদি এখনই কিছু করা না যায় তো নেতৃত্ব সুভাষবাদীদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে:

> "both Congress and the Muslim League are being dominated by the Indian National Army movement... ... Indian situation is such that before long the initiative could pass out in the hands of Gandhi to those who believe in Bose's doctrine." (Feb. 19, 1946)

নৌ-বিদ্রোহ

সন্দেশ এল ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এলবার্ট এলেকজাণ্ডারকে নিয়ে এক মন্ত্রীমিশন আসছে। লণ্ডন সংবাদের তারিখটা ছিল ১৯এ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬।

ঠিক সেদিনই বোম্বে ও কলকাতার কয়েক হাজার ভারতীয় নাবিকের ধর্মঘটের একটা অগোছালো সংবাদও পাওয়া গেল এবং এই ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, অনিন্দ্য কিন্তু ব্যর্থ নৌ-বিদ্রোহের সূচনা। তোমায় আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব গুছিয়ে বলার চেষ্টা করব। বেসরকারী সূত্রের সংবাদ ও হিসেব হ'ল যে, রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির 'তলোয়ারের' ধর্মঘট অন্যান্য নৌ সংস্থায়ও ৭০০০ নৌ-সেনাকে এর

আওতায় এনে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, বন্দরের জাহাজগুলোও তীরে নৌ সংস্থার ধর্মঘটীর উদ্দেশে সিগন্যালে সমর্থন জানিয়েছে। ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং রিয়ার য়্যাডমিরাল র‍্যাটরে (Rattray) ধর্মঘটী মুখপাত্রদের সঙ্গে দেখা করেন। ধর্মঘটীরা অফিসার কম্যাণ্ডিংয়ের পদচ্যুতি দাবী করেন। ওঁর অপমানকর আচরণই ধর্মঘটের আশু কারণ। ধর্মঘটীরা জানান যে, অনেকদিন ধরে তাঁরা কুখাদ্য ও অসদ্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছিলেন। ২০,০০০ নৌ-সেনা তাঁদের সঙ্গে আছেন।

কিছু গ্রেপ্তার হলেন, নৌ-সেনারা বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে গেলেন।

কলকাতার কাছে মাঝেরহাটে ৫০০ শিক্ষানবিশী নৌ-সেনাও ১৯এ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করেন ; তাঁদের দাবী বোম্বেতে ধৃত নৌ-সেনার মুক্তি ; তাঁর অপরাধ তিনি ক্যাম্পের মধ্যে "জয় হিন্দ" ও "কুইট ইণ্ডিয়া" লিখেছিলেন।

পরবর্তী সংবাদ ঃ "তলোয়ারের" বি. সি. দত্ত স্যালিউটিং বেস-এ (সেলামি বেদী) ঐ কথাগুলো লেখবার সময় ধরা পড়েন, তখন ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর আসবার সময়। দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাঁর মুক্তির জন্য নৌ-সেনারা আন্দোলন করছিলেন সেই আর. কে. সিং তখন জেলে। 'তলোয়ারের' কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন এই ধর্মঘটের আশুকারণ, তাঁকে বদলি করা হ'ল। তাঁর জায়গায় এলেন এক বৃটিশ অফিসার।

সত্য, এই বি. সি. দত্ত হচ্ছেন আমাদের বাংলা দেশের বর্ধমান জেলার বলাই চন্দ্র দত্ত। তিনি ছোট্ট একখানি বই লিখেছেন, নাম 'নৌ-বিদ্রোহ' আমার কুড়োনো অজস্র তথ্য থাক, আপততঃ নৌ-বিদ্রোহের অন্যতম অগ্রণী নায়ক বলাই দত্তকে বলতে দি ঃ

"১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির লোকদের ভারতে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে দেখা দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন—বিক্ষোভ।

"আজাদ হিন্দ ফৌজের আসন্ন বিচারের সংবাদে নৌ-সৈন্যেরা বা

রেটিংগণ হয়ে উঠলো বিচলিত, চঞ্চল। ব্যারাকগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরো বেশী সঙ্কটাপন্ন।

"ঘটনাবলীর এমনি কাঠামোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এমন এক শক্তি যে শক্তিকে পূর্বে কখনো দেখতে পায়নি আর. আই. এন. এর রেটিং নাবিকেরা।......আমরা ছিলাম বহুদূরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সব লোক—ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসংস্কৃতি।

"আমি ছিলাম একজন বেতার টেলিগ্রাফ কর্মী।......আমরা প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়েছিলাম বর্মাদেশের যুদ্ধে। সেখানে আমরা ভোগ করেছিলাম এমন পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত অবমাননা যে বৃটিশ সৈন্যদের প্রতি আমাদের আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা অবশিষ্ট ছিল না। প্রায়ই আমরা টমীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম।...

"আমি সহজেই আমার মত আরো লোকের সন্ধান পেলাম 'তলোয়ারে'।......

"আমরা আমাদের নিজেদের বলতাম 'আজাদ হিন্দ' (স্বাধীন ভারতীয়)।...

"আবেগপ্রবণ আর. কে. সিংকে একটা কিছু করতেই হতো। এক স্বপন বিলাসী যুবক।......দর্শনীয়ভাবে আর. আই. এন. থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের সাহায্য করতে।

"......সিংএর লাভ হলো, তিন মাসের কারাবাসের শাস্তি।

"১৯৪৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কমাণ্ডার-ইন-চিফ-এর 'তলোয়ার' পরিদর্শনে আসার খবর ঘোষণা করা হলো...ভারতীয় সন্ধ্যার স্তিমিত আলোর সুযোগ নিলাম। যে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে কমাণ্ডার-ইন-চিফ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন, সেই বেদীর ওপরে 'জয় হিন্দ' এবং 'ভারত ছাড়ো' লিখে রাখা হলো।...যে সময়ে আমার কাজ শেষ হলো, তখন প্রভাতের আলো সবে ফুটে উঠেছে দিগন্তে।...এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অনবধানবশত একাধিক সূত্র ফেলে এলাম পিছনে। সেই সূত্র ধরে অনতিবিলম্বে তারা আমার সন্ধান পেলো।... আমাকে গ্রেপ্তার করল।

ধর্মঘটের আওতায় এসেছিল কোলাবায় ভারতের রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির বৃহত্তম বেতার ঘাঁটি। ধর্মঘটে ক্যাসল ব্যারাক, ফোর্ট ব্যারাকের এবং বন্দরের বহু জাহাজের লোকেরাও। যাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন "শান্তি লরীগুলো" তাঁদের কুড়িয়ে নিয়ে এল। ধর্মঘটীরা খাবার প্রত্যাখ্যান করলেন। পতাকাদণ্ড থেকে 'তলোয়ারের' প্রতীকচিহ্ন নামিয়ে এনে সেখানে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাও তোলা হ'ল। পরে অবশ্য আপাততঃ কোন পতাকাই সেখানে না রাখবার সিদ্ধান্ত হয়।

২০এ ফেব্রুয়ারী বোম্বে সহরতলীর ভরোসা ও অন্যান্য নৌ-সংস্থা থেকে শত শত নৌ-সেনা লোকাল ট্রেন করে চার্চগেট স্টেশনে পৌঁছোতে লাগলেন। পনের মিনিটের মধ্যে হাজার তুইয়ের এক সমাবেশ হ'ল চার্চগেট স্টেশনে। হাতে কংগ্রেসের তেরঙা ঝাণ্ডা ও কণ্ঠে ধ্বনি। আন্ধেরী থেকে চার্চগেট পর্যন্ত ধর্মঘটীরা ধ্বনি দিয়ে এসেছেন এবং বৃটিশ সেনা দেখলেই বিদ্রূপের শব্দ করেছেন।

তারপর সমবেত বিক্ষোভকারীরা স্টেশন থেকে এলেন 'ওভাল'-এ, নেতারা তাঁদের সম্বোধন করে অহিংস ও সুশৃঙ্খল থাকতে বললেন। তারপর মার্চ করে তলোয়ারের দিকে চললেন সবাই।...

কত সংক্ষেপে বলব, জানি না, সত্য। করাচীতে গুলী চলল, ভারতীয় নৌ-সেনারা পাল্টা কামান দাগল। বোম্বাইয়ে বৃটিশ সেনারা চালালো গুলী। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেনঃ রয়াল নেভি রওনা দিয়েছে বোম্বের দিকে।

ভারতীয় নৌ-সেনারা ২০টি জাহাজ ও অস্ত্রাগার দখল করল।

ইত্যাদি। তারপর ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশে আত্মসমর্পণ।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তখন কোথায় ছিলেন? মৌলানা আজাদ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করে বেড়াচ্ছিলেন সারা ভারতে। জনতার বিপরীত মেজাজ লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে বলছিলেন, বৃটিশ সরকার যদি অবহিত না হন, সংগ্রামের আহ্বান দিতেই হবে; কিন্তু হে

ভারতবাসিগণ, তোমরা যেন সত্যিই আন্দোলন করে বোসো না, শান্ত থাক ঃ তাঁর সম্মুখে এক উজ্জ্বল চিত্র ; বললেন ঃ

> "The picture that I am seeing now is a picture of success and glory. It is a splendid picture. I was in Karachi. I was in Shillong. But I have the same picture before me."

এ কথা বললেন এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার কাছে লাহোরে ১লা মার্চ। এবার পাঞ্জাবে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট। শুনে নাকি লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিল্লীতে নৌ-বিদ্রোহের কথা শুনে তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, "this was not an appropriate time for any mass movement or direct action."

হতভাগ্য ভারতীয় নৌ-সেনারা যেদিন ভারতীয় নেতাদের সক্রিয় চাপে আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেন সেদিন কংগ্রেসের সর্বময় নেতা গান্ধীজী পুণা থেকে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি প্রচার করলেন নৌ-সেনাদের সর্বাংশে নিন্দা করে, কেন না, তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি যত্নবান হবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তিনি নৌ-সেনাদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কি বলেছিলেন, অবকাশ পেলে তোমায় বলব। আপাততঃ শুধু এইটুকু তুলে দিচ্ছি ঃ

> "Why should they continue to serve, if service is humiliating for them or India ?

সত্য, এই মহাত্মাই একদা মিস মেয়োর বই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন Drain-Inspector's Report. আমি জানিনে, গান্ধীজীর এই বিবৃতির মাপকাঠি কি হবে। এ বিবৃতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী অথবা এখানকার বড়লাট কি বোম্বে গবর্ণর দিলেও কিছুমাত্র বেমানান হ'ত না ; কিন্তু লোকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করত এই মাত্র। অথচ দেখ, এই বিশুষ্ক নিষ্করুণ বিবৃতিতে ভারতীয় নৌ-সেনাদের দুঃখ-কষ্ট বেদনার জন্য লেশমাত্র সহানুভূতির কথা নেই, পক্ষান্তরে ওরা কেন লাঞ্ছনা বয়ে চাকরী ক'রে সেজন্য নিষ্ঠুর কটাক্ষ আছে।

লাঞ্ছনা ? এ সমাজের কোথায় নেই ? জেলখানায় লাঞ্ছনা নেই ? তবে জেলে যাওয়া কেন ? আমেদনগর ফোর্ট আর পর্ণকুটিরের কপাল নিয়ে কোটী কোটী লোক জন্মায় না ; তাই ব'লে রাজনীতিতে লাঞ্ছনা নেই ? মসলের বিবরণ যদি সত্যি হয় তো এ লাঞ্ছনা নয় ?

"গান্ধী ঃ কিন্তু আপনি তো আগেই ঘোষণা করেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট হবে। এখন তো কথা ফিরিয়ে নিতে পারেন না।

"ওয়াভেল ঃ অবস্থা বদলে গেছে। কলকাতায় হত্যালীলার পর ভারত এসে পড়েছে গৃহযুদ্ধের সীমান্তে। এ নিবারণ করা আমার কর্তব্য। আমি তা নিবারণ করতে পারব না, যদি মুসলমানদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে দি। তাহলে তারা স্থির করবে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামই একমাত্র পথ, আবার তবে বাংলা দেশে হত্যালীলা হবে।

"নেহরু ঃ অর্থাৎ আপনি মুসলিম লীগের ব্লাকমেলের (মানে যাকে বলে হুমকি দিয়ে কাজ আদায়ের) কাছে আত্মসমর্পণ করছেন ?

> "Wavell : (with great heat) : For God's sake, man, who are you to talk of blackmail ?"

লাঞ্ছনার মাপকাঠি কি, সত্য ?

অপরে রাজসিক গ্রাসাচ্ছদন জোগাবে এমন সৌভাগ্যে নিয়ে সবাই জন্মায় না ; পৃথিবীর কোটী কোটী মানুষকে লাঞ্ছনা অপমানের মধ্যেই মেহনত ক'রে জীবনধারণের অন্ন খুটতে হয়। তাই বলে তারা কাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শ্রমানুপাত মজুরী—সর্বোপরি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অন্তরে দেশপ্রেম পোষণ করতে পারবে না ? সে যদি কখনো উদ্বেলিত হয় তবে তা আমার মতে চলল না বলে নিন্দা করতে হবে এবং দণ্ডদাতাদের অপেক্ষায় না থেকে বিচার করব আমি ? দণ্ড দেব আমি ? না, সত্য, এত তত্ত্বকথার কাঁটা আমি সহ্য করতে পারতাম যদিনা বিবৃতির শেষে মূল উদ্দেশ্যটা অত বিবস্ত্র হয়ে দেখা দিত। শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, অতএব, শান্ত হও, ধীরে কথা কও, ওরে মন নত কর শির।

তুমি বিশ্বাস করবে, সত্য, এজন্য লণ্ডনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'ইকনমিষ্ট' গান্ধীজীকে পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন ?

> "Credit for the restoration of order in India must go not only to the police and troops called out to control of mobs, but to Indian leaders—particularly, Mr. Gandhi."

কিন্তু রাগ করছিলেন নেহরুজীর উচ্ছ্বাসপ্রবণতায়।

> "A dangerous pettern has already been set—particularly by Pandit Nehru—of using revolutionary phrases in times of quiet and then of repudiating the consequences when the fervour of nationalism breaks out into open demonstrations."

এই পত্রিকার মতে এ হচ্ছে "alternate blowing hot and cold." ঠিক ২রা মার্চেই ঝাঁন্সীতে এমনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন নেহেরু :

> "If the British Cabinet Mission fails to solve the pressing and urging problems which are clamouring for a solution, a political earthquake of devastating intensity would sweep the entire country."

এবং নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে কি বলেছিলেন, পরে আমি তোমায় বিশদ বলব।

পচানব্বই শতাংশ পাকিস্থান

আমরা জানতাম না, সত্য, বৃটেনের প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ ও অন্যতম শ্রমিক নেতা হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রকাশ করে দিলেন ; বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন আসবার আগেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পচানব্বই শতাংশ পাকিস্থান মেনে নিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে পণ্ডিত নেহরুর একটি বক্তৃতার উল্লেখ করলেন।

এ-পি-আই এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পণ্ডিত নেহরু অস্বীকার করলেন না, বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রস্তাবেই তো তা আছে :

> "What I said was that Congress proposals as contained in recent resolutions and in particular in the election mani-

festo were such as to give 95 percent self-determination to the constituent units in the Federation."

"আমরা বলেছি যে, আমরা ফেডারেশনে স্বেচ্ছাসম্মত শরিক চাই এবং এইসব ইউনিটের সাধারণ বিষয়গুলো ন্যূনতম করতে হবে—যেমন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ইত্যাদি। একেই আমি বলেছি ৯৫ শতাংশ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এবং অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ সমষ্টিভূত।

ক্যাবিনেট মিশন এল

অতএব ক্যাবিনেট মিশন বেশ প্রস্তুত হয়েই এল। চার বছর আগে এসেছিল একক ব্যক্তি এক মিশন—ক্রিপস মিশন। আর ১৯৪৬-এর মার্চ নয়াদিল্লীতে এল ক্যাবিনেট মিশন। সাংবাদিক সম্মেলনে জওরলালের ৯৫ শতাংশ পাকিস্থানেরই প্রতিধ্বনি করে লর্ড পেথিক লরেন্স বললেন ঃ নীতিগতভাবে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ স্থির হয়ে গেছে। এখন দেখতে হবে কি উপায় নিলে ভারতীয়েরাই ন্যূনতম কলহ উত্তীর্ণ হয়ে দ্রুততম গতিতে নিজেদের প্রশাসনযন্ত্র স্থির করতে পারে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ৩১এ মার্চ জিন্নার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, ঘণ্টাখানেক আলাপও হল। ভারত সচিবের সঙ্গে গান্ধীজীরও আলাপ হল ১লা এপ্রিল। এর পর ঐদিন সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব। ক্যাবিনেট মিশন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন। খাঁন আবদুল কায়ুম খান ও স্যার মহম্মদ সাদুল্লা মিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসতেই গান্ধীজীর পত্রবাহক বড়লাট ভবনে গাড়ী করে এলেন এবং মিশনের হাতে এক পত্র অর্পণ করলেন। মিশন সপ্রু-ভবনে গিয়েও সপ্রুজীর সঙ্গে দেখা করলেন। মিশনের সঙ্গে দেখা হল রাজন্য পরিষদের চ্যান্সেলারের সঙ্গেও। জিন্নাজীর পরামর্শ মতো সাদুল্লা গোটা আসামই পূর্ব-পাকিস্থানের জন্য দাবী করলেন। (২রা এপ্রিল)

মৌলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল, বোম্বে-ইউপি-বিহারের প্রধান মন্ত্রিগণও দেখা করলেন। (৩রা এপ্রিল)

ইতিমধ্যে ৩রা এপ্রিল নয়াদিল্লী থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি খবর দিলেন যে, আজকে লবি মহলে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় বিধানসভা কক্ষে এক সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে; মন্ত্রিমণ্ডলী ও সদস্যদের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের মুক্তি নিয়ে লক্ষ্যণীয় বিভেদ দেখা দেয়। সীমান্ত কংগ্রেস সদস্য খান আবদুল গণি খানের একটি বেসরকারী প্রস্তাবই ছিল এই বিতর্কের বিষয়। কংগ্রেস ও লীগ সদস্যেরা প্রথমে যে বক্তৃতা দেন তার সুরই ছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী-সেনানীদের মুক্তি দিতে না পারলে পণ্ডিত নেহরু ও লিয়াকৎ আলি যেন পদত্যাগ করেন। জবাব দেবার কথা ছিল বলদেব সিংয়ের কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিধায় জওহরলালই আগাম এক বিবৃতি দেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানান যে, একটা সাংবিধানিক সঙ্কট এড়িয়ে এদের মুক্তিদানে গবর্ণমেণ্ট অসমর্থ। প্রধান সেনাপতি মুক্তি-দানের অত্যন্ত বিরোধী; তাঁকে বদল করার ক্ষমতা বর্তমান গবর্ণমেণ্টের নেই, অথচ প্রধান সেনাপতি বদল না হলে ঐ বাধা অতিক্রম করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সদস্যেরা যদি এই প্রস্তাব গ্রহণে অবিচলিত থাকেন তবে গবর্ণমেণ্টের পদত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই বিবৃতিতে কংগ্রেস সদস্যগণ প্রশমিত হলেও মুসলিম সদস্যেরা অনমনীয় রইলেন। গবর্ণমেণ্ট বিষয়টি ফেডারাল কোর্টে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবক প্রগাঢ় অনিচ্ছায় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমতি চাইতেই তা দিয়ে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু এর অন্তরালে কি হয়েছিল? সিঙ্গাপুরে মাউণ্টব্যাটেনের ভারতীয় বন্ধুর কি ভূমিকা ছিল? সিঙ্গাপুরে বন্ধুত্ব সঞ্চারের কথা সানন্দে স্মরণ করে মাউণ্টব্যাটেনই বলেছেন:

> "On Ist April Nehru admitted that this situation confronted me with a grave dilemma."

"দুদিনের মধ্যেই এসেম্বলিতে এই নিয়ে বিতর্ক সুরু হবে। এটি আবার মুলতুবী রাখা যাবে না [এর আগে লর্ড ওয়াভেল ভেটো প্রয়োগ

করেছিলেন]। আমি যদি ভেটোর পুনরাবৃত্তি করি তবে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনার সূচনায়ই আমি সকল দলের ভারতীয় রাজনীতিকদের সুনাম নষ্ট করব। আর যদি ব্যবস্থান্তর গ্রহণ করি তবে আমার বন্ধু ও যুদ্ধকালীন আমার সহকর্মী, প্রধান সেনাপতি অকিনলেক নিশ্চয়ই পদত্যাগ করবেন এবং তাতে অনুগত ভারত সেনাবাহিনী, সাধারণভাবে বৃটেনের অধিবাসী, বিশেষ করে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গুরুতর রকমে ক্ষুণ্ণ হবে।

"আমি অকিনলেককে আমার সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় দেখা করতে বললাম। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, আমি যদি এই সব বিশ্বাস-হন্তাদের মুক্তির আদেশ দি তবে তিনি সেনাবাহিনীর আস্থা হারাবেন এবং একবার তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাঁর ঐ পদে থাকার কোন সার্থকতা থাকে না। শেষে তিনি বললেন যে, উভয় পক্ষ যদি আর আর এক পা অগ্রসর হতে রাজী না হন তা হলে আমার সামনে দুটি বিকল্প থাকবে ; তার যে কোন একটি আসন্ন আলোচনায় আমার মর্যাদার হানি ঘটাবে।

"পরদিন আমি প্রবীণ তিনজন মন্ত্রী—নেহেরু, লিয়াকৎ আলি খান ও বলদেব সিংয়ের যে বৈঠক হবে তাতে তাঁকে আসতে বললাম। এই বৈঠকটি দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হয়েছিল। পরিশেষে নেহরু এই অচলাবস্থা ভাঙলেন তাঁর সহকর্মীদের বুঝিয়ে ; তিনি পরদিন এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে অবিলম্বে মুক্তির দাবী প্রত্যাখ্যান করবেন। কিন্তু তাঁদের একথা বলতে দিতে হবে যে, প্রধান সেনাপতি এদের দণ্ড পরিবর্তন করা হবে কি না এই সুপারিশ করে বিষয়গুলো ফেডারাল কোর্টের সামনে উপস্থিত করবেন। প্রস্তাবটি ভেবে প্রধান সেনাপতি রাজী হয়ে গেলেন।

মাউন্টব্যাটেন মন্তব্য করেছেন : "that was the end of the I.N.A. as a political issue. I breathed again. গান্ধীজী তো ওদের চাষ-আবাদে মন দিতে বলেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন আরও বলেছেন—যে-কথা শাসকশ্রেণী অনুগতদের বরাবর বলে এসেছেন ঃ

> "Nehru had already had some idea of the I.N.A. problem in Singapore when he agreed not to lay a wreath on the local INA. Memorial, but it must have taken great moral courage to persuade his colleges to accept this solution,"

কিন্তু সেও আই.এন. এ'র নামে নির্বাচনোত্তীর্ণ হবার পর।

৪ঠা তারিখে তিন ঘণ্টা ধরে জিন্নার সঙ্গে মিশনের আলাপ ; তিনি আলাপের বিষয় কিছুই ভাঙলেন না ; কিন্তু লণ্ডন নিউজ ক্রনিকলের পররাষ্ট্র সম্পাদক নর্মাল ক্লিফকে জিন্নাজী বললেন ঃ "আমি নিজেকে ভারতীয় মনে করিনে ; ভারত বহু জাতির বাসস্থান ; তার মধ্যে দুটি বড় জাতি। আমরা শুধু চাই আমাদের জাতির জন্য একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র—পাকিস্থান।

কিন্তু লিওনার্ড মসলে বলেছেন ঃ Nehru drew attention to the fact that Jinnah was himself only a second generation Muslim whose grandfather had been a Hindu." অর্থাৎ, ঠাকুর্দা ছিলেন হিন্দু, বাপ মুসলমান, সেই সুবাদে মুসলমান।

লিওনার্ড মসলেকে নেহেরু আরও বলেছিলেন যে, "I have Muslim relatives and friends. Jinnah conldn't even recite a Muslim prayer and had certainly never read the Koran."

না হোক, জিন্নার বাহাদুরি এখানে তিনি "অভারতীয়" হয়ে গিয়ে ভারতীয় নন এটি প্রতিপন্ন করেছেন। পাকিস্থান ভারতবর্ষের নামোচ্চারণ করেনা, বলে হিন্দুস্থান এবং এখানকার নাগরিক হিন্দুস্থানী। সেই ভারত, ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের বাইরে আলাদা এক অভারতীয় রাষ্ট্র এবং স্থিরলক্ষ্য পাকিস্থান পত্তনি করার সামর্থ ও সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন—একজন মহাত্মা পরিচালিত কংগ্রেসের পরিশুদ্ধ সংগ্রামী সমবেত শক্তি সত্ত্বেও। দ্বিতীয়ত তিনি নেমাজ পড়তে জানতেন কি জানতেন না, কোরান পড়েছেন কি পড়েন নি, রাজনীতিতে এও অতিতুচ্ছ কথা। হিন্দুদেরও তবে রাজনীতিক হতে

হলে শাস্ত্রী ও বৈদান্তিক হতে হয় ; অধিকাংশ হিন্দুরই—কি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, বেদ বেদান্ত পড়া নাই, নিত্য আহ্নিক সন্ধ্যায়-পূজাও করেন না। কিন্তু জিন্নাজীর মত কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্থকতা কোন হিন্দুনেতা লাভ করেন নি।

"পাকিস্থান কিছুতেই নয়"—নেহরু

পণ্ডিত নেহরুর বরাবরই কথাবার্তা কিছু নাটকীয়—বাস্তবসম্পর্ক-লেশহীন। তিনি কার্যত পচানব্বই শতাংশ পাকিস্থান মেনে নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু ১৯৪৬ এর এপ্রিল মাসে খানিকটা বাহাদুরি বলেই ঘোষণা করলেন ঃ

> "The Congress is not going to agree to the League demand for Pakistan under any circumstances whatsoever—even if the British Government agrees to it...... Nothing on earth, not even U.N.O., is going to bring about Pakistan that Mr. Jinnah wants."

"বৃটিশ সরকার রাজী হলেও কংগ্রেস কোন অবস্থাতেই লীগের পাকিস্থান দাবী মানবেনা। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, রাষ্ট্রপুঞ্জও নয়, যে জিন্নার চাহিদামতো পাকিস্থান এনে দিতে পারে।" অথচ ভাগ্যের কুটিল পরিহাস, মাত্র কয়েকমাস পরেই, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম যে দু'জন মাউণ্টব্যাটেনের ফাঁদে পড়ে পচানব্বই শতাংশমাত্র নয়, পূর্ণ পাকিস্থানে রাজী হন, নেহরু তাঁদের দ্বিতীয়।

দেশবিভাগের বিরুদ্ধে শিখেরা ছিলেন, দেশীয় রাজন্যবর্গ ছিলেন ; মিশনকে মাষ্টার তারা সিং, স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার একথা জানিয়ে দিলেন। (৫ই এপ্রিল)

পক্ষান্তরে, জিন্নাজী তেমনি জোরে নয়াদিল্লীতে মুসলিমলীগ সংসদ সদস্যবর্গের কনভেনসানকে সম্বোধন করে ৭ই এপ্রিল বললেন ঃ মুসলিম ভারত কক্ষণো একটিমাত্র সংবিধান রচয়িতা সংস্থায় সম্মত হবেনা এবং পাকিস্থান মেনে না নেওয়ার আগে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠন করলে তা গ্রহণ করবে না। মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত যদি

চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় মুসলিম ভারত সর্বতোভাবে ও সর্বস্ব দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে।

লক্ষ্য করছ, সত্য, শব্দটা "মুসলিম ভারত," "ভারতীয় মুসলমান" নয়। মুসলিম ভারত বলে কিছু ছিল না, একটা কল্পিত, হাইপথেটিকাল উচ্চারণ মাত্র, কিন্তু জিন্নার কৃতিত্ব ঐ শূন্যমার্গী বস্তুকেই তিনি মাটীতে সুপ্রোথিত করেছেন, সজ্ঘশক্তিবলে যত নয় তার চাইতে বেশী অপরের দুর্বলতা প্রয়োগে।

সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরু যথাক্রমে পাকিস্থান মেনে নেন; তাঁদের দু'জনের বক্তৃতা উল্লেখ ও ঠাট্টা করে গান্ধীজীর "কায়েদ-ই-আজম" বললেন: রক্তপাতের যে হুমকি দেওয়া হয়েছে ওটা অন্ততঃ এবারের মতো ধাপ্পা (more a bluff than reality this time); তবু যদি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইংরাজরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তবে মুসলিম ভারত নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ থাকবে না। মিঃ নেহরু ভুল করছেন। গোলমাল হয়তো একটু হবে, তবে খুব বেশী নয়।

এরই মধ্যে (৬ই এপ্রিল) গান্ধীজী নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় বললেন, স্বাধীনতার পদধ্বনি কানে আসছে।

"To-day freedom is ringing in our ears."

পণ্ডিত নেহেরু অবশ্য জিন্নাজীর জবাব দিলেন ৭ই এপ্রিল বি বি সি'র স্পেশ্যাল করেসপণ্ডেন্ট ডোনাল্ড এডওয়ার্ডসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, কিন্তু কিছু নরম সুরে: "আমার মত হচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে কেটে পৃথক মুসলিম জাতি (a separate Muslim nation) সৃষ্টির ভাবনা উদ্ভট ও অবাস্তব। তবে এ জনসাধারণই স্থির করবে। যাঁরা অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চান না তাঁদের আমি থাকতে বাধ্য করতে চাইনে। আমার প্রস্তাব ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ কর্তৃত্ব অপসারণের পর গণভোট নেওয়া। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, মুসলিম জনসাধারণ আসল অবস্থাটা জানতে পারলে আমাদের ছাড়তে চাইবে না। তবু যদি তারা যাওয়াই স্থির করে, আমি তাদের যেভাবে খুশী কাজ করতে দেব। আমি মনে করি তারা শিগগিরই বুঝতে

পারবে তারা দীর্ঘকাল পৃথকভাবে চলতে পারে না, তখন তারা ফিরে আসবে।”

সত্য, এই হ'চ্ছে আমাদের রাজনৈতিক প্রবক্তাদের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান। যে-কোন দেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব পেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই তার সখ্য যাচনার হিড়িক পড়ে যায়। পাকিস্থান সম্পর্কেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভারতীয় নির্বোধ জনসাধারণকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলেন; কিন্তু আজ? আজ তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি লিভায়েথান ভারতকে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে।

গান্ধীজীর তৃতীয় পক্ষ

গান্ধীজী ৯ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে এই উক্তি করলেন যে, পাকিস্থান প্রশ্নে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যদি কোন সমাধানে না পৌঁছোতে পারে তবে সমগ্র প্রশ্নটি এক আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনালে দেওয়া যেতে পারে।

দেখ, সত্য, আমরা প্রতিনিয়ত ব'লে চলেছি তৃতীয় পক্ষই যত অনর্থের মূল, তৃতীয় পক্ষ অপসারিত হোক, আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি ক'রে থাকব। কিন্তু দেখ, তৃতীয় পক্ষের ওপর কি অপরিমেয় বিশ্বাস! কম্যুনাল এওয়ার্ডে দেখেছ তার ফল। ছুঁচো গেলা! তারপর ইতিহাসে এগিয়ে গেলে আরও দেখবে, কাশ্মীর বনাম ইউ. এন, ও, বাগে এওয়ার্ড, কচ্ছ এওয়ার্ড ইত্যাদি।

আপাততঃ গান্ধীজী গেলেন বড়লাট ভবনে যেদিন এই উক্তি করলেন সেদিনই। কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল অকিনলেকের সঙ্গে দেখা করলেন। বড়লাটের সঙ্গেও।

কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ বৃথা; ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই পাকিস্থানের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছেন। নেহরুর মতো সর্দার প্যাটেল লণ্ডন "ডেলী ওয়ার্কার”-এর রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেন:

“কংগ্রেসের কথা হচ্ছে যে, লীগ যদি মনে করে মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে চায় সেভাবে তার বিকাশ হচ্ছে না, কংগ্রেস তবে প্রদেশগুলোর

এমন ভাবে পুনর্বণ্টনে রাজী আছে যাতে তাঁরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পূর্ণতম স্বায়ত্তশাসন পেতে পারেন—তবে সাধারণ স্বার্থের কয়েকটি বিষয়ে এক নীতি হবে।"

আলোচনার তৃতীয় পর্যায়

এইভাবে, মিশনের মতে, সমঝোতার আলোচনা তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করল। মিশন সব্বার কথা শুনেছেন; এবার একটা কাঠামো দাঁড় করানো, অতএব, 'চুপ করার পালা'।

অথবা, সত্য, ছাগশিশুর বলিদান স্থির ; এখন শুধু মাথাটা ন্যাজাটা নিয়ে বাঁটোয়ারার কোঁদল।

১২ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বা "কংগ্রেস ক্যাবিনেটের" বৈঠক বসল। দেখা গেল, অনেকেই পাকিস্থান কম বেশী গিলে ফেলেছেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর পুনর্বিন্যাস ক'রে একটা সীমান্ত-কমিশন গঠনের দিকেও এগিয়েছেন। কিন্তু ঐ একটু কোঁদলের জেদ রইল একটা কেন্দ্রীয়সংস্থার কয়েকটি কর্তব্য নিয়ে। আর থাকল সেই সর্বনেশে মিথ্যা সিকিউলার তত্ত্ব যে, অধিবাসী অদল-বদল নয়।

এদিকে বিলেত থেকে ১৪ই এপ্রিল শমন এল : যে-কোন মূল্যে ফয়সালা একটা ক'রেই ফিরতে হবে মিশনকে।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎগতি অন্ধ তৎপরতা বেড়ে গেল সব মহলেই।

বহুকথা (আহা, কত কথা !) মন্থনের পর কথাসরিৎসাগরে এই ফেনপুঞ্জ ভাসতে লাগল : (১) দুটি বা তারও বেশী সার্বভৌমাধিকার-সম্পন্ন ফেডারেশন হবে ; (২) এই ফেডারেশনগুলো স্বেচ্ছায় একটা কনফেডারেশনের মধ্যে আসবে, তাদের চূড়ায় থাকবে একটা ঢিলেঢালা কেন্দ্র ; (৩) এই চূড়া বা কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, কাষ্টমস, পরিবহন ; (৪) এর কোন আইন সভা থাকবে না, স্রেফ প্রশাসনিক ; (৫) ঐ প্রশাসনে সব কনফেডারেশনের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

আজাদ বললেন, না, প্রথম হ'ল, পূর্ণ স্বাধীনতা ; দ্বিতীয়, অখণ্ড ভারত ; তৃতীয়, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এক ফেডারেশন ; চতুর্থ, কেন্দ্রের ছুটো তালিকা, একটি আবশ্যিক, আর একটি ঐচ্ছিক।

তুমি লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই; সত্য, যে, এই এতবড় দেশে যে-হিন্দুর আধিপত্যে লীগের আপত্তি ও আশঙ্কা, সেই হিন্দু বা হিন্দুমহাসভার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই এই দীর্ঘকালীন সংলাপে।

মিশন গেলেন শ্রীনগরে ১৯এ এপ্রিল।

তুমি আরও লক্ষ্য করবে, সত্য, এক জিন্না ছাড়া, ব্যাপারটা যতই এগোচ্ছে আর সবার ভেতর ততই একটা চেপে যাওয়ার অথবা অবান্তর কথা কওয়ার তৎপরতা চলেছে। ১৭ই এপ্রিল ভারত সচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর গান্ধীজী অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কিছু বলতে রাজী হলেন না। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্যতম মুখ্যনট পণ্ডিত নেহরু কৌতূহলী জনতার উদ্দেশে ধাঁধাঁ রাখলেন: যবনিকা উঠছে মহানাটকের:

> "Curtain is very soon likely to go up on the final act of the great drama of our struggle for independence."

মিশন ও বড়লাটের মিলন বৈঠক হ'ল, বৈঠক হ'ল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৫এ এপ্রিল। মিশন-বড়লাট সাক্ষাতের পর স্যার স্ট্যাফোর্ড গেলেন আজাদ আর গান্ধীজীর কাছে পৃথক পৃথক ভাবে। ২৭এ এপ্রিল মিশন গেলেন আজাদ ও জিন্নার কাছে একটা মীমাংসা সাধনের উদ্দেশ্যে এক ত্রিপক্ষীয় যুগ্মসম্মেলনে অংশ নেবার জন্য প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধ নিয়ে।

ব্যাপারটা যখন মোটামুটি স্থির, তখন সর্দার প্যাটেল ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানার্জীর কাছে এক জবাবী চিঠিতে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন বাংলাকে: "আপনাকে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা এক বিষয়ে এক, অর্থাৎ কংগ্রেস সমগ্রভাবে ভারতীয় ঐক্যের পক্ষপাতী এবং আপনার আশঙ্কা-মতো কোন বিভাজনে কংগ্রেস রাজি হতে পারে না। একটা প্রদেশের

সমষ্টিগত ইচ্ছা কংগ্রেস কি ক'রে উপেক্ষা করতে পারে? কার্জন তা পারে, কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক সংস্থা তা পারে না।

> "A Curzon can do it but not a democratic organisation like the Congress. But even what Lord Curzon did was undone by Bengal and it would be easier for Bengal to assert its will against any attempt to repeat such a folly by any popular organisation. (অঃ বাঃ পঃ ২৮এ এপ্রিল)

মিশন-প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় বা যুগ্মসম্মেলনের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রেসিডেণ্ট আজাদকে আর তিনজন সদস্য সঙ্গে নেবার অধিকার দিল; মুসলিম-লীগ কাউন্সিলও প্রেসিডেণ্ট জিন্নাকে তিনজন সদস্য সঙ্গে নেবার অধিকার দিল।

সিমলা বৈঠক

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দিল্লী থেকে সিমলায় এসে স্থির হ'ল।

ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের ওপর অকস্মাৎ যবনিকা পড়ল আর গ্রীণরুমের কোনে কোনে গুচ্ছ গুচ্ছ নেতার ফিসফিসানি চলল। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে ও মিশনের দেখা করলেন, পণ্ডিত নেহরু ও আজাদও মিনিট পঁচিশেক রইলেন বড়লাট ভবনে। নেহরু এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, আবতুল গফফর খান পায়ে হেঁটে পাছতুয়ার দিয়ে। একই সময়ে গান্ধীজী যখন স্যার স্যাফোর্ডের সঙ্গে কথা কইছেন তখন জিন্নাজী কথা কইছিলেন বড়লাটের সঙ্গে। মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেলও বড়লাটের সঙ্গে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে আলাপ করলেন। কথাবার্তা এতই গোপন যে, মৌলানা কিছু ভাঙতে চাইলেন না।

এসব কথাবার্তার কৌতুককর দিকটার ওপর মসলে ভারী চমৎকার আলো ফেলেছেন। একদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কথা কইতে সুরু করলে থামতে জানেন না, অন্য দিকে বড়লাট ওয়াভেল একেবারেই কম কথার মানুষ। "He did not know how to talk" অপর পক্ষের অনর্গল কথার কোথাও বিরতি ঘটলে বলতেন "I see. Thank you" শুধু অবস্থাটা বোঝাবার জন্যই এই সব কথাবার্তা বলতে

হয়, নইলে শেষ পরিণামের দিক থেকে এসব যে নিছক "ক্যাচমেচি" একথাটা বোঝাবার জন্যই মসলে বলেছেন ঃ

> "So much of the futile squabbling, the litigious argumet, the divagations of Congress, the mulishness of Jinnah, the cloudy idealism of Gandhi had no more effect on the eventual outcome than the chatter of birds in a thunderstorm."

জিন্নাজী একজন বিশেষ বাহক মারফৎ লর্ড পেথিক লরেন্সকে একখানি চিঠি পাঠালেন। বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা স্যার কনরাড কর্ণফিল্ড এসে পৌছোলেন সিমলায় ; সব মিলিয়ে অনুমানের সঞ্চার হ'ল যে, আলোচনার মূল কথা কেন্দ্রীয় ইণ্টারিম সরকার গঠন। পত্রিকায় ১০ই মে সাতকলামব্যাপী খবর ঃ বড়লাট পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগ ঃ ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টের পথ পরিষ্কার—এই খবরে ঐ অনুমান ঘনীভূত হ'ল।

দীর্ঘ অদর্শনের পর

এদিকে যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক চলছিল তার একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হ'ল জিন্না-নেহরুর মধ্যে। মসলের মতে এঁরা দু'জন কেউ কাউকে দেখতে পারতেন না। জিন্না সম্পর্কে নেহরুর এমন বহু উক্তি মসলে লিপিবদ্ধ করেছেন যা আদৌ 'গুণ-বাচক' নয়। ১৯৩৯এ একবার দু'জন বসেছিলেন বৈঠকে, খানাও খেয়েছিলেন, তারপর সাত বছর পর এই প্রথম। আজাদের বদলে নেহরু হয়েছেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য, সত্য, খুবই উল্লেযোগ্য যে, লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ পেল, ভারতে বৃটিশ কারবারীরা এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে, ভারত সরকার অথবা সংবিধানের যাই পরিবর্তন হোক না কেন তাঁদের স্বার্থ কোন রকমেও ক্ষুন্ন হবে না। ক্ষমতা হস্তান্তর যদি স্থির হয়ে যায় তবে ভারত-বৃটিশ চুক্তিপত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই একটি ধারা থাকবে। তখন ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

১০ই মে সিমলাতে আর একটি একাঙ্ক নাটক হ'ল। মুসলিম লীগ

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ; জিন্নাজী কক্ষে প্রবেশোদ্যত ; নেহরুর সেক্রেটারী উপাধ্যায়ের প্রবেশ ; জিন্নাজীর হাতে একখানি পত্র অর্পণ। ১৬৫ মিনিট ধরে লীগ বৈঠক। জিন্নাজীর চিঠি নেহরুজীর হাতে অর্পণ। ১১ই মে জিন্না-নেহরু বৈঠক। নিষ্ফলং। মিশন-হোয়াইট হ'ল যোগ। তারপর পত্রিকার সাত-কলাম ব্যানার লাইন ঃ ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ব্যর্থ।

একটু উত্তেজনা হয়েছিল। কংগ্রেস ও লীগ সমর্থকেরা মল-এ কংগ্রেসী ও পাকিস্থানী ধ্বনি দিয়ে ফেরে ; আজাদ ও নেহরুর পেছনে পেছনে এক বিরাট জনতা যায় আর ধ্বনি দিতে থাকে। "রিট্রিটের" অলিন্দে দাঁড়িয়ে নেহরু বললেন, সম্মেলন শেষ।

পুলিশীব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এখন শুধু ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টের সূত্রটি ঝুলছিল। অকস্মাৎ আবার এক সাত-কলামের শিরোনামা বেরোলো ঃ ভারতীয় ইউনিয়ান ঃ পাকিস্থান নয় ঃ ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ ঃ অবিলম্বে মধ্যবর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন ঃ ভবিষৎ সংবিধানের ছয়দফা প্রস্তাব।

ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ

একই সঙ্গে ভারতের বড়লাট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ ঘোষণা করলেন ঃ

(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ান ; তার এক্তিয়ার হবে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ-পরিবহন ; এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থজোগান।

(২) ইউনিয়ানে থাকবে প্রশাসন বিভাগ ও বিধানসভা। তাতে থাকবে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি। আইনসভায় কোন রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এলে তার সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য দরকার হবে ; দরকার হবে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির ভোটিং ও উপস্থিত সকল সদস্যের সংখ্যাধিক্য ও ভোটিং।

(৩) ইউনিয়ান বিষয় ছাড়া অন্যান্য অবশিষ্ট বিষয় প্রদেশগুলোর এক্তিয়ারভুক্ত হবে।

(৪) ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত অন্য সব বিষয়ই দেশীয় রাজ্যগুলোর থাকবে।

(৫) প্রদেশগুলো ইচ্ছে করলে প্রশাসন বিভাগ ও বিধানসভা নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে পারবে; কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় সাধারণ বলে গণ্য হবে প্রত্যেকটি গ্রুপ তাও স্থির করতে পারবে।

(৬) ইউনিয়ান ও গ্রুপ-সংবিধানে এমন একটি বিধান থাকবে যে বিধানবলে প্রথম দশ বছর পর, তারপর দশ বছর পর পর যেকোন প্রাদেশিক বিধানসভা সংবিধানের বিধানাবলী পুনর্বিচার করতে পারবে।

মিশন লীগের দুটো প্রস্তাবই ভেবে দেখেছেন; একটি ছটি প্রদেশ নিয়ে পৃথক সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র, দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র। প্রথমটি তাঁরা সুপারিশ করতে পারছেন না; কেননা, এর মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩৭.৯৩ শতাংশ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৪৮.৩১ শতাংশ অমুসলমান অধিবাসী এসে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি সুপারিশ করতে না পারার কারণ ওটি অবাস্তব; এতে বাদ পড়েছে পাঞ্জাবের সমগ্র আম্বালা জলন্ধর ডিভিসান, শ্রীহট্ট বাদে সমগ্র আসাম ও কলকাতাসহ পশ্চিম-বাংলার অনেকখানি। মিশনের বিশ্বাস যে, পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাগ এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হবে; আর, পাঞ্জাবের বিভাজন অর্থ শিখদেরও বিভাজন। অন্যান্য প্রশাসনিক, অর্থ-নৈতিক ও সামরিক কারণও আছে। সুতরাং, মিশন বৃটিশ সরকারের কাছে দুটি সর্বতোভাবে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের সুপারিশ করতে পারেন নি।

গান্ধীজী এই ঘোষণাকে বললেন most momentous one in the history of India আর চার্চিল বললেন, Melancholy Document. (অঃ বাঃ পঃ, ১৭ই মে, ১৯৪৬)

এওয়ার্ড নয়, সুপারিশ

লর্ড পেথিক লরেন্স বললেন, এটি এওয়ার্ড নয়, এটি সুপারিশ ; ভারতীয় প্রতিনিধিদের ডেকে তাঁদের মনোমত সংবিধান রচনার এ হচ্ছে ভিৎ, চাপিয়ে দেওয়া বা পুলিশ নিয়োগ করার কথাই ওঠে না।

জিন্নাজী দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, তাঁর পাকিস্থান দাবী গ্রাহ্য করেননি মিশন ; "কিন্তু আমাদের মতে ঐ একমাত্র সমাধান।" দুহাজার শব্দ সম্বলিত এক বিবৃতি দিলেন।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মধ্যবর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন। এই গবর্ণমেণ্ট বড়লাট ছাড়া আর সবাই ভারতীয় হবেন।

সত্য, আপাতত; দুটো জিনিস মাথায় রেখে আমাদের এগোতে হবে ; একটি হচ্ছে, ভারতের ভবিষ্যৎ মধ্যবর্তী সরকার বা ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট ; একটি দীর্ঘমেয়াদী, আর একটি স্বল্পমেয়াদী বা আশু।

এই ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সমসংখ্যক হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিত্বে রাজী হল না ; আর, চূড়ান্ত কথা না বলে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব সম্পর্কে হাজার শব্দের এক প্রস্তাব নিল ২৪এ মে।

কিন্তু গান্ধীজী প্রথমে মিশনের প্রস্তাবকে বললেন, 'শ্রেষ্ঠ দলিল' পরে সরকারী ব্যাখ্যা শুনে বললেন, তবে তো 'দুর্লক্ষণ'! ২৬এ বললেন :

> "After four days of searching examination of the state paper issued by the Cabinet Mission and the Viceroy on behalf of the British Government my conviction abides that it is the best document the British could have produced in the circumstances."

অথচ তিনি এটিকে কার্যতঃ "promissory note" বলে সেভাবেই ওটি গ্রহণ করতে বললেন। পরে ২রা জুন বললেন :

> "Intrinsically and as legally interpreted, the State paper seems to me to be a brave and frank document.

Nevertheless, the official interpretation would appear to be different from the popular. If it is so and prevails, it will be a bad omen."

আর তাঁর প্রার্থনাসভায় নেহরু সম্পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে, বললেন :

"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে অপরিমেয় কাজ করে চলেছেন তার কথা গতকাল উল্লেখ করেছি। আমি তাঁকে মুকুটহীন, রাজা বলে অভিহিত করছি।

"He cannot be replaced to-day whilst charge is being taken from Englishmen. He, a Harrow boy, a Cambridge Graduate and a barrister, is wanted to carry on negotiations with Englishmen."

১৯২৯-৩০-এ তিনি জওহরলালকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তা তোমায় পড়ে শুনিয়েছিলাম। এখন আবার শুনলে। আজকালকার 'ইংরাজী হটাও'-ওয়ালাদের এবং স্বয়ং গান্ধীজীরই হিন্দীর ওপর জোর ও জেদ মনে রেখে এ সার্টিফিকেটটা পড়তে বেশ একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায়, তাই না, সত্য ?

এদিকে মধ্যবর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বুঝে নেবার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আজাদ বড়লাটকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার জবাব পেলেন।

মুসলিম লীগের সম্মতি

মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব ৬ই জুন মুসলিম লীগ কয়েকটি সর্তে মেনে নিল ; উল্লেখ থাকল যে, প্রদেশ বা গ্রুপের ইউনিয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকবে ; আর সংবিধান সম্পর্কেও চূড়ান্ত মত প্রকাশ করা হবে সংবিধান কি আকার নেয় তা দেখে।

গ্রুপ বা গ্রুপিংটা কি ?

হ্যাঁ, মুসলিম দাবীর দিকে তাকিয়ে ক খ গ এই তিন ভাগে ভারতবর্ষের সব প্রদেশকে ভাগ করা হয়েছে ; এর মধ্যে খ আর গ হচ্ছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলো এবং বাংলা ও আসাম।

ক হচ্ছে ছ'টি হিন্দু প্রধান প্রদেশ। খ'র সঙ্গে বৃটিশ বেলুচিস্তানকে যোগ করলে কার্যতঃ সংখ্যাসাম্য দাঁড়ায়। এখন এই যে তিনটি গ্রুপ এরা গ্রুপভুক্ত প্রদেশগুলোর সংবিধান রচনা করবে কিনা, করলে কি কি বিষয় নিয়ে করবে ঠিক হবে প্রথম নির্বাচনের পর প্রাদেশিক বিধানসভাগুলো গঠিত হ'লে, প্রদেশগুলোর প্রত্যেকটির স্ব স্ব বিধানসভার সিদ্ধান্ত মতো গ্রুপ-বহির্ভূত হবার অধিকার থাকবে। অর্থাৎ, গ্রুপিংটা মিশনের ফর্মুলা মতো মেনে নিতেই হবে; তারপর গ্রুপ-সংবিধান গ্রুপ-শরিকদের ইচ্ছাধীন। এর পর এই সব গ্রুপ-শরিকদের ২৯ জন প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজ্যের ৯৩ জন প্রতিনিধি পুনর্মিলিত হবেন ইউনিয়ান সংবিধান রচনায়।

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুর রব নিস্তার খুশী হয়ে বলেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিৎপ্রস্তর স্থাপন করেছে। সংশয়ীদের উদ্দেশে স্বয়ং জিন্না গর্জে উঠে বললেন: আমি কি ১৯৪২এ ক্রিপস প্রস্তাব আর ১৯৪৫এ ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বলিনি? আমি কেন এখন মিশন-প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলছি? আমার কি মতি পরিবর্তন হয়েছে? কেন আমি এ কয়তে বলছি? বলছি এজন্য যে, এই পরিকল্পনায় পাকিস্থানের ভিৎ আছে। বিনা রক্তপাতেই আমরা পাকিস্থানের প্রথম কিস্তি পেলাম।

কংগ্রেসও ঝুঁকেছিল এদিকেই, একটুকু আপত্তি ঐ সংখ্যাসাম্যে। কিসের ভিত্তিতে যে এই প্রস্তাব হ'ল বোঝা মুস্কিল; মুসলমানদের সংখ্যা সাপটে ধরলেও পাঁচ কোটি; হিন্দুসহ ৩০ কোটি অমুসলমান। সেখানে সম-প্রতিনিধিত্ব কিসের জোরে? জিন্নারই জেদে কিছুদিন আগে যে নির্বাচন হয় তাতে দেখা গেল, জিন্না যে পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্থান করতে চেয়েছেন তার তিনটিতেই অ-লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বিরাজমান।

পত্রিকা সুন্দর একটি সম্পাদকীয় প্রবেন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছেন:

"(a) They have ostensibly rejected Pakistan but have implemented it; (b) they have produced a mathematical miracle in the so-called formula of parity by which

one-fourth has been made equal to three-fourth or, more accurately speaking, one-sixth of the integer has been made equal to the whole ; (c) they have proposed to unite India by dividing it ; dthey have made the centre as weak as possible leaving the door open for the wiping out of it altogether ; (e) they have equalised the people of Princely India......and finaly ; (f) while giving the provinces freedom to join or not to join the Pakistan group of States......made it obligatory on the provinces to join." (A.B.P. June 13, 1946)

কংগ্রেসও সম্মত

ঐদিনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কতগুলো সর্তে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দুটো প্রস্তাবই মেনে নিতে সম্মত হলেন এবং ১৪ই জুন সন্ধ্যায় তা বড়লাটকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

ঐ তারিখেই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, সত্য।

বৃটিশ সরকার অমনি একটা ধাঁধাঁর সৃষ্টি করলেন : লীগ-কংগ্রেসের মতৈক্য যখন হ'লই না তখন আমরাই ঘোষণা করছি কাদের নিয়ে মধ্যবর্তীকালীন সরকার বা ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট হবে : সর্দার বলদেব সিং, স্যার এন. পি. ইঞ্জিনিয়ার, জগজীবন রাম, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এম. এ. জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান, হরেকৃষ্ণ মহতাব, ডঃ জন মাথাই, নবাবজাদা মহম্মদ ইসমাইল খান, খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন, সর্দার আবদুর রব নিস্তার, সি. রাজাগোপালাচারি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।"

এঁদের ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্রও গেল। যদি না আসেন তবে বড়লাট কিন্তু তাঁর মনোমত সরকার গঠন করে ফেলবেন।

সত্য, আর কি সেদিন আছে যে, আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে? নেহরু মসলেকে বলেছিলেন :

"We were tired men. We were not prepared to go to jail again."

কংগ্রেস পুনর্বিবেচনায় বসল ; দু'একদিন প্রশ্নটাকে থিতোতে দিল, তার পর সম্মতির খবর পত্রিকা লাল কালীর ব্যানারে ছাপলেন। অকস্মাৎ শ্রীনগরে নেহরুর গ্রেপ্তারে সামান্য জট ছাড়িয়ে ২৩এ জুন আজাদ-নেহরু-প্যাটেল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু নতুন জট বাঁধালো আসাম। সে জানালো, বড়লাটের অফিস থেকে স্পীকার এই মর্মে চিঠি পেয়েছেন যে, ১৬ই মে তারিখের মিশন-প্রস্তাবের গ্রুপিং সংক্রান্ত ১৯ ধারা না মেনে নিলে কেউ সংবিধান পরিষদের নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন না।

ব্যস, গেল মোড় ঘুরে ; ২৪-এ জুন বড়লাটকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, কংগ্রেস মধ্যবর্তীকালীন সরকারে যাবে না।

কিন্তু এর পরেই আর এক চমকপ্রদ ঘটনা ঃ 'কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ'—এই হ'ল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার ব্যানার লাইন। এও বড়লাটকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

আরও চমক আছে, সত্য। ঐদিনই ঐ পৃষ্ঠায়ই খবর বেরোলো ঃ 'লীগের ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গ্রহণের সিদ্ধান্ত'। তাঁরাও বড়লাটকে জানিয়েছেন।

"কেয়ার-টেকার গবর্ণমেণ্ট"

দৃশ্যান্তরে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে এক তদারকি ভারত-সরকারের আবির্ভাব !

সে কি !

মিশন আর বড়লাট বললেন, কি করা যাবে ? কংগ্রেস নিলনা তো লীগ নিল এমন করে তো হয় না, তাই ভারতের এই কাজ চালানো অস্থায়ী সরকার।

দুঃখ পেলেন জিন্নাজী আর তাঁর লীগ। কেন না, বড়লাট তাঁকে একান্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ঐ মধ্যবর্তীকালীন সরকারে থাকবেন ৫ জন কংগ্রেস (হিন্দু), ৫ জন লীগ (মুসলমান), একজন শিখ,

একজন ভারতীয় খৃষ্টান বা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বড়লাট-আজাদ পত্রাবলীতে এটি জানা গেল।

কিন্তু তদারকি সরকারে কে কে এলেন? এলেন স্যার ক্লড অকিনলেক (যুদ্ধ), স্যার গুরুনাথ বেয়ুর (বাণিজ্য, কমনওয়েলথ), স্যার এরিক কোটস (অর্থ), স্যার এরিক কনরান স্মিথ (যুদ্ধ-পরিবহন), স্যার রবার্ট হাচিন্‌স (খাদ্য ও কৃষি), স্যার আকবর-হায়দরি (শ্রম ইত্যাদি), স্যার জর্জ স্পেন্স (আইন, শিক্ষা), এ. এ. ওয়াগ (স্বরাষ্ট্র, শিল্প)।

আর উভয়পক্ষ দীর্ঘমেয়াদী সংবিধান পরিষদ গ্রহণ করায় গবর্ণমেণ্ট যখন তার প্রস্তুতি কাজে নামলেন তখন মুসলিম লীগ আবার 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' এর মহড়া স্থরু করে দিল। আমেদাবাদে রক্তপাতে হ'ল তার প্রস্তাবনা। লীগের ক্রীড অহিংসা নয়, তার নেতারা নরঘাতী পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী। আমেদাবাদে ক্লান্তি দেখা দিলে ঢাকায় হ'ল আরম্ভ।

এ. আই. সি. সি. সংবিধান পরিষদ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী প্রস্তাব সমর্থন করল ২০৪-৫১ ভোটে।

মারাত্মক সাংবাদিক সম্মেলন

পণ্ডিত নেহরু তখন মৌলানা আজাদের স্থলাভিষিক্ত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। এবং এই সময়েই লাগল গোলমাল কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট জওহরলালের এক উক্তি নিয়ে; বোম্বের এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই উক্তি করেছিলেন। এই একটি উক্তিতে কিভাবে ভারত-ইতিহাসের গতিমুখ ঘুরে গেল, মৌলানা আজাদ স্বয়ং এবং লিওনার্ড মসলে তার বিবরণ দিয়েছেন, আমার খাতার পাতায়ও তা লিপিবদ্ধ আছে। নেহরু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ কংগ্রেস কোন রকম বাধ্যবাধকতা স্বীকার না করেই সংবিধান পরিষদে যাচ্ছে। কয়েকটি কর্মপদ্ধতিতে সম্মত হয়েছি, সত্যি কথা, কিন্তু কি করব তা আমাদের ইচ্ছাধীন।

"the Congress would enter the Constituent Assembly completely unfettered by agreements. True, we agreed

to certain procedures for going into it. But we are absolutely free to act."

মসলে যথার্থই বলেছেন : এই একটা সন্ধিক্ষণ যখন নীরবতায়ই অনেক কিছু লাভ করা যেত। ভারতের নিয়তি তখন দুলছে, একটু ভুল হাওয়ার দোলে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নেহরু এই সময়টাই বেছে নিলেন তাঁর অগ্নিগর্ভ ও প্ররোচনামূলক উক্তি করার সময়।

> "It was a moment in history when circumspection should have been the order of the day. There was much to be gained by silence. The fortunes of India were in the balance, and one false move could upset them. Nehru chose this moment to launch into what his biographer, Michael, Brecher, has described as one of the most fiery and provocative statements in his forty years of public life."

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ; প্রথমে তা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলির মুখে; পরে জিন্নাজীর মুখে ; তাঁরা মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর থেকে সুরু করলেন সোজা মার পাকিস্থান আদায়ের জন্য।

নেহরু যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে, যে-মিশন-প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ করেছে তার খোল নলচে তাঁরা বদলে দিতে পারবেন, দেবেন। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর অভিপ্রায় ঐ প্ল্যান বদলে দেওয়া। "যেদিক থেকেই দেখি না কেন, গ্রুপিং হবার সম্ভাবনা নেই। 'ক', মানে, হিন্দুরা এর বিরোধিতা করবেন ; উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের বিরোধিতার সম্ভাবনা খুবই বেশী। গেল খ। খুব সম্ভব বাংলা, আসামও বিরোধিতা করবে। কাজেই দেখছেন, গ্রুপিং ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ?"

নেহরুর সাবোতাজ

মসলে বলেছেন : এই অবস্থায় নেহরুর ঐ মন্তব্য সাবোতাজের কাজ করেছে। নেহরুর জীবনীকার বলেছেন :

Jinnah was given incomparable wedge to press more openly for Pakistan on the grounds of Congress "tyranny."

নেহরুর এই উক্তির ফল হ'ল বিষময়। লিয়াকৎ আলি বললেন, অবস্থাটা যদি পরিষ্কার করা না হয় তবে মুসলিম লীগের পক্ষে সংবিধান পরিষদে যোগ দেওয়া আত্মহত্যার সামিল হবে। মুসলিম লীগ যোগ না দিলেও যদি তা চলে তবে ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ হবে না—এ আমি বলতে পারি। মুসলমানেরা নতশিরে এ অবস্থা মেনে নেবেন না।

জিন্নাজী ১৩ই জুলাই বললেন: যে ভিত্তির ওপর মিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব, জওহরলাল তাই অস্বীকার করেছেন।

"Pandit Nehru's interpretation of the Congress acceptance of the Cabinet Misson's proposals of May 16 is a complete repudiation of the basic form upon which the long-term scheme rests and all its fundamentals and terms and obligations and rights of parties accepting the scheme."

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন: "আমি একথা লিপিবদ্ধ করতে চাই যে, জওহরলালের এ বিবৃতি অসঙ্গত। একথা ঠিক নয় যে, কংগ্রেস ইচ্ছেমত প্ল্যান বদলাতে পারে। পক্ষান্তরে, আমরা মেনে নিয়েছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার হবে ফেডারাল। তার এক্তিয়ারে তিনটি আবশ্যিক বিষয় থাকবে, বাকী যাবে প্রাদেশিক এক্তিয়ারে। আমরা আরও মেনে নিয়েছি যে, তিনটি সেকসান হবে, যথা, ক খ গ; প্রদেশগুলো এরই মধ্যে গ্রুপভুক্ত হবে। অন্যান্য পক্ষের সম্মতি ছাড়া কংগ্রেস এককভাবে এর কিছু পরিবর্তন করতে পারে না।

"আপোষ-আলোচনার ফলাফলে জিন্নাজী সুখী হন নি, কিন্তু কোনো বিকল্প ছিল না বলে মেনে নিয়েছিলেন। জওহরলালের বিবৃতি তাঁর কাছে বোমা বিস্ফোরণ বলে প্রতীয়মান হ'ল। তিনি তক্ষুণি এক বিবৃতি-যোগে জানালেন যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের বিবৃতির পর অবস্থাটার পুনর্বিচার দরকার। তিনি লিয়াকৎকে লীগ কাউন্সিলের এক সভা ডাকতে

বলে ঐ বিবৃতিতে বললেন, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেছে বলে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হলেই মুসলিম লীগ কাউন্সিল তা গ্রহণ করে। এখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে সংখ্যাধিক্যবলে কংগ্রেস ঐ পরিকল্পনার পরিবর্তন সাধন করতে পারবে ; এর অর্থ যে, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুর কৃপানির্ভর হবে। জিন্নাজীর মতে জওহরলালের ঘোষণার মানে এই দাঁড়ায় যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন-প্ল্যান অগ্রাহ্য করেছে ; সুতরাং বড়লাটের কর্তব্য হবে যে-লীগ মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেছে তাকে গবর্ণমেণ্ট গঠনে আহ্বান করা।"

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মস্‌লে বলেছেন ঃ

> "The Consequences of the Nehru speech were profound and tragic."

মৌলানা আজাদ লিখেছেন ঃ

> "Jawaharlal's mistake in 1937 had been bad enough. The mistake of 1946 proved even more costly."

মুসলিম লীগের পিস্তল

২৭এ জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভা হ'ল। মিশন পরিকল্পনা সমর্থন প্রত্যাহৃত হ'ল। ২৯-এ জুলাই পাকিস্থান দাবীটির পুনরাবৃত্তি করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ স্থির করা হ'ল এবং দিন স্থির হ'ল ১৬ই আগস্ট। আজাদ তাঁর এ অধ্যায়ের শিরোনামা দিয়েছেন 'দেশ বিভাগের প্রস্তাবনা'।

স্যার ফিরোজ খাঁ নুন বললেন ঃ "আমাদের দিক থেকে ইংরাজ ও হিন্দু এদের একজনের সঙ্গে লড়াই করাই ভালো। কংগ্রেস ইংরাজদের তাড়াক আমরা তখন দেখাব কংগ্রেসের সঙ্গে কেমন করে লড়াই করতে হয়।"

জিন্নাজী বললেন, আমরা আমাদের যথাসাধ্য করেছি। এর পর ইংরাজদের বা কংগ্রেসের কর্তব্য। তিনি বড়লাটের পত্র পেয়েছেন, কিন্তু কি তা ভাঙলেন না।

এদিকে খবর রটল, বিলেত থেকে কড়া নির্দেশ এসেছে ১৫ই আগস্টের মধ্যে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠন করতেই হবে।

গান্ধীজী ৯ই আগস্ট "আগস্ট বিপ্লব দিবস" পালন নিষিদ্ধ করলেন। কংগ্রেসের সংবিধান পরিষদ যাওয়াই যেখানে স্থির সেখানে অনুকূল আবহাওয়া রাখতে হবে।

ওয়ার্ধাতে তাই ১০ই আগস্ট এক সভায় ওয়ার্কিং কমিটি সখেদে জওহরলালের উক্তিকে 'তরলীকৃত' করার জন্য এক প্রস্তাব নিলেন; কিন্তু জিন্নার অবিশ্বাস দূর করা গেল না। তিনি বললেন, জওহরলালের বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রকৃত মানসিকতা উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইংরাজেরা থাকতে এবং ক্ষমতা হাতে না আসতেই যাঁর এত পরিবর্তন, ইংরাজেরা চলে গেলে সখ্যালঘুরা আর ভরসা পাবে কোথায়, কে জানে জওহরলাল আবার একথার পুনরাবৃত্তি করবেন না?

সুতরাং জিন্নার ঐ কথাটিই সত্য হয়ে রইল ঃ

> "This day we bid good-bye to constitutional methods.... Today we have also forged a Pistol and are in a position to use it."

পিস্তলটা যে একান্তভাবে কংগ্রেসকে উপলক্ষ্য করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বুকে চাঁদমারি করা হ'ল এবিষয়ে কারোই কোন সন্দেহ রইল না।

নেহরুর স্বাধীনতা

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নেহরু বড়লাটকে চিঠি দিলেন তাঁর চিঠি পেয়ে; লীগের সিদ্ধান্ত নিয়েও আলাপ হ'ল বড়লাটের সঙ্গে; অনেক পত্রালাপ হ'ল দশদিন ধরে। সব চিঠির মাথায় থাকল "টপ সিক্রেট"। এইটুকু জানা গেল; ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য নাম পাঠাতে বলেছেন বড়লাট। নেহরু ওয়ার্ধার এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "আর এক বছরের মধ্যেই আমরা স্বাধীন হব নিজস্ব জোরে আর বিশ্ব পরিস্থিতির চাপ বলে।" বড়লাটের ঘোষণা এল ঃ

"His Excellency the Viceroy, with the approval of His Majesty's Government has invited the President of the Congress to make proposals for the immediate formation of an Interim Government and the President of the Congress has accepted the invitation."

জিন্নাজীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "বড়লাট ও কংগ্রেস অথবা তার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কি হচ্ছে আমি তার কিছুই জানিনে।"

নেহরুজী ৬ ঃ ৫ ঃ ৩-এর ভিত্তিতেই লীগকে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। শিখেরা রাজী হলেন। জিন্নার বাসভবনে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুচনার একদিন আগে, নেহরুজী জিন্নাজীর সঙ্গে দেখা করলেন। ৮০ মিনিট আলাপের পর জিন্নাজী সাংবাদিকদের কাছে বললেন ঃ "পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমার আর কোন বৈঠক হবে না।"

মসলে তারিখটা ভুল করেছেন, তারিখ ভুল অবশ্য আজাদের বইয়েও আছে। মসলে বললেন, নেহরু জিন্নার সঙ্গে ১৬ই তারিখ সকালে দেখা করেন বড়লাটের তাগিদে পড়ে। আসলে ১৬ই তারিখে কলকাতায় যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে সুরাবর্দীর গুণ্ডারাজ চলছে তখন পণ্ডিত নেহরু বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন এবং বলছেন ঃ "লীগ-সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে ; কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট গঠনে এগিয়ে যাবে।" বড়লাট ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনো গোপন চুক্তি হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করলেন না।

আর বললেন, এবং এইটিই ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"লীগ যদি কোন রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে তবে গবর্ণমেণ্টকে, কোন মীমাংসায় এসে নতুবা বিরোধিতা করে, তার মোকাবিলা করতে হবে। যদি গবর্ণমেণ্ট শক্ত হয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরাভূত হবে ; গবর্ণমেণ্ট যদি দুর্বল হয়, গবর্ণমেণ্ট নতজানু হবে।"

পরের কথাটা কি নিদারুণ সত্য হয়েছিল !

কিন্তু নেহরুজী বড়লাটকে গিয়ে ১৭ই তারিখ বললেন, কলকাতায় কিছু লোক অসদাচরণ করছে বলে আমাদের কর্মসূচী বানচাল হবে না। সিন্ধু ও বাংলা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, আমাদের বসে ভাবতে হবে কি

করা যায়। ১০ই আগস্ট সুরাবর্দী বলেছিলেন দিল্লীতে ঃ "আমরা দেখবো যাতে এই ধরণের গবর্ণমেণ্ট বাংলা দেশ থেকে কোন রাজস্ব না পায় এবং আমরা নিজেদের কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট মনে করব।" সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট এম. এইচ. গজদরও এই কথা বলেছিলেন ঃ যেই ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট বসবে অমনি সিন্ধু স্বাধীন হবে।

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

কি হয়েছিল কলকাতায় আমি তোমায় এখানে বিশদ বলতে পারছিনে, সত্য। আমি তখন কলকাতায় এবং স্বীকার করব, সন্ত্রস্ত। মুসলিম লীগ গবর্ণমেণ্ট, মুসলমান অফিসার, মুসলিম দারোগা ও পুলিসের আধিক্য। প্রদেশান্তর থেকে আমদানী মুসলমান গুণ্ডা। সমস্ত কলকাতা জ্বালিয়ে দেবার মতো তাদের পেট্রোল প্রভৃতি রসদ; নরহত্যার আয়োজনে অস্ত্রের প্রাচুর্য। তবু সুরাবর্দী আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন হিন্দুদের অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ এবং অনভ্যস্ত হাতের সমান হত্যালীলা। তখনই মিলিটারী ডাকতে হ'ল। কিন্তু ততক্ষণে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মহল্লায় মহল্লায় অন্তত চার হাজার মৃতের স্তূপ, অগণিত ছিন্ন বিধ্বস্ত অঙ্গের কাতরানি কলকাতার আকাশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। যদি কোনদিন অবকাশ পাই, তোমাকে এ রক্তাক্ত কাহিনীও বলব, না বলতে পারলেই খুশী হতাম, কিন্তু বলেছি, ইতিহাস নির্দয়।

এই মহাশ্মশান থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কোথায় ছিলেন? জিন্নাজী ও নেহেরুজী এর নিন্দা করলেন, কিন্তু কেউ নেমে এলেন না তাঁদের নিরাপদ জায়গা ছেড়ে; একজন গবর্ণমেণ্ট গড়ছেন, আর একজন রক্তপ্রবাহে পাকিস্থান হাসিলের স্বপ্ন দেখছেন। গান্ধীজীর কোন চিহ্নও নেই।

মসলে লিখেছেন ঃ কেউ হয়তো আশা করে থাকবেন যে, কংগ্রেসের নেহেরু ও লীগের জিন্না হিংসার প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশের জন্য

কলকাতায় আসবেন; কিন্তু তাঁরা এত ব্যস্ত ছিলেন যে এদিকে নজর দেবার সময় তাঁদের ছিলনা।

> "One might have thought the Indian leaders, Nehru of Congress and Jinnah of the League, would have come to Calcutta immediately and possibly shown themselves together to demonstrate their common abhorence of violence and bloodshed for political purposes. But both of them were too busy for that. Mr. Jinnah was in Conference with the Working Committee of the Muslim League, planning new tactics in his fight with Congress. Pandit Nehru was holding the first meetings to pick the Cabinet (minus the Muslims) of the interim Government."

শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে এক চরম শিক্ষা জিন্নাজীকে উল্লসিত করে তুলল: হিন্দু মুসলমান যে এক সঙ্গে থাকতে পারে না এর চাইতে আর ভালো প্রমাণ কি হতে পারে?

> "Could anything prove more ruthlessly the validity of of his claims that, in an independent India, Hindus and Muslims could no longer live together; that civil war would be the result?

সুতরাং, তাঁর খোয়াব যখন বাস্তব হয়ে আসছে তখন তিনি তা থামাতে যাবেন কেন সরেজমিনে হাজির হয়ে? আর, ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট যখন করতলগত তখন নেহরু আসবেন নেমে খুনখারাবির কলকাতায়?

সরকারী ইস্তাহারে ২৪এ আগস্ট যখন মন্ত্রিমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হ'ল কলকাতায় তখনও রক্ত ঝরছে। ১৪ জন মন্ত্রিসভার নামোল্লেখ বাহুল্য, উল্লেযোগ্য শুধু ডঃ জন মাথাই, সফাৎ আমেদ খাঁন, সৈয়দ আলি জহির, কুবেরজি হরমাসজি ভাবা। আরও দু'জন মুসলমানের স্থান প্রতিশ্রুত রইল।

ওয়াভেলের কলকাতা পরিদর্শন

কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তক্তপোষ থেকে বা আশ্রম ছেড়ে কলকাতায় না এলেও বহুযুদ্ধের নায়ক লর্ড ওয়াভেল কলকাতা-পরিদর্শনে

বড়লাটের কর্তব্য সেরে যখন নয়াদিল্লীতে ফিরলেন তখনও ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে তিনি লজ্জা দিতে পারলেন না ; গদীসীন তাঁরা বড়লাটের মুখেই কলকাতার বিবরণ শুনলেন। মসলে বলেছেন, ২৭এ আগস্ট ওয়াভেল গান্ধী ও নেহরুকে ডেকে পাঠালেন :

"আমি কলকাতা থেকে এই মাত্র ফিরলাম।

"I am appalled at what I have seen".

তিনি বর্ণনাকালে উভয় সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তিনি মনে করেন, তিনি যদ্দিন বড়লাট আছেন তদ্দিন এ নিবারণের জন্য তাঁকে চেষ্টা করতে হবে। মানুষ হিসেবেই কি ইংরাজ হিসেবেই কি এ দৃশ্য দুঃসহ।

> "Neither as an Englishman nor as a human being could he stomach such savagery and bestiality."

তিনি সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে বললেন, মুসলিগ লীগ যে গ্যারান্টি চান তা তাঁরা দেবেন কি ? তাঁরা শুধু বলুন, তাঁরা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিয়েছেন। গান্ধী-নেহরু বললেন, মেনেছি বলেছি তো। কিন্তু আমাদের ভাষ্য মতো। তা যদি মিশনের ব্যাখ্যার সঙ্গে না মেলে, তবু ? তবু। নইলে এ যে পক্ষপাতী কংগ্রেস সরকার হবে, দেখছেন না ?

> "But don't you see", exploded Wavell, in an unusual burst of temper, "it will be a Congress Government ! They are bound to be lacking in impartiality."

নেহরু বলতে চাইছিলেন, কংগ্রেসকে আপনি ভুল বুঝছেন ; এ হিন্দুপন্থীও নয়, মুসলিম-বিরোধীও নয়। এটি সকল ভারতীয় জনসাধারণের। এ মুসলিম-স্বার্থবিরোধী কোনো আইন করবে না।

> "But whose Muslims, Pandit Nehru ? Yours, the Congress Muslims, the so-called stooges ?..."

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিরকম খসড়া হবে তাও তিনি তাঁর ড্রয়ার থেকে টেনে গান্ধীজীর হাতে দিলেন। গান্ধীজী পড়ে জওহরের হাতে দিলেন। জওহর পড়ে বললেন, এ গ্রহণ করতে বলা মানে তাঁকে

শেকলে বাঁধা। ওয়াভেল বললেন, আপনারা না বুঝে ওটি গ্রহণ করেছেন তা আমি বিশ্বাস করিনে। দেশকে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করার আভাস তো রয়েইছে। গ্রহণ করলেন কেন? এখন তো মুখ ফিরিয়ে বলতে পারেন না যে, এই অভিপ্রায় বুঝতে পারিনি। গান্ধীজী বললেন, ক্যাবিনেটের কি অভিপ্রায় ছিল এবং আমাদের ব্যাখ্যামতো তাঁদের কি অভিপ্রায় ছিল তা এক নাও হ'তে পারে। ওয়াভেল বললেন, ওসব আইনের চুলচেরা তর্ক ছাড়ুন।

"Dammit, the Cabinet Mission made its intentions as clear as day-light."

ওঁদের অভিপ্রায় দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আমাদের এজন্য নিশ্চয়ই আইনজ্ঞের কাছে যেতে হবে না। আমি সরল মানুষ, আমার কাছে জিনিসটাও সরল। আমি যা চাই, কংগ্রেস যদি সেই গ্যারান্টি দেয় আমি বুঝিয়ে লীগকে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে আনতে পারি। আমাদের গবর্ণমেণ্টে তাঁদের দরকার; ভারতের দরকার, এবং আপনারা যদি গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কায় সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, তবে আপনাদের দরকার। গান্ধীজী বললেন, কিন্তু আপনি তো বলেছেন, গবর্ণমেণ্ট হবে; আপনি তো কথার খেলাপ করতে পারেন না। ওয়াভেল বললেনঃ অবস্থা বদলে গেছে। কলকাতার হত্যালীলার পর ভারতবর্ষ আজ গৃহযুদ্ধের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। এ নিবারণ করা কর্তব্য। আমি যদি মুসলমানদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে দি তা হ'লে আমি তা নিবারণ করতে পারব না। তাহলে ওঁরা, স্থির করবেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামই একমাত্র পথ এবং

"We shall have the massacre of Bengal all over again."

এর পর যা হয়েছিল, তা তোমায় রাজনৈতিক লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত দিতে বলেছি, তোমার মনে আছে, সত্য? (৪৫৯ পৃঃ)

লীগ-বহির্ভূত মুসলমান স্যার সফাৎ আমেদ খাঁনকে নেহেরু তাঁর গবর্ণমেণ্টে নিয়েছিলেন। সিমলায় তিনি যখন ২৪এ আগস্ট বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, দুই সশস্ত্র যুবক দ্বারভাঙ্গা ভবনের সামনে তাঁর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর দেহের সাত জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করল। এক রিক্সাওয়ালা তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যায়।

সুতরাং, গৃহযুদ্ধ কলকাতায় শেষ হয়নি ; দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাত শুধু জানান দিয়ে গেল, ও চলছে, চলবে। লিয়াকৎ আলি এক সার্কুলার জারী করে বললেন, কোন লীগ সদস্য যেন এই গবর্ণমেণ্টের কোন কমিটিতেই যোগ না দেন।

জিন্নাজীর ঈদ মোবারক

জিন্নাজী স্বধর্মীয়দের উদ্দেশে ঈদ মোবারক জানাতে গিয়ে মুসলমানের রাজনৈতিক বেহেস্তে আসবার জন্যও আবেদন জানালেন ঃ মুসলিম লীগ জমায়েৎ-উলেমা, খাকসার, অর্হর, জাতীয়তাবাদী মুসলমান, ইসলামের স্বার্থে সবাই এসে দাঁড়ান লীগের পতাকাতলে।

এই 'ঈদ' উপলক্ষ্য করে নোয়াখালীর মুসলমানেরা সারা জেলায় কিভাবে হিন্দুদের কবর খুঁড়েছিল এবং অগ্নিদাহে পৈশাচিক আনন্দলাভ করেছিল সেই অমানুষিক কাহিনীও আমায় পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হবে, সত্য। এমন সতর্ক পরিকল্পনায় দুঃস্বপ্ন-প্রতীক সুরাবর্দীর মুসলিম লীগ শাসনের নিরাপদ আশ্রয়ে এই দানবীয় তাণ্ডব ঘটেছিল যে, সহসা খবর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খবর পাওয়া গেল যখন হাজার হাজার সন্ত্রস্ত গৃহ আশ্রয়হীন নিঃস্ব শরণার্থীর ঢল নামল জেলার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার প্রান্তে। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় একদল গুণ্ডাধর্মী হিন্দু-নরনারীকে বিবস্ত্র ক'রেই তৃপ্ত হয়নি সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লাসে ওদের ধর্মান্তরিতও করেছে এবং দেবমন্দির কলুষিতকরণ, নিষিদ্ধ খাদ্যের আস্ফালন প্রভৃতি প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসের প্রত্যেকটি কীর্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছে তারা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশেও ; তখনও ইংরাজ হাত গুটিয়ে নেয়নি ; স্যার ফ্রেডারিক বারোজ তখনও মহা আড়ম্বরে রাজভবনে বিরাজমান এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গদেশের ততোধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ এক মুসলিম জেলায় এই নির্বিচার নিধন চলেছে। নোয়াখালি অধিবাসীদের ৮১'৪ শতাংশ মুসলমান এবং হিন্দু ১৮'৬ শতাংশ এবং

রায়পুরের মত এমন থানাও ছিল যেখানে ৯০শতাংশ মুসলমান। কিন্তু এ কাহিনী বলার অবকাশ নেই আমার ইতিহাস বর্ণনায়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে মুসলিম লীগ এবার ২রা সেপ্টেম্বর "হিন্দু কংগ্রেস ও তার উপগ্রহদের মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রতি মুসলিম জাতির নীরব ঘৃণা" প্রকাশের জন্য এক "কৃষ্ণ দিবস বা কালো দিন" পালনের আহ্বান জানায়। সারা ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকৎ আলি খান এক বিবৃতিযোগে নির্দেশ দিলেন দেশব্যাপী গৃহ ও ব্যবসায়স্থলে কালো পতাকা তুলতে।

এদিকে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর দপ্তর বণ্টন হয়ে গেল। ২রা সেপ্টেম্বর শপথ নিলেন ৭ জন মন্ত্রী। নেহেরুর মুখ দিয়ে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসৃত হ'ল ঃ

"Destiny has conspired to test us in new days.…"

মুসলিম লীগ-অনুগামীরা কালো পতাকা তুলে অভিনন্দন জানালো ; বোম্বাইয়ে বাঁধালো দাঙ্গা।

রাজা গজনফর আলি খান এক লীগ সভায় মুসলিম উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে যাতে হিন্দুদের হাতে খাদ্যশস্য না যায় এজন্য পোড়ামাটীর নীতি অবলম্বনের আভাস দিয়ে বললেন, যেদিন হিন্দু ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট শপথ নেবে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সূচনা করবে না, করবে গৃহযুদ্ধের ঃ "sanguinary war between the usurper and the oppressed."

কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিতে পূর্ণ স্বরাজের দ্বার খুলে গেল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের আগে যে ঝগড়াই হয়ে থাক না কেন, আজ তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে হবে স্বেচ্ছায় এই মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য।

পক্ষান্তরে, জিন্নাজী বললেন, গান্ধীজীর একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিনে যে, কংগ্রেস মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটেনের সাথী হতে পারে না।

নেহরুর মত পরিবর্তন

নেহরু ক্ষমতাসীন হয়ে কিছুটা মত-পরিবর্তন করে বললেন ঃ

> "We are perfectly prepared to and have accepted, the position of sitting in sections which will consider the question of formation of groups.......We do not look upon the Constituent Assembly as an arena for conflict or for the forcible imposition of one viewpoint over another."

হায়রে, ১০ই জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে যদি এই সুবুদ্ধির উদয় হ'ত হয়তো কলকাতাকেও রক্তস্নাত শ্মশানবাসী হতে হত না এবং হয়তো পাকিস্থানের পথও অত মসৃণ অথবা অত অনিবার্য অথবা অত আকর্ষণযোগ্য হ'ত না। সর্বনেশে অনিষ্ট সাধনের পর এই উক্তি অর্থহীন প্রতীয়মান হলেও কলকাতার বীভৎস হত্যার প্রতিমূর্তি সুরাবর্দী বলে উঠলেন : সাবাস, আর একটু এগিয়ে গিয়ে লীগের হাত ধর।

কিন্তু কৌতুক এই, কেন্দ্রে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট থাকলেও "বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাবে পূর্ণ মুসলিম-রাজ বিরাজ করছে", একথা বললেন গান্ধীজীই ৯ই সেপ্টেম্বর।

এরপর প্রত্যক্ষ সংগ্রামটা কি প্রকৃতি ও রূপ নেবে জিন্নাজী তার জবাবে ১০ই সেপ্টেম্বর ডেলী মেল-প্রতিনিধিকে বললেন, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতা। পরদিন বোম্বাইয়ে বললেন ঃ

> "It is to avoid blood shed and to create conditions in which India's two nations can live as friendly neighbours that I offer my constructive solution—Pakistan."

কিন্তু ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্য জিন্নাজী বড়লাটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলাও ছাড়লেন না যে, কি ধরণের গৃহযুদ্ধ হবে তার নমুনা কলকাতা ও বোম্বাইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর নয়াদিল্লীতে ২৫-এ সেপ্টেম্বর যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সভা চলছে তখন এম. এ. জিন্না বড়লাটের সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধরে আলাপ চালালেন; তারপর নিজের বাড়ীতে লীগের সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন। পরদিন গান্ধীজী-নেহরুজীর সঙ্গে বড়লাটের আলাপ হ'ল। তার পরদিন আবার জিন্নাজী মিলিত হলেন বড়লাটের সঙ্গে।

পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেছেন।

মুসলিম লীগের যোগদান

ভারতের রাজনীতিও একটা বিশেষ মোড় নিল। বড়লাটের আমন্ত্রণে কিন্তু "স্বাধিকারে" মুসলিম লীগ ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে এল। ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর জিন্না দেখা করলেন বড়লাটের সঙ্গে; লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল।

বৃটিশ সরকার সানন্দে এঁদের নিয়োগপত্র ঘোষণা করলেন: লিয়াকৎ আলি খান, আই. আই. চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খান ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

য়্যা! যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল? মুসলমান?

না, হিন্দু, গান্ধীজীর হরিজন হিন্দু, গান্ধীজী এঁদের জন্য উপোস করে আসনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অভিভাবকত্ব দাবী করেছিলেন জিন্না। ভারতীয় রাজনীতির এও এক কৌতুক।

স্বভাবতই মনঃক্ষুব্ধ গান্ধীজী ১৬ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর এক প্রার্থনা-সভায় বললেন, পূর্ব বাংলায় যা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভায় তাঁদের পাঁচটা আসনের মধ্যে একটি আসন একজন হরিজনকে মনোনীত করার যে উদারতা দেখানো হয়েছে তার কোনো অর্থ খুঁজে পাই নে। কায়েদ-ই-আজম বলেন যে, মুসলমান ও হিন্দু দুই জাতি; তাহলে কি করে তাঁরা একজন হরিজনকে তাঁদের প্রতিভূ করলেন?

আর এক কৌতুক পুরোনো মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লেন সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, স্যার সফাৎ আমেদ খাঁ, সৈয়দ আলি জহির।

আর, জিন্নাজী বললেন, তাঁরা এলেন বটে, কিন্তু যুগ্ম দায়িত্ব বলে কিছু থাকবে না।

কিন্তু, আমি মনে করি, সত্য, তার চাইতেও মারাত্মক কথা হচ্ছে, মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংস্থা বলে কংগ্রেসের স্বীকৃতি। আর তা করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এতদিন জীইয়ে রেখে নেকড়েদের মুখে ছুঁড়ে ফেলা। পৃথিবীতে এজাতীয় বিশ্বাসভঙ্গের দৃষ্টান্ত বিরল। কংগ্রেস-লীগের চুক্তি সম্পাদনে যে গান্ধী-জিন্না ফরমুলা দাঁড় করানো হয়েছিল, জিন্না-নেহরুর পত্রালাপে তা প্রকাশ পেল। এই পত্রাবলীতে দেখা যায়, মুসলিম লীগ যে

> "authoritative representative of an overwhelming majority of Muslims of India"

মুসলিম লীগের এই দাবীতে কংগ্রেস কোনো আপত্তি তো তোলেই নি, মেনে নিয়েছে এবং বলেছে, গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে কেবল লীগেরই ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আছে।

> "As such and in accordance with democratic principles, they alone had an unquestionable right to represent the Muslims of India."

আর কংগ্রেস কি? সকল অমুসলমানের সংস্থা:

> "as the authoritative organisation representing all non-Muslims......"

non-muslim, non-mahamedan বা সংখ্যাগুরু ইত্যাদি শব্দগুলো হিন্দুরই জিভ-কাটা নাম।

জিভ-কাটা মানে?

হিন্দুর পক্ষে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে জিভ কাটতে হয়, নইলে প্রগ্রেসিভ হওয়া যায় না; আর ইংরাজের পক্ষে ভারতে মুখ্য-অধিবাসীরা হচ্ছেন মুসলমান, অবশিষ্টেরা নঙর্থক বা নগণ্য তাই non বা না দিয়ে তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় দিতে হয়।

কি ফল লভিনু হায়

কিন্তু এত সব স্বীকার করেও কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বশে আনতে পারেনি ; লীগ প্রতিনিধিরা ইণ্টারিমের পেটে গুঁতো মারার উদ্দেশ্যেই শিং বাঁকিয়ে এল। রাজা গজনফর আলি বললেন ঃ লীগ ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট বা মধ্যবর্ত্তীকালীন সরকারে যাচ্ছে পাকিস্থানের জন্য লড়তে। শুনে গান্ধীজী ২২এ অক্টোবর বললেন ঃ সে কি কথা! মধ্যবর্ত্তীকালীন সরকার কেবল মধ্যবর্তী কালের জন্যই ; কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি বা সংবিধান পরিষদ যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য খুব বেশী সময় অতিবাহিত হবে না। বৃটিশ সরকারের ঘোষণাপত্রানুসারেই ঐ সংবিধান পরিষদ ; ঐ ঘোষণাপত্র পাকিস্থান পরিকল্পনাকে হিমঘরে রেখে দিয়েছে। ঘোষণাপত্রে আছে গ্রুপিং, তার ব্যাখ্যা লীগের এক, কংগ্রেসের এক, মিশনের এক।

গান্ধীজী একথার পুনরাবৃত্তি করে আবার গোলমাল বাঁধালেন। তাঁর সেই "তৃতীয় পুরুষ যাক ও তৃতীয় পুরুষ আসুক" নীতি অনুসারে তিনি এই ভাষ্য-বিরোধকে এক ট্রাইবিউনালে দিতে বললেন।

সঙ্কটের পর সঙ্কট

খবর অবিলম্বেই পাওয়া গেল যে, ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে সঙ্কট ঘনিয়েছে। প্রকাশ পেল বড়লাট-কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পত্রাবলীতে ; তারপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে।

একই দিনে (২৪এ অক্টোবর) বড়লাট নেহরুর ঠিকানায় ছ'খানা চিঠি চালাচালির পর আশ্বাস পাওয়া গেল, গোলমাল চুকেছে। গোলমাল দেখা দিয়েছিল দপ্তর বণ্টন নিয়ে। লীগকে দেওয়া হ'ল— অর্থ, আইন, বাণিজ্য, ডাক ও বিমান, স্বাস্থ্য।

মৌলানা আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম'-এ লিখেছেন ঃ "লীগ

গবর্ণমেন্টে যোগ দিলে দপ্তর পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দিল। বড়লাটের প্রস্তাব ছিল লীগকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেবার। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি প্রবল আপত্তি জানালেন। এমনও বললেন, তিনি বরং গবর্ণমেণ্ট ছাড়বেন কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়বেন না।

"আর কি বিকল্প হতে পারে এই যখন আমরা ভাবছি, রফি আমেদ কিদোয়াই প্রস্তাব করলেন, অর্থ দপ্তরটা লীগকে দেওয়া হোক। অন্যতম প্রধান দপ্তর বটে কিন্তু এত টেকনিকাল যে, লীগে তার সমকক্ষ কেউ নেই। না নেয় ভাল, নিলেও বোকা ব'নে যাবে। সর্দার প্যাটেল প্রস্তাবটা লুফে নিয়ে জোর সমর্থন জানালেন।

"লর্ড ওয়াভেল খবরটা জিন্নাকে জানালে তিনি পরদিন মত দেবেন বললেন। কেননা, তিনি এ ব্যাপারে খুব নিঃসংশয় ছিলেন না। কিন্তু চৌধুরী মহম্মদ আলি এই খবর শুনে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, কংগ্রেসের দিক থেকে এ অপ্রত্যাশিত উপহার। অর্থ দপ্তর হাতে থাকলে লীগ প্রত্যেক বিভাগের ওপর খবরদারি করতে পারবে। জিন্নার ভয় নেই, লিয়াকৎকে দিন, যা করবার মহম্মদ আলিই করবেন।"

ফল ফলতে দেরী হয়নি। অর্থদপ্তর কংগ্রেস মন্ত্রীদের চরম নাজেহাল করে ছেড়েছিল।

অন্তরালের পর্দা আরও একটু উন্মোচিত হয়েছিল। ২৪এ অক্টোবর বড়লাট ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নেহরুকে বললেন, তিনি মুসলিম লীগকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র দপ্তর দিচ্ছেন। এ হচ্ছে সকাল-বেলার কথা। বিকালে নেহরু এই প্রস্তাব গ্রহণে অসামর্থ্য জানালেন এবং সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পেশ করলেন।

বড়লাট বললেন, না, না, আপনারা যে দপ্তর দেবেন সে দপ্তরই লীগ নেবে। তাঁরা আসছেন মিশন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতেই, যদি না করেন চলে যেতে হবে।

কিন্তু আর কোন বিষয়ের জবাব দিলেন না।

তবু হল। কিন্তু হবার সঙ্গে সঙ্গে ২৬এ অক্টোবর লীগ নেতারা নয়াদিল্লীতে বললেন, না তো, তাঁরা কোন প্রতিশ্রুতিই দেন নি।

"মুসলিম ভারতের স্বার্থেই মুসলিম লীগ ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে-এল। আমাদের কি কর্তব্য আমরা জানি ; কারো কাছে কোন প্রতিশ্রুতি দেবার কথা তো ওঠে না।

> "This Government has been formed under the present Constitution and as such there is no such thing as joint or collective responsibility. Under the present Constitution there is no such thing as leadership of Government by one individual. The Congress Bloc in the Government has a leader of its own, and the Muslim League will have a leader of its own."

স্পষ্ট কথা। যুগ্ম দায়িত্বও নেই, এক ব্যক্তির নেতৃত্বও নেই।

স্পষ্টতর কথা চলছিল ছুরির ডগায় আর রক্তের কালিতে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। পাকিস্থান হাসিলের প্রত্যক্ষ পথটায় ওরা ঢিলে দেয়নি ঃ বলেছিল লড়কে লেঙ্গে। তার প্রত্যাঘাত এসে পড়ছিল ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টের দুই 'ব্লকে'। অর্থদপ্তর হাতে পেয়ে লিয়াকৎ এমনই এক বাজেট উপস্থিত করলেন যা কংগ্রেসের ঘোষিত অর্থনীতির 'বিদ্রূপও' বটে ; বৈপ্লবিকও বটে। মৌলানা আজাদ বলেছেন, "তিনি এমন কর ধার্যের প্রস্তাব করলেন যা ধনীমাত্রকেই নিঃস্ব ক'রে ছাড়ে এবং বাণিজ্য শিল্পের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করলেন ঃ এই কমিশন কারা সব কর ফাঁকি দিয়েছে তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় ক'রে আনবেন।"

কংগ্রেসের পক্ষে এ হ'ল ছুঁচো গেলা। নিজেদেরই ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। কিন্তু "increasing equalization of wealth and that all tax-evaders should be brought to book" সে কি এই ভাবে ?

লিয়াকৎ তাঁর বাজেট মন্ত্রিসভায় পর্যন্ত উত্থাপন করতে রাজী হন নি। জিন্না ঘোষণা করলেন ১৪ই নবেম্বর—প্রশাসন বা আচরণে ইন্‌টারিম গবর্ণমেণ্টকে এমন কিছু করতে দেওয়া হবে না যাতে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের সমস্যা জটিলতর হ'তে পারে ; প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে পাকিস্থানের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা হলে আমরা তার প্রতিরোধ করব।

জিন্না-বড়লাটের যে পত্রালাপ প্রকাশিত হল তাতে দেখা গেল, জিন্নাজী সংবিধান পরিষদকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

পণ্ডিত নেহরু মীরাটে বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় খুলেই বললেন যে, ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে লীগের যোগদানের পর থেকে অবস্থা এমন সঙ্গীণ হয়েছে যে, কংগ্রেস সদস্যরা দুবার পদত্যাগ করেন।

"Our patience is fast reaching the limit."

হবারই কথা। মৌলানা আজাদ একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেছেন। "ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট হবার পর সব বিষয়ে ঘরোয়া ভাবে আলোচনার জন্য মন্ত্রীরা পালাক্রমে এক এক দিন এক এক মন্ত্রীর ঘরে আসতেন। কিন্তু জওহরলাল প্রায়ই নিজের ঘরে সব্বার চায়ের আমন্ত্রণ করতেন। আর, আমন্ত্রণ পত্র যেত নেহেরুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর নামে। লীগ যোগদানের পর লিয়াকৎ এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে অপমানিত বোধ করলেন: জওহরের প্রাইভেট সেক্রেটারী চায়ের নেমন্তন্নে ডাকছে! জওহরলালকেই বা এ অধিকার কে দিল? লিয়াকৎ নিজের ঘরে লীগ সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে মিলিত হ'তে লাগলেন।

জিন্নাজী ঘোষণা করলেন যে, মুসলিম লীগের কোন প্রতিনিধি সংবিধান পরিষদে যোগ দেবেন না; লীগ কাউন্সিলের বোম্বে প্রস্তাবটি বলবৎ আছে।

সর্দার প্যাটেল মীরাটে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বললেন: "ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট থেকে কংগ্রেস যাতে চলে আসে এখন সেভাবেই কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমরা সে ফাঁদে পা দেব না।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী দেখলেন, এ তো বড় ঝামেলা! ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট একটা ঝগড়ার আড্ডা হ'য়ে উঠল, সংবিধান পরিষদের কাজও হচ্ছে না। তিনি ডেকে পাঠালেন ওঁদের বিলেতে।

যাব কি যাব না

আবেগচালিত জওহরলাল প্রথমে বললেন, যাব না। জিন্না যেতে রাজী হতেই বললেন, যাব। অবশ্য মৌলানা বলছেন, তিনি কংগ্রেস নেতাদের সম্মত হবার জন্য বুঝিয়েছিলেন।

যাই হোক, যাত্রা করলেন হর্ষবর্ধন। ওয়াভেল, নেহরু, জিন্না, লিয়াকৎ, বলদেব। লণ্ডনে কথাও হ'ল। ফল হ'ল না। জওহরলাল স্বদেশ যাত্রা করলেন, স্থিরবুদ্ধি জিন্না লিয়াকৎকে নিয়ে থেকে গেলেন। ১৯৪৬ এর ৬ই ডিসেম্বর মিশনের পূর্ব প্রস্তাব সংশোধন করে যে নতুন ঘোষণা হ'ল, আজাদ বলছেন তা গ্রুপিং সম্পর্কে মুসলিম লীগের ভাষ্যই সমর্থন করল। কিন্তু কিমাশ্চর্যম্, সত্য, শ্রান্ত, ক্লান্ত, সংগ্রাম-ভীত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ. আই. সি. সি'কে দিয়ে তাই পাশ করিয়ে নিলেন। পত্রিকা বললেন, খুব সহজে নয়, মাত্র ৪৭ ভোটের ব্যবধানে। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট থেকে অকারণ-স্খলিত শরৎ চন্দ্র বসু; তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

শচীন দেব বর্মণের একটা চমৎকার গান আছে, সত্য, 'তুমি আর নেই সে তুমি'; কংগ্রেসও আর সে কংগ্রেস নেই; ধান-খাওয়া মুরগী; রাজ্যশাসনের খেল্না পেয়ে আর ছাড়তে চাইছে না। পাছে পুতুল নাচানেওলা চটে এজন্য ১৯৪২এর "কুইট-ইণ্ডিয়া" বা "ভারত ছাড়ো" অংশটুকু বাদ দিয়ে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সঙ্কল্প পরিমার্জিত করা হ'ল। (৮ই জানুয়ারী ১৯৪৭)

সংবিধান পরিষদ বা সংবিধান পরিষদে কংগ্রেস একা ব'সে রইল দরজা খুলে যদি মুসলিম লীগ আসে। এল না।

এই অচলাবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা তারিখ স্থির করে ঘোষণা করার কথা নিয়ে এদিকে বড়লাট ওদিকে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলী দ্বিমত হলেন।

ইন্টারিম গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজা গজনফর আলি গর্জে উঠলেন ঃ মহম্মদ বিন কাসেম আর মহম্মদ গজনবী মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পরাভূত করেছিলেন। আল্লার দোয়ায় এখনও কয়েক লক্ষ মুসলমান কয়েক কোটী হিন্দুকে অভিভূত করতে পারেন।

পর্বতে যে আগুন লেগেছে ধোঁয়াই তার প্রমাণ, সত্য ; ভারতের বিভেদাগ্নি অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে, নিস্তার নেই। দুর্বল নেতৃত্ব— Tired !!

ওয়াভেলের চাকরী গেল

ইন্টারিম গবর্ণমেণ্টেই কংগ্রেস কবলধৃত পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী মাসে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনলেন লীগ সদস্যেরা। কিন্তু লীগ বিচালি না খাক বিচালির পাত্র ছেড়ে দিতে রাজী নয়। ইন্টারিম গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান হাসিলের একটা দুর্গ। পণ্ডিত নেহরু নালিশ জানালেন বিলাতে ওপরওলার কাছে বড়লাটের হাত দিয়ে।

এরই মধ্যে অকস্মাৎ লর্ড ওয়াভেল বড়লাট পদ থেকে অপসৃত হবার গোপন পত্র পেলেন। লণ্ডনে ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে খবর রটছিল, তাঁর জায়গায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসছেন। ২০এ ফেব্রুয়ারী প্রধান-মন্ত্রী এটলী কমন্স সভায় এ গুজব সত্য ব'লে সমর্থন করলেন।

মসলে এই সম্পর্কে একটি বিষণ্ণ-কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন ঃ

"১৯এ ফেব্রুয়ারী বড়লাট জর্জ এবেলের সঙ্গে ব'সে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিলেন ; এমন সময় চিঠিপত্র এল। একটি কেব্‌ল্-এ 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' চিহ্নিত ছিল। সেটি বড়লাটের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল, উনি খুললেন, পড়লেন, তারপর যেমন ডিম খাচ্ছিলেন খেতে লাগলেন। এবেল ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ; ওয়াভেলের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন, কিছু একটা হয়েছে। অপেক্ষা করতে লাগলেন ওঁর মুখ থেকে শুনবেন বলে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। শেষে এবেল বললেন, কিছু, জরুরী, স্যার ?

"ওয়াভেল : ওঁরা আমাকে বরখাস্ত করেছেন, জর্জ।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় এও জানিয়েছিলেন যে,

"The British Government wish to make it clear that it is their definite intention to take the necessary steps to effect transference of power into responsible Indian hands by a date not later than June 1948."

সুতরাং, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা তারিখ স্থির করে দিলেন ৩০এ জুনের মধ্যে।

নেহরু বললেন, কংগ্রেসের জয়। জিন্নার 'ডন' পত্রিকা বললেন, মুসলিম লীগের জয়। অমৃতবাজার পত্রিকা বললেন, কংগ্রেসেরও নয়, লীগেরও নয়, বৃটিশ কূটনীতির জয়। (ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৪৭)

জিন্না বললেন, আমরা পাকিস্থান দাবী ছাড়ছি নে।

বারোজের শোক-গীতি

তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় কলকাতা-নোয়াখালী হত্যাকাণ্ডের 'সাক্ষী গোপাল' গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ শোক-গীত গাইলেন :

"The fixing of a definite date has jolted us all, Indians and British alike, out of our usual lines of thought. You, as leaders of European Community in and around Calcutta, should make your future plans on the definite assumption that by the middle of next summer there may be no British troops here, no British civil servants, no British Governor."

মসলে বলেছেন, গবর্ণর বারোজ ভারতীয়দের একথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে গর্ববোধ করতেন যে, তিনি একজন রেলকর্মী ছিলেন। "আপনারা এখানে এমন লোক পান যাঁরা 'হান্টিং' আর 'সুটীং'য়ে বিশেষজ্ঞ ; কিন্তু আমি 'সান্টিং' আর 'ছুটিং'য়ে বিশেষজ্ঞ।"

তাই এই বিবৃতিতে লাইনের ওপর ঝাঁকুনির কথা বললেন।

উইনস্টন চার্চিল চীৎকার করে উঠলেন, গেল, গেল, Our Empire is being cast away. (২রা মার্চ, ১৯৪৭) তবু কমন্স সভায়

'ভারত-ছাড়' নীতি ৩৩৭-১৮৫ ভোটে গৃহীত হ'ল ৭ই মার্চ। ৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য মুসলিম লীগকে অনুরোধ করলেন।

কংগ্রেসের বিভাগ-প্রস্তাব

এ কিন্তু কিছুই নয়, সত্য, সমূহ সর্বনাশের সূচনা হ'ল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সর্দার প্যাটেলের এক প্রস্তাব গ্রহণে। লীগ নয়, জিন্না নয়, কংগ্রেসই প্রথম প্রস্তাব করল—পাঞ্জাবকে সূত্র করে—দেশ বিভাগের। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের হাতে এই প্রস্তাবটিই ভারত বিভাগের ধারালো অস্ত্র হয়ে ওঠে এবং কংগ্রেস নিজের দর্পণে মুখ দেখে মুখ লুকোবার পথ পায়নি।

আমি তোমায় বলেছি, সত্য, তারিখের দিক থেকে মৌলানা আজাদের বইটি খুব সহায়ক নয়, বরং ক্রমিক ঘটনানুসরণে বিভ্রান্তিকর। সর্দার প্যাটেলের এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ৮ই মার্চ এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দিল্লীতে আসেন ২২-এ মার্চ, অর্থাৎ ঐ প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষকাল পর; ২৪-এ মার্চ বড়লাটপদে অভিষিক্ত হবার পর থেকে যখন তিনি একটা মীমাংসাসূত্র হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভি. পি. মেনন তাঁর হাতে ঐ অস্ত্রটি তুলে দেন; ওরই বিদ্যুৎ ঝলকে মাউণ্টব্যাটেন পথ পেয়ে যান এবং অনিবার্য গতিতে জিন্নার উল্লাসধ্বনির মধ্যে ঠেলে নিয়ে যান মুখ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে। আজাদ বাদে—কেননা, তিনি শত অপযশ সহ্য করেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁর খেদ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ে। কিন্তু তিনিও সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবটি তাঁর বইয়ে তোলেন নি, মসলেও না। প্রস্তাবের পটভূমিকাটি অবশ্যই আছে আজাদের বইয়ে।

"ইতিমধ্যে, প্রতিদিনই অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে। কলকাতা থেকে নোয়াখালী, নোয়াখালী থেকে বিহারে, সেখান থেকে বোম্বাইয়ে, তারপর এযাবৎ শান্ত পাঞ্জাবেও হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে। মালিক

খিজির হায়াৎ খান পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন ২রা মার্চ; ৪ঠা মার্চ লাহোরে পাকিস্থান-বিরোধী বিক্ষোভে ১৩ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়; সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অমৃতসর, তক্ষশীলা, রাওয়ালপিণ্ডিতে ছড়িয়ে পড়ে।

"এদিকে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেস-লীগের বিপরীত মনোভাবে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।...সর্দার প্যাটেল দেখলেন, তিনি স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হলেও অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির অনুমোদন ছাড়া একটা চাপরাশিও নিয়োগ করতে পারেন না। কংগ্রেস মন্ত্রীরা বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা কি করবেন।"

এই হতাশার মধ্যেই এবং মৌলানা আজাদ ও গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেলের পাঞ্জাব প্রস্তাব:

> "In viw of the tragic events of the Punjab, it is necessary to find a way out which involves the least amount of compulsion. This would necessitate a division of the Punjab into two provinces, so that the predominantly Muslim part may be separated from the predominantly non-Muslim part."

একেবারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের পরেও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত রাখার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আচার্য কৃপালনী এই মিথ্যা কথাটা রাখলেন যে,

> "The resolution does not recommend the division of the Punjab."

নিতান্তই যদি মারামারি চলে তবেই। জনসাধারণকে বোকা বানাবার বাগ্‌জাল বিস্তারের কৌশল কংগ্রেস রপ্ত করেছিল ভালোই, কিন্তু যাঁরা ভারতীয় নন এবং তখনও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কর্ণধার তাঁদের অন্যতম লর্ড-মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা উত্থাপককে খুঁজে বের করলেন। এরপর পাকিস্থান অবধি তুফান এক্সপ্রেস ছুটে গেছে। কিন্তু তার আগে দুটি বিষণ্ণ কথা তোমায় শোনাই, সত্য।

সজল-চোখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান

শেখ আবদুল মজিদের নেতৃত্বে একদল প্রগতিশীল মুসলমান প্রদেশ সমূহ বিভাজনের বিরোধিতা জানালেন: "আমাদের দল প্রগ্রেসিভ মুসলিম জমায়েৎ ভাষাভিত্তি ছাড়া দেশেরই কি প্রদেশেরই কি বিভাজনে বিশ্বাস করেনা।"

অশীতিবৎসর বয়স্ক শিখ নেতা বাবা খরক সিং বললেন, এ প্রস্তাব অবস্থাকে আরও খারাপ ক'রে তুলল, কংগ্রেস প্রকারান্তরে পাকিস্থানের দাবীকেই মেনে নিল।

শুধু মেনে নেওয়া নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উঁচু মহলে পাঞ্জাবকে পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করে দুটি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আরম্ভ হ'য়ে গেছে তখন। (১১ই মার্চ) নেহরু আবার একটি আঞ্চলিক বিভাজনের কথা ব'লে আসল কথাটাকে একটু ঘোলাটে করলেন মাত্র। ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং ভরতপুরে ৩৫তম সারা ভারত জাঠ মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন: আম্বালা, জলন্ধর ও লুধিয়ানা জেলা নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করাই ভবিষ্যৎ সর্বনাশ নিবারণের একমাত্র উপায়।

তখনও মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসেন নি, বড়লাটপদে আসীন হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং, যাঁরা বলেন, মাউণ্টব্যাটেনই দেশ-বিভাগের প্রস্তাবক, তাঁরা হয় অজ্ঞ, নাহয় নিজেদের অমার্জনীয় অপরাধ ঢাকতে একথা বলেন।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

৫ই এপ্রিলের মধ্যে গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের পাঁচ বারে দশঘণ্টা-কাল সাক্ষাৎ আলাপ হল। তারপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ওঁকে বুঝে নিয়ে ওঁকে ওঁর মনের যাদুঘরে তুলে রাখলেন।

> "He is not a practical man. Look at the silly plan he produced to hand India over to Jinnah. This is no time for idealistic gestures—this is the time for action."

পৌঁছোবার এক পক্ষ কালের মধ্যেই বড়লাট গান্ধীজীকে স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনার ব্যাপারে বাদ দিয়ে রাখলেন। জিন্নাজীর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎ আলাপ হল ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত তিন দিন।

মসলে বলেছেন, জিন্নাজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বড়লাট বুঝে নিলেন, এই একটি মানুষ যাঁর ওপর তাঁর মোহ বিস্তার করা যাবে না।

> "My God, he was cold! It took all my efforts to unfreeze him". He quickly discovered that here was a man completely impervious to his charm.

নেহরু-বড়লাট মোলাকাৎ সম্পর্কে মসলে যা বলেছেন এবং যে প্রসঙ্গ উহ্য রেখেছেন তা অতি-সম্প্রতি মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং কোন একটি বক্তৃতামালা উপলক্ষ্যে ব'লে দিয়েছেন। সেটি সিঙ্গাপুরের ঘটনা; সেখানে নেহরু চরিত্রটি স্বচ্ছ দর্পণের মতো; কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যখন সিঙ্গাপুরে তখন তিনি মনে করলেন, নেহরুর সিঙ্গাপুর ও মালয়ে আসা দরকার। এই পরিদর্শন ব্যবস্থা একটু ভুল পথে যাবার উপক্রম হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, নেহরুর পরিদর্শনকালে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যারাকে আটকে রাখা হবে এবং নেহরুকে কোনরকম পরিবহন দেওয়া হবে না। "নেহরুর পৌঁছোবার মাত্র দু'দিন আগে, ১৯৪৬ এর ১৬ই মার্চ আমি আমার সিঙ্গাপুর হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম; ভারতীয় সৈন্যদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলাম এবং তাদের নেতাকে দেখবার জন্য সৈন্যদের পরিবহন ব্যবস্থা করার আদেশ দিলাম। ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর ওপর প্রোগ্রামের ভার দিয়ে নেহরুকে আমার একটি গাড়ী দিলাম এবং গবর্নমেণ্ট হাউসে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম।

"যখন তিনি এলেন, আমি বললাম, তিনি যেখানে খুশী যেতে পারেন

এবং যা খুশী করতে পারেন; কিন্তু স্থানীয় ভারতীয়েরা যদি তাঁকে আজাদ-হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য দেবার অনুরোধ জানায় তিনি যেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং যারা জাপানীদের পক্ষে যুদ্ধ করতে চায়নি তাদের প্রতি অসভ্য আচরণ করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তার এমন লোকের ওপরই নির্ভর করতে হবে যারা শপথ ভঙ্গ করেনি; সৈন্যদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুগতই থাকা উচিত। তিনি আমার কথা মেনে নিলেন।

"He saw the point and agreed not to lay their wreath."

তারপর তাঁরা দুজন কিভাবে সেই ভিড় থেকে লেডী মাউণ্টব্যাটেনকে উদ্ধার করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বললেন, এইভাবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারপর এই বন্ধুত্ববলে পরবর্তীকালে যখন মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট আর নেহরু প্রধানমন্ত্রী তখন কিভাবে ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেকের জেদে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের মুক্তি-প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে দিয়েই বানচাল করিয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনাও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই বক্তৃতামালায় তুমি পাবে, সত্য।

শাহ নওয়াজ খান তাঁর বহু তথ্যপূর্ণ "আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী" বইয়ে, মাউণ্টব্যাটেনের সর্বশেষ বক্তৃতামালার আলোকসম্পাতে বলা যায়, একটি ভুল অথবা ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তিকর উক্তি করেছেন এবং স্বয়ং নেহরু উক্তির মূল উপলক্ষ্য হয়েও বইয়ের মুখবন্ধে এই বই-খানিকেই "সর্বশ্রেষ্ঠ" বলে প্রমাণপত্র দিয়েছেন। শাহ নওয়াজের উক্তিটি এই:

"১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন মালয়ে যান তখন তিনিও আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভটি যেখানে ছিল, সেই স্থানটিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে এসেছেন। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন—শোনা যায় তিনিও নাকি এখানে পুষ্পমাল্য দিয়েছেন···ভণ্ডামির চূড়ান্ত নিদর্শন!"

বলা বাহুল্য, সত্য, যে, শাহ্ নওয়াজ কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকের কাছে এই গালগল্পটি শুনে থাকবেন। গল্পটাকে বিশ্বাস্য করার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের হাতেও মালা তুলে দিয়েছেন গল্পকার!

কিন্তু আসল কথা ঘোড়ার মুখে শোনা গেল, ইংরাজীতে একেই বলে horse's mouth!

আপাততঃ বড়লাট হ'য়ে আসার পর দোঁহে যে মিলন হল লিওনার্ড মসলে তার বর্ণনা দিন, আমরা শুনি, কেননা, এঁরাই তখন ভারত ভাগ্যবিধাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ।

বন্ধুত্ব পাশে বন্দী নেহরু

নেহরু ছিলেন প্রথম অফিসিয়াল ভিজিটার।

> "The Viceroy was shrewd enough to spot from the start one of Nehru's weaknesses; he cannot help, when encouraged, being gossipy and malicious about his friends and collegues. It was from Nehru that Mountbatten obtained much of the ammunition which he subsequently used upon other Congress leaders."

তিনঘণ্টা আলাপের শেষে নেহরুকে জয় করে নিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং মানুষটির যথাযথ পরিমাপ করলেন। তোষামোদপ্রিয়, তাঁকে বোঝানো যায়।

> "Nehru was completely won over and Mountbatten had the measure of his man. He could be flattered. He could be persuaded."

"মিঃ নেহরু," মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "আপনি আমাকে কিন্তু বৃটিশরাজ গুটিয়ে নেবার শেষ ভাইসরয় ব'লে মনে করবেন না, আমি নবভারতের পথিকৃৎ।

"নেহরু অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন, এখন বুঝতে পারছি, লোকে কেন বলে, আপনার যাদু বিপজ্জনক।

"সেই মুহূর্ত থেকে নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের আপনজন হয়ে গেলেন; আরও মোহগ্রস্ত হলেন লেডী মাউণ্টব্যাটেনের আচরণে।

"But he was Mountbatten's man from that moment on and his attachment to the Mountbatten menage was much increased by his subequent contact with Lady Mountbatten. He has long been a widower, and he was a lonely man. Lady Mountbatten filled an important gap in his life."

মৌলানা আজাদও তাঁর বইয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং জবাব পেয়েছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কিভাবে নেহরুকে জয় করলেন। "জওহরলাল নীতিনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু আবেগপ্রবণ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে নমনীয়ও। জওহরলাল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আচরণে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, সম্ভবত তার চাইতেও বেশী ছিল লেডী মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাব।"

কারণগুলো বিশ্লেষণে মসলেও বলেছেন, one of them was certainly Lady Mounbatten. আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কেও বলেছেন "a successfnl lubricant of the Nehru-Mountbatten axis".

মাউণ্টব্যাটেনের সমগ্র পরিবার, তাঁর সুনির্বাচিত স্টাফ, সহকর্মী, সব মিলিয়ে একটা সুসম্বদ্ধ টিমের মতো কাজ করেছে এবং খুঁজতে খুঁজতে দুর্বলতম জায়গাটি বের করেছে। মসলে ভারী সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন: "like eager beavers, nibbling their way into Indian hearts."

প্যাটেলের মানসিকতা

ধরলেন লীগের আচরণে সব চাইতে তিক্ত বিরক্ত এবং পাঞ্জাবের বিভাজন প্রস্তাবের জনক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। মৌলানা আজাদ প্যাটেল সম্পর্কে বলেছেন:

"It must be placed on record that the man in India who first fell for Lord Mountbatten's idea was Sardar Patel."

কিন্তু কোনো জিনিস তো হঠাৎ হয় না, সত্য, প্রত্যেকটি ব্যাপারের কার্যকারণ সূত্র থাকে। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী প্রথম পড়লেন, কেন না, তার মানসিকতায় ক্ষয়রোগটি ছিল। প্যাটেল একদিন

কথায় কথায় আজাদকে বলেও ছিলেন, আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ভারতবর্ষে তুটি জাতই আছে। এই যে মানসিকতা তা একদিনে সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং, যখন বড়লাট-প্যাটেল সাক্ষাৎ ঘটল তখন প্যাটেলের মন "জাতিভেদে" দেশবিভাগের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা ভাষণে-প্রলাপে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে বলে চলেছেন বিপরীত কথা। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে তো আর প্রলাপ বকা চলবেনা, সেখানে একটি মন একটি কথাই বলতে পারে, বলেছে।

মসলে বলেছেন, প্যাটেল কিন্তু তাঁর এই মনোভাব সহকর্মীদের কাছে এমন নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করেন নি। তিনি তাঁদের বলেছিলেন ঃ "লীগ যদি পাকিস্থানের জন্য জেদ করতেই থাকে তবে তার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা। আমার মনে হয় না, বৃটিশ সরকার বিভাজনে রাজী হবেন। পরিশেষে তাঁরা প্রবলতম কোনো পার্টির হাতে শাসনকার্য দিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করবেন। যদি না করে ক্ষতি নেই। পূর্ব-বাংলা, পাঞ্জাবের কিছু, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান বাদ দিয়ে কেন্দ্রাধীন একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন প্রশাসন এতই শক্তিশালী হবে যে, অবশিষ্টাংশ কালক্রমে চলে আসবে।"

সত্য, প্যাটেলের এই অলীক স্বপ্ন নেহরুও দেখেছিলেন এবং নেহরুর দেখাদেখি আর সবাই ; গোটা ওয়ার্কিং কমিটি এবং এ. আই. সি. সি. ! কারও মাথায় এই অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধি জাগল না যে, এক অতিক্ষুদ্র ভূখণ্ডও যদি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয় স্ববিরোধী আন্তর্জাতিকতা, অন্যান্য রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী স্বার্থই তাকে রক্ষা করবে। যেমন আজ পাকিস্থানের বন্ধু-সংখ্যা হয়েছে ভারতের চাইতেও বেশী। নাগাদের সাহায্য করতে চায় চীন, পাকিস্থান, বৃটেন। পাকিস্থানকে সাহায্য করতে চায় তামাম মুসলিম তুনিয়া ও চীন-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়াও। এই সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও যাঁদের ছিল না তাঁরাই আমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা—ভারতভাগ্যবিধাতা ছিলেন। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন টিম, মসলে যাকে বলেছেন "ডিকি বার্ডস," তাঁরা যে এই

জাতীয় ভারতীয় বক্তাদের অনায়াসেই মহাপ্রস্থানের পথে পাঠাবেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

ওঁরা নিজেদের এই ব'লে কাকের মত চোখ বুজে ভাবলেন যে, পাঞ্জাব বিভাগের ধাপ্পাতেই জিন্না ঘাবড়ে যাবেন ; মুসলমানেরা বুঝতে পারবেন পাকিস্থানের কি ঠ্যালা। জিন্না অবশ্য ভিন্নার্থে ৩০এ এপ্রিল বাংলা পাঞ্জাবের বিভাজন প্রস্তাবে রাগ প্রকাশ করলেন, কিন্তু পাকিস্থান যেখানে একটা প্রস্তাবমাত্র নয়, বাস্তব এবং আসন্ন, সেখানে এই রাগ কতখানি কৃত্রিম অথবা দেশবিভাগকে ত্বরান্বিত করার কৌশল, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সেটুকু পর্যন্ত ধরতে পারেন নি।

গান্ধীজী বিহার থেকে পাঞ্জাব বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাবটির তাৎপর্য জানতে চেয়ে প্যাটেল ও নেহরুর কাছে চিঠি দিলেন। জবাব দিলেন প্রথম প্যাটেল : "পাঞ্জাব সংক্রান্ত প্রস্তাবটির মর্ম আপনাকে বুঝিয়ে বলা কঠিন। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গেই এটি গৃহীত হয়েছে। তাড়াহুড়া করে বা পুরোপুরি বিচার না করে কিছু করা হয়নি। আপনি যে এর বিরুদ্ধে, তা সংবাদপত্র থেকেই জানতে পারলাম। যা ঠিক মনে করেন তা বলার অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। পাঞ্জাবের অবস্থা বিহারের চাইতেও খারাপ। মিলিটারীর হাতে গেছে।.........

নেহরু লিখলেন : "আমাদের পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব আমাদের পূর্বেকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে স্বতঃই অনুসৃত হয়েছে। আগে সেগুলো ছিল নঙর্থক, কিন্তু এবার একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার হয়ে পড়েছে ; শুধু প্রস্তাব পাশ করে অভিমতজ্ঞাপন করার অর্থ কিছু হয় না। আমার শুধু নয়, অধিকাংশ সদস্যেরই দৃঢ় প্রত্যয় যে, আমাদের এক্ষুণি বিভাজনের জন্য চাপ দিতে হবে যাতে বাস্তব চিত্রটা ফুটে উঠতে পারে।" বস্তুতঃ, জিন্নার দেশবিভাগ দাবীর এই একমাত্র জবাব হতে পারে। তাঁর এখনও ধারণা, জিন্না যাকে পরে পোকা-কাটা পাকিস্থান বলেছেন তা পাওয়ার চাইতে বরং পাকিস্থানই নেবেন না।

সিংহের বিবরে লৌহমানব

জর্জ এবেল এবং রাও বাহাদুর ভি. পি. মেনন এদিকে বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণে একটুও দেরী করলেন না ; সদস্যেরা বুঝুন না বুঝুন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য ঘটেছে বিশেষ করে সেদিকটার দিকে।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তক্ষুণি সাধারণ্যে লৌহ-মানব বলে খ্যাত সর্দার প্যাটেলকে ডেকে পাঠালেন ; পাঞ্জাব-প্রস্তাবের পেছনে কি উদ্দেশ্য তা তাঁর কাছ থেকে বুঝতে চেষ্টা করলেন ঃ

> "It was no part of Patel's technique to play the game of Indian indepndence with his cards face up on the table, and for most of the interview he was the somewhat naive Hindu politician only half aware of what the Resolution meant."

তিনি যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে ও হতবিহ্বল হয়ে স্বীকার করলেন যে, পাঞ্জাব বিভাগ মেনে নিয়ে তিনি কিন্তু দেশবিভাগের নীতিই মেনে নিয়েছেন। যেন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এই ভাবে মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তি মেনে নিলেন যে, সম্ভবত এই সমাধানের পথ। একবার ভেবে দেখুন দেখি, কি শান্তি বিরাজ করবে যদি মুসলমানদের তাঁদের স্ব-দেশে নির্বাসিত করা যায়। কংগ্রেস কার্যক্রমে আর বাধা নেই। কংগ্রেস পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে কোন চতুর অভিযান নয়। স্বাধীন ভারতে একদলীয় শাসন—খুশীমত অবাধে কাজ করে যাও।

যেন বড্ড অনিচ্ছায় সর্দার প্যাটেলও বুঝলেন, সম্ভবত এই-ই পথ। মাউণ্টব্যাটেন সোল্লাসে বৈঠক থেকে উঠে এসে তার স্টাফকে বললেন ঃ

> "It worked ! He seemed like such a hard nut—yet once I cracked the shell, he was all pulp inside."

মসলে বললেন, ভি. পি. মেনন ও প্যাটেল কেউই আসলে বড়-লাটের কাছে ভাঙলেন না যে, প্রস্তাবের আগে থেকেই তাঁরা এ নিয়ে কথা কয়েছেন, বাহ্যত ওরকম গোবেচারার মতো বৈঠকে প্রবেশ করলেও সর্দার প্যাটেল তাঁর জাল বুনে যাচ্ছিলেন।

মৌলানা আজাদ তাঁর বইয়ে বলেছেন: সর্দার প্যাটেলের বিশ্বাস জন্মাতেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলালের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। জওহরলাল প্রথমে কিছুতেই সম্মত হলেন না, বরং দেশবিভাগের কথায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হ'ল, কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছাড়লেন না, ধীরে ধীরে জওহরলালের প্রতিরোধ ক্ষয় করে আনলেন।

নেহরু ও লেডী

মসলে এই কাহিনীকে পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, লেডী মাউন্টব্যাটেন গেছলেন পাঞ্জাবে। দিল্লীতে ফিরে এলেন নিদারুণ মনঃপীড়া নিয়ে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভিব্যক্তিতে হতবিহ্বল হয়ে এবং এই প্রত্যয় নিয়ে যে, তাঁর স্বামী ও তাঁর উপদেষ্টারাই ঠিক, দেশবিভাগই একমাত্র পথ।

> "It was while she was in this wretched state of numbed horror and despair that Mountbatten sent her to see Nehru. They grieved together over India's misery."

এরই কিছুদিন পর জওহরলাল গেলেন মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করতে। মৌলানা আজাদ লিখেছেন: "তিনি এক দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করলেন; একথাটিই জোর দিয়ে বলতে চাইলেন যে, আমাদের কল্পনা-বিলাস শোভা পায় না, বাস্তবের মোকাবিলা করতে হবে। পরিশেষে আসল কথায় এলেন এবং আমাকে বিভাজনের বিরোধিতা পরিহার করতে বললেন। তিনি বললেন, এ অনিবার্য, যা ঘটবেই তাতে বাধা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার পক্ষে এ-বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনের প্রতিরোধ করাও সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে না।

"It was done." লিওনার্ড মসলে বলেছেন:

> "The man who had fought so long for a free and unitary India, who had mocked Jinnah and despised the Muslim League, had been won over by Mountbatten's charm and Lady Mountbatten's distress in less than a month."

মৌলানা আজাদের একমাত্র ভরসা ছিল গান্ধীজী। তিনি ৩১এ মার্চ দিল্লী এলে মৌলানা আজাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজীই

কথাটা তুললেন। 'মনে হচ্ছে, বল্লভভাই, এমনকি জওহরলালও, আত্মসমর্পণ করেছে। আপনি কি আমার পাশে দাঁড়াবেন, না, আপনিও বদলে গেছেন ?'

মৌলানা বললেন, আমার একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি যদি দেশবিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, আমরা এখনও রক্ষা করতে পারি। গান্ধীজী বললেন, কি বলছেন ? কংগ্রেস যদি দেশ বিভাগ চায় তবে তা আমার মৃতদেহ ডিঙিয়ে পেতে হবে।

তারপর গান্ধীজী-বড়লাট সাক্ষাৎ হ'ল ; গান্ধীজী-প্যাটেল সাক্ষাৎ হ'ল। আকাশের রঙ গেল বদলে। এর পর যেদিন মৌলানা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন

"I received the greatest shock of my life, for I found that he too had changed."

তাঁর মুখে প্যাটেলের যুক্তি।

সুতরাং, যাঁরা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেন, গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মিথ্যোক্তির একমাত্র প্রমাণ পাকিস্থান গান্ধীজীর মৃতদেহ ডিঙিয়ে আসেনি, এসেছে অন্ততঃ এক পাঞ্জাবেই ছয়লক্ষ সাধারণ মানুষেরই মৃতদেহ ডিঙিয়ে।

সত্য, ছেলেবেলায় আমাকে আমার দাদারা নিয়ে গেছলেন এক কালীপূজোয় কিছু বেশী রাত্রেই। কলকাতার এত আলোর সমারোহের কালী মূর্তি নয়। আবছা আবছা আলো-অন্ধকারে গর্জন তেলের সেই চকচকে মূর্তিকে আমি প্রণাম করব কি, দাদাদের জড়িয়ে ধরে পেছন ফিরে ছিলাম। আমার ভয় দেখে ওঁরা হাসছিলেন। সে রাত্রেই ভীষণ বৃষ্টি হ'ল ; সব ধুয়ে মুছে যাবার উপক্রম। আমার ভয় ভাঙাবার জন্যই নাকি জানিনে, আমাকে না জানিয়ে যেন বৃষ্টিপাতের পরিণাম দেখাতে দেখাতে তাঁরা সেই কালীমণ্ডপে হাজির হলেন। ওমা ! কোথায় সেই কালী মূর্তি, এবড়ো খেবড়ো মাটী লাগানো একটা খড়ের পিণ্ড দেখিয়ে বললেন, তুই ভয় পেয়েছিলি, এই দেখ তার দশা !

সত্য, আমরা ভক্তিনিষ্ঠায় যে মাটীর মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম বিপর্যয়কালে সঙ্কটে তাদের খড়ের আসল মূর্তিগুলো বেরিয়ে গেল।

মৌলানা নেহরুকে বলেছিলেন : ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না, নেহরু'।

"History would never forgive us if we agreed to partition. The verdict would then be that India was divided as much by the Muslim League as by Congress."

আহ্লাদে আত্মহারা জিন্না

আর পরম সৌভাগ্যের কিরীটশোভিত মহম্মদ আলি জিন্নার কি প্রতিক্রিয়া? "তিনি বাহ্যতঃ শান্ত ও গম্ভীর ভাব বজায় রাখলেন এবং নেহরুর এই 'ভোল ফেরতাই'কে অনস্বীকার্য বাস্তবতার বিলম্বিত স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করলেন; কিন্তু একান্তে তিনি আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে গেলেন।

"His satisfaction was as great as the Viceroy's. He had never expected recognition of Pakistan by Congress to come so soon. In fact, many who knew him maintained that he had never really expected Pakistan to come either."

"কিন্তু আজ তিনি (সেই অপ্রত্যাশিত কল্পনার মূর্ত বাস্তবের) সিংহদ্বারে উপনীত।" মসলে বলেছেন এ কথাগুলো।

১১ই এপ্রিল রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে লর্ড ইসমে সব কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা খসড়া করবার জন্য তাগিদ দিলেন। খসড়াটি হ'লে তা সব গবর্ণরের 'বরাবরে' বিলি করা হ'ল। কলকাতা-নোয়াখালীতে রাজনৈতিক হত্যালীলার নায়ক-বন্ধু ফ্রেডারিক বারোজ ছাড়া সবাই বড়লাটকে বললেন, ঠিক আছে। অপদার্থ এই গবর্ণরটি সুরাবর্দীর স্বাধীন বঙ্গদর্শনের জন্য পায়তাড়া কষছিলেন।

এক মাসের মধ্যে ভারতের দিগন্ত গেল পালটে। ২৮এ এপ্রিল খোদ সংবিধান পরিষদের প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করলেন, শুধু দেশ বিভাগ নয়, কোন কোন প্রদেশ বিভাগের জন্যও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং সংবিধান সেই মতোই রচনা করতে হবে।

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বা এ. আই. সি. সি. বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে

জানিয়ে দিল, কমিটি বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবাবলী সর্বাংশে গ্রহণে প্রস্তুত।

বড়লাট ১৭ই মে নাগাদ ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলাপের জন্য সব নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েও তা প্রত্যাহার করে নিলেন। কথা হ'ল ওটা হবে ২রা জুন।

নেহরুর কন্যা ইন্দিরা খবর দিলেন, বাবার ঘুমে কথা বলা বড্ড বেড়ে গেছে।

সিমলায় নব-চেতনা

মে মাসে মাউণ্টব্যাটেন এলেন সিমলায় এবং এতদিনে তাঁর চেতনা হ'ল, তিনি ভারতীয় রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে এড়িয়ে সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করে ২রা মে লর্ড ইসমে ও জর্জ এবেলের হাতে যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, তার মধ্যে কিছু কিছু গলতি আছে। সিমলায় একান্তে পেয়ে মেনন তা দেখিয়ে দিলেন। তিনি তখন কি পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে তা তাঁর আর নেহরুর সামনে খুলে বলার জন্য মেননকে অনুরোধ করলেন। মেনন ইতিমধ্যেই প্যাটেলকে সব গুছিয়ে বলেছেন, প্যাটেল রাজী হয়েছেন। শুনে নেহরুর একবার উষ্মা হ'ল বটে কিন্তু কিছুক্ষণ কথার পরই প্রশমিত হলেন। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। "মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে দুটো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে—একটি পাকিস্থান আর একটি হিন্দুস্থান। প্রত্যেকটির একজন করে গবর্ণর-জেনারেল থাকবেন। যদ্দিন-না যার যার সংবিধান পরিষদে সংবিধান স্থির হচ্ছে তদ্দিন ১৯৩৫ ভারত আইনের ভিত্তিতেই দুটো ডোমিনিয়ান হবে।

এ হ'লে আর ১৯৪৮-এর জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। নেহরু চমৎকৃত হলেন। কিন্তু বললেন, একথা স্মরণ রাখা দরকার, ভারতবর্ষে এক বিশাল জনমত পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথায় অনেকে বিরক্ত হ'তে পারেন। আমি জানি, তত্ত্বের

দিক থেকে দেখানো যায় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পূর্ণ স্বাধীনতারই সামিল কিন্তু সাধারণ লোকে অত চুলচেরা বিচার করবে না।

মেনন বললেন, "সম্রাট" কথাটা বাদ দেওয়া যেতে পারে। নেহরু বললেন বটে যে, এটারও বিশেষ আবেদন থাকবে না জনসাধারণের কাছে, কিন্তু বেশ প্রদীপ্ত হ'য়ে বললেন ঃ

> "I myself have always been most anxious for sentimental reasons to have the closest possible relationship with the British Commonwealth."

সত্য, নেহরুর ইচ্ছামত আজও আমরা বৃটিশ কমনওয়েলথে আছি, নাম পাল্টানোর একটা ফাঁকি আছে, কিন্তু যার নাম বেগুন তারই নাম বার্তাকু বা যার নাম লাউ তারই নাম অলাবু।

১৪ই মে নয়াদিল্লীতে ফিরে মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক পত্র পেলেন লণ্ডন যাবার জন্য। ইতিমধ্যে ইস্‌মের হাতে পাঠানো তাঁর প্ল্যান বৃটিশ মন্ত্রিসভা গ্রহণ করায় ও মেনন আর এক প্রস্তাব নেহরুর কাছে উপস্থিত করায় যে জট পাকিয়েছিল তাতে ইচ্ছে হ'ল না লণ্ডন যেতে। মেননের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন সব কথা খুলে বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। ১৯৪৭-এর ১৮ই মে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন ভি. পি. মেননকে নিয়ে পালাম বিমানঘাঁটি থেকে লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন।

পাঁচ মিনিটে বৃটিশ মন্ত্রিসভা মেনন-রচিত মাউণ্টব্যাটেনের নতুন খসড়া অনুমোদন করলেন ২৩এ মে।

করিডর বনাম মৌন দিবস

কংগ্রেসের অমার্জনীয় দুর্বলতায় বা অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ-নীতির লালসায় স্খলিত ভারত ভূখণ্ডের পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দ আনায় খুশী না হবার ভান ক'রে জিন্না দাবী করলেন এক করিডর—পশ্চিম-পাকিস্থান পূর্ব-পাকিস্থানকে সংযুক্ত করার জন্য। ছিন্নমস্ত পাকিস্থানের ঐ নাকি ক্ষতিপূরণ। নিদ্রাকাতর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শেষ সর্বনাশের মুখে হৈ-চৈ-করে উঠলেন। কেন না, এতক্ষণ ছিল 'যা-শত্রু পরে পরে'; কিন্তু

করিডর হলে তাকে উত্তর প্রদেশ প্রাঙ্গন দিয়ে ও বিহারের হৃদয় চিরে যেতে হয়। দাক্ষিণাত্যকে তা স্পর্শ করবে না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহরু বলে উঠলেন : অসম্ভব।

মসলে এরও একটা কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন :

> "Congress reacted to the demand with the startled yelps of a pack of dogs among whioh a firecracker has been thrown, but they quickly regained their composure on discovering that it was all noise and no damage."

এবং গান্ধীজীও তাঁর কথকতায় দেশবিভাগের বিরুদ্ধে গেয়ে চলেছেন : "কেউ যেন না বলে গান্ধী দেশবিভাজনে হাত দিয়েছেন।" বলে ছুটে এলেন দিল্লীতে। "আমি সারা জীবন লড়েছি। দিল্লীতে এলাম লড়তে হারবার মুখেই।" মাউন্টব্যাটেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি কৌশল করে এযাবৎ মহাত্মাকে দূরে সরিয়েই রেখেছেন, কিন্তু এবার এসে পড়ে গোলমাল বাঁধালেন বুঝি! কিন্তু দেখে আশ্বস্ত হলেন, ভয়ের কিছু নেই। এ হচ্ছে সেই, তেড়ে মেড়ে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা। গান্ধীজী এসে এক টুকরো কাগজে লিখলেন, 'এ হচ্ছে তাঁর মৌনব্রতের দিন এবং তাঁর কিছু বলবার নেই।' ব্যস্, সঙ্কট কেটে গেল।

মৌলানা আজাদও এসেছিলেন শেষরক্ষা করতে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন।

জিন্না নিঃসন্দেহে তামাসা দেখছিলেন, কেননা, তাঁর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন জিন্নার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন : "His delight was unconcealed."

বোধ হয় কথা উঠেছিল এবং পরে কাজে হাসিল হয়েছিল যে, পাকিস্থান যদি তার ভূখণ্ডে অন্য কোনো রাষ্ট্রের বসত-অধিকার দেয়? নেহরু আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন : "In no event can we agree to any part of India having foreign bases or conceding extra-territorial rights."

কিন্তু করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সত্য, এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই ; পেশোয়ারে মার্কিণ-গোয়েন্দা-বিমানঘাঁটি প্রতিষ্ঠার 'খবর'

পেয়ে তিনি কিছু করতে পারেন নি, চেপে গেছলেন। যেমন পারেন নি পাকিস্থানকে মার্কিণ সমরাস্ত্র সাহায্য নিবারণ করতে। পাকিস্থান তো আর ভারত নয়, ভারতে মুসলিম লীগও নয়, ওটি একটি আলাদা রাষ্ট্র, যা-খুশী তাই করবে, করবে বলেই তো আলাদা। আমি আজও বুঝিনে, সত্য, বহু কথকতায় অভ্যস্ত নেতৃবৃন্দের মাথায় কি প্রাথমিক রাষ্ট্রজ্ঞানও ছিল না ?

কিন্তু জিন্নার এই কৌতুকও সত্যি হতে পারত মাউণ্টব্যাটেন যদি কংগ্রেসের প্রতি করুণা না করতেন। মসলে এই কৌতুকের শিরোনামা দিয়েছেন—"Please, Mr. Jinnah !"

৩০এ মে নয়াদিল্লীতে ফিরে নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্না, লিয়াকৎ, নিস্তার ও বলদেব সিংকে আমন্ত্রণ জানালেন। ২রা জুন থেকে নেতৃ-সম্মেলন হ'ল। একজন মাত্র ভারতীয় ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে গোলটেবিলে বসেছেন মাউণ্টব্যাটেন, তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে যথাক্রমে নেহরু, জিন্না, আর অদূরেই যাঁর যাঁর নেতার সান্নিধ্যে প্যাটেল, কৃপালনী, নিস্তার, লিয়াকৎ, মাঝখানে বলদেব। সব্বার সম্মতিতে সম্মেলন নির্বিঘ্নে চুকে গেল। পরদিন ৩রা জুন ওঁদের সবাইকে মাইক্রোফোনের মুখে এগিয়ে দেবার আগে সামান্য কিছু কথা হয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তখনও কংগ্রেসী মুসলমানদের শাসনাধীন, প্রধানমন্ত্রী খান সাহেব পৃথক পাখতুনিস্থান বা পাঠানি-স্থানের কথা বলে চলেছেন। মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে বললেন যে, নেহরুর অনুরোধেই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পাকিস্থান, হিন্দুস্থান অথবা স্বাধীনতা প্রশ্নে ভোট দেবার মূল প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন, এখন নেহরু আশা করতে পারেন না যে, মাউণ্টব্যাটেন এই পর্যায়ে আবার তা উত্থাপন করবেন ? নেহরু খোলাখুলি স্বীকার করলেন, তা বটে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একা টিঁকতে পারবে না। নেহরু মেনে নিলেন, সভায় এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য হবে না।

সুতরাং, ওটি নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল। জিন্না বলেছিলেন, বাংলাদেশেও গণভোট হোক, অস্পৃশ্যেরা মুসলমানদের পক্ষে ভোট

দেবেন। বড়লাট বললেন, এবার আপনার চুপ করার পালা।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ভারতীয় নেতারা বড্ড বেশী কথা কন ; ওঁদের নিবৃত্ত করা কঠিন।

কিন্তু সে কঠিন কর্তব্যও তিনি উত্তীর্ণ হলেন এবং এক এক করে যাঁর যাঁর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার জন্য মাইকের সামনে দাঁড় করালেন। ভূমিকায় মাউণ্টব্যাটেন বললেন ঃ

কেন ভারত বিভাগ

"বৃটিশ সরকার তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা এখন বৃটিশ ভারতে একটি নয় দুটি সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন, ব্যবস্থাবিধি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের মর্যাদা পাবেন। তা কয়েক মাসের মধ্যেই হবে বলে আশা করা যায়। বড়ই দুঃখের বিষয়

ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা যায় এমন কোন পরিকল্পনায়ই সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া গেল না।

কিন্তু যখন মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ দাবী করল তখন কংগ্রেস একই যুক্তিতে প্রদেশ বিভাগ দাবী করল। আমার মতে এই যুক্তি অকাট্য। মোট কথা, কোন পক্ষই যেখানে তার সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তা ছাড়তে চায়নি। আমি অবশ্য যেমন প্রদেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে তেমনি দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে। তাই, আমি ভাবলাম, ভারতবাসীরাই দেশবিভাগের প্রশ্নটি ঠিক করে ফেলুন।"

এরপর নেহরু তাঁর ভাবপ্রবণতা নিয়ে দাঁড়ালেন, 'আমার হৃদয়ের আনন্দ নিয়ে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলছিনে কিন্তু আমার মতে এই শ্রেষ্ঠ পথ। আর—আশা রাখি, শান্তি ও সমঝোতা ফিরে আসবে এই হতভাগ্য দেশে এবং কিছুকাল বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন হবে। আশা করা যাক, যদিও স্বীকার করতে হবে, আশার কোন হেতু নেই।

সত্য, এই হচ্ছে আমাদের ভাগ্যবিধাতা রাষ্ট্র-নেতাদের কথা। পৃথক রাষ্ট্রসৃষ্টির পর পুনর্মিলন হবে, একি অজ্ঞতা না সজ্ঞান ধোঁকাবাজি?

তৃতীয় বক্তা জিন্না, নীরস, উচ্ছ্বাসহীন।

"It is for us to cosider whether the Plan as presented to us by His Majesty's Government should be accepted by us as a compromise or as a settlement. Pakistan Zindabad !"

গান্ধীজী এখানে কেউ নন, সুতরাং উপস্থিতও ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রার্থনাসভায়। একদিন বললেন, যা হয়েছে তার জন্য বড়লাটকে দোষ দেওয়া যায় না। এ কাজ কংগ্রেস ও লীগের। বড়লাট খোলাখুলিই বলেছেন, তিনি অখণ্ড ভারতই চেয়েছিলেন, কংগ্রেস মুসলমানদের দাবী মেনে নেওয়ায় তিনি নিরুপায় হয়ে পড়েন। এখন তাঁর (গান্ধীজীর) কি কর্তব্য? তিনি কংগ্রেসের সেবক, কেন না, তিনি দেশের সেবক, তাই তিনি তার অবাধ্য হতে পারেন না। (৪ঠা জুন, ১৯৪৭) পরদিনই (৫ই জুন, ১৯৪৭) বললেন, তাঁর অন্তর্বাণী নির্দেশ না দিলে তিনি আমরণ অনশন করবেন না তো! তিনি কেন অনশন করছেন না জানতে চেয়ে অনেক চিঠি লিখছেন তাঁকে। কংগ্রেস যদি পাগলামি করে আমাকে মরতে হবে নাকি? কংগ্রেস যদ্দিন গণপ্রতিষ্ঠান আছে তদ্দিন তিনি বিদ্রোহ করবেন না। ৬ই জুনও এক সাক্ষাৎকালে বললেন, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একসঙ্গে যা চেয়েছে বড়লাট তাই করেছেন। ৭ই তারিখে এ. আই. সি. সি'কে পরামর্শ দিলেন ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে সায় দিতে। ৯ই জুন বললেন, তিনি যখন ভারত-বিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন তখন তিনি জনমতই প্রতিফলিত করেছিলেন; আজ তিনি দেখছেন সেই জনমত দেশ-বিভাগের দিকেই ঝুঁকেছে, সুতরাং, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত চাপানোর জুলুমবাজি তিনি করতে পারবেন না। তিনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসও মেনে নিলেন; বললেন, এজন্য ইংরাজদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, তাঁদের যদি ১৫ই আগস্ট ভারত ছেড়ে যেতেই হয় তবে কোথাও ক্ষমতা হস্তান্তর তো করতে হবে; তাই হবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস।

গান্ধীজীর নেতৃত্বাবসান

গান্ধীজী চরম ক্ষণ পর্যন্ত রইলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু কোথাও বাধা দিলেন না, আপত্তি করলেন না, গর্জে দাঁড়ালেন না। পক্ষান্তরে, এ. আই. সি. সি. সভায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে একই কথা বললেন।

এই চরম ক্ষণ—যখন মানুষের কর্তব্য আপন পূর্ণ সত্তায় মহিমান্বিত হয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলে—না, সেই ক্ষণেও তিনি বললেন, কেউ সংশোধনী এনো না যেন; অধিকার আছে থাক; তাঁদেরই প্রতিনিধি প্ল্যান মেনে নিয়েছেন, এ. আই. সি. সি'র কর্তব্য হবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা প্রবীণ, পরীক্ষোত্তীর্ণ নেতা, এযাবৎ সকল কংগ্রেস-সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁদেরই, তাঁরাই কংগ্রেসের মেরুদণ্ড; তাঁদের বর্তমান অবস্থায় অপসারণ করা দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক হবে। একটা জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নির্ধারণে কি অসামান্য অষ্টবক্র নেতৃত্ব, সত্য!

সত্য, যে-নির্বোধ ১৯৪৮এ গান্ধীজীকে অকারণে হত্যা করেছিল সে বা তার উৎসাহদাতারা বোঝেনি, ইতিহাসের গতিমুখে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের অধিকারী মহাত্মার রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছিল ১৯৪৭-এই। ইতিহাসের গতিমুখেই তিনি পথপ্রান্তে বিস্মৃত হয়ে যেতেন। আর তাঁর নেতৃত্ব নেবার সামর্থ্য ছিল না অথবা যে আত্মবিশ্বাসবলে সুভাষচন্দ্রের মতো শক্তিকে অনায়াসে অশ্রদ্ধেয় উপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন এবং তথাকথিত নেতৃবৃন্দকে অজগরের হরিণকে মোহগ্রস্ত করার মতো ক'রে রেখেছিলেন, সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, অথবা ঐ নেতৃবৃন্দ তাঁর চারিদিকে যে মাহাত্ম্যের আলো জ্বালিয়েছিলেন সেই তেজোঃশক্তি নিঃশেষ হয়েছিল। তাই তোমার কাছে গান্ধীজীর এসব কথা যতখানি চমকপ্রদ ঠেকবে, আমার কথা ছাড়ো, তাঁর নিত্যসঙ্গীপ্রায় মৌলানা আজাদেরও

বেদনার অবধি ছিল না। তিনি তাঁর বইয়ে "স্বপ্নাবসান" শিরোনামায় তাঁর সেই বেদনা প্রকাশ করেছেন।

মৌলানা স্পষ্টতঃই বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ও মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন; একেবারে মৌলিক পার্থক্য। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে অখণ্ড ভারতের ফেডারাল কাঠামোর মধ্যে মুসলিম লীগ স্বায়ত্তশাসন-প্রাসাদে পাকিস্থানের স্বাদ পেতে পারত; তাতেই তারা সন্তুষ্টও থাকত। এজন্য মৌলানা এটাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু প্রথম গোলমাল হল, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে মৌলানার অপসৃতির পর, নতুন প্রেসিডেণ্ট জওহরলালের মিশন প্রস্তাব সম্পর্কে নতুন সংগ্রামী ভাষ্য, লীগের সংশয় ও অসহযোগিতা, ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে এসে প্রতিপদে বাধা ও বিরক্তির সৃষ্টি, তারপর স্বর্গলাভের পথে পাণ্ডবকুলের একে একে পতন।

শেষ পর্যন্ত মৌলানার আশা ছিল দুটি: এক, লেবার মন্ত্রিসভা তাঁদেরই তিনজন মন্ত্রীরচিত পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে একক বড়লাটের পরিকল্পনা নেবেন না, দুই, গান্ধীজী। ৩রা জুন শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলে তিনি দেখলেন তাঁর সব আশা নির্মূল হয়েছে। আর ওয়ার্কিং কমিটিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রশ্নে যখন গান্ধীজীর ভূমিকা দেখলেন, তখন বুঝলেন, সকল বিরোধের এন্তেকাল ঘটেছে।

আমারও কথা শেষ হয়ে এসেছে, সত্য, দেশবিভাগ, প্রদেশ বিভাগ, সেনাবাহিনী বিভাগ, গবর্ণর জেনারেল নিয়োগ, র‍্যাডক্লিফ-বাগে-এওয়ার্ড ইত্যাদি আমার কাছে তুচ্ছ, আমার কাছে বড় তাঁদের ভূমিকা যাঁরা দেশকে এই পরিণতিতে নিয়ে এলেন; আমি তোমায় শেষ অঙ্কের দুটি বিয়োগ-গাঁথা দিয়ে আমার এবারকার বর্ণনাকে শেষ করব: একটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যার শিরোনামা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফার খান স্বয়ং দিয়েছেন—নেকড়ের মুখে বিসর্জন—আর পাঞ্জাবের নির্মম স্বাধীনতার রক্ত প্রবাহ, অহিংসবাদীদের সকল মিথ্যা অহঙ্কার যেখানে রুদ্ধ প্রতিহিংসায় হাহাকার করে ফিরছে।

নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ

৩রা জুনের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উঠল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমস্যা। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই যে নেহরুর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের কথা হয়ে গেছে মৌলানা সম্ভব তা জানতেন না। তিনি লিখছেন: "আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে গান্ধীজীর সায় দেখে আমি বিস্মিত ও আহত হয়েছিলাম। তিনি এখন ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশ বিভাগের পক্ষে বললেন। আমি যেহেতু এর আভাস আগে পেয়েছিলাম এজন্য আমার কাছে এ তত বিস্ময় সঞ্চার করতে পারে নি। কিন্তু খান আবদুল গফফার খানের প্রতিক্রিয়া কেবল অনুমানই করা চলে। তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। তখন তিনি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আবেদন করলেন এবং কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি সর্বদাই কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছেন। এখন যদি কংগ্রেস তাঁকে পরিত্যাগ করে সীমান্তে তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হবে। শত্রুরা হাসবে, বন্ধুরাও বলবেন, যদ্দিন সীমান্তে কংগ্রেসের দরকার ছিল, সে খুদাই খিদমতগার-দের সমর্থন করেছে। কিন্তু যখন মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষে আসতে চাইল, সীমান্তের সঙ্গে ও তার নেতাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সলা না করে দেশবিভাগের বিরোধিতা পরিহার করল। খান আবদুল গফফার খান বার বার বলতে লাগলেন, কংগ্রেস যদি এখন খুদাই খিদমতগারদের নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করে সীমান্তবাসীরা এই কাজকে বেইমানি বলে গণ্য করবে।"

গান্ধীজী কিছু বিচলিত হয়েছিলেন। কথাটা তিনি মাউন্টব্যাটেনের গোচরে আনবেন একথা বলা ছাড়া তাঁর কিছু করবার ছিল না। তুলেও ছিলেন কথাটা বড়লাটের কাছে। বড়লাট বলেছিলেন, দেখব বলে জিন্নাকে। তিনি তো জানেন আসলে কথা হয়ে গেছে নেহরুর সঙ্গে।

জিন্না অবশ্য খান আবদুল গফফার খানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। দিল্লীতে সাক্ষাৎও হয়েছিল, কিন্তু কথা অসমাপ্ত থেকে গেছে।

"এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কংগ্রেস একবার যখন দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে তখন খান আবদুল গফফার খান ও তাঁর দলের কি ভবিষ্যৎ থাকতে পারে ? মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানের ভিত্তিই হচ্ছে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোকে আলাদা করে একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। সীমান্তপ্রদেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীই মুসলমান। সুতরাং, এটি পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও সীমান্তপ্রদেশ প্রস্তাবিত পাকিস্থান-অঞ্চলভুক্ত। ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগের কোনো উপায়ই থাকবে না।"

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য একটা সান্ত্বনা দিলেন যে, সীমান্তপ্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। পাকিস্থান বা ভারত কার সঙ্গে যোগ দেবে তাই নিয়ে সেখানে গণ-ভোট নেওয়া হবে। সীমান্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব আপত্তি করেন নি ; তবে নতুন একটা কথা জুড়ে দিতে চেয়েছেন। গণভোটই যদি হয় তো পাখতুনিস্থানের প্রশ্নেও নেওয়া হোক। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এটি নাকচ করে দিলেন। জিন্নাও মানলেন না। তখন খাঁ ভাইয়েরা ঐ গণ-ভোট বর্জনের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু উপসংহারে এই আহ্বানে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

পিয়ারীলাল তাঁর Thrown To The Wolves বইয়ে সেই ওয়ার্কিং কমিটির একটি মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন :

> "So, Mahatmaji, you will henceforth regard us as Pakistanis, aliens, will you not ?"

বাদশা খাঁ বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলেছিলেন গান্ধীজীকে। আরও বলেছিলেন, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নসীবে জবর হয়রানি আসন্ন। জানিয়ে কি করব।

গান্ধীজী তাঁর অভ্যস্ত বচনে বলেছিলেন, অহিংসায় হতাশা নেই। পাকিস্থান হলে আমার স্থান হবে পাকিস্থানেই।

১৯৪৭ এর ৩রা আগস্টও গান্ধীজী বলেছিলেন ঃ

"The rest of my life is going to be spent in Pakistan, may be in East Bengal or Western Punjab or perhaps North West Frontier Province."

সেদিন বাদশা খান আর প্রশ্ন করেন নি।

পাকিস্থান হবার পর গান্ধীজীও পাকিস্থানকে তাঁর বাসস্থান করেন নি।

সত্য, অন্যান্য ফেলে আসা ঘটনার মতই, যদি অবকাশ পাই, তোমায় শোনাবো সীমান্ত কাহিনীও, বলে এক তাড়া কাগজ দেখালেন টাইপ করা, তারপর বললেন, পাঞ্জাব কাহিনী দিয়ে ৪৭ এর ইতিহাস শেষ করব, তারও আগে একটু কথা।

গান্ধীজী কোন একদিন ইংরাজদের বলেছিলেন, তোমরা যাও না চলে আমাদের অরাজকতায় ফেলে, সে আমরা বুঝব। ইচ্ছে করে সম্ভবত নয়, কিছু চালের ভুলেই মনে করি, ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক আগে অখণ্ড ভারতবর্ষকে ইংরাজেরা অরাজকতায় ফেলে দিয়েছিলেন। মৌলানার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়েও মাউণ্টব্যাটেন যথেষ্ট সতর্ক হন নি। পাঞ্জাবের ট্রাজেডি তারই সাক্ষাৎ ফল।

সেনাবাহিনী ভাগ বাঁটোয়ারা

দেশভাগ হলে সেনাবাহিনী ও তাদের আনুগত্যও যে বিভক্ত হয়ে যাবে একথাটি ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেক (Auchinleck) ভেবে দেখেন নি, ভেবে রেখেছিলেন জেনারেল টুকের (Tuker)। কিন্তু এ সম্পর্কে যে কাগজপত্র তৈরী করেছিলেন, তা উপেক্ষাভরে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। জেনারেল টুকের লিওনার্ড মসলেকে বলেছেন ঃ

"It was a pity that the Paper was sidetracked in 1946, because it did forecast all the Punjab massacres of 1947. Imagine, if only they have done something then, the Government and G. H. Q. would have had no less than eighteen months in which to have everything ready......"

কিন্তু ঐ কাগজপত্তর ভুলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন। টুকেরের উৎকণ্ঠা আর যায় না। তিনি আবার প্রস্তাব করলেন কিছু বৃটিশ সৈন্য আর ৪০টি গোর্খা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে একটা সেনাবাহিনী গড়ে রাখবার। অকিনলেক তাও উড়িয়ে দিলেন।

আসলে অকিনলেক সেনাবাহিনীই ভাগ করতে চান নি। মাউণ্টব্যাটেন, ইস্‌মেরও ইচ্ছা, অখণ্ড সেনাবাহিনী আরও কিছুকাল থাকে। কিন্তু আপত্তি জানালেন নেহরু-জিন্নাই। নিজস্ব সৈন্য নেই তো স্বাধীনতা কি? ১৫ই আগস্টের আগেই পৃথক পৃথক সৈন্য চাই।

অকিনলেক কিছুতেই রাজী হন না। তখন বড়লাট বাধ্য হয়ে হুকুম দিলেন, অবিলম্বে তিনি যেন সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেন।

এত সত্ত্বেও পুনর্বিন্যাসের কাজ জুলাইয়ের আগে আরম্ভ করা হয়নি। নির্দেশও গেল খুব সতর্কতা রক্ষা করে। অকিনলেকের আসল ভাবনা ছিল ইংরাজদের জন্য; ওঁর ধারণা ছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-নিধন সুরু হয়ে যাবে। তাঁর ভাবনাটা ঐ পথ ধরে চলেছে বলে, আর কারও বিপদ তিনি ধরেন নি। ইংরাজদের রক্ষার জন্য বৃটিশ সৈন্য রক্ষার প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন। এতে ভুল বোঝাবুঝি হবে মনে করে মাউণ্টব্যাটেন আপত্তি জানান, বৃটিশ সরকারও তাঁকে সমর্থন করেন।

দেশ বিভাগের প্রস্তাবনাস্বরূপ প্রদেশ বিভাগের যে কার্যসূচী ছিল তা সম্পন্ন হল যথাক্রমে ২০এ ও ২৩এ জুন বাংলা ও পাঞ্জাবে। বাংলায় কলকাতা ও নোয়াখালীতে লীগের "লড়কে লেঙ্গে" হয়ে গেছে ৪৬-এই। কিন্তু পাঞ্জাবকে নিয়েই দেশবিভাগের 'আইডিয়া'।

পাঞ্জাব—পাঞ্জাব

নেহেরু পাঞ্জাব ঘুরে এসেছেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ দেখে এসেছেন। মার্চ ও এপ্রিলে ২০০০ মানুষ নিহত হয়েছে। 'I have seen ghastly sights and I have heard of

behaviour by human beings which would degrade brutes.' কিন্তু তিনি যদি ৪৬-এ কলকাতা দেখতেন বা তার কিছু শুনতেন, তবে হয়তো ৪৬-এর আগস্টেই এমনি চিত্তের অস্থিরতা আসত; এখানে ৬,০০০ মানুষ তো সরকারী হিসেবেই মারা গেছে, ১০,০০০ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি নোয়াখালীর কিছু শুনেছেন, বিহারে কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, এবং বমবর্ষা করার হুমকিও দিয়েছেন। কিন্তু পাঞ্জাবের সদ্যসূচনা দেখে তাঁর হিম্মত গেল, সর্দার প্যাটেলের কাছে সবই অদর্শন ছিল, কিন্তু পাঞ্জাবের সংবাদে দিল্লীও বুঝি যায় সেই ভয়ে তাঁর হিম্মত গেল। তারপর লেডী মাউণ্টব্যাটেন পাঞ্জাবে দেখে এলেন।

> "all the horrors of communal savagery—a child with its hands chopped off, a pregnant mother disembowelled···
> ইত্যাদি।

সুতরাং, কাটো পাঞ্জাবকে সাম্প্রদায়িক করাতে; কাটো দেশকেও। রক্তপাত নিবারণই নাকি ছিল সব চাইতে বড় যুক্তি, যতটুকু পাওয়া ততটুকু রাজ্যলাভের লোভে নয়। রক্ত-পিয়াসীরা নিবৃত্ত হয়েছিল পাঞ্জাব কেটে, দেশ কেটে? একথার জবাব দিয়েছে রুধিরাক্ত ছিন্নাঙ্গ পাঞ্জাব, বাংলা। সারা পৃথিবীতে প্রচার চলেছে, ভারতবর্ষ অহিংসপথে বিনা রক্তপাতে ৪৭-এর স্বাধীনতা এনেছে এবং এই সত্যবাদী প্রচারকদের মাথার ওপর দেবনাগরীতে লেখা 'সত্যমেব জয়তে'। বিশ্বের সব চাইতে বড় মিথ্যাকে লজ্জা দিয়ে বলা হয়ে থাকে, এজন্য মুসলিম লীগ দায়ী, জিন্না দায়ী, ভারতের আরও ত্রিশকোটী মানুষের কোন দায় দায়িত্ব নেই এবং কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিষ্পাপ।

ইতিহাস তা বলবে না।

২৩-এ জুন পাঞ্জাব বিভক্ত হল ৫০-২২ ভোটে। তোমায় আর একটি কথা বলে রাখি, সত্য, এসব ভোট কিন্তু ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভোট, এতেই দেশবিভাগ এবং এতেই সংবিধান পরিষদ, এতেই সংবিধান, এবং তা থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দের ইচ্ছামতো বারবার দশবার সংবিধান সংশোধন।

২৬এ জুন গান্ধীজী এই আশঙ্কা ও প্রার্থনা জানালেন যে, লাহোর অমৃতসর গুরগাঁও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হবে। অহিংসার যাদু প্রয়োগে তিনি সেখানে যান নি।

২৮এ জুন অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি নয়াদিল্লী থেকে জানালেন যে, তিনি এইমাত্র পাকিস্থান থেকে ফিরলেন, লাহোর জ্বলছে দেখে এসেছেন। গৃহ-পরিজন-রিক্ত ছিন্নমূল শরণার্থীরা দিশেহারা হয়ে ছুটে আসছে স্টেশনের দিকে। লাহোর স্টেশন ভীত সন্ত্রস্ত জনগণে আকীর্ণ।

প্রায় একমাস পর বিভাজন পরিষদ রাজী হলেন পরিবর্তনকালে পাঞ্জাবের শান্তিরক্ষায় একটি স্পেশ্যাল মিলিটারী গঠন করতে। ১লা আগস্ট থেকে; পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ১২টি জেলা এর আওতায় পড়বে। বিভাজন পরিষদে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতি-নিধিরা ছিলেন। এত সর্বনাশের পর ২৪এ জুলাইয়েও ঢিমে তালে চলছে সব। প্রধান সেনাপতির কথা তোমায় বলেছি। নেতারা ব্যস্ত ছিলেন কাকে বা কাকে কাকে দুই ডোমিনিয়ানের গবর্ণর জেনারেল করা যায় তারই ফয়সালা নিয়ে। এও এক কাহিনী, সত্য, এবং কাহিনীতে কেবল গান্ধীজী বা কংগ্রেসের পরাজয় নয়, মাউণ্টব্যাটেনেরও পরাজয় জিন্নার কাছে। 'ভালো-মানুষ' কংগ্রেস খুশী মনে মাউণ্টব্যাটেনকেই মধ্যবর্তীকালে গবর্ণর-জেনারেল রাখার পক্ষপাতী; জিন্নাজীর তুষ্ণীম্ভাব। মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের প্রস্তাবে খুশী হয়েছিলেন, জিন্নাজীকে নানাভাবে পটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভবী ভোলেনি। ১০ই জুলাই কমন্স সভায় প্রধান-মন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলী ঘোষণা করলেন, মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল হবেন।

গান্ধীজী অমনি মন্তব্য করলেন, জিন্নাজী পাকিস্থান ডোমিনিয়ানের গবর্ণর জেনারেল হয়ে কথার খেলাপ করেছেন। জিন্নাজীও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিসের খেলাপ? গান্ধীজী বলেছিলেন, তিনি যতটা জানতেন,

তা হচ্ছে কংগ্রেস ও লীগ এবিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, দুই ডোমিনিয়ানে একজন গবর্ণর জেনারেল হবেন। তারপর জিন্না নিজেই পাকিস্থান ডোমিনিয়ানের গবর্ণর জেনারেল হতে চান। গান্ধীজী অবশ্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আশ্বস্ত হবার জন্য বললেন, এই তো ভালো, যদ্দিন ভারত ডোমিনিয়ান স্তরে থাকছে তদ্দিন একজন বৃটিশ গবর্ণর জেনারেলের অধীন থাকাই তো ভাল। গবর্ণর জেনারেল ইংরাজ, না, ফরাসী, না আর কোন জাতের, তাতে কিছু যায় আসে? যায়ও যে এবং আসেও যে তা মাউণ্টব্যাটেন খুব ভালভাবেই বুঝেছেন, গান্ধীজী, নেতৃবৃন্দ, ভারতবাসীও বুঝেছেন। কিন্তু উপায় ছিল না। পাকিস্থানের প্রথম গবর্ণর জেনারেল একজন পাকিস্থানীই; ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল একজন ইংরাজ।

জিন্না স্পষ্ট করে বলেছিলেন, কে বলেছে, ভারত পাকিস্থানের একজন গবর্ণর জেনারেল রাখার প্রস্তাবে মুসলিম লীগ প্রথমে রাজী হয়ে পরে পিছিয়ে গেছে? অমৃতবাজার পত্রিকা প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন্‌টি সত্য?" এটলী বলেছেন, হালে দেখা যাচ্ছিল, মুসলিম লীগ একজন পৃথক গবর্ণর জেনারেলের পক্ষপাতী।

মসলে এ বিষয়ে এক বিশদ ও কৌতুকময় বিবরণ দিয়েছেন।

হিজ একসেলেন্সি জিন্না

যে দিন পাঞ্জাব বিভাগ হল, সেই ২৩এ জুনও গড়িয়ে গেল, মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর স্টাফের আপ্রাণ নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও ৫ই জুলাই লিয়াকৎ আলি খান এক বিপরীত চিঠি দিলেন বড়লাটকে: জিন্নাজী মনঃস্থির করে ফেলেছেন; হিজ একসেলেন্সি যেন পাকিস্থানের গবর্ণর-জেনারেল পদে মহম্মদ আলি জিন্নার নামই সুপারিশ করেন।

১৮ই জুলাই "ভারত স্বাধীনতা বিল" বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। মসলে লিখেছেন:

"On 4 July 1947 the Indian Independence Bill was introduced in the House of Commons, and passed into law a

fortnight later. It included a clause confirming the appointment of Admiral Lord Mountbatten as the first Governor-General of India. There was also a clause confirming the appointment of Mohammed Ali Jinnah as Governer-General of Pakistan. Neither man had any doubt who had emerged the victor from the manoeuvres and intrigues of the past weeks."

সত্য, আমাদের ৪৭-এর স্বাধীনতা পেতে আর এক মাসও নেই ; অশান্ত পাঞ্জাবের পটভূমিকায় ভারত-পাকিস্থান প্রতিনিধি-সমন্বিত বিভাজন-পরিষদ স্বাধীন দিনের দিন কুড়ি আগে একটা সদিচ্ছার প্রস্তাব নিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, হে সংখ্যালঘুগণ, সমব্যবহার সম্পর্কে তোমরা সুনিশ্চিত হও ; কংগ্রেস লীগ দু'জনই এই আশ্বাস দিয়েছে, ভয় কি ? সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে, থাকবে বাক্ স্বাধীনতা, সংগঠনের, ধর্মচর্চার, ভাষার, সংস্কৃতির স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, দুই সরকারই হিংসা দমনে বদ্ধ পরিকর ।

দূর-ভবিষ্যৎ নয়, সত্য, অদূর ভবিষতের দ্বার খুলি, তুমি দেখ। ক্যালেণ্ডারের চলমান তারিখগুলো গড়িয়ে গিয়ে যখন স্বাধীনতার ১৫ই আগস্ট স্থির হয়ে দাঁড়াল তখন তার সর্বাঙ্গে রক্ত ; দিল্লীর দরবার হলে যখন খণ্ডিত ভারতের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর মন্ত্রিসভা, নেহরু প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, ভারত ডোমিনিয়ানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিচ্ছেন তখন পাঞ্জাব রুধিরাক্ত। যে বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ বিভিন্নদেশের কূটনীতিক এই দরবারের শোভাবর্ধন করেছিলেন তাঁরা কেউ জানেন না, ঐতিহাসিক উৎসবের অন্তরালে মনুষ্যত্বের ক্ষমাহীন অবমাননা চলছে, পঞ্চনদে অবিরাম শোনিতস্রাব।

ঠিক এই মুহূর্তে রাওয়ালপিণ্ডি অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ; লাহোর থেকে ট্রেন আসছে না ১৪ই আগস্ট থেকে তো বটেই। পাকিস্থানে তখন ডোমিনিয়ানের ঊষা। ভারত ডোমিনিয়ানের প্রাক্-প্রদোষ। কোন ডাক আসছে না, কোন সংবাদপত্র নয়, সংবাদ নয়।

ছদিকে চলেছে ঘর ছাড়ার পালা—সীমান্ত, সীমান্ত, নিরাপদ সীমান্ত, কে কতদূরে, কোথায় দাগ পড়েছে পাক-ভারতের? পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী জরুরী তার পাঠাচ্ছেন: "grave comumnal flare-ups."

উৎসবের রবি-রশ্মি অতিক্রান্ত হয়ে নেতৃবৃন্দ কালো যবনিকা উত্তোলন করলেন। "তিন দিন আগে হয়ে গেছে উৎসব। এই উৎসবে যোগ দিতে পারে নি এক পাঞ্জাব। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে আনন্দোল্লাসের বদলে ঘটেছে সর্বনাশ আর ভয়াবহ লাঞ্ছনা"—দুই ডোমিনিয়ানের দুই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও লিয়াকৎ আলি বললেন ১৮ই আগস্ট।

"লাহোরের শেষ খবর হচ্ছে, লাহোর-অমৃতসরে শান্তি ফিরে এসেছে। লাহোরের যে শান্তি তা কবরের। সহরের পাঁচ লক্ষ সংখ্যালঘুর মাত্র কয়েকশ এখনও আছে। ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই লাহোরে যা হয়েছে তা হৃদয়বিদারক। প্রাচীর ঘেরা সহরটি ধ্বংসস্তূপ।"

১২ই আগস্টে কিছু খবর এসেছিল: "গত ২৪ ঘণ্টায় অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। কোন কোন এলাকায় এখনও হানাহানি চলছে, কিন্তু সেনাবাহিনীরও গুলী চলছে দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে। গত ২৪ ঘণ্টায় বড় বড় গুণ্ডাদলের উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে।" বললেন পাঞ্জাব সীমান্ত বাহিনী। খবর আসলে ১০ই তারিখের।

ঐ খবরে আরও বলা হ'ল, এখন গোলমালের প্রধান উপলক্ষ্য হ'ল উভয় সম্প্রদায়ের শরণার্থীরা। অধিকাংশ সহর অপেক্ষাকৃত শান্ত।

২৯এ আগস্ট সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের রিপোর্ট হচ্ছে: "পঞ্চনদের সুন্দর ভূখণ্ড আজ গৃহযুদ্ধের নখর-ভিন্ন। একদিক থেকে গৃহযুদ্ধের চাইতেও এ জঘন্য; কেননা, এখানে বীভৎস, আদিম অন্ধ প্রতিহিংসার লক্ষ্য আত্মরক্ষায় অসহায় সংখ্যালঘুরা। লাহোর—একদা আনন্দ নগর—আজ মৃতের সহর; সর্বত্র এর শোকছায়া, মানুষ কি কোনকালে হেসেছে? বাইরে জনাকীর্ণ শরণার্থী শিবিরে একজনও তো হিন্দু বা শিখ দেখলাম না। যোগাযোগ ব্যবস্থা পঙ্গু, সত্যি খবর চলেনা।

হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ শরণার্থী বয়ে নিয়ে চলেছে, আসছে অগ্নিদাহের, লুণ্ঠনের, কসাই বৃত্তির অফুরন্ত পৈশাচিক কাহিনী। পুলিশ মিলিটারীও যোগ দিয়েছে এই তাণ্ডবে, তাদেরই ওপর ভার ছিল লোকরক্ষার। শেখপুরায় দুদিনে যারা মরেছে তারা এদের গুলীতেই।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সাংবাদিকদের নয়াদিল্লীতে বললেন : "সরকারী হিসেবমতো পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবে নিহতের সংখ্যা হচ্ছে ১৫,০০০; কিন্তু তিনি মনে করেন, সংখ্যাটা খুবই কম, অনায়াসেই এর দ্বিগুণ তিনগুণ হবে। মনে হচ্ছে, সোয়া বারো লক্ষ শরণার্থী পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে এবং বিপরীত পথে সমসংখ্যক; দুদিকের পথে আছে ৫০ হাজার করে; আরও ৫০ হাজার করে আসতে প্রস্তুত। হয়তো আরও। তবু আমরা লোক বিনিময় চাইছি নে।"

অন্ত্যেষ্টির মন্ত্র

তথ্যসমৃদ্ধ লিওনার্ড মসলের "দি লাষ্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ" থেকে স্বাধীনতার শহীদ বেদীমূলে এস শেষ তর্পণ করি। তোমার মনে পড়ে, বিপ্লবী আন্দোলন বলতে গিয়ে একটা ছোট্ট ইস্তাহারের শিরোনামা বলেছিলাম : 'রক্ত বিনা হে দেশভক্ত দেশ না স্বাধীন হবে।' এ সেই রক্ত তর্পণ!

"১৯৪৭-এর আগষ্ট ও পরের বছর বসন্তকাল পর্যন্ত ন'মাসে ১,৪০,০০,০০০ থেকে ১,৬০,০০,০০০ হিন্দু, শিখ ও মুসলমান ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। রক্তপিপাসু জনতার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য। ঐ একই সময়ে ৬,০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে। কিন্তু, না, নিহত বলতে যা বোঝায় তা নয়। শিশু হ'লে তার পা দুটো তুলে ধরে আছড়ে মেরেছে দেওয়ালে। কিশোরী হলে ধর্ষণ করেছে। যুবতী হলে বলাৎকারের পর স্তন কেটে দিয়েছে। অন্তঃস্বত্বা হলে পেট কেটে ফেলেছে।......

"ট্রেনের পর ট্রেন এসেছে লাহোরে, যাত্রী পরিপূর্ণ ট্রেন, সব মৃত, বগিগুলোর গায়ে লেখা ঃ ভারতের উপহার। তেমনি ট্রেন ভরতি হিন্দু শিখের শব পাঠিয়েছে মুসলমানেরা ঃ পাকিস্থানের উপহার। যেদেশে গান্ধীর প্রেরণায় অহিংসাকে জাতীয় ধর্ম বলে গ্রহণ করেছে, সেখানে এই হত্যা, লুট, অগ্নিদাহ ও নারীধর্ষণ; চেঙ্গিস খাঁর কালের পর পৃথিবীর আর কোথাও যা হয়নি। ডি এফ কারাকা নামে এক ভারতীয় সাংবাদিক এসময়ে এক পুস্তিকা লিখে বলেছিলেন ঃ 'স্বাধীনতায় দুর্গন্ধ নেই।' কিন্তু সারা ভারত দুর্গন্ধ পরিপূরিত হয়েছিল—অগণিত মৃতদেহের পূতিগন্ধ, দুস্কৃতির পাঁক, আর অগ্নিশিখা।

"India in 1947 was a bumper year for vultures."

"শকুনের স্বর্গ হয়েছিল ১৯৪৭এর ভারত। সুদূর আকাশ থেকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে পেতে হয়নি তাদের পচা মাংস, এ তাদের চারদিকে, জন্তুর মানুষের। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসছিল ৭৪ মাইল দীর্ঘ শিখ ও হিন্দুর এক কনভয়; সারা পথে তারা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রমণ-কারীদের খুঁজতে হয়নি কক্ষণো—কলেরা ও মহামারীর ঘ্রাণেই বুঝতে পারত ওরা আসছে। তাদের এমনি মেজাজ যে, যদি দেখেছে উল্টো পথে তেমনি একটা মুসলিম শরণার্থীর কনভয় আসছে, ভারতীয় কনভয়ের সমর্থ ব্যক্তিরা কিছু হত্যায় লিপ্ত হয়ে পড়ত।

"৬,০০,০০০ মৃত। ১,৪০,০০,০০০ গৃহবিতাড়িত। ১,০০,০০০ তরুণী উভয় দিকে অপহৃত, জবরদস্তি ধর্মান্তরিত অথবা নীলামে বিক্রীত। একবার একটা চেষ্টা হয়েছিল যুক্ত পাক-ভারত কমিশনের উদ্যোগে এই অপহৃতা তরুণীদের উদ্ধারের; সফল হয়নি। পাকিস্থানীদের অনুযোগ, ভারত ধর্ষিতা স্ত্রীকন্যা ফিরিয়ে নিতে চায়নি।"

মসলের উপসংহার ঃ

"স্বাধীনতার জন্য ৬,০০,০০০ ভারতীয় প্রাণ হারালো, ১,৪০,০০,০০০ মানুষ গৃহহারা হ'ল। মানুষেরা পশু হয়ে গেছল। অন্ততঃ একটা যুগ পাক-ভারত সীমান্তের আকাশ বায়ু তিক্ত হয়ে ছিল। অকারণ।

"হওয়া উচিত ছিল না। এরকম বেপরোয়া গতিতে যদি স্বাধীনতাকে হিঁচড়ে না আনা হ'ত, এ হ'ত না। নিদারুণ পরিণতির কথা কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আর কোথাও এত দক্ষতা, এত নৈপুণ্য, এত সৌকর্যের সঙ্গে ৩৫ কোটী মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়নি।

"মে মাসে পার্টিশান, আগস্ট মাসে স্বাধীনতা; কিন্তু এদেশের উৎকণ্ঠিত নরনারীর জিজ্ঞাসু মনকে ইচ্ছে করে অন্ধকারে রাখা হয়েছে—স্বাধীনতার দুদিন পরে জানল।

"......একটু ধৈর্য ধরলে সকল দুঃখ পরিহার করা যেত। পাকিস্থান একটি মাত্র মানুষের কীর্তি—মহম্মদ আলি জিন্নার; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। একটু মাত্র ধৈর্য। না, এত তাড়াহুড়ো নয়, এইটুকু বলা।

> "But for Nehru and Patel and all the Congressmen yearning for the fruits of power, the carrot Mountbatten dangled in front of their noses was too delectable to be refused. They gobbled it down."

নেহরু মসলের কাছে বলেছেন, ১৯৬০খৃস্টাব্দে, নাকের ডগায় ঝুলন্ত আঙ্গুর গিলে ফেলার তের বছর পর: "আমাদের কোন ধারণাই ছিল না এত হত্যা হতে পারে, কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্ককে এত তেতো করে তুলতে পারে।"

এই রাজনৈতিক প্রাজ্ঞদের হাতেই কোটী কোটী ভারতবাসীর ভাগ্য করায়ত্ত ছিল, অহিংসার মিথ্যা জাল বুনে যাঁরা বিপ্লবী ভারতকে বন্দী নতুবা নির্বাসিত করতে পেরেছিলেন। মসলে পাঞ্জাবের হিসেব ধরেছেন। বাংলা দেশের রক্ত ঝরা দেখেন নি, দেখেন নি সারা ভারতে ছড়িয়ে-পড়া বাঙালী ভিখারীর দলকে। সশস্ত্র বিপ্লব কি, সত্য, এর চাইতেও ভয়াবহ হ'ত, না, একটা বলিষ্ঠ জাত জন্মাত?'

তারপর......তারপর......তারপর......

বলতে বলতে উঠে গেলেন তক্তপোষ থেকে; জীর্ণ ঘরের জীর্ণতর পশ্চিমের বেড়ায় প্রলম্বিত একখানি মলিন ধুতি স্পর্শ করলেন, তারপর সেটি তুলে ধরলেন :

একখানি মানচিত্র, ছিন্নাঙ্গ ভারতবর্ষ, পঞ্চনদ বয়ে আরব সাগরে আর পদ্মা গঙ্গা বয়ে বঙ্গোপসাগরে অনর্গল ঝরছে—রক্ত!

ঝরছে ওঁর দু'চোখ বেয়ে জল, টপ, টপ, টপ, অবিরাম!